অখণ্ড লালনসংগীত

আবদেল মাননান সম্পাদিত

অখণ্ড লালন সঙ্গীত

অখণ্ড লালনসঙ্গীত

পটভূমি • সংগ্রহ • সঙ্কলন • সম্পাদনা

আবদেল মাননান

অখণ্ড লালনসঙ্গীত
আবদেল মাননান

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
অফিস : ৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদচিত্রণ
মাহবুব কামরান

মেকআপ
খোরশেদ আলম সবুজ

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা

জগত গুরু সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতীর পাদপদ্মে

যিনি

এই

লালন-অন্ধের

অন্তর্দৃষ্টি

উন্মীলন

করেন

প্র কা শ কে র ক থা

আনন্দের সমাচার সালে একুশের বইমেলায় কবি আবদেল মাননানের 'অখণ্ড লালনসঙ্গীত', 'লালনদর্শন' ও 'লালনভাষা অনুসন্ধান' দুখণ্ডসহ মোট চারটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন গ্রন্থ রোদেলা একত্রে পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছে। ফকির লালন শাহের উপর একসাথে এতোগুলো মৌলিক-গবেষণাগ্রন্থ ইতোপূর্বে আর কেউ প্রকাশ করেছে বলে আমাদের জানা নেই। কোনো শ্লাঘা নয়, এটাই আমাদের কাজ।

এ পর্যন্ত যতোগুলো লালনসঙ্গীত সংগ্রহ ও সঙ্কলন গ্রন্থিতরূপে বাজারে এসেছে সবকটির সংগ্রহ সংখ্যার পুরনো রেকর্ড ভেঙে সর্বাধিক ৯০৪টি কালাম সমৃদ্ধ 'অখণ্ড লালনসঙ্গীত' সংগ্রহ আমরাই পাঠক সমীপে প্রথম নিবেদন করলাম। এ পর্যন্ত প্রকাশিত সর্বাধিক সংখ্যক আদি লালনসঙ্গীত পাঠকদের হাতে পৌছে দেয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। পাশাপাশি লোকোত্তর দর্শনের আলোকে রচিত আবদেল মাননানের 'লালনদর্শন' নামক গ্রন্থটি পাঠককে গভীরতর শুদ্ধজ্ঞানের ধারায় সম্যক লালনজ্ঞান আহরণে যেমন সহায়ক হবে তেমনই দুখণ্ডে বিন্যস্ত 'লালনভাষা অনুসন্ধান' স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণানুক্রমিক শৃঙ্খলায় লালনভাব-সাধুভাষাবাক্যের সংজ্ঞা ও রূপক অর্থ অনুধাবনের আভিধানিক প্রয়াসও লালন গবেষণার ইতিহাসে নতুনতর মাত্রাযোগ করেছে। লালনসঙ্গীতের পাশাপাশি তাঁর দর্শন আর অর্থ নির্দেশনা সমৃদ্ধ সার্বিক এ সুসমঞ্জস উপস্থাপনা লালনপ্রেমী রসিক-পাঠকদের পক্ষে নিশ্চয় বাড়তি পাওনা।

রোদেলা'র প্রকাশনা মানের গুরুত্ব বিচারে অবশ্য 'লালন শাঁইজি' সর্বশীর্ষতম বিষয়। তাই রোদেলা'র প্যাভেলিয়ানই একমাত্র 'লালন প্যাভেলিয়ান' ২০০৯ সালে বাংলা একাডেমীর একুশে বইমেলায়।

এতোদিন ধরে যে লালনকে আমরা জেনে শুনে এসেছি কবি আবদেল মাননান সেসব বদ্ধমূল ধারণা একেবারে উল্টে দিলেন। অন্য এক লালনকে তিনি উন্মোচন করলেন যাঁকে পৃথিবীর মানুষ এমনভাবে আর কখনো দেখেনি। শুধু তাই নয়, বাজার চলতি সব লালন গবেষণা-প্রকাশনাকেও কবি বড় রকমের এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। এতোদিন যাবৎ লালনের নামে কাঠমোল্লা শ্রেণী ও কলোনিয়াল বুদ্ধিজীবীদের আরোপিত ভ্রান্ত সব মতান্ধতা সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে দিলেন তিনি। দুঃসাহসী কবি আবারো হাতে কলমে প্রমাণ করলেন, লালনচর্চার প্রাণভোমরা তাঁর 'দেলকোরান'। ফকির লালন শাহ্‌কে স্থূল ভাগাভাগির ঘেরাটোপ থেকে সযত্নে বের করে এনে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিলেন। তাঁর আগে এতো গভীর দরদ আর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ফকির লালনকে দেখার চোখ আর কোনো বাঙালি কবির হয়নি।

বিলম্ব হলেও এ সাধু কবির অন্তর্লীন লালনচর্চাকে আমরা সদয় পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে স্বস্তিবোধ করছি। সেই সাথে দীর্ঘকালীন গবেষণা কাজে যে সাধু-সুধীগণ উদার হৃদয়ে কবিকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতিও নিবেদন করছি রোদেলা'র বিনম্র ভক্তি।

কৈ ফি য় ত

সুফি সম্রাট ফকির লালন শাহের তত্ত্ব, লীলা ও দেশ তথা দেহভিত্তিক মহাসঙ্গীত উদ্যানে মালাগাঁথার এ মালিকাগিরি শুরু হয়েছিলো একযুগেরও অধিক সময়কাল পূর্বে। সেই উত্থানপতন বন্ধুর দীর্ঘ কাহিনি বলার জায়গা অবশ্য এটা নয়। সালে হঠাৎ বাংলাবাজার ঢাকার 'নালন্দা প্রকাশনী' আমার সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'অখণ্ড লালনসঙ্গীত' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি 'লালনসমগ্র' নামে ছেপে বাজারজাত করে। 'অখণ্ড লালনসঙ্গীত'কে উক্ত প্রকাশনী 'লালনসমগ্র' নামারোপ করে ছাপে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। এতে নালন্দার অর্বাচীন প্রকাশকের 'লালনপ্রেম' নয়, বাণিজ্যবুদ্ধিই বড়ো ছিলো মনে হয়। দু'বছর আগেকার অসম্পূর্ণ সূচিপত্র, অগোছালো পাণ্ডুলিপিটি 'লালনসমগ্র' নামক গ্রন্থের মোড়কে বাজারে ছেড়ে উক্ত প্রকাশক বেশ মুনাফা লুটলেও ক্ষতিটি করেছে শাঁইজির ভাবদর্শন প্রচারের মিশনের। কারণ ওর দেখাদেখি ইদানিং আরো অনেকে 'লালনসমগ্র' ব্যবসায় নেমেছে। শাঁইজির মহাশক্তিমান জীবন্ত অস্তিত্বকে দূরে ফেলে রেখে নিরস কাগুজে স্তূপকে 'লালনসমগ্র' বলে প্রচারণার মাধ্যমে শাঁইজির সামগ্রিকতাকে খণ্ডিত করা লালনাদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থি কাজ। পরিহাসের বিষয়, শাঁইজির সর্বকালীন জীবন্ত অস্তিত্বশীলতা তথা একজন সম্যক গুরুর সাত্তিক উপস্থিতি ব্যতীত শুধু ছাপানো কাগজের ফর্মা দিয়ে কীরূপে 'ফকির' লালন শাহের সমগ্রতা বা পূর্ণতা অভিব্যক্ত হতে পারে তা আমার এ ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে একদম কুলায় না। অন্যসব রমরমা বাজারি সাহিত্যিকদের 'রচনাসমগ্র' মার্কা বাণিজ্যিক সংস্করণবুদ্ধি শাঁইজি লালনের মতো বেনেয়াজ–মোহবিমুক্ত মহাসত্তার উপর আরোপ করা ঘোরতর মহাঅপরাধ। তাছাড়া ওই প্রকাশকের অযত্নপ্রসূত তাড়াহুড়োর কারণে সে গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটি গানে ভুলের এতো ছড়াছড়ি যে, নিজে পড়তেই কষ্ট পাই। পাঠকের কষ্টের কথা ভাবলে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আসে। তাই ব্যথিত পরাণে শাঁইজিকে বলি: 'ক্ষমো অপরাধ ওহে দীননাথ, কেশে ধরে আমায় লাগও কিনারে...'।

তৃণমূল পর্যায়ে দীর্ঘদিনের শ্রমসাধ্য সংগ্রহকর্ম ও সম্পাদনা পর্ষদের সহযোগে ফকির লালন শাঁইজির ৯০১টি গানের সংগৃহীত এ পূর্ণাঙ্গ সংকলন গ্রন্থ 'অখণ্ড লালনসঙ্গীত' নামে এ প্রথমবার প্রকাশ পেলো। শাঁইজির এ 'অখণ্ড'তা তত্ত্বগত, লীলাগত এবং মনোদেহগত। রোদেলা'র রিয়াজ খান লালনকাতর প্রকাশক বলেই আমার মতো উড়োমানুষকে দিয়ে এমন অসাধ্যসাধন সাধলেন। এতে আমার বহুদিনের ভোগান্তির অবসান হলো। ভ্রান্তধারণামূলক 'লালনসমগ্র' বাণিজ্যের বিপরীতে সহৃদয় সাধক-পাঠক মহল অবশ্য স্বস্তিবোধ করবেন শুদ্ধধারায় 'অখণ্ড লালনসঙ্গীত' পাঠে ও গানে। বাজারে মেদবহুল যতো লালনসঙ্গীত গ্রন্থাকারে সাজানো আছে তার প্রায় সবই

দর্শনগত গোলমাল আর প্রয়োগিক গোজামিলে ঠাসা। শাঁইজির আদি ধরনকরণসিদ্ধ সাধুভাবের লালনসঙ্গীত সঙ্কলন গ্রন্থাকারে এ প্রথম আমরাই তুলে ধরার সাধ্যায়ত্ত চেষ্টা করলাম। ফকির লালন শাহ এমন বিশাল ও বিশেষ এক বিষয় যে, তাঁর সাধনসঙ্গীত নির্ভুল ঘরানায় সঠিকভাবে সঙ্কলিত করা কোনো পণ্ডিতমন্য ব্যক্তির সাধ্য নয়। এ কারণে দেখা যায়, বাজারচলতি 'লালনসমগ্র'গুলো নানা সস্তা ফাঁকিবাজি আর উপরিচালাকির গণ্ডগোলে ভরা। পাশ্চাত্যধর্মী প্রাতিষ্ঠানিক ঘরানার খ্যাতিযশধারি যতো ডক্টর-প্রফেসর লালনসঙ্গীত সংগ্রাহক-সম্পাদক আছেন তারা সবাই যেমন আমিত্বের অহঙ্কারবশে গোলে 'হরিবল' ঘটনপটিয়সী তেমনই ছেউড়িয়ার আনোয়ার হোসেন মন্টুর মতো তত্ত্ববোধশূন্য স্বঘোষিত 'ফকির'ও নিজের মেজাজ-মর্জিমতো তিনখণ্ডে 'লালনসঙ্গীত' বের করে শাঁইজির শানমান হানিকর বেয়াদপি করে বসে। মাঝারিদের কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য।

আমাদের প্রয়াস আত্মদর্শনমূলক সম্যক গুরুমুখি সাধনার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পথ-পদ্ধতি অবলম্বনে আদিধারার ফকিরি ঘরানা 'গুরু লালন শাহী মোস্তানি'র সুদর্শন পুনরুদ্ধারকল্প (Resilience)। ভালোমন্দ গ্রহণবর্জনের সব ভার থাকলো তত্ত্বজ্ঞানী সাধক, পাঠক, অনুঘটক ও সুজনদের হাতে।

শাঁইজির কালামগুলো সাধুসঙ্গের ঐতিহ্যে শুদ্ধরূপে বিন্যাসের উদ্দেশে প্রবীণ স্মৃতিশ্রুতিধর প্রাজ্ঞ ছয়জন সাধক এবং তিনজন তরুণ গবেষকের সমন্বয়ে মোট নয় সদস্য ঘনিষ্ট 'সংযুক্ত সম্পাদনা পর্ষদ' গঠন করা হয় পাঁচ বছর পূর্বে। যার সদস্য সংখ্যা আমিসহ দাঁড়ায় সর্বমোট দশজন। এটা টোটাল টিম ওয়ার্কের ফসল। শাঁইজির সংগৃহীত প্রতিটি কালাম সূক্ষ্ম পন্থায় শ্রবণ, পঠন, পুনর্পাঠ, বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে গ্রন্থভুক্ত করা হয় চূড়ান্ত পর্যায়ে। ইতিপূর্বে আর কখনো এমন একক ও যৌথ পদ্ধতিতে শাঁইজির কালাম সঙ্কলিত বা সম্পাদিত হয়নি কোথাও। বিগত প্রায় দুশো বছরের অবহেলা ও বিস্মৃতির কবল থেকে এখানে শাঁইজির বিলুপ্তপ্রায় শতাধিক দুর্লভ কালাম উদ্ধারের মাধ্যমে সঙ্কলিত হয়েছে। ফলে শাঁইজির সঙ্গীতভাণ্ডার সংখ্যায় ও গুণে আরো সমৃদ্ধতর হলো। এতে লালনপিয়াসী সরস সাধক-পাঠকের আত্মিক তৃষ্ণা নিবারণের বাড়তি সুযোগ মিলবে আশা করি।

কোনো কোনো প্রবীণ সাধুর মুখে শুনেছি, শতবর্ষ আগে লালন শাঁইজির কয়েক হাজার কালাম সাধুসংঘে গীত হতো। অথচ লিখিত বা মুদ্রিতরূপে সাড়ে সাত কি সাড়ে আটশোর অধিক কালাম কোথাও সংরক্ষিত হয়নি। শাঁইজি সদানন্দ সাধুভাব থেকে গেয়ে উঠতেন তাঁর এক একটি কালাম। আমাদের মতো লেখালেখি বা সংরক্ষণের কোনো প্রয়োজনও তিনি বোধ করেননি। তাঁর পরিশুদ্ধ মুক্তসত্তা থেকে এলহামযোগে স্বতোৎসারিত চিরন্তন কোরানের বাণী সাধুসঙ্গে সুর, তাল, মাত্রা ও লয়যোগে সাথে সাথেই প্রকাশ করতেন শাঁইজি। তখন প্রেমিক-ভক্তজন তাঁর মুখনিসৃত গুরুবাণী সুর ধরে গেয়ে গেয়ে মূলত শ্রুতিস্মৃতির মধ্যে সংরক্ষণ করতেন। এভাবেই শতশত বছর ধরে শ্রুতিলবদ্ধ-স্মৃতিজাত শাঁইজির হাজারো কালাম সাধু-ভক্তগণ বংশপরম্পরায় রক্ষা করে এসেছেন গভীরতর ভক্তিপ্রেমে। রাষ্ট্রযন্ত্র, বিশ্ববিদ্যালয়, মিডিয়া বা কাঠমোল্লাতন্ত্র একে কখনো সংরক্ষণ যেমন করেনি আবার একেবারে ধ্বংস করে ফেলতেও পারেনি।

এমন অভিযোগও অবশ্য কেউ কেউ তোলেন, অন্য পদকর্তাদের গান লালন নামের

ভনিতা দিয়ে চালানো হচ্ছে। তাদের যুক্তিতর্ক খুবই খণ্ডিত ও সংকীর্ণতাদুষ্ট। কারণ অন্য পদকর্তা-সাধকগণের রচিত ভাবসঙ্গীতের সাথে মৌলিকভাবে লালনসঙ্গীতের গাঠনিক ধরনধারণ ও গুণমানগত পার্থক্য অন্ধকার বেষ্টিত আলোর মতো অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সঙ্গীতে শাঁইজি তাঁর তত্ত্বকথা অতিসংক্ষিপ্ত আকারে চুম্বক কথায় অনায়াসে তুলে ধরেন। বিরল পারদর্শিতায় তাঁর প্রত্যেক বাক্যে মৌলিক যে দর্শনদেশনা সূক্ষ্মধারায় উঠে আসে তা সর্বকালীন ও সর্বজনীন কোরানের জীবনদর্শনের সমার্থক ভাবধারা বিজড়িত। ফকির লালন শাহ্ নির্দেশিত গুরুভক্তিযোগে এবং জ্ঞানযোগে আত্মদর্শন দ্বারা সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ (Spacific and special) ধারায় আত্মিক সাধনা করলে পরিশেষে তাঁর সঙ্গীত লক্ষণের আসলনকল পার্থক্য স্বাচ্ছন্দে বুঝে নেয়া যায়। এখানে আমরা আত্মদর্শনমূলক গুরুবাদী-জ্ঞানবাদী পদ্ধতির মিলিত প্রয়োগ করেছি, মোটেও পাণ্ডিত্যের নয়। দুধে টক পড়ামাত্র ঘোল থেকে ননী যেমন নিমেষে আলাদারূপে ভেসে ওঠে লালনসম্মত গুরুমুখি সালাত প্রয়োগে আমরাও তেমন পুরনো অলঙ্কার থেকে খাদ সরিয়ে আসল সোনা উদ্ধারের কষ্টসাধ্য অভিযান চালিয়েছি। বস্তুত এ কারণেই অন্যান্য লালনসঙ্গীত সঙ্কলন থেকে আমাদের কাজ একেবারে ভিন্ন চারিত্র্যের। শাঁইজির কালামে পাই:

দুগ্ধে বারি মিশাইলে
বেছে খায় রাজহংস হলে
কারো সাধ যদি হয় সাধনবলে
হও গো হংসরাজের ন্যায়
সামান্যে কি তাঁর মর্ম জানা যায় ॥

এ নিছক গান বা কাব্যভান নয়, জীবন্তভাবে প্রযোজ্য পথ ও পদ্ধতি (Theory and Practice) যা আমাদের তত্ত্ব ও চর্চার সাথে একসূত্রে সংযুক্ত। দুধ ও পানি একপাত্রে মিশিয়ে দিলেও রাজহাঁস জল থেকে দুধকে যেমন পৃথক করে টেনে নেয় আমরাও শাঁইজির শুদ্ধভাবময় রাজহাঁসের মতো অশুদ্ধি, বিকৃতি আর বিভ্রান্তির সমুদ্রমন্থন করে অমূল্য মণিমাণিক্য উদ্ধার করে এ গ্রন্থটি তিলে তিলে সাজিয়েছি।

এতোদিন যাবৎ আরোপিত ঝুট-জঞ্জালগুলো সরিয়ে আমরা জগত গুরু ফকির লালন শাঁইজির আদি ও অকৃত্রিম সত্যবাণী বিশ্ববাসীর সামনে আবার তুলে ধরলাম। আমাদের মূল লক্ষ শাঁইজির আদি ভাবদর্শন সমাজে পুনর্সঞ্চারিত করে বিকাশমান রাখা। এ ধারায় পর্যায়ক্রমে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট রাষ্ট্র, সীমান্ত, সেনাবাহিনী, আগ্রাসন, যুদ্ধ, শোষণ, বৈষম্য, নিপীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদী রাহুমুক্ত একটি শান্তিময় 'লালনবিশ্ব' প্রতিষ্ঠার পথ কাঁটামুক্ত করাই আমাদের কাজ। আমাদের সমস্ত প্রয়াসই এ অঙ্গীকারে বিকাশমান একটি বিশ্বমিশন।

শাঁইজির মহাসত্যভাব বিকাশে এ সাধনা তথা গবেষণা সাধক ও পাঠকদের সহায়ক বলে গৃহীত হলে আমাদের নিবেদন পূর্ণতা পাবে।

আবদেল মাননান

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশের প্রথম সাত মাসেই 'অখণ্ড লালনসঙ্গীত' প্রথম সংস্করণের সব কপি বিক্রি হয়ে যায়। প্রকাশক সেই থেকে নিয়মিত তাগিদ দিয়ে চলেছেন নতুন সংস্করণের জন্যে। প্রথম সংস্করণে যেসব অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি ছিলো সেগুলো শুধরে নেয়া বেশ সময় ও ধৈর্য সাপেক্ষ কাজ। তাছাড়া নতুন করে সংগৃহীত শাঁইজির কালামগুলো এ সংস্করণে সংযুক্ত করাটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

দ্বিতীয় এ সংস্করণে শাঁইজির আরো তিনটি কালাম সংযুক্ত করা হলো। তাতে আমাদের সংগৃহীত লালনসঙ্গীতের সর্বশেষ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ৯০৪এ। এ পর্যন্ত বিশ্বে সর্বাধিক সংগৃহীত লালনসঙ্গীত সংখ্যার এটাই চূড়ান্ত রেকর্ড।

'সংযোজন' শিরোনামে নতুন অধ্যায়ে নতুনভাবে সংগৃহীত কালামগুলো সংযোজিত করা হলো 'দেশ' বিভাজন অনুসারে। আমাদের সংগ্রহকর্ম অব্যাহত আছে এখনো। ভবিষ্যত সংস্করণসমূহেও আমাদের এ সংযোজনক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

গ্রন্থের শেষভাগে 'আলোচন' অধ্যায়ে জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত গ্রন্থ সমালোচকদের দুটি অভিমত সংযুক্ত করা হলো।

ফকির লালন শাঁইজির কালাম নিয়ে দেশবিদেশে যে গভীর আগ্রহ ক্রমান্বয়ে তৈরি হচ্ছে তাকে বিকশিত করে তোলার আত্মিক দায়বোধ থেকে আমরা এ কর্মে নিবেদিত রয়েছি। শাঁইজির কাঙ্ক্ষিত শান্তিময় একবিশ্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আরো বেগবান হোক।

আবদেল মাননান

স ম্পা দ না প্র স ঙ্গে

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিশ্বমানসে পাকাপাকিভাবে সিংহাসন করে নিয়েছেন ফকির লালন শাহ্। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ মুক্তবিশ্বচিন্তা যার প্রধান ভিত্তি। দুশো বছর ধরে বাঙালি অল্পবিস্তর তাঁর গান গেয়ে চলেছে। লালন কালজয়ী মহান সত্তা। যাঁর সন্ধানে শতবর্ষ পরও পৃথিবীর নানাপ্রান্তের জ্ঞানীগুণীজন উৎসুক হয়ে ছুটে আসেন এখানে।

অখণ্ড ভারতবর্ষে জাতপাত, গোত্রকুল, ভাষা-অঞ্চলে হাজারো ভাগাভাগির মধ্যেও জন্ম জন্মান্তরে তাঁকে বুক দিয়ে আগলে আছেন নিষ্ঠাবান ভক্তগণ। তাঁদের প্রেম আর ভক্তিভাবের কাছে রাষ্ট্রীয়-প্রাতিষ্ঠানিক পাণ্ডিত্য ও খবরদারি ব্যর্থ হয়ে যায়। লালন ফকিরের সত্য দ্বীন গুরুমুখি আত্মতত্ত্ব সাধনার নিগূঢ়পথ। ব্রিটিশ-পাকিস্তান যুগের দ্বিজাতিতাত্ত্বিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ভাগাভাগির সাম্রাজ্যবাদী কূট চক্রান্তের কারণে এ মহৎ মানবধর্মদর্শন বারবার আক্রান্ত ও নির্যাতিত হয়েছে। শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে তাঁর সত্য পতাকা সগৌরবে উড্ডীন। এ আদর্শ কেউ সম্পূর্ণ উৎখাত করতে কখনো পারেনি। যদিও তাঁ বিকশিত হয়ে যেভাবে ব্যাপ্তিলাভ করতে পারতো সে সম্ভাবনাকে পাথরচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।

চরম বিরুদ্ধ পরিবেশ অগ্রাহ্য করে তরুণপ্রাণ কবি আবদেল মাননান এ পর্যন্ত সর্বাধিক সংখ্যক ৯০৪টি ফকির লালন শাহ্র কালাম মাঠপর্যায় থেকে সংগ্রহ করে সাধুসম্মত তত্ত্ব, লীলা ও দেশানুসারে মোট বারোটি স্তরে বিন্যস্ত করে লালনসঙ্গীত সংস্কার ও সম্পাদনার কঠিন দায়ভার গ্রহণ করেন। আজকের জনপ্রিয়তাকামী গবেষণা হুজুগের যুগে যা অবিশ্বাস্য ব্যাপার বটে। শুধু বৃহত্তর কুষ্টিয়া অঞ্চলের সাধুদের স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর উৎস থেকে লালনের কালাম সংগ্রহ করেই তিনি থেমে যাননি। পাশাপাশি গত একশো বছরে ছোটবড় যতোগুলো লালনসঙ্গীত গ্রন্থিত সঙ্কলনরূপে দেশবিদেশে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর ভেতর থেকে লালনসঙ্গীতের তুলনামূলক সুদীর্ঘ অধ্যয়ন চালিয়ে এ গ্রন্থের খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত 'লালন শাহ্র গানের পুরনো খাতা', মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সংগৃহীত ভাবসঙ্গীত সঙ্কলন 'হারামণি' তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড, শ্রীমতিলাল দাস ও শ্রীপীযূষ কান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'লালন গীতিকা', খোন্দকার রফিউদ্দিন সম্পাদিত 'হুয়াল গানি' ভাবসঙ্গীত, আবু তালিব সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা,' মুহম্মদ কামালউদ্দিন সম্পাদিত 'লালন গীতিকা', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'লালন ও তাঁর গান', ড. সনৎকুমার মিত্রের 'লালন ফকির কবি ও কাব্য', ড. তৃপ্তি ব্রহ্মের 'লালন পরিক্রমা', অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ

ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', সোমেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'বাংলার বাউল: কাব্য ও দর্শন', ড. এস. এম. লুৎফর রহমানের 'বাউলতত্ত্ব ও বাউলগান', ড. আনোয়ারুল করিমের 'বাংলাদেশের বাউল সমাজ সাহিত্য ও সঙ্গীত', ড. খন্দকার রিয়াজুল হকের 'লালন সংগীত চয়ন', সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত 'লালনের গৌরগান', জহর আচার্যের 'গানে গানে ফকির লালন' আনোয়ার হোসেন মন্টু সংকলিত তিনখণ্ডের 'লালন সঙ্গীত', ফরহাদ মজহারের 'সাঁইজির দৈন্য গান', ড. ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত 'লালন গীতিসমগ্র', ড. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত 'লালনসমগ্র', মোবারক হোসেন খান সম্পাদিত 'লালনসমগ্র' নামক প্রায় সবকটি বই একে একে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সব ভেজালে সয়লাব।

অতপর শুদ্ধিকরণ ও যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজনে আমাদের 'লালন বিশ্বমৈত্রী সংঘ'এর নয় সদস্যের সংযুক্ত সম্পাদনা পর্ষদ শাঁইজির কালামগুলো যাচাই-বিশ্লেষণ করেন। আমাদের সম্পাদনা পর্ষদ মূল সম্পাদকের সাথে একক ও যৌথভাবে প্রতিটি লালনসঙ্গীত নানাদিক থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে অসঙ্গতি ও ক্রটিগুলো অপনোদনে সম্পাদককে নানা পরামর্শ দেয়। তিনি যথাযথ পন্থায় গ্রহণবর্জন ও সমন্বয়ের কাজে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে তিনি পুনর্বার প্রমাণ করলেন, আপন গুরুর প্রতি পরিপূর্ণ ভক্তি-বিশ্বাস ও প্রেমনিষ্ঠা থাকলে অসম্ভবও সম্ভবপর হতে পারে। শাঁইজির আদিভাবমুখি সঙ্গীতের এ শুদ্ধতম সংস্করণ সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে।

আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস, আগামী দিনে যারা ফকির লালন শাহ্ সম্বন্ধে সম্যক জানতে-বুঝতে আসবেন, তাঁর শুদ্ধসত্ত্ব উদ্ধারে প্রয়াসী হবেন এ বই তাদের হাতে তুলে নিতেই হবে। মহাপুরুষের মহাসত্য বাণীকে চক্রান্ত, চালাকি ও মিথ্যাচার দিয়ে আর আড়াল করে রাখা সম্ভব হবে না–'অখণ্ড লালনসঙ্গীত'এর প্রকাশনা সে শুভবার্তাই আগাম বহন করছে। লালন প্রেমিক-পাঠক সবাইকে জানাচ্ছি আমাদের ভক্তি ও আত্মিক শুভেচ্ছা।

সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষে

ফকির দেলোয়ার হোসেন শাহ্
ফকির হোসেন আলী শাহ্
ডা. শামসুল আলম ভাণ্ডারী
ওস্তাদ মশিউর রহমান শাহ্
রওশন ফকির
ফকির আবদুস সাত্তার শাহ্
ফকির আশরাফ শাহ্
রফিক ভূঁইয়া
গোঁসাই পাহ্লভী

সংযুক্ত সম্পাদকমণ্ডলী
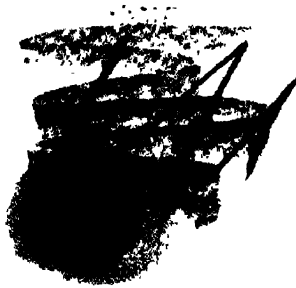
পটভূমি

প ট ভূ মি

আলিফ লাম মিম (আলে মোহাম্মদ) এই কেতাব (সৃষ্টির রহস্যজ্ঞান), ইহা তোমার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে যাহাতে তুমি মানবজাতিকে তাহাদের আপন রবের (সম্যক গুরু) নির্দেশনাক্রমে উদ্ধার করিয়া লইতে পার অন্ধকার হইতে আলোর দিকে, তাঁহার দিকে যিনি পরাক্রমশালী, প্রতিষ্ঠিত ও প্রশংসিত। আকাশমণ্ডলী (মন) ও পৃথিবীতে (দেহ) যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। কঠিন শাস্তির ভোগান্তি মিথ্যারোপকারীদিগের (কাফের) জন্য। যাহারা দুনিয়ার (খণ্ড আমিত্বের) জীবনকে আখেরাতের (পরবর্তী জন্মের) চাইতে অধিক ভালবাসে, মানুষকে বাধা দেয় আল্লাহর পথে এবং আল্লাহর পথ বক্র করিতে চাহে। উহারাই তো স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে।

আমরা প্রত্যেক রসুলকেই তাঁহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট হেদায়েতসহ জীবনরহস্য ব্যাখ্যা করিবার জন্য। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিপ্রজ্ঞাময়।

– সূরা ইব্রাহিম ॥ বাক্য ১–৪ ॥ কোরানুল করিম

এক.

কোরানের শাশ্বত বাণী ও ফকির লালন শাহ্‌র সুফিসঙ্গীত ভাবার্থে এক ও অভিন্ন। তুলনামূলক মানদণ্ডে বিচার করলে আমাদের এ দাবির প্রতি সমর্থন মেলে দুদিক থেকেই; যেমন কোরানুল করিম বলছেন: "হে মানুষ, আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ এবং এক নারী হইতেই। এবং তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জ্বাতি ও গোত্রে যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরস্পর পরিচিত (বা মিলিত) হইতে পার। তোমাদের মধ্য হইতে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম মর্যাদাপ্রাপ্ত যে অধিক মোত্তাকি (সৎকর্মশীল)। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ের উপর সূক্ষ্ম দ্রষ্টা এবং শ্রোতা; তিনি সকল কিছুরই খবর রাখেন"।

– সূরা আল হুজুরাত ॥ বাক্য ১৩ ॥ কোরানুল হাকিম

কোরানুল করিমের এ অদ্ব্যর্থ ঘোষণা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিশ্বের সব মানুষ একই মূল উৎস থেকে আগত। মানুষে মানুষে কোনো ভেদরেখা নেই। বংশ, জাতপাত, গোত্র, লিঙ্গ, দেশ, কাল, ভাষা ইত্যাদির কারণে বিশ্বমানবকে রাষ্ট্র-জাতীয়তাবাদের ছকে ফেলে পৃথক পৃথক বলে ভাবা মোহাম্মদী ইসলামের মৌলিক বিধান পরিপন্থি। বিশ্বে নানা বৈচিত্র্য রাখা হয়েছে একের সাথে অপরের সম্পর্কচর্চা, ভাব লেনদেন তথা মিলনের মাধ্যমে আনন্দে বসবাসের জন্যে। হিংসা, বিভেদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও খুনোখুনির জন্যে কখনো নয়। নানা জাতির অনেক রঙের বিচিত্র ফুল দিয়ে একটি সুন্দর প্রেমমালা গাঁথার প্রয়োজনে এতো ভাষা, গোত্র, জাতির সৃষ্টি হয়েছে। কারণ বিশ্বের সব মানুষ কোরানের দৃষ্টিতে অখণ্ড একজাতি। তাই শাঁইজির কাছে সে ব্যক্তিই পৃথিবীর আর সব মানুষের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান যিনি আপন গুরুর প্রতি সদা কর্তব্যপরায়ণ। কোরান বিশ্বের সকল মানুষের জন্যেই সুবিচার ও সুখ আশা করে। একদল অন্যদলের দ্বারা শোষিত, লুণ্ঠিত, অত্যাচারিত বা ঘৃণিত হোক কোরান তা কখনো চান না। চিরন্তন কোরানের এ কথাটিই শাঁইজি সক্ষ্মভাষায় বলেন সৃষ্টি আর স্রষ্টাকে একতারে বেঁধে:

> সবলোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।
> লালন কয় জাতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে॥
>
> সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
> নারীলোকের কী হয় বিধান
> বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ বামনী চিনি কিসেরে ॥
>
> জগত জুড়ে জাতের কথা
> লোকে গল্প করে যথাতথা
> লালন বলে জাতের ফাতা ডুবিয়েছি সাধবাজারে ॥

কোরানুল হাকিমে রসুলাল্লাহ্ ঘোষণা করেন বিশ্বের সব মানুষ এক জাতি আর এক ধর্মভুক্ত বলে; প্রমাণস্বরূপ: "*নিশ্চয়ই এই মানবজাতি একজাতি (একই ধর্মের) আর আমি তোমাদের রব (প্রতিপালক তথা সম্যক গুরু) তাই আমারই উপাসনা কর।*
এবং মানুষ তাহাদের কার্যকলাপ (কর্মফল) দ্বারা পারস্পরিক বিষয়ে বিভেদ (কলহ) সৃষ্টি করে। নিশ্চয় আল্লাহর দিকে প্রত্যেকের প্রত্যাবর্তন"।

– সুরা আম্বিয়া ॥ বাক্য: ৯২-৯৩ ॥ কোরানুল করিম

সমগ্র মানবজাতি একজাতি। সবার একধর্ম দ্বীনে ইসলাম তথা মানবধর্ম। কিন্তু দেশকালভাষার বিবর্তনে, ইন্দ্রিয়-লিপ্সু তথা খণ্ড খণ্ড আমিত্বের স্থূল প্ররোচনায় মানুষে মানুষে ভেদাভেদের দেয়াল উঠেছে। বংশের নামে, গোত্রের দোহাই

পড়ে, জাতের বড়াই ফলাতে গিয়ে মানববিশ্বকে বিপন্ন ও বিভক্ত করে ফেলা হয়েছে। 'ইসলাম' অর্থ শান্তি। যে ব্যক্তি চিন্তায়, কর্মে, বাক্যে, আচরণে প্রশান্তিময় আত্মদর্শন দ্বারা প্রজ্ঞাময় হালে থাকেন তিনিই ইসলামের সুশীতল ছায়ার পরশ পেয়েছেন। তাই মোহাম্মদী অর্থাৎ সম্যক গুরুমুখি সর্বকালের আত্মদর্শনমূলক সকল ধর্মই ইসলাম ধর্ম। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখি তার বিপরীত। সেজন্যে ফকির লালন শাহ্ কুধর্মের জঞ্জালভরা পৃথিবীতে নেমে আসেন ধর্মবর্ণগোত্রজাতির সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিপরীতে কোরানের হিরন্ময় জ্ঞানদ্যুতির বিচ্ছুরণ ঘটাতে:

সবে বলে লালন ফকির কোন জাতের ছেলে।
কারে বা কি বলি ওরে দিশে না মেলে ॥

একদণ্ড জরায়ু ধরে
এক একেশ্বর সৃষ্টি করে
আগমনিগম চরাচরে তাইতে জাত ভিন্ন বলে ॥

জাত বলতে কী হয় বিধান
হিন্দু যবন বৌদ্ধ খ্রিস্টান
জাতের আছে কি বা প্রমাণ শাস্ত্র খুঁজিলে ॥

মানুষের নাই জাতের বিচার
এক এক দেশে এক এক আচার
লালন বলে জাত ব্যবহার গিয়েছি ভুলে ॥

কোরানে উল্লিখিত পৃথিবীর সকল মানুষের এক মূলজাতিত্ব গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে আমরা দেখি, সমস্ত জন্ম ও ধর্মের উদ্ভব হয়েছে এ প্রাচ্যে। সকল নবি, রসুল, অবতার ও মহাপুরুষের আবির্ভাব এখানেই। হিমালয় শোভিত ভারত যার প্রাচীনতম পাদপীঠ। প্রখ্যাত গবেষক অক্ষয় কুমার দত্তের 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থ ২য় খণ্ডের ২-৩ পৃষ্ঠায় পাই এ সত্যের প্রতিধ্বনি। আদিতে পৃথিবীর প্রথম মানবগোষ্ঠীর বসবাস শুরু হয় এশিয়া ভূখণ্ডে—এমন একটি মতবাদ ঐতিহাসিক মহলে ব্যাপকভাবে চালু আছে। এখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানবগণ যাত্রা শুরু করেন। চীনা জাতি ভারতের প্রাচীন আদিবাসী। হুন সাম্রাজ্যের মানুষেরা উক্ত স্থান থেকে পশ্চিমমুখে অগ্রযাত্রা করেছিলো। তারাই রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ দ্বারা সম্পূর্ণ অধিগত করে নেয়। তেমনই তৈমুর লং ও চেঙ্গিস খাঁন এখান থেকেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, আর্যবংশীয়দের একাংশও এশিয়া খণ্ডের অধিবাসী। মনে করা হয় তারা বেলুতার্ক ও মুস্তাক পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বস্থ উঁচুভূমিতে বসতি পত্তন করেছিলো।

কোরানে বর্ণিত এক উৎস থেকে মানবজাতির আগমনের সূক্ষ্ম প্রমাণ মেলে বিশ্বভাষার শব্দভাণ্ডার নিয়ে তুলনামূলক শ্রুতিচর্চা করলে। বিশেষত ভারতীয় শব্দগুলোর মূলধ্বনির সাথে অন্য ভাষাগুলোর মূলধ্বনিগত মিলের দিকে তাকালে; যেমন: সংস্কৃত শব্দ 'অস্টন্' থেকে হয়েছে যথাক্রমে আবস্তিক শব্দ 'অস্তন্', পারসিক শব্দ 'হস্তন্', গ্রিক শব্দ 'অক্টো', লাতিন শব্দ 'অক্টো', জর্মন শব্দ 'অক্টো', ফরাসি শব্দ 'আখত্', ইংরেজি শব্দ 'এইট্' এবং বাংলা শব্দ 'আট'। আবার সংস্কৃত শব্দ 'দদাসি' থেকে হয়েছে আবস্তিক শব্দ 'দধাহি', পারসিক শব্দ 'দেহ্', গ্রিক শব্দ 'ডিডোস্', লাতিন শব্দ 'ডাস' ইত্যাদি।
অপরদিকে সংস্কৃত শব্দ 'মাতৃ' থেকে হয়েছে আবস্তিক শব্দ 'মাতৃ', পারসিক শব্দ 'মাদর্', গ্রিক শব্দ 'মাটর্', ল্যাটিন শব্দ 'মাটর্', জর্মন শব্দ 'মুতের্', ফরাসি শব্দ 'মেখ্', জর্মান শব্দ 'মদর্', বাংলা শব্দ 'মা'। আবার সংস্কৃত শব্দ 'পিতৃ' থেকে এসেছে আবস্তিক শব্দ 'পৈতর্', পারসিক শব্দ 'পাদর্', গ্রিক শব্দ 'পাটর্', লাতিন শব্দ 'পাটর্', জর্মন শব্দ 'ফাতের্', ফরাসি শব্দ 'পেখ্', ইংরেজি শব্দ 'ফাদার' এবং বাংলা শব্দ 'পিতা' ইত্যাদি।
'দ্বীন' বলতে খণ্ডিতভাবে আমরা 'ধর্ম'কে বুঝে থাকি কিন্তু কোরানের ভাষায় 'দ্বীন' অর্থ 'বিধান' Constitution। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সৃষ্টিময় একটি অখণ্ড বিধান বিরাজমান। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রব তথা সম্যক গুরুরূপে এ অখণ্ড বিধানের সংবিধাতা। গ্রহ-নক্ষত্র থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্রতম অণুকণা পর্যন্ত এই একক বিধানের অধীন। এ বিধানের অধীন থাকবার নাম সেজদা বা আত্মসমর্পণ। এজন্যে কোরান ঘোষণা করছেন: 'নক্ষত্র ও বৃক্ষলাতাদি সবাই সেজদায় আছে'। কোরানে আকাশ ও পৃথিবী বলতে সমস্ত সৃষ্টি বোঝায়। তারাও আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের মধ্যে বিরাজ করে (কোরান)। সুতরাং 'সেজদা' অর্থ আল্লাহর বিধানে বাস করা। সমগ্র সৃষ্টি সেজদায় আছে। মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; যথা: চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহর সৃষ্ট এ মহাবিধানের পরিচালনাধীন রয়েছে। আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যার যা কাজ নির্ধারিত করা হয়েছে সে কাজ একই নিয়মে সে করে চলছে। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টিই আত্মসমর্পণকারি অর্থাৎ জন্মগতভাবে মুসলমান। স্বভাব প্রকৃতির দিক থেকে তাদের কাউকেই প্রকৃতির মহানিয়ম ভঙ্গ করার অধিকার দেয়া হয়নি। এ মহানিয়মের ব্যতিক্রম শুধু মানুষের মন ও তার চিন্তাশক্তি। পার্থিব জীবনে তাকে স্বল্প ও সাময়িক ইচ্ছাশক্তি দেয়া হয়েছে। এ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সে তার মুসলমান অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে তার ইচ্ছামতো ব্যবহার করে থাকে। এর মূলে আছে নফসের ইচ্ছাশক্তির ক্রমবিকাশ। যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এ বিকাশ বা নফস পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

তখন নফস তার পার্থিব জীবনপথে সৃষ্টি করে চলে সাময়িক অনেক বিধান বা পদ্ধতি। প্রত্যেক কাজের জন্যে তার একটি নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণের দরকার হয়। সে পদ্ধতি ঐ কাজের দ্বীন। এ রূপে রাষ্ট্রের আইন তার দ্বীন। অফিস-আদালত-কল-কারখানার দ্বীন তার নিয়মাবলি, প্রয়োজন অনুসারে তা লিখিত হোক বা অলিখিতই হোক।

নফস তার নিজের দ্বীনগুলোর অনুসরণ ও তাতে মনকে লাগিয়ে রাখার ফলে সে যে তখনো অন্যান্য সৃষ্টির মতোই প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর একক দ্বীনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা–এ অনুভূতি থেকে দূরে সরে থাকে। এটা মনের একটা পর্দামাত্র। জলে ডুবে থেকেও জলে না থাকার মতো অনুভূতি মাত্র। সমস্ত সৃষ্টি না বুঝে যে মহানিয়মের মধ্যে রয়েছে বুঝে শুনে সে নিয়মের আনুগত্য তথা আত্মসমর্পণের বিধানের আনুগত্য গ্রহণ করার নামই পূর্ণ ইসলাম। কিন্তু মানুষ তার নিজ ক্ষমতায় আর সেই পূর্ব আনুগত্য গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ সে তার রচিত দ্বীনসমূহ ত্যাগ করে চলতে পারবে না। অথচ তাকে পুনরায় মৃত্যুর পর আল্লাহর দ্বীনে আসতেই হবে। তার নফস থেকে নিজ ইচ্ছা পরিত্যাগ করতেই হবে। তাই জীবদ্দশায় এই শিক্ষা অনুশীলন করা তার একান্ত প্রয়োজন হবে।

আল্লাহর দ্বীনের শিক্ষা মানুষের সর্বকর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার জন্যে নবিগণকে তিনি পাঠিয়েছেন। মানুষের প্রত্যেক কাজের দ্বীনকে আল্লাহর দ্বীনের রঙে রাঙিয়ে দেবার এটাই সর্বকালীন ব্যবস্থা। এজন্যেই মানব রচিত কার্য পদ্ধতি নবিগণ বর্জন করে ঐ পদ্ধতির উপর এমন সব দ্বীন বা নিয়মাবলি করেন যেন তার দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আত্মসমর্পণভাব মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যদিও ঐ প্রভাবের সাহায্যে সে আর কখনো বৃক্ষাদির মতো একেবারে আল্লাহর দ্বীনে ফিরে যেতে পারবে না। কিন্তু যদি সে নফসের ভীষণ কষ্ট উপেক্ষা করে কিছুতেই আর পিছ পা না হয়ে সেই অচল অবস্থায় স্থির থাকতে বদ্ধপরিকর হয় তবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বৃক্ষাদির মতো তাকেও আহারাদি যুগিয়ে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। আর যদি তা একান্তই না করেন তাও পার্থিব জীবনে পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে থাকবে। কেন না তাকে সে অবস্থায় পরলোকপ্রাপ্তি করিয়ে পূর্ণতা দান করবেন। অবশ্য এ অবস্থা ধর্মসাধনার চরম স্তর।

এখানেই হয় মানবীয় নফসের কঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় মানুষ নিজে নিজে উত্তীর্ণ হতে পারে না। দয়াল রবরূপে আপন গুরুই তাকে উদ্ধার করে পূর্ণতাদান করেন এবং তার নফসের অভিব্যক্তিগুলো নিজহাতে গ্রহণ করেন। এরপর তিনি যে কাজই করুন না কেন তা তার গুরুর ইচ্ছার সাথে সম্মিলিত থাকে। তখন কর্মগুলো মানবীয় অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে প্রকাশ পায় বটে কিন্তু তা আর তার কর্ম

থাকে না। নবি ও মহামানবগণের হাল এমনই হয়ে থাকে। ফকির লালন শাহ তাই জগতবাসীর উদ্ধারকর্তা সম্যক গুরুরূপে অবতীর্ণ হন মানুষের সকল দ্বীনের উপর সত্যদ্বীন তথা দ্বীনে এলাহি প্রকাশ করার প্রয়োজনে। তিনি আদি ধরনধারণ সঙ্গীতের আড়াল দিয়ে প্রকাশ করেন। কোরানের মূলনীতির সাথে শাঁইজির স্বর এক রাগে বাঁধা। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

ইসলাম কায়েম হয় যদি শরায়।
কী জন্যে নবিজি রহে পনেরো বছর হেরাগুহায় ॥

পঞ্চবেনায় শরা জারি
মৌলভীদের তম্বি ভারি
নবিজি কী সাধন করি নবুয়তি পায় ॥

না করিলে নামাজ রোজা
হাসরে হয় যদি সাজা
চল্লিশ বছর নামাজ কাজা করেছেন রসুল দয়াময় ॥

কায়েম উদ্ দ্বীন হবে কিসে
অহর্নিশি ভাবছি বসে
দায়েমি নামাজের দিশে লালন ফকির জানায় ॥

দুই.

দু বাংলার খ্যাতনামা গবেষক-লেখকদের কেউ কেউ ফকির লালনের কাগুজে জীবনেতিহাস-কাহিনির অনুসরণে তাঁর জাতিধর্ম-গোত্রগোষ্ঠীর পরিচয় খুঁজতে নেমে মরুভূমিতে পথ হারিয়েছেন। পরিণামে শাঁইজিকে তারা 'হিন্দু', 'কায়স্থ', 'বাউল' ইত্যাদি বানানোর যতো আজগুবি মিছে কথা ও বাজে বিতর্ক জনমনে ছড়িয়েছেন। যদি খুঁটিয়ে যাচাই করা শুরু হয় তবে ওসব অসার প্রচারণা মোটেও ধোপে টেকে না। শাঁইজির বাণী দিয়েই তাঁর পরিচয় উপলব্ধি করা সহজ। তিনি যদি হিন্দু বা বাউল হোন তবে কোন যুক্তিতে 'কোরান'কে এতো মহিমান্বিত উচ্চতায় তুলে ধরে বেদ-বেদান্তকে চরম তুলোধুনো বানিয়ে খারিজ করে দিলেন? শাঁইজির বাক্যে ফেরা করা যাক; যেমন:

যে মুরাশিদ সেই তো রসুল
ইহাতে নাই কোনো ভুল খোদাও সে হয়
এমন কথা লালন কয় না, কোরানে কয়।

এখানে মুর্শিদতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে শাঁইজি নিজের দাবিকে কোরানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এবং কোরান যে এক—একথা নিশ্চয় আর বলার দরকার পড়ে না।
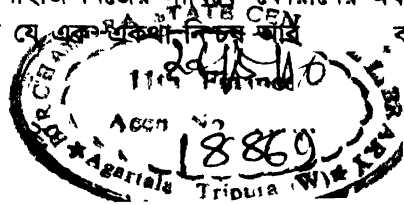
কোরান কালুল্লায় কুল্লে সাইয়ুন মোহিত লেখা যায়
আল জবানের খবর জেনে হও হুঁশিয়ারই ॥

বেদ পড়ে ভেদ পেতো যদি সবে
গুরুর গৌরব থাকতো না ভবে
লালন বলে তাই না জেনে গোলমাল করি ॥

শাঁইজি আপন কোরানসত্তা তথা গুরুসত্তার প্রামাণ্যস্বরূপ উপরোক্ত আট লাইনে সরাসরি আরবি বাক্য 'কুল্লে সাইয়ুন মোহিত' উদ্ধৃতির পাশপাশি 'বেদ'কে সম্পূর্ণ নাকচ করেন দেন। গানে গানে এ রকম অজস্র 'প্রমাণ' খুঁজে বের করা সোজা:

তফসিরে হোসাইনী নাম
তাই ঢুঁড়ে মসনবি কালাম
ভেদ ইশারায় লেখা তামাম লালন বলে নাই নিজে ॥
কিংবা,
এখলাস সূরায় তাঁর
ইশারায় আছে বিচার
লালন বলে দেখ না এবার দিন থাকিতে।

এ রকম সরাসরি 'কোরান' কথাটি প্রয়োগ করা ছাড়াও তিনি আরবি কোরানের অনেক সূত্র তাঁর কালামের ছত্রে ছত্রে ব্যবহার করেন। কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত:

১. নফি এজবাত যে জানে না।
মিছেরে তার পড়াশোনা ॥

২. ইসা মুসা দাউদ নবি বেনামাজি নহে কভি
শেরেক বেদাত সকলই ছিলো নবি কী জানালেন শেষে ॥

৩. আলিম লাম মিমতে কোরান তামাম শোধ লিখেছে।
আলিফে আল্লাজি মিম মানে নবি লামের হয় দুইমানে।
ইশারার বচন কোরানে যেমন হিসাব করো এইদেহেতে।
পাবি লালন সব অন্বেষণ ঘুরিসনে আর ঘুরপথে ॥

৪. কতো হাজার আহাদ কালাম তার খবর কও আমায়।
কোন সাধনে নূর সাধিলে সিনার কালাম হয় আদায় ॥

হিন্দু, বৈষ্ণব, বাউল বা গোস্বামীগণ কখনো আল কোরানকে দর্শনের মানদণ্ড হিসেবে সামনে রেখে এতো চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের গরজবোধ করে না। কোরানের কলেমা, সালাত, জাকাত, হজ ও কোরবানির প্রচলিত রাজসিকতা-তামসিকতামুক্ত সুফিগণের বক্তব্য কেন তিনি তুলে ধরেন তবে?

১. রোজা নামাজ হজ কলেমা জাকাত
তাই করলে কি হয় শরিয়ত শরা কবুল করে।
ভাবে জানা যায় কলেমা শরিয়ত নয় অর্থ কিছু থাকতে পারে ॥

২. খোদ বান্দার দেহে
খোদা সে লুকায়ে
আলিফে মিম বসায়ে আহম্‌দ নাম হলো সে না।

৩. ইরফানি কোরান খুঁজে
দেখতে পাবে তনের মাঝে
ছয় লতিফা কী রূপ সাজে জিকির উঠছে সদাই ॥

'নবিতত্ত্ব'এ শাঁইজি লালন মহানবির দেহত্যাগের পর তাঁর মনোনীত 'মাওলা' আলীকে রসুলরূপে ওমর, আবু বকর, ওসমান, আয়েশা প্রমুখ কর্তৃক অগ্রাহ্য করার ফলে ইসলাম ধর্মে যে জঘন্য মতভেদ ও উপদলীয় কোন্দল-রক্তাক্ত গোলমাল শুরু হয় সে বিষয়ে আমাদের সজাগ করে দেন :

নবি বিনে পথে গেলে হলো চারমতে
ফকির লালন বলে যেন গোলে পড়িসনে ॥

শাঁইজি রাজতান্ত্রিক ভাবধারায় ওমরের আমল থেকে আরোপিত আরবীয় সাম্রাজ্যবাদের অহাবিমুখি প্রচলিত বৃদ্ধমত ও মিথ্যা ধারণার বিরুদ্ধে আলে মোহাম্মদের সাম্যবাদী কোরানের সৎপতাকা সবার উপরে তুলে ধরার জন্যেই পুনরাগমন করছেন ধরাধামে:

যে মুর্শিদ সে রসুলাল্লাহ
সাবুদ কোরান কালুল্লাহ
আশেকে বলিলে আল্লাহ তাও হয় সে ॥

তাঁর বিশাল সঙ্গীতভাণ্ডার থেকে এমন অনেক কথা বের করা যায়। ফকির লালন শাহী কালামের কয়েকটি উদাহরণেও কি প্রমাণ হয় না তিনি কোন ধর্মমতের আদিধরনধারণ নিয়ে এতো বেশি সোচ্চার।

ডানে বেদ বামে কোরান
মাঝখানে ফকিরের বয়ান
যার হয়েছে দিব্যজ্ঞান সে-ই দেখতে পায়।

শাঁইজি বেদ ও কোরানের মধ্যে অবস্থান নিয়ে যে দিব্যজ্ঞান মানে জীবন্ত কোরানজ্ঞান থেকে ধর্ম সংস্কারসাধন করেন তা বোঝার মতো গভীর অনুভবক্ষমতা কি সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত প্রতিষ্ঠানিক পণ্ডিত-ব্রাহ্মণদের আছে?

লালন ফকির যদি 'হিন্দুঘরে' জন্মগ্রহণ করেন, অক্ষরজ্ঞানবিহীন 'নিরক্ষর লোক'ই হন তবে আরবি-ফার্সি বাক্যের এতো সুগভীর জ্ঞান তিনি কোথায় পেলেন–এ প্রশ্নের কি জবাব দেবেন সুশীল ডক্টর–প্রফেসর–লেখক সাহেবগণ?
উপরে কোরানের যে ইনফারেন্স ও রেফারেন্সসমূহ আমরা উদ্ধৃত করলাম তাতে কাগজে ছাপানো কোরানের উল্লেখ যেমন শাঁইজি করেছেন তেমনই 'জ্যান্ত বা বাঙময় কোরান' একজন কামেল মোর্শেদের শরণাপন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা যে কোরানজ্ঞানের ধারে কাছেও পৌছাতে পারি না–সেকথাই সাব্যস্ত হয়েছে। হিন্দু বা বাউল হলে তিনি কোরানের যতো মহিমা করলেন তার বিপরীতে 'বেদ'বিধি-শাস্ত্রকে এতো তিরস্কৃত আর তুলোধুনো করে ছাড়লেন কোন কারণে? এ রকম অজস্র প্রমাণ থেকে মাত্র ডজনখানেক নমুনা তুলে ধরা হলো শাঁইজির কালাম থেকে:

১. 'নফি'র জোরে পাবি দেখা
বেদে নাই যার চিহ্নরেখা
সিবাজ শাই কয় লালন বোকা এসব ধোকাতে হারায় ॥

২. সিরাজ শাঁই বলেরে লালন
বৈদিক বানে করিসনে রণ
বান হরায়ে পড়বি তখন রণখেলাতে হুবড়ি খেয়ে ॥

৩. চারবেদ চৌদ্দশাস্ত্রের
কাজ কিরে তার সেসব খবর
জানে কেবল 'নুক্তা'র খবর নুক্তা হয় না হারা ॥

৪. কী বৈদিকে ঘিরলো হৃদয়
হলো না সুরাগের উদয়
নয়ন থাকিতে সদাই হলি কানা ॥

৫. ভজনের নিগূঢ়কথা যাতে আছে।
ব্রহ্মার বেদছাড়া ভেদবিধান সে যে ॥

৬. দিবানিশি আট প্রহরে
একরূপে সে চাররূপ ধরে
বর্ত থাকতে দেখলি নারে ঘুরে ম'লি বেদের ধোঁকায় ॥

৭. সপ্ততলার উপরে সে
নিরূপে রয় অচিন দেশে
চেনা যায় না নাহি গেলে বেদের ঘোলা ॥

৮. সিরাজ শাঁই বলেরে লালন
বৈদিকে ভুলো না মন
একনিষ্ঠা মন করো সাধন বিকার তোমার যাবে ছুটে ॥

৯. প্রেম নহরে ভাসছে যারা।
বেদবিধি শাস্ত্র অগণ্য মানে না আইন ছাড়া ॥

১০. বেদবিধির পর শাস্ত্র কানা আরেক কানা মন আমার।
এসব দেখি কানার হাট বাজার ॥

১১. বেদপুরাণে শুনি সদাই
কীর্তিকর্মা আছে একজন জগতময়
আমি না জানি তাঁর বাড়ি কোথায় কী সাধনে তাঁরে পাই ॥

১২. বেদবিধি ত্যাজিয়ে দয়াময়
কী নতুন ভাব আনলেন নদীয়ায়
লালন বলে আমি সে তো ভাব জানিবার যোগ্য নই ॥

অতএব শাঁইজি লালনের এসব আপন ভাষ্য থেকে আমরা নিশ্চিত করে বুঝতে পারি, সনাতন বেদপুরাণশাস্ত্র সব পরিত্যক্ত করলেও কোরানকে কখনো তিনি খারিজ করছেন না। কোনো কায়স্থ হিন্দু কি ব্রাহ্মণ কি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এটা কখনো সম্ভব? কোরানের জাহেরি-বাতেনি শ্রেষ্ঠত্ব তিনি সকল ধর্মের উপর জাহির করলেন তবে কি জন্যে? কোরান যে পৃথিবীর আদি সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর সে সত্যায়নই শাঁইজির জবানে আমরা পাই না? তথাকথিত সেক্যুলার ছদ্মবেশী 'কমিউন্যাল পণ্ডিত'গণ কী বলেন?

তিন.

রোজা আর নামাজ ব্যক্ত এহি কাজ
গুপ্তপথ মেলে ভক্তির সন্ধানে.....

ফকির লালন শাহ্ সাধারণ কোনো মানুষ নন, একজন শুদ্ধতম মহাপুরুষ তথা অতিমানব গুরু। একাধারে তাঁর অনেক নাম বা গুণ; যেমন: সামাদ আল্লাহ্, ইনসানে কামেল, নফসে ওয়াহেদ। আহাদ জগত-জনসাধারণ তাঁর গান শুনে সুররসে-ভাবাবেশে আপ্লুত হলেও শাঁইজির সাত্ত্বিক সংস্পর্শে যাবার যোগ্য মানসিকতা তাদের নেই। তাঁকে বোঝার বা বোঝানোর শক্তি প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবী, মোল্লা-মুন্সি, ব্রাহ্মণ, পাদ্রি, পুরোহিত কারো নেই। শাঁইজি 'কোরানুন নাতেক' অর্থাৎ স্বয়ং 'বাঙ্ময় কোরান'। তাঁর বাণী সংক্ষেপে সে রহস্যগূঢ়তা জায়মান। অবশ্য কোথাও কোথাও সে সংক্ষেপ কথার বিস্তারও

রয়েছে। তাঁর সমগ্র কর্মকাণ্ড সর্বকালীন কোরানের জাগ্রত অভিব্যক্তি। শাঁইজির অখণ্ড কোরানদর্শন গ্রহণ করলে খণ্ড খণ্ড প্রচলিত শরিয়তি-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মাচার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতেই হয়। শাঁইজির কোরান তফসির গ্রহণ করলে রাজতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী কুসংস্করণের কোরান, হাদিস, ফেকাহ শাস্ত্র ইত্যাদি ভ্রান্ত বলেই প্রতিপন্ন হয়। আমিত্বহারা মুক্তিপাগল সাধক ব্যতীত আর কেউই লালনতত্ত্বের সঠিক ব্যাখ্যা উপলব্ধি করার অধিকার রাখে না। সর্বোপরি চিরকালীন মোহাম্মদ এবং মোহাম্মদের আদর্শিক বংশধরগণ যাঁরা তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক জীবনে সর্বদাই অখণ্ড এক সত্যের ধারক-বাহক তাঁদের উপর আত্মসমর্পিত মন না থাকলে রহস্যালোকে প্রবেশ করা অসম্ভব। অখণ্ড একজন সম্যক গুরুরূপে আলে মোহাম্মদ শাঁইজি সর্বযুগে সশরীরে অবশ্যই উপস্থিত আছেন। এ মৌলিক ভিত্তির প্রতি মনের দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হলে মানবমন আপনাআপনি সত্যসন্ধানী দ্রষ্টা হয়ে ওঠে।

সত্য জানার জন্যে তাই সন্ধানী মনের ব্যাকুলতা আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকা চাই। সবার আগে দরকার, শাঁইজির প্রতি অকৃত্রিম দাস্যভক্তি এবং তাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করার অন্তর্গত তাগিদ। কারণ শাঁইজির কালামের গভীরে প্রবেশ করার আগে এতোকাল ধরে চরম মিথ্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজসিক ধর্ম সম্বন্ধে পাঠকের মন-মস্তিষ্কে যতো আবর্জনা জমে রয়েছে সেগুলো সব ব্যর্থতার নিরর্থক বোঝা বলেই জানা যাবে এবং এসব জবরদস্তির ধর্মকর্ম প্রথমে নিজের ভেতর থেকেই তছনছ করে ফেলবার সৎসাহস থাকতে হবে। কারণ গত দু হাজার বছর ধরে কোরানবিষয়ে রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আরোপিত যেসব বিকৃত ভাবার্থ জনমনে প্রচারচক্রান্ত দ্বার প্রচলিত রাখা হয়েছে সেগুলো আগাগোড়া গোত্রীয় হিংসা আর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দ্বারা রচিত, প্রচারিত এবং আসুরিক শক্তিবলে কঠিনভাবে যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত।

ফকির লালন শাহী সত্য সবার পক্ষে তাই গ্রহণ করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। চিত্তশুদ্ধির মুক্তিপাগল তরুণেরাই কেবল তাঁর চরণে আশ্রয়প্রার্থী হতে আসবেন। শাঁইজি লালন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো শুধু বই পড়ে নয়, আত্মিক সাধনার সাহায্যেও তাঁকে নিজের ভেতর উদ্ধার করে নেয়ার চেষ্টা করা। যেমন করে থাকেন যুগ-যুগান্তের সাধকগণ। সাধনার চরমপরম পর্যায়ে সাধকের উপর কোরানজ্ঞান অর্থাৎ লালনজ্ঞান নাজেল হয়ে চলেছে সর্বযুগে। আজকের যান্ত্রিক শাসনের যুগেও ন্যূনতম একমাস লালন সমাধিতে হেরাগুহার সাধনা দ্বারা আপনদেহের মধ্যে মন দিয়ে ভ্রমণ করলে শাঁইজিকে চেনা-জানার বদ্ধ দুয়ারগুলো ভেতর থেকে ধীরে ধীরে খুলে যাবে। এ সত্যধারা অনুসরণ না করলে আত্মমুক্তির সর্বকালীন-সর্বজনীন অর্জনীয় মহাজ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। তা যতো পড়াশোনা করা মস্ত গাধা-পণ্ডিত-পাণ্ডা হই না কেন।

চার.

মহাজন লালন শাহ্ সকল কল্প কাহিনি-বর্ণনার অতীত নিত্যবস্তু। তিনি নূরে মোহাম্মদী, অদ্বৈত ব্রহ্ম, পরমতত্ত্ব, Devine light ইত্যাদি বহু নামে অভিষিক্ত। কী দিয়ে তাঁর বন্দনা-বন্দেগি করতে পারি আমরা, যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের কলসিকে সমুদ্র মনে করে আগলে ধরে আছি। হিমালয় শীর্ষের উপরে যাঁর শির অটল মহিমায় চিরউন্নত, পাতাল ছাড়িয়ে গেছে যাঁর চরণতল তাঁকে রক্তমাংসের মানুষ মনে করলে কি আর কখনো ধরা দেবেন? তিনি সব ঘটেপটে আছেন, আবার নাইও বলা যায়। অধরাকে ধরতে পারি কই। লালন জন্মগ্রহণ করেন না, লালন মৃত্যুবরণও করেন না, তিনি কখনো কখনো এখানে ভ্রমণে আসেন। শাঁইজি অন্তর্যামী বলেই যখন ইচ্ছে 'না' হয়ে যেতে পারেন। কোরান সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথা ঘোষণা করছেন : "আল্লাহর অলিগণকে তোমরা মৃত বলো না। আল্লাহর অলিগণ কখনো মরেন না। তোমরা তা জানো না"। লালন শাঁইজির মতো খাস মহাপুরুষ ধর্মাবতার অখণ্ড বাংলায় আবির্ভূত হয়েছেন। সেজন্যে এ মাটি সোনার চেয়ে খাঁটি। ধন্য বাংলা। ধন্যরে বাঙালি।

নূরের দিরাকের উপরে
নূরনবি নূর পয়দা করে
নূরের হুজুরার ভিতরে নূরনবির সিংহাসন রয় ॥

যে পিতা সেই তো পতি
গঠলেন শাঁই আদম সফি
কে বোঝে তাঁর কুদরতি কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় ॥

ধরাতে শাঁই সৃষ্টি করে
ছিলেন শাঁই নিগম ঘরে
লালন বলে সেই দ্বারে জানা যায় শাঁইয়ের নিগম পরিচয় ॥

জন্মজন্মান্তে মানবসৃষ্টির নিগমরহস্য তথা দেহমনরহস্য পথ খোঁজে প্রকাশের। এ আগমনিগম রহস্যকে প্রকাশ করতে আকারসাকারে ভাব-ভাষা দিতে হয়। তাতেই বোবামূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। শাঁইজি একতারে দেহ বেঁধে দেলকোরানকে তুলে ধরেন ছন্দ সুরের মধুমাখা আন্দোলনে। সর্বযুগের কামেল-মহৎগণ স্থানকালের সীমানা ছাপিয়ে শাঁইজির বিশালত্বে মিশে একদেহ ধারণ করেন। উপস্থিত একজন 'আদম'কে সেজদা বা মানসিক আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোরানের 'ক'ও কেউ বোঝে না।

আল্লাহ অখণ্ডরূপে হন সম্যক গুরু 'আলিফ' মানে আমি বা স্বয়ং। 'দাল' হলো দ্বীনের প্রতীক দ্বীনে ইসলাম বা দ্বীনে এলাহী বা ধর্ম। এবং 'মিম' অর্থ মোহাম্মদ

অর্থাৎ একজন ইনসানে কামেল বা সম্যক গুরু। মহাপুরুষদেহ একজন 'আদম' হন এ তিনটি বিশেষগুণের মিলিত বিকাশপ্রকাশক্ষেত্র। সর্বযুগে 'আদম'রূপে শাঁইজি ছিলেন, এখনো আছেন এবং অনাগতকালেও তিনি থাকবেন। এই মৌলিক সত্য নির্দেশনাটি জানান দিতে গিয়েই কোরানের এতো হুশিয়ারি উচ্চারণ এবং রূপক ভয়ভীতিজ্ঞাপন। সর্বকালীন নবি ও রসুলগণ অখণ্ড 'আদম' রূপবৈচিত্র্যের ধারাবাহিক লীলানাট্য। সাধারণ মানুষ না বুঝলে কি হবে, গুরুলীলা চলছে এবং চলবেই। তিনি আবার 'সফিউল্লাহ্'। সফি + আল্লাহ্ = সফিউল্লাহ্। মানে জিন ও ইনসানের সাফায়াতকারি অর্থাৎ ত্রাণকর্তা। এ কথা জিন ও ইনসান তথা বদ্ধজীব ও মুক্তজীবদের মনে করিয়ে দেবার জন্যে শাঁইজি আদমসুরত হয়ে গান করেন নূরতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব, রসুলতত্ত্বের। নবরসে সিক্ত করেন শ্রীকৃষ্ণের দিব্যযুগলীলা। এ হলো কোরানেরই অখণ্ড 'আবহায়াত'। আল্লাহর জাতি নূরের ঝরনাধারা, নবিধারা, চিরকালীন রসুলধারা। সকল অলি আল্লাহর কুরসিনামা।

সংসারাসক্ত মানুষকে অনিত্য প্রয়োজন মেটাতে কতশত ঝকমারি কাজ করতে হয়, যাকে বলে গাধার খাটুনি। তাই বলে তো শুধু দেহের চাহিদাপূরণই তার কাছে যথেষ্ট মনে হয় না। সে আরো কিছু চায়, অন্য কিছু। এ 'অন্য কিছু'ই বিশ্বসংসারকে দান করার জন্যে যুগে যুগে নবিবেশে, কখনো কবিবেশে, কখনো আল্লাহর চেহারা 'রুহুলুল্লাহ' হয়ে উর্ধ্বলোক থেকে কাদার পৃথিবীতে নেমে আসেন শাঁইজি। তিনি একাধারে অবতার এবং অবতারী। সবই তাঁর পক্ষে সম্ভব। যখন তিনি কোনো মাতৃযোনির দ্বার পরিগ্রহ না করে স্বয়ম বা স্বয়ংরূপে মানবদানব জগতে অবতরণ করেন তখন তিনি অবতার বা 'আলী'। যখন তিনি অবতাররূপে আরো অনেক অবতার সৃষ্টি করেন তখন তাঁর পরিচয় হয় অবতারী অর্থাৎ মহাপুরুষগণের জননী, 'উন্মুল কোরান' বা সকল কোরানের জন্মদাত্রী। সামাদ ও আহাদরূপে শাঁইজি লালন পুরুষ ও প্রকৃতি বা নারী। এই দ্বৈতরূপে সমগ্র সৃষ্টি জগতকে রূপে রসে প্রেমে সত্যে লীলাময় করে রেখেছেন। এ দুইরূপের উর্ধ্বে তাঁর নিরপেক্ষ আর একটি রূপও আছে। তাঁর সেই মোকামের নাম 'লা'। তিনি শরিকালা হু'র মাহমুদা মোকামবাসী। প্রকৃতিপুরুষ উভয়কে অর্থাৎ মায়া ও মায়ীকে অতিক্রম দ্বারা দেহমনু থেকে মূলসত্তা যখন অনন্ত মহাশূন্যতায় বিরাজমান তখন শাঁইজি লা শরিক অবস্থা। সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে জয় করা মহারাজার মোহশূন্য বা The Great Empty mind হালই প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষতা, সমাধি।

পাঁচ.

"এবং তাঁহারই জন্য বিশেষ নৌকাগুলি সমুদ্রটির মধ্যে নিশানের মতো উঁচু হইয়া থাকে। (অর্থাৎ ভাসমান হইয়া থাকে)। সুতরাং তোমাদের (দুইয়ের অর্থাৎ মানুষ

ও জিনের) রবের কোন্ 'আপন সার্বিক লা'র সহিত মিথ্যা আরোপ করিবে?
যে কেহ ইহার উপর আছে সে ফানা (অর্থাৎ ধ্বংস) হইয়া আছে।
এবং বাকা হয় তোমার রবের (অর্থাৎ আপন গুরুর) চেহারা যাঁহা জালাল এবং কেরামতের অধিকারী হইয়াছে। সুতরাং তোমাদের দুইয়ের রবের কোন্ 'আপন সার্বিক লা'এর সহিত মিথ্যা আরোপ করিবে?
যে কেহ দেহমনে (আবদ্ধ) আছে সে তাঁহার নিকট প্রার্থী হইয়াই আছে। প্রত্যেক সময় তিনি এক একটি শানের মধ্যে থাকেন (অর্থাৎ গৌরবময় অবস্থায় বিরাজ করেন)। সুতরাং তোমাদের দুইয়ের রবের কোন্ 'আপন সার্বিক লা'এর সহিত মিথ্যা আরোপ করিবে"?

– সূরা আর রহমান ॥ বাক্য ২৪–৩০

আমিত্বের সার্বিক 'না' অবস্থাকেই বলা হয় 'লা'। কোরানুল করিমে 'লা'এর উপর বড় মদচিহ্ন স্থাপন করে এই 'লা' অবস্থার চিরস্থায়িত্বের বিস্তার ও বিকাশ বোঝানো হয়েছে। তাই 'লা' অবস্থাকে দেহমন ছাড়িয়ে যিনি মূলসত্তার সঙ্গে পালন করেন তিনিই লালন। লা+লন=লালন। সম্যক গুরুর অপর নাম হলো মন ও দেহ বিচূর্ণকারী। আরবি কোরানের ভাষায় 'ফাতেরিস সামাওয়াতে অল্ আর্দ'। লালন শাহ্ কামেল গুরুরূপে আপন অস্তিত্ব থেকে দেহমন বিচূর্ণ করতে পেরেছেন বলেই শিষ্যগণকেও সেপথে পরিচালনা করার কাজে তিনি পূর্ণযোগ্য। এইরূপে শাঁইজি লালনের কোনো অবস্থার সঙ্গেই শেরেক মানে মিথ্যার কোনোরূপ যোগ থাকে না। শাঁইজির আপন ইন্দ্রিয়পথ দিয়ে যতো ধর্মরাশি মস্তিষ্কে আগমন করে তার প্রত্যেকটির মোহ তিনি সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নিষ্কাম-নির্বিকার অর্থাৎ মোহশূন্য অবস্থায় বিরাজ করেন। সুতরাং শাঁইজির কোনো বিষয়ের সঙ্গেই মিথ্যে বা মোহ যুক্ত হতে পারে না। মনের শেরেকশূন্যতাই রবরূপে ফকির লালন শাহের আদি ও অনাদি পরিচয়।

> লা মোকামে আছে বারি
> জবরুতে হয় তাঁর ফুকারি
> জাহের নয় সে রয় গভীরই জিহ্বায় কে সে নামে কয় ॥

লালন শাঁই লা মোকামে অবস্থান করেন। তাঁর সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বারপথে দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, ভাব ইত্যাদি নানারূপে যা কিছু সত্তার কাছে আগমন করে তাদের কোনোটাই শাঁইজির মনের মধ্যে মোহের দাগ কাটতে পারে না। অর্থাৎ তাতে কোনোরূপ শেরেক উৎপাদিত হয় না। তাই তিনি জন্মচক্র থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং দেহমনকে আপন সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। অতএব স্থানকালজয়ী মহাপুরুষ হয়েছেন।

মানবমন প্রতিনিয়ত বিষয়বস্তুর প্রতি মোহ দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যে শেরেক তথা সংস্কার করে সেই শেরেক তার পুনর্জন্মের বীজ বপন করে। মনের শেরেক ছাড়া দেহের উৎপাদন অর্থাৎ জন্ম হয় না। জীবের জন্মচক্রের মূলে রয়েছে শেরেক। আবার সৃষ্টি বিকাশের মূলে নূর মোহাম্মদরূপে লালন আবর্তমান। অতএব ফকির লালন শাঁইজি জীবের মনের শেরেক ধর্মের সুষ্ঠু পরিচালনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছেন। জীবের জন্মচক্র সচল রাখার উদ্দেশ্যে এই শেরেক প্রয়োজন। যাঁদের মন শেরেক থেকে মুক্ত হয়ে কাফশক্তির অধিকারী হয়েছেন তাঁরাই 'ফকির' অর্থাৎ পুরুষ হয়ে গেছেন। তাঁরা ব্যতীত বাদবাকি আর সকল অস্তিত্বের মূলাধার লালন এখানে স্ত্রীলিঙ্গ। পুরুষ ও প্রকৃতির অর্থাৎ সমস্ত অস্তিত্বের মূলাধার লালন শাহ ব্যক্তিগতভাবে নিজে শুধু পুরুষই নন বরং পুরুষোত্তম সত্য। তা সত্ত্বেও তাঁর প্রতীক প্রকৃতি বা স্ত্রীলিঙ্গ এজন্যেই যে, তিনি পুরুষ সৃষ্টি করে থাকেন। এঁরা প্রকৃতির সন্তানরূপেই সৃষ্ট হয়ে পুরুষে পরিণত হন।

দয়াল লালন কামেল মোর্শেদরূপে 'আল কোরান' শিক্ষা দিয়ে ইনসান বা ভক্ত থেকে নিম্নমানের জীবগণকে অর্থাৎ জিন বা দানব প্রকৃতির জীবগণকে গুণগতভাবে রূপান্তর করে ইনসানিয়াত দান করেন। জীব সকলের মধ্যে ইনসান অর্থাৎ গুরুচরণে আত্মসমর্পণকারী সর্বোচ্চমানের জীব। ইনসান ব্যতীত নিম্নমানের জীব কোরান ব্যাখ্যা তথা জীবন ব্যাখ্যা বুঝতেই পারে না। লালন শাহ নিম্নমানের জীবকে ইনসানে রূপান্তর করে অর্থাৎ উন্নীত করে তাদের জীবন ব্যাখ্যা তথা জীবনদর্শনের জ্ঞানদান করেন।

> রূপকাষ্ঠের এই নৌকাখানি নাই ডোবার ভয়।
> পারে কে যাবি নবির নৌকাতে আয় ॥

কোরানে মানবদেহকে 'সংস্কার সমুদ্রের নৌকা' বলা হয়েছে। ভরা নৌকা ডুবে যায়। বিশেষ নির্ভার নৌকা বা প্রতিষ্ঠিত নৌকারূপী মহাপুরুষ লালনদেহ সদাভাসমান থাকেন। বিষয়রাশির সংস্কার সমুদ্রে লালন শাঁইজির মতো সিদ্ধ মহাপুরুষগণ ব্যতীত সব নৌকাই ডুবে আছে। ফকির লালন শাহর মতো সিদ্ধপুরুষণ এই সমুদ্রের উপর ভাসমান থেকে সংস্কারের উপর চেতনার বিজয় নিশানারূপে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহরূপে গুরুর ইচ্ছানুযায়ী এবং আল্লাহর জন্যেই হয়ে থাকে। তাঁরাই জগতে অন্য সবার জন্যে আল্লাহর পথের দিগ্‌দর্শন। কামালিয়াতের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে তাঁদের দেহনৌকা এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মোহ সমুদ্রের উপর বিজয় কেতন উড্ডীয়মান রেখে সগৌরবে ভাসমান আছে।

সম্যক গুরু তথা আল্লাহ্‌র চেহারা অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় গুণরাজি প্রাপ্তগণ ব্যতীত আর সবাই সংস্কার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে আছে। সৃষ্টির মধ্যে জিন এবং ইনসান পর্যায়ের জীব জাহান্নামে অর্থাৎ সংস্কার সমুদ্রে আগমন করেনি অর্থাৎ এখনো সেখানে উন্নীত হয়ে আসেনি। এই সমুদ্রে আগমনকারী সব অসালাতি অর্থাৎ ধ্যানবিমুখ ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। অপর দিকে যাঁরা সালাতকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে আল্লাহর চেহারা (আদম সুরত) লাভ করেছেন তাঁরাই 'বাকা' হয়েছেন অর্থাৎ চিরঞ্জীব লালন হয়েছেন এবং জন্মমৃত্যুকে জয় করে ধ্বংসের রাজ্য থেকে স্থায়ীভাবে উদ্ধার পেয়েছেন।

চাতক পাখির এমনই ধারা
অন্যবারি খায় না তারা
প্রাণ থাকিতে জ্যান্তে মরা ঐ রূপডালে বসে ডাকে ॥

পরিশুদ্ধ মহাসত্তারূপে গুরু লালন সব সময় থাকেন মর্যাদার এক একটি গৌরবের মধ্যে অধিষ্ঠিত। অপর পক্ষে দেহমনের মোহে আবদ্ধ জীব থাকে প্রতিনিয়ত এক একটি চাহিদার জালে বন্দি। এদের বিষয়তৃষ্ণার যেন শেষ নেই। তাই লালন শাঁইজির প্রতি তাদের অনন্ত জিজ্ঞাসা আর চাহিদা কখনো শেষ হতে চায় না। ফলে তারা মন ও দেহের সীমা অতিক্রম করতেও পারে না। দেহমন বিচূর্ণ করা তথা দেহমনের সীমানা ভেঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া। জন্মচক্রের শেকল ঘেরা প্রকৃতি মায়ের এই বন্দিশালা থেকে মুক্ত হয়ে ওঠা মানে পুরুষোত্তম সত্যে পরিণত হওয়া। এ সাধনা আত্মিক তথা মানসিক শক্তি-সামর্থসাপেক্ষ অতিসূক্ষ্ম বিষয়। এর অপর নাম 'মুতু কাবালা আন্তা মউত' অর্থ মরার আগেই মরে যাওয়া। শাঁইজির কথায় 'জ্যান্তে মরা প্রেমসাধন'। ঐকান্তিক সালাত প্রক্রিয়ার সাহায্যে জন্মমৃত্যুর উপর, সমস্ত দুঃখজ্বালার উপর 'লা'এর এমন মহাবিজয় অর্জন করা সম্ভবপর হয়ে থাকে।

সদাই থাকে নিষ্ঠারতি হয়ে মরার আগে মরা।
কতো মণিমুক্তা রত্নহীরা মালাখানায় দেয় পাহারা ॥

দেহমন সর্বদাই নানারকম চিন্তা-ভাবনার পথে অন্তহীন পথিক হয়ে অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। জন্ম জন্মান্তরে এর কোনো শেষ নেই। সাত্তিক মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ বারবার দেহমনে আবদ্ধ হচ্ছে এবং আপনাপন গতিপথে প্রত্যেকে ভ্রমণ করছে। বিরামহীন এই ভ্রমণ অতিক্রম করতে চাইলে শাঁইজির 'লা'সাধনা তথা জন্মচক্র থেকে মুক্তিলাভের মোক্ষসাধনা করতে হবে। তবেই আত্মিক মহাশক্তির অধিকারী হয়ে জন্মচক্র থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। ঘুরে ফিরে

কোরানের চিরায়ত এ বাণীই শাঁইজি তাঁর সুর ও স্বরের জীবন্ত স্পন্দনে জারি রাখেন। মহৎগণের ভাষা-বাক্যের বাইরের খোলস ধরে খুব টানাটানি চালালে শেষাবধি অন্তরের 'সার পদার্থ' ধরাছোঁয়ার নাগালের বাইরে থেকে যেতে বাধ্য। দেশে দেশে কালাকালে এমনই হয়।

লা মোকা অর্থাৎ মোকামে মাহমুদা নামক আধ্যাত্মিকতার শেষ স্তরে উত্তীর্ণ মুক্তপুরুষগণ যুগে যুগে যা বলেন তা 'কোরান' ছাড়া আর কিছু নয়। আরবি ভাষায় 'কোরান' অর্থ 'কিছু কথা'। জীবন্ত দেলকোরানের প্রকাশ 'কিছু কথা' চুম্বক ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে শাঁই লালনের সবাক্ কোরানে। আরবি কোরান জীবন্ত আদি কোরানসমূহের প্রকৃষ্ট সঙ্কলন। পূর্ববর্তী নবি-রসুল নূহ, ইব্রাহিম, ইসমাইল, দাউদ, সোলামান, মুসা, ইসার সার্বিক 'লা'চর্চার শ্রেষ্ঠতর ভাষ্য উঠে আসে মহানবি মোহাম্মদের (আ) সর্বশেষ আরবি কোরানে। তিনি হেরাগুহায় আত্মদর্শন দ্বারা আদি নবিগণের সর্বেশ্বরবাদী দর্শনের যেমন সত্যায়ন করেন প্রত্যক্ষ স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়ে তেমনই অন্তর্মুখি সার্বক্ষণিক ধ্যানের (দায়েমি সালাত) মাধ্যমে আত্মদর্শন লাভ করে সৃষ্টির বন্ধনমুক্ত মহাপুরুষ হবার মারেফত বহাল রাখেন আলীর মাওলাইয়াতে। তাই হেরাগুহা স্থানকালে মোটেও আবদ্ধ নয়, এটি সর্বকালে জায়মান ছিলো, আছে এবং থাকবে। প্রতিটি মানুষের আপনাপন দেহগুহায় হেরাগুহা লুকিয়ে রয়েছে। কোরানুল হাকিমের বিধানমতে দেহের ভেতর মন দিয়ে অবিরাম চারমাস ভ্রমণ করলে এ নশ্বরদেহের অসারতা গভীরভাবে যেমন উপলব্ধি করা যায় তেমনই রোগশোক, জ্বরা, যন্ত্রণা, অকৃতকার্য মৃত্যু থেকে চিরমুক্তির দিকে উত্থানের (নশর) মাধ্যমে অনন্ত পরমব্রহ্ম 'লা' মোকামে লীন হওয়ার সাধনা। তাই দেশে দেশে কালে কালে যুগোপযোগী অভিধায় কোরান সর্বভাষায় ও সর্বজাতির মধ্যে প্রকাশিত হয়ে চলেছেন। এ বিকাশক্রিয়া কেউ স্বীকার করুক কি না করুক তাতে অখণ্ডধারায় বহমান চিরসত্যের বিকাশক্রম কখনো থেমে থাকে না। সব বাধার মধ্যেও শাঁইজি তাঁর অটলপথে (সেরাতাল মোস্তাকিম) বিনা বাধায় এগিয়ে যান। শাঁই লালনের বিকাশধারা তাই বন্ধনহীন অসীম মুক্তধারা।

কোরানের ভাষা-বাক্যের উপর খেলাফতী ওমর, আবু বকরের অবৈধ হস্তক্ষেপ আর উপর্যুপরি অস্ত্রোপচারের ফলে এবং ওসমানের ষড়যন্ত্রমূলক কোরান সঙ্কলনের কারণে 'লা' মোকামের কোরানকে তাঁর আসল চরিত্র থেকে সরিয়ে সম্পূর্ণ উল্টোভাবে দাঁড় করানো হয়েছিলো জগতের সামনে [বিস্তারিত জানার জন্যে সুফি সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী লিখিত 'মাওলার অভিষেক ও ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য]। পররাজ্যশিকারী, ক্ষমতালোভী শোষক আব্বাসী-উমাইয়া রাজারা কোরান-হাদিসকে রাজতান্ত্রিক স্বার্থসিদ্ধির

এজাজতনামায় পরিণত করে পরবর্তী কালে। মহানবির ইন্তেকালের পরপরই তাঁর আধ্যাত্মিক রাজত্বের উত্তরাধিকারী মাওলা আলীকে এই তিন বিশ্বাস খেলাপী খলিফা নানাভাবে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করার কারণে হেরাগুহার অহিলব্ধ মোহাম্মদী কোরানের সর্বকালীন বিকাশধারা রুদ্ধ করা হয় সরকারিভাবে। কালে কালে মা ফাতেমা, মাওলা আলী, ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইনসহ নবিবংশের চৌদ্দজন মাসুম ইমাম প্রত্যেকেই জঘন্য ও নির্মম পন্থায় শহীদ হন সুন্নি মুসলমান আবু সুফিয়ান, মাবিয়া, আয়েশা, এজিদ প্রমুখ ক্ষমতালোভী সাম্রাজ্যবাদী বকধার্মিকদের গোত্রহিংসা আর বেইমানির কারণে।

হাজারো বছরের কোরান হত্যাকারি মধ্যপ্রাচ্যের চরিত্রহীন ভোগবাদী রাজা-বাদশাদের স্বার্থরক্ষার বানোয়াট কাগুজে কোরানের বিকৃত ব্যাখ্যাগুলো তাই পুরোপুরি খারিজ করে দেন শাঁইজি। এর ভেতর দিয়ে লা মোকামবাসী সদাজীবন্ত 'আলীর দেলকোরান' আবারো বিশ্বের কাছে খুলে ধরলেন শাঁইজি লালন ফকির। জগতের বুকে আবারো মোহাম্মদী কোরানের ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরার মিশনে তিনি সর্বদা অক্লান্ত ও শ্রান্তিহীন। কাগুজে যতো 'বোবা কোরান' সবই তাঁর 'বাঙ্ময় কোরান' জিহ্বার কাছে পরাস্ত। অহাবি কাঠমোল্লা-মাদ্রাসাপাশ মুন্সিদের বানোয়াট গল্পেসল্পভরা ভোজবাজির ঠুনকো ধর্ম শাঁইজি এক ফুঁয়েই কুপোকাৎ। আত্মদর্শনমূলক 'লা' মোকামের জীবন্ত কোরানের সামনে রাজ দরবারের মুখস্ত বুলিবলা তোতাপাখিরা হাতেনাতে এমন ধরা খায় যে আর মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। অনুষ্ঠানাচারপ্রিয় এসব তামসিক-রাজসিক লোকধর্মকর্ম কখনো শাঁইজির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষমতা রাখে না। সামনে আর ওরা কোমর সোজা করে দাঁড়াবার সুযোগ তাই খুব বেশিদিন তেমন আর পাবে না। শাঁইজির দার্শনিক উত্থানের সাথে অবশ্য অনেক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটবে আগামী দিনগুলোয়। কেন না রাজা-বাদশাদের স্বার্থরক্ষার ধর্মকাহিনির বানানো বিভ্রান্তি লা মোকামে প্রতিষ্ঠিত লালনরূপী 'মানুষ মোহাম্মদ গুরু'কে পাশ কাটাতে গিয়ে আজ সম্পূর্ণ নাজেহাল হয়ে পড়ছে ভেতর থেকে। আদি মোহাম্মদী ধর্মকে রাজশক্তি মারাত্মক ভয় পায়। তাই এতোদিন ধরে কম *পরিমাণ সৌদি পেট্রোডলার–ইউ.এস. ডলার ঢালা হয়নি কোরানের ভাষা-*বাক্যের স্থূল ধারণাতন্ত্রকে জনমনে বদ্ধভাবে চাপিয়ে রাখতে। লালনের 'লা'দর্শনের অত্যাসন্ন পুনরুত্থান ঠেকাতে আন্তর্জাতিক ধর্মমাফিয়ারা এখন উল্টোপাল্টা নানান ছক বানাতে ব্যস্ত। মোহাম্মদী সত্যধর্মের মূল টার্গেট লা-মোকামকে ওরা বহুকাল যাবৎ ধামাচাপা রাখতে চেষ্টা চালিয়েছে সস্তা শব্দাচারি ধর্মব্যবসার লোকদেখানো পণ্যসুলভ চরিত্র বিশ্লেষণের উপর জোর দিয়ে।

এখনো সুন্নি-অহাবি ধর্মডাকাতেরা পুরনো মিথ্যাব্যবসার বেসাতি জবরদস্তি কায়েম রাখতে মরিয়া। এসব ভ্রমাত্মক-খণ্ডিতচিন্তা ও তৎপরতা সর্বাংশে নাকচ করে দিয়ে আদি 'সত্যধর্ম' দ্বীনে এলাহীকে পুনরুদ্ধারের জন্যে শাইজি লালনের লোকোত্তর দর্শনের অগ্রাভিযান দিন দিন হয়ে উঠছে অপ্রতিরোধ্য।

ছয়.

গত দু'শ বছরে লালন শাহী মৌলিক বিধান যাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ অর্থে বিকশিত হয়েছে তিনি সুফি সম্রাট সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী যিনি লালনের 'লা' মোকাম তথা লোকোত্তরদর্শনকে অভিব্যক্ত করেন বিশ্বজনীন ঐশ্বর্যে: Know NOT and Practice NOT the Zakat will arise with Salat of NOT and Ultimately the great NO will be reached and victory over births and deaths; victory over all sufferings.

According to the Quranic terminology this stage is called LAA MOKAM that is, masterly Stage of the Permanent annihilation of human self. বাংলায় এর ভাবার্থ দাঁড়ায়: কেবল 'না'কেই জানা এবং 'না'এরই সাধনা। জাকাত (আমিত্বশূন্যতা বা মোহশূন্যতা তথা লা) জেগে উঠবে কঠোর সালাতে। এবং পরিশেষে পৌঁছে যাবে সেই পরম 'না'এ। বিজয় আসবে জন্মমৃত্যুর ওপর, বিজয় আসবে সমস্ত দুঃখজ্বালার ওপর। এই চরম স্তরকেই কোরানের পরিভাষায় মোকামে মাহমুদা বা লা মোকাম অর্থাৎ নির্বাণ বলে। 'যথায় শূন্য তথায় পুণ্য তথায় দেবতাও নগণ্য। আকাশপাতাল সব জঘন্য। জঘন্য স্বাধীনতা করে তারা ক্ষুণ্ন'।

ধর্মের দুটো ধরন। একটি 'হ্যাঁ' অর্থাৎ বিষয়ামোহের চাঞ্চল্যকর আকর্ষণে মদমত্ত হয়ে বারবার জন্মমৃত চক্রে পড়ে জাহান্নামের জ্বালাভোগ করা। এবং অপরটি তার ঠিক বিপরীতে ধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশে রয়েছে 'লা' তথা মোকামে মাহ্‌মুদা মর্যাদার শেষতম স্তর। এই মানসিক স্তরই হলো শেরেকহীন বা সংস্কারমুক্ত পরিশুদ্ধতম শুদ্ধদেহ। কোরান বলেন: 'শুদ্ধদেহ ছাড়া জগতে মানুষের জন্যে কোনো আশ্রয় নেই'।

> লামে আলিফ লুকায় যেমন
> মানুষে শাঁই আছে তেমন
> তা নইলে কি সব নূরীতন আদমকে সেজদা জানায় ॥

'শুদ্ধদেহ' তৈরির প্রাথমিক পথ হলো একজন লালনের শরণাগত হওয়া অর্থাৎ সর্মপিত হওয়া এবং তাঁর পদ্ধতি হলো সাতটি ইন্দ্রিয়ের দুয়ার অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, মুখ, হাত ও মন বা ভাব দিয়ে আপন দেহমনে বাইরে থেকে একে একে

যতো বিষয়রাশি ঢুকছে তার উপর সার্বক্ষণিক সালাতময় অর্থাৎ প্রজ্ঞাময় সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ জারি রাখা। শাঁইজির নিগূঢ় জ্ঞানসাধন পদ্ধতি অনুসরণ, অনুকরণ ও চরিত্রগত করার মধ্য দিয়ে মানুষ পূর্বের জ্ঞানহীন স্বরূপটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং পর্যায়ক্রমে জীবধর্ম পরিত্যাগ করে উত্তীর্ণ হবে শিবলোক তথা লা মোকামে। চুরাশি লক্ষযোনি পরিগ্রহ করিয়ে এজন্যে শাঁইজি মানুষ সৃষ্টি করেন। মানুষলীলাই তাঁর ঈশ্বরলীলা। নারায়ণের সর্বোত্তম নরলীলা। বিগত দু হাজার বছরের সাম্রাজ্যবাদী মিথ্যারোপ, হস্তক্ষেপ ও ষড়যন্ত্রের ফলে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ধর্মকর্ম বলতে একাধিক অসুস্থ চিন্তা-ভাবনা এখনো বিরাজ করছে। লৌকিক ধর্মচর্চার নামে এসব অসার ধারণা ও অপতৎপরতার মূল্যে নিহিত রয়েছে স্থুল লাভালাভের প্রতিযোগিতা উস্কে দেয়ার পুজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসন পরিকল্পনা।

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যবাদ থেকে আজকের আগ্রাসী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্বের সবাই ধর্মের নামে দেশে দেশে এ কুধর্মের আগুনে টনটন তেল ঢালছে। শাঁইজি লালনের সর্বোত্তম কোরানিক বিকাশ সদগুরু সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ঘটিয়েছেন তাঁর 'মসজিদদর্শন' নামক চিরায়ত আকরগ্রন্থে এবং মোহাম্মদী 'কোরানদর্শন'এর সূক্ষ্ম ব্যাখ্যায়। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে অনুষ্ঠানবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-অবদমন ব্যবস্থার চালচরিত্র পরখ করেছেন তিনি লালন-কোরানের 'লা' তথা দ্য 'নো' তথা The school of great Noএর আঁকশি দিয়ে। তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা যথার্থই সাব্যস্ত হয়, ব্যক্তিসত্তা উৎপাদন ব্যতীত যা কিছু ভোগ করে এবং অন্য কোনো স্থুলবস্তুর মধ্য দিয়ে যখন তার সূক্ষ্মসত্তার পরিচয় ব্যক্ত করে ফেলে সেখানেই মূলসত্তার সাথে সরাসরি দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতা শুরু হয়ে যায়। শাসক-শোষক কায়েমি গোষ্ঠীর লোকপ্রিয় ধার্মিকতার সাথে শাঁইজির লোকোত্তরদর্শনের দ্বান্দ্বিক এই মূল আঙটা তিনি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। স্পষ্ট করে তিনি দেখান, ব্যক্তির শ্রমহীন-উৎপাদন বহির্ভূত কোনো বস্তুর উপরই তার কোনো অধিকার থাকে না। কিন্তু আধুনিক সূক্ষ্ম শোষণবাদী অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মোড়ল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ব্যক্তির নিজস্ব উৎপাদন সংশ্লিষ্টতা থেকে তার সত্তার সম্বন্ধকে সম্পূর্ণ পৃথক করে মধ্যসত্বভোগী ফাড়িয়া শ্রেণী তথা অনুগত ভড়াটে মোল্লা, ব্রাহ্মণ, পাদ্রিদের ধর্মব্যবসাকে রমরমা করে রেখেছে। এতো মাদ্রাসা কাদের লাভের জন্যে খোলা হলো? নবি-রসুলগণ কে কোন মাদ্রাসায় পড়ে কোরানেওয়ালা হয়েছেন কবে?

এক সময় উৎপাদন ব্যবস্থা ছিলো প্রত্যক্ষ উৎপাদক ব্যক্তির অধীন। যেমন নবি-রসুলের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে কর্তৃত্বে নবুয়ত-রেসালতের প্রতিষ্ঠিত ধারা সচল ছিলো আদিযুগেও। মধ্যবর্তী এতো এতো মিথ্যা হাদিস-পুঁথির কোনো প্রয়োজনই পড়তো না, কোনো মক্তব-মাদ্রাসা ছাড়াই সম্যক গুরুরূপে নবির

মুখনিসৃত বাক্যই ব্যক্তি সমাজের কাছে চূড়ান্ত সত্য বলে বিশ্বাস্য ছিলো। লালন শাঁইজি অনুগামী ভক্তের কাছে সর্বদাই প্রত্যক্ষগোচর। আপন ভক্তের কাছে তিনিই জীবন্ত আল্লাহ-রসুল। কিন্তু আজ একাডেমিক পাণ্ডা-পণ্ডিতদের ছাঁচে ঢালা গবেষণা-গ্রন্থনার মাধ্যমে ভক্ত ও লালনের মধ্যবর্তী এজেন্ট হয়ে উঠেছে ড. কি পণ্ডিতদের তৈরি করা নিষ্প্রাণ-নিরস কাগুজে ব্যাখ্যা-বয়ান। এভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও 'জ্ঞান' বা 'বস্তু' বা 'দ্রব্য' তথা 'উৎপাদন' প্রত্যক্ষ ব্যক্তিক ফরমেট হারিয়ে পরোক্ষ নৈব্যক্তিক ফরমেটে ঢুকে পড়েছে। এভাবে দুর্দশা কবলিত ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়েই উৎপাদনক্ষমতা ও বিতরণ কর্তৃত্ব হারিয়ে অর্থাৎ ক্রমেই আত্মনির্ভরশীলতা হারিয়ে পরনির্ভর হয়ে পড়েছে। ফলে আসল ময়ূরের নাচ আর দেখাই যায় না। চতুর কাক ময়ূরের নকল পেখম ধরে নাচে বেড়াচ্ছে। শাঁইজির লা মোকাম তথা নির্বাণ হলো পরনির্ভরশীলতা থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জন করে নিজেকে স্বরূপসত্তায় প্রতিষ্ঠা করা।

ফরাসি দার্শনিক রনে দেকার্ত René Decart ব্যক্তির এ অবস্থাকে 'বস্তু' তথা 'দ্রব্য' বা 'Substance' বলেন। তার মতে বস্তু বা দ্রব্য মানে: 'An existent thing which requires nothing but itself in order to exist' অর্থাৎ যাকে আপন সত্তার অস্তিত্বশীলতার জন্যে আর কখনো পরের উপর নির্ভর করতে হয় না এবং যাকে অন্য কোনো ধারণার সাহায্য ছাড়াই বোঝা যায় তা-ই হলো বস্তু বা দ্রব্য বা মাল । তাই 'লা' এবং 'Substance' এর মূল নির্যাসে ভেদ নেই তেমন। ভেদ শুধু শব্দ বা ভাষা বাক্যে কিন্তু কখনোই মূলভাবে নয়।

এনে মহাজনের ধন বিনাশ করলি ক্ষ্যাপা।
শুদ্ধ বাকির দায় যাবি যমালয় হবেরে কপালে দায়মাল ছাপা ॥

কীর্তিকর্ম সেই ধনী অমূল্য মানিকমণি তোরে করছিলেন কৃপা।
সে ধন এখন হারালিরে মন এমনই তোমার কপাল বদওফা ॥

আনন্দবাজারে এলে ব্যাপারে লাভ করবে বলে এখন সারলে সে দফা।
কুসঙ্গের সঙ্গে মজিয়ে কুরঙ্গে হাতের তীর হারায়ে হলিরে ক্ষ্যাপা ॥

দেখলিনে মূল বস্তু ঢুঁড়ে কাঠের মালা নেড়েচেড়ে মিছে নাম জপা।
লালন ফকির কয় কী হবে উপায় বৈদিকে রইলো জ্ঞানচক্ষু ঝাপা ॥

শাঁইজির এ গানের বিশেষ বিশেষ শব্দ; যেমন: 'মহাজনের ধন', 'অমূল্য মানিকমণি', 'হাতের তীর' 'মূল বস্তু', 'আনন্দবাজার' সবই তাঁর লা মোকামের অর্থাৎ অখণ্ড জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতীকী ব্যঞ্জনা। প্রতিটি মানুষ এ মহাসম্পদ জন্মসূত্রে শাঁইজি লালন থেকে প্রাপ্ত হয়েই পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু যথাসময়ে সম্যক

গুরুর কাছে আশ্রয়গ্রহণ না করার কারণে ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষ আল্লাহ্‌র মহাধন বিকাশের পরিবর্তে বিনাশ ঘটায়। জিনপ্রকৃতির মানুষ যৌবনে শক্তি-সামর্থ্য থাকতে সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পিত না হওয়ার দরুণ 'শুদ্ধ বাকির দায়'এ পড়ে প্রাপ্তধন হারায়। ফলে প্রত্যক্ষ গুরুকৃপা থেকেও বঞ্চিত হয়। চিত্তের মধ্যে বিষয়মোহের চাঞ্চল্য বা আকর্ষণ মানুষকে শাইজির সুসঙ্গ থেকে সরিয়ে অসৎসঙ্গে, আসক্তির ঘোলাজলে ডুবিয়ে মারে। হাত কর্মশক্তির প্রতীক। বিষয়রাশির মোহের উপর শাঁইজির প্রত্যক্ষ সালাত-জাকাত না করার ফলে ইন্দ্রিয়রিপুর ভোগলিপ্সায় তলিয়ে পড়া মানুষ হাতের 'তীর' তথা সৎকর্মফলহারা 'ক্ষ্যাপা' হয়ে ঘুরপাক খায়।

সাত.

প্রত্যক্ষ উৎপাদন সম্বন্ধহীন জগতের বেশির ভাগ মানুষই আজো মান্ধাতা আমলের রাজতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী ধর্মকর্মের দুর্বল জোয়ালে বাধা পড়ে আছে। শুধু লোকজানানো বাইরের ভঙ্গিসর্বস্ব আচার-অনুষ্ঠানের ধামাধরা। বেহেস্ত বা স্বর্গের লোভে এরা কুধর্ম করে বেড়ায়। তসবিহ্‌-কাঠের মালা টেনে ওরা বেহেস্তের আগাম টিকিট বুকিং নিশ্চিত করতে চায়। হায় আহাম্মক, জাহান্নাম-জান্নাত যে তার জীবনের প্রতিদিনের বাস্তব বিষয়। আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ না ঘটিয়ে একে মৃত্যু পরবর্তী ব্যাপার বলেই মনে করে ওরা। কোরানমতে সাধকের জন্যে জাহান্নাম-জান্নাত পরিত্যাজ্য। লা মোকামে অধিষ্ঠানই তার পরম লক্ষ্য। লোকেরা লা মোকামের 'মূল বস্তু' নূরে মোহাম্মদীর জ্যোতির্ময় উদয় ঘটাতে আত্মদর্শনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে না। তাই শাঁইজি কোটি কোটি অজ্ঞান ধার্মিক ব্যক্তির অসহায় দুর্বল অবস্থার ভিত্ নড়বড়ে করে দেন। এরা স্ব স্ব দেহের মধ্যে অন্তর্মুখি জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না করে, বহির্মুখি কাগুজে বেদ-বাইবেল পড়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ থেকে চিরবঞ্চিত থাকে। মুন্সি-পাদ্রির ফতুয়াবাজির জোরে শোরগোল তুলে পরস্পর মারামারি বাঁধায়। সম্যক গুরুরূপে লালন শাঁইজি প্রবর্তিত পদ্ধতির অনুসরণে দেলকোরানের সন্ধান করেই না। রাজশক্তির কাগুজে নিষ্প্রাণ কথা নিয়ে এরা অজ্ঞান অবস্থাকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং বারবার পৃথিবীতে নরপশুদেহ ধারণ করে এসে নিজেরা যেমন নানামুখি বিপদাপদের ফাঁদে আটকে পড়ে তেমনই অন্যদেরও বিপদের মধ্যে ফেলে রাখে। এসব সুরহীন অর্থাৎ অসুর ধার্মিকদের মিথ্যা দর্প চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পূর্বে লালন শাহ্‌ ত্রাণকর্তা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সামনেও তিনি উত্থিত হবেন অতীতের যে কোনো কালের চেয়ে অপ্রতিহত মহাশক্তিবল নিয়ে। 'লালন বলে নূর চিনিলে যেতো মনের অন্ধকার'।

আট.

আল কোরান বলেন: 'লা কুম দ্বীনিকুম অলিয়া দ্বীন' অর্থাৎ ধর্মে কোনো জবরদস্তি বা জোরাজুরি নেই। লালন শাহী ধর্মে তাই কোনো জোর-জবরদস্তির বিধান নেই বরং এ হলো মহব্বত সহব্বতের ধর্ম। প্রেমযোগ সর্ব ধর্মসাহিত্যের সারাৎসার। লালন শাহ্ প্রমাণ করেন, প্রকৃত মোহাম্মদী ধর্মের উদার গ্রহণক্ষমতা আর বহুমত সহিষ্ণুতার নির্দশন একেবারে শেষ হয়ে যায়নি, এখনো বেঁচে আছি। সত্যধর্ম বা দ্বীনে এলাহীকে কেউ সমূলে ধ্বংস করতে পারে না। প্রকৃত দ্বীনে ইলাহী বা আল্লাহর সত্যধর্ম রসহীন কূটতর্কবাগীশের অসহিষ্ণু হাঙ্গামা থেকে বহুদূরের জিনিস। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সুফি সম্রাট খাজা মঈন উদ্দিন চিশতীর উত্থানের পর থেকে হিন্দুধর্মের বিবর্তনে মোহাম্মদী ইসলামের প্রভাব অস্বীকারের উপায় নেই। ভারতীয় ধর্ম গবেষণার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাসূত্রে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন: "সমসাময়িকতায় আচ্ছন্ন অনেক ভারতীয় ইসলামের এই প্রভাবকে মেনে না নিলেও, হিন্দুধর্মের বিবর্তনকে নিরপেক্ষভাবে দেখলে মহান ধর্ম ইসলামের সৃজনশীল প্রভাবকে অস্বীকার করার কোনও উপায় থাকে না।' [দ্রষ্টব্য: হিন্দুধর্ম ॥ ক্ষিতিমোহন সেন]

ভক্তি আন্দোলন, মধযুগে পারাস্য থেকে আগত চিশতীয়া সাধুগণের সুফিসাধনা ও সংস্কার, গৌড়ীয় ভক্তি, ফকির লালন শাহর তত্ত্বসাহিত্য মানুষ মানুষে মিলনের যে অপূর্ব তত্ত্ব প্রচার করে তা শুধু ভেদাভেদমূলক ধর্মীয় গোড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদই নয়, সেই সঙ্গে এ স্বীকৃতিরও প্রমাণ যে, ক্ষমতা, ধনসম্পদ ছাড়াও মহৎ চেতনা আপন জোরেই শক্তিশালী। ফকির-সাধুদের এ প্রতিবাদ এসেছে প্রায়শ রাষ্ট্র ক্ষমতাচর্চার বাইরে থেকে দীনহীন শোষিত সর্বহারা শ্রেণী থেকে। অবহেলিত-বঞ্চিত-লাঞ্ছিত মানুষ হিসেবে ক্ষমতাসীন-ধনিক শ্রেণীর কাছে কোনো স্বীকৃতিই যেখানে পায় না।

বিত্ত বেসাতে দরিদ্র হলেও মনের ধনে মহাধনবান কবীর ছিলেন জোলা বা বস্ত্র বয়নকারি, দাউদ তথা দাদু ছিলেন ধুনুরি বা তুলো ধুনোকারি, সেনা ছিলেন নাপিত, নামদেব ছিলেন দর্জি, তুকারাম ছিলেন ক্ষেতমজুর। লালন শাহের গুরু সিরাজ শাহ্ নাকি ছিলেন পালকিবহনকারি বেহারা। লালনপূর্ব বাংলার ভক্তি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হলেন শ্রীচৈতন্যের পূর্বে বাংলার মানুষকে প্রভাবিত করেছিলেন বৈষ্ণব কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। কিন্তু চৈতন্যই ভক্তিধর্মকে শক্তিশালী এক ধর্মীয় আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন। পরিণতির বিচারে যা থেকে যায় অসম্পূর্ণ। ফকির লালনের তুঙ্গস্পর্শী উত্তরণে ভক্তিধর্মের *ঐতিহ্য পাল্টে সাধুসঙ্গীতের ধারা পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে* ।

প্রাচীন ভারতে আদি নারায়ণী উৎস থেকেই এসেছে ভক্তি আন্দোলন। পদ্মপুরাণ তো ভক্তিকে দ্রাবিড়ভূমিরই ফল বলেছে। আর্যদের অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক

শুকনো ধর্মাচার বিরোধিতা আর জাতপাত-বর্ণবাদী সমাজ ব্যবস্থা অমান্য করার কারণে ব্রাহ্মণেরা বহুকাল ধরে ভক্তি আন্দোলনের সাথে শত্রুতা করেছে। পরে যখন এ আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে, তখন ঐ ব্রাহ্মণেরাই দলে দলে এসে যোগ দেয় ভক্তি আন্দোলনে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারগুলোকেই অন্যভাবে টিকিয়ে রেখেছে বৈদিক ভাবাবেশে। সে কারণে তারা লালন শাহ্‌কে অবজ্ঞা করেছে।

নয়.

ফকির লালন শাহ'র ইসলাম তথা দ্বীনে এলাহি প্রতিষ্ঠিত না হলে বাংলা-পাঞ্জাব-কাশ্মিরের সাধুগুরুগণের অখণ্ড ভারতপথ প্রতিষ্ঠিত হবে না বিশ্বে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট ষড়যন্ত্র রাষ্ট্রীয় বিভাজন এ অঞ্চলে হিন্দুমুসলমান বিদ্বেষকে জিইয়ে রেখেছে। পাকিস্তান নামে সাম্প্রদায়িক দুষ্টক্ষত এ রাষ্ট্রটি ভূবিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এ অঞ্চলে স্থায়ী শান্তির সুবাতাস বইবে না কখনো। অবশ্য তার আগে ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণমানসিকতার সংকীর্ণ হিন্দুয়ানি বুদ্ধি আর ব্রিটিশ-আমেরিকার তোষামদি থেকে ভারতের জাতীয় ও আঞ্চলিক নেতাদের বেরিয়ে আসতে হবে। শাঁইজির নূরসত্তা থেকে অহিলব্ধ অখণ্ড সৃষ্টিরহস্যজ্ঞান উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা করা না গেলে বিশ্বজুড়ে হাজারো বছর ধরে জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে বসা নানারঙের হিংসাত্মক ব্রাহ্মণ্যবাদ ও কাঠমোল্লাতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী দুঃশাসনের রাহুগ্রাস থাকে মানব জাতিকে বাঁচানো যাবে না। পৃথিবীর বুক থেকে পররাজ্যলোভী যুদ্ধংদেহী সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক নৈরাজ্যেরও নিরসন হবে না। 'শান্তিময় একবিশ্ব' প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো ফকির লালন শাহী কোরানকে সামনে তুলে আনা:

> মুর্শিদের মহৎগুণ নে না বুঝে।
> যার কদম বিনে ধরমকরম মিছে ॥
> যতো সব কলেমা কালাম
> ঢুঁড়িলে মেলে তামাম কোরান বিচে।
> তবে কেন ফাজেল মুর্শিদ ভজে ॥

কোরানের মূলনীতি শাঁইজির কালামে যেরূপ জীবন্তভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে সেই আলোকে বলা যায়, লালনজ্ঞানীগণ আগামী বিশ্বব্যবস্থার আশু সংস্কারসাধন করবেন। উপস্থিত লালন তথা গুরুজ্ঞানই অখণ্ড কোরানজ্ঞানরূপে প্রতীয়মান হবে। এ নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করলে প্রমাণিত হবে, কোরান কখনোই সাম্প্রদায়িক-গোত্রীয় গ্রন্থবিশেষ নয়। আহলে বাইতগণ তাঁদের জীবন দিয়ে খুব ভালো করেই তা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি বলেন

তাই: 'কোরানের মগজটুকু আমি খেয়ে ফেলেছি। আর হাড়গুলো রেখেছি কুকরদের জন্যে'।

দশ.

ফকির লালন শাহকে যারা 'হিন্দু' বা 'বাউল' বলে তাঁর মুসলিম আদি'সুফি'রূপ বেমালুম চাপা দিয়ে রাখতে এতোদিন আদাজল খেয়ে গবেষণা চালিয়ে যেসব ঢাউস মাপের 'সমগ্রব্যবসা'র চালিয়াতি করেছে শাঁইজি তাঁর শুদ্ধতত্ত্ব দিয়ে তাদের খারিজ করে দিয়েছেন বহুপূর্বেই:

> যার মর্ম সে যদি না কয়
> কার সাধ্য তা জানিতে পায় ॥

লালন নিজের কোরান পরিচয় নিজেই দিয়েছেন। কোনো বিশেষজ্ঞ মতামত এখানে নিষ্প্রয়োজন, সর্বজ্ঞ গুরুমত অতিপ্রয়োজন। যে বুঝে সে ভাগ্যবান। বুঝলো না যারা হতভাগা শয়তান। এদের করুণা করার উপায়ও আর থাকে না।

> যেহি মুরশিদ সেই তো রসুল
> ইহাতে নাই কোনো ভুল
> খোদাও সে হয় এমন কথা লালন কয়না কোরানে কয় ॥

সাম্রাজ্যবাদী-রাজতান্ত্রিক কোরানে অদ্বৈতসত্তা আল্লাহ আর রসুলকে সম্পূর্ণ দুভাবে বিভক্ত করে পৃথক দুটি সত্তা হিসেবে দেখানে হয়। আবু বকর-ওমর গং এ চক্রান্ত কার্যকর করে নবিকে আল্লাহ্ থেকে আলাদা বানিয়ে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিলো। আর অহাবি-অসুর কাঠমোল্লারা তো 'মুরশিদ বা গুরু'সত্তার কোনো স্বীকৃতিই দেয় না। আরবি কোরানই বলেন: 'যারা আল্লাহ ও রসুলের মধ্যে পার্থক্য করে তারা কাফের'। শাঁইজি লালনের দিব্যদৃষ্টিতে মুরশিদ-রসুল-আল্লাহ্ একই সত্তা, অখণ্ড অহাদানিয়াত। সর্বেশ্বরবাদ বা একেশ্বরবাদ মানেও তাই। আরব জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ আল্লাহ-রসুলকে নিজেদের স্বার্থমতো দাঁড় করিয়েছে পৃথক পৃথক অস্তিত্ব বলে। আর শাঁইজি এই তিনকে গেঁথেছেন একসুতোয়। 'লালন কয় না এমন কথা কোরানে কয়'– একথার সূক্ষ্ম তাৎপর্য হয়, লালন শাহ্‌র বাক্য সবই কোরানবাক্য। মনগড়া কোনো কথা মোটেও নয়। নিজেকে 'নফি' বা 'না' করতে গিয়ে শাঁইজি আপন কোরানসত্তাও সমান্তরাল অর্থে প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজকীয় কোরান সঙ্কলনের এন্টি থিসিস বা বিরুদ্ধমতের প্রতীকরূপে দেলকোরান প্রকাশকালে তিনি নিজেই সিনথেসিস বা সংশ্লিষ্ট পরিশুদ্ধ রূপ হয়ে দাঁড়ান। নিজেকে শাঁইজি যেখানে *যেখানে 'না' বলে খারিজ করে দিচ্ছেন, নিঃসংশয়ে ধরে নিতে হয় সেখানে* সেখানেই বিরাজ করছে সব 'হা' মানে অসীম মনলোকের অসীমজ্ঞান বা গুপ্তসুপ্ত

রহস্যভাণ্ডার। পৃথিবীতে শরিয়তী মুসলমানদের এমন হতভাগা ধার্মিক আর নেই, ওরা আল্লাহ্‌র মুখ দেখে না। অথচ জগতের অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীগণ তাদের আল্লাহ বা ঈশ্বর বা ভগবান বা Father Godকে কে না দেখেছে। কেবল অহাবি-সুন্নি 'মুসলমান' নামধারীরাই চোখ থাকতেও এমন জন্মান্ধ যে, কখনো আল্লাহর চেহারা ওরা দেখতে পায় না। কোরানে মহানবি বলছেন: 'ওদের চোখ আছে কিন্তু দেখে না, কান আছে কিন্তু ওরা শোনে না, হৃদয় আছে কিন্তু ওরা হৃদয়ঙ্গম করে না'। ধর্মজ্ঞানে এমন অকাট মূর্খ আলেম নামধারী জালেমরা যখন শাঁইজি লালনের জিন্দা 'দেলকোরান' না জেনে না শুনে গাধার মতো ছাপানো কাগজের বোঝা বয়ে বয়ে নিজেদের মস্ত বিদ্যার জাহাজ ভাবে। প্রতিদিনের বাস্তব জীবনযোগ থেকে জাহান্নামজান্নাতকে বিচ্ছিন্ন করে পরলোকের বানোয়াট ধর্মকাহিনি প্রচার করে। মাঠেঘাটে তামসিক ওয়াজ শুনিয়ে ওরা মানুষকে আতঙ্কিত করে তোলে তখন শাঁইজির অন্তস্থল উৎসারিত কথাগুলো আমাদের চেতনাহত করে:

> সোনার মান গেলোরে ভাই ব্যাঙ্গা এক পিতলের কাছে।
> শালপটকের কপালের ফ্যার কুষ্টার বানাত দেশ জুড়েছে ॥
>
> বাজিল কলির আরতি
> প্যাঁচ প'লো ভাই মানীর প্রতি
> ময়ূরের নৃত্য দেখি প্যাঁচায় পেখম ধরতে বসে ॥
>
> শালগ্রামকে করে নোড়া
> ভূতের ঘরে ঘণ্টা নাড়া
> কলির তো এমনই দাঁড়া স্থূলকাজে সব ভুল পড়েছে ॥
>
> সবাই কেনে পিতলদানা
> জহরের তো উল হলো না
> লালন কয় গেলো জানা চটকে জগত মেতেছে ॥

অন্যত্র শাঁইজি বলেন 'চটকে মোল্লার দড়বড়ি মিছে'। মধ্যপ্রাচ্যের অনাচারি রাজা, বাদশা, ধনকুবেরদের দয়াদাক্ষিণ্য ও বাংলাদেশি ভিক্ষা ব্যবসায়ী মুন্সি-মোল্লাদের দৌরাত্ম্যে কতো লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা পয়দা করা হয়েছে এবং হচ্ছে চটকে মোল্লাদের দড়বড়ি বাড়াতে। এখানে জহরের অর্থাৎ অমূল্য রত্নের অধীশ্বর লালন শাহকে 'হিন্দু' বা 'বাউল' বলে অপপ্রচার জোরদার করার রাজনীতি যতো বাড়বে ততো সোনার চেয়ে পিতলের চাকচিক্যে কোটি কোটি মানুষ ধোঁকায় পড়ে থাকবে। সোনা অক্ষয়। পরিণামে মূল্যবানই থেকে যাবে। যুগে যুগে দু একজন জহরি ছাড়া এ জহরের উল বা সন্ধান কে বা করতে পারে?

এগারো.

লালনসঙ্গীতের মর্মকথা জানতে-বুঝতে হলে শাঁইজির মূল তত্ত্বদর্শনের পাঁচটি সুদৃঢ় ভিত্তি সম্বন্ধে স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা জরুরি। শাঁইজিকে তাঁর মহাভাব ধরে না বুঝে আমাদের ক্ষুদ্রধারণায় যার যার খেয়ালখুশিমতো বুঝতে গেলে 'ফ্যারে' বা 'গোলমালে' পড়ে থাকতে হবে। শাঁইজি লালনের তত্ত্বসাহিত্যের মূলদর্শনগত ভিত্তি পাঁচটির প্রথম ভিত্তিটি হলো জন্মান্তরবাদ বা পুর্নজন্মবাদ বা রূপান্তরবাদ বা কর্মফলবাদ। দ্বিতীয় ভিত্তি আধ্যাত্মবাদ বা সুফিবাদ বা বিশুদ্ধিমার্গ বা নির্বাণতন্ত্র। তৃতীয় ভিত্তি গুরুবাদ বা মাওলাতন্ত্র। চতুর্থ ভিত্তি দায়েমি সালাত বা সার্বক্ষণিক ধ্যান। পঞ্চম ভিত্তি রূপক ভাষা বা সান্ধ্য ভাষা বা সাংকেতিক ইঙ্গিত। এ পাঁচটি ভিত্তি বা পঞ্চশীলানীতি অগ্রাহ্য করলে ফকির লালন শাহকে চিরকাল দুর্বোধ্য আর দুর্গম্য বোধ হবে [বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে দ্রষ্টব্য: লালনদর্শন ॥ আবদেল মাননান ॥ রোদেলা সংস্করণ, ঢাকা ২০০৯]।

ফকির লালন শাহ অনিত্য মানবজীবনের যে নিত্যরূপ পূর্ণচন্দ্রদর্শন তা অতিসংক্ষেপিত বাক্যে ও দিব্যঐশ্বর্যে চরণরূপে প্রকাশ অর্থাৎ আচরণ করেন। সেটি তাঁর 'আত্মদর্শন'স্নাত মহাভাবের বিকাশ। যার যার নিজের নফসের আচ্ছাদনে আবৃত শাঁইজির মূল বা বস্তু বা স্বরূপ বা নূর বা নুক্তা বা জ্যোতি বা অণুদর্শন তথা আত্মদর্শনের প্রথম পাঠ। 'দর্শন' তাই 'খোদ' বা 'নিজের মধ্যে' চেতনমানুষ 'খোদা' বা অসীমচেতন 'নিজেকে' দর্শন করাই প্রত্যেক মানুষের অপরিহার্য এবাদত। আত্ম + দর্শন = আত্মদর্শন। এই দুটো শব্দই সংস্কৃত আগম বা বেদ এবং নিগম বা তন্ত্রশাস্ত্র থেকে এসেছে। যার আরবি প্রতিশব্দ হলো 'হজ্ব'। সংস্কৃত 'দৃশ' ধাতু থেকে হয়েছে 'দর্শন' শব্দের উৎপত্তি। এর অনেকগুলো অর্থ রয়েছে Many shades of meaning। তাতে 'চোখে দেখা' অর্থে এর প্রধান অর্থনির্দেশ আছে তেমনই 'যার মধ্যে দেখা যায়' অর্থাৎ প্রতিবিম্বের আশ্রয়গ্রহণ করার অর্থেও গভীর ভাবার্থ নির্দেশ করা হয়। আবার অন্যতর এক অর্থে 'কানে শোনা'ও 'চোখের দেখার মতো' স্পষ্ট হয় এরকম ভাবও 'দর্শন' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে আচার্য শবরস্বামী 'দর্শন' শব্দের অর্থ 'উচ্চারণ করা'র মাহাত্ম্যেও উদ্ধার করেছেন। মহাসিদ্ধ গুরুগণ শব্দময় মন্ত্র বা ধ্বনি কীভাবে চোখে দেখতে পেতেন তা আম-জনতার পক্ষে বুঝে ওঠা অসাধ্য ব্যাপার বটে। 'দর্শন' অর্থ 'দেখা যায়' এমন অর্থে ব্যবহার যেমন হয়েছে তেমনই একেবারে যেখানে দেখা যায় না সে অর্থেও এর প্রয়োগ রয়েছে। অমাবস্যার একটি নাম 'দর্শ' আকাশে যখন চাঁদ দেখা যায় না। চোখের দেখাঅদেখা ছাড়াও "অতীন্দ্রিয় বস্তু দেখা'র অর্থে 'দর্শন' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন কবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে। রামায়ণে 'ধ্যানের দ্বারা যা উপলব্ধি

করা যায়' তাকে 'দর্শন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্য অর্থে 'জ্ঞান'কেও দর্শন বলা হচ্ছে।

মনুসংহিতায় 'মনের (চিত্ত) দ্বারা যাহা দেখা যায়' তা-ই দর্শন বলা হয়েছে। উপরে আলোচিত 'দর্শন' শব্দের নানামাত্রিক অর্থ যে শুধু 'প্রত্যক্ষ' বা চোখে দেখা সম্বন্ধে করা হতো তাই নয়, চিন্তা-ধ্যান-মনন-করণ দ্বারা আমরা যতো কিছু 'আলোচন' তথা 'আলোড়ন' করি, যা কিছু চিন্তা করি এবং তার ফলে যে জ্ঞানই যতটুকু লাভ করি, সবই 'দেখা'র রকমফের। কোনো একটি বিষয়ে যখন আমরা নানাদিক থেকে 'আলোড়ন' বা 'আলোচন' করি তখন আমরা 'লোচন' অর্থাৎ 'চোখ' শব্দটাই ব্যবহার করে থাকি। তাই 'আত্মদর্শন' মানে চোখে দেখা, কানে শোনা, উচ্চারণ করা, চিন্তন, অনুভব যা মানবদেহের সাতটি ইন্দ্রিয় দুয়ারের কর্ম বা ধর্ম । এগুলোর স্থূল ব্যবহারের দ্বারা দেখা, শোনা, জানা, অনুভব করা, বিচার-বিবেচনা করা প্রভৃতি অর্থে যেমন নানা কর্ম বোঝায় তাই শুধু নয়, সূক্ষ্ম ব্যবহারের মাধ্যমে মানে যোগ সাধনার দ্বারা অদৃশ্য-অজ্ঞাত নানাবিষয়ের সাক্ষাতদর্শন লাভ করা যায়। বোধবুদ্ধির সমস্ত স্তরের সমস্ত প্রকার জ্ঞানই মানুষের 'আত্মদর্শন' দ্বারা অর্জনীয় মুক্তির চিরন্তন বিষয়।

লালন শাঁইজির দর্শনভিত্তিসমূহ উপলব্ধি করতে হলে, আমরা যে বহুজন্ম-জন্মান্তরে অসীম চেতনা থেকে বহুরূপে বিবর্তিত ও বিকশিত হয়ে হয়ে 'মানবজনম' লাভ করেছি–সৃষ্টি রহস্যের এ গুপ্তসুপ্তলীলা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানই মানবজাতির আরাধ্য হওয়া উচিত। জন্মান্তরবাদ কোরানদর্শনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। বহু পূর্বজন্মের সৎকর্মের ফলস্বরূপ মানুষ তাঁর অভিভাবক বা গুরুসত্তাকে সাথে নিয়েই জ্ঞানজগতে আসে। যারা সম্যক গুরুর সান্নিধ্য লাভ দ্বারা হাতে কলমে আত্মমুক্তির শিক্ষাপ্রাপ্ত হবে তাদের আর পতন নেই পরজন্মে। কিন্তু যারা বিষয়মোহে আপ্লুত হয়ে আল্লাহদ্রোহী বা গুরুবিরোধী জীবনযাপন করে তারা কালগ্রস্ত হয়ে মন-মানসিকতায় পশুককুলে পড়ে থাকে। নিম্নমানের সৃষ্টিজগত যেমন বৃক্ষজগত, মৎস্যজগত, পক্ষীজগত, পশুজগত থেকে কোটি কোটি বছরের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে মানুষরূপে জীবের দৈহিক প্রকাশ ঘটে। তাই দেহমনে পূর্বসংস্কারের যে অশুদ্ধি বা আকর্ষণপ্রবণতা সুপ্তরূপে লেগে থাকে তার মোহ থেকে আপনি ইন্দ্রিয়পথ ও মন মস্তিষ্ককে গুরুর জ্ঞানসাবানে ধুয়ে ধুয়ে সাফ বা পরিশুদ্ধ করতে হয়। এর নামই আধ্যাত্মবাদ তথা সুফিবাদ। আরবি কোরানের শব্দ 'সাফা' থেকে সুফি শব্দটির উদ্ভব। নবির প্রত্যক্ষ প্রভাববলয়ের অধীন তাঁর আদর্শিক গৃহের অধিবাসী 'আহ্সাবে সুফ্ফা'গণ সর্বকালে সশরীরে বিরাজমান ছিলেন এবং আছেন।

'আল্লাহ' কি 'খোদা' অদৃশ্য আকারশূন্য কিছু নন বরং তিনি আকারসাকারে *প্রত্যেক সৃষ্টির মূলে স্রষ্টাস্বরূপে জড়িয়ে রয়েছেন। সৃষ্টি ও স্রষ্টা একগাছের বীজ*

এবং ফল। আল্লাহ নিজেই সম্যক গুরু বা চেতনমানুষের রূপ ধরে প্রতি যুগে দেশে দেশে নানা নামে মাওলারূপে অবতীর্ণ হন আপন ভক্তকে উদ্ধার এবং অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী রাজাদের নির্মূল করতে।

গু + রু = গুরু। 'গু' অর্থ অন্ধকার বা আবরণ এবং 'রু' মানে বিদীর্ণকারী। যিনি জিন ও ইনসানের (ভক্ত) অজ্ঞান চিত্তাকাশে জ্ঞানসূর্যের উদয় ঘটান। গুরু ছাড়া জগতে প্রকৃত জ্ঞানরাজ্যের কোনো ঘর বা দরজা নাই। গুরুই ভক্তমনের আল্লাহ, নবি, রসুল শিরোমণি। গুরু বিনে জগতে কোনো ভাষা নেই তাই ভাবও নেই। সব অভাবের অত্যাচার আর জুলুম। সুভাবের জন্যে তাই মনে আমিত্বশূন্যতা অর্জনের প্রধান আশ্রয় সম্যক গুরুর শুদ্ধদেহ। সম্যক গুরুর ঘরে আত্মসমর্পণ বা 'আসলেম' করে আমাদের 'মোসলেম' হবার প্রেমশিক্ষা দান করেন ফকির লালন শাহ্। সাধারণ মানুষ মুক্তপুরুষকেও তাদের মতো দুর্বল মনে করে থাকে। মনুকে চেনার জন্যে জ্ঞানচক্ষু অর্জন করতে হবে। একেই বলা হয় 'ত্রিনয়ন' বা 'ত্রিবেনী' গুরুমুখি আত্মদর্শন তথা মোরাকাবা-মোশাহেদার দায়েমি সালাত। কোরানে কোথাও পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ নেই। কোরানের সালাত একটি সার্বক্ষণিক বা অবিরাম বর্তমান বাস্তবিক বিষয়। গুরুভক্ত শুদ্ধপ্রেমসাধকের সালাতকর্মে কোনো বিরাম বা বিরতি থাকে না। কেন না প্রতিনিয়ত দেহের সাতটি ইন্দ্রিয় দুয়ার দিয়ে আমাদের মনে মস্তিষ্কে বাইরে থেকে অসংখ্য বিষয়রাশি প্রবেশ করে মোহের ছাপ ফেলে যায়। দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ, ভাবরূপে কতো মোহের বহর বিরামহীন গতিতে ঢুকে দেহমনের স্বস্তি ও শান্তি ভঙ্গ করে দেয় সেটা দায়েমি সালাতি তথা সাধকব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তা দেখতে পায় না। মনে আগত প্রতিটি বিষয়কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে শুনে প্রজ্ঞাময় হালে গ্রহণবর্জনই দায়েমি সালাত। চিত্তশুদ্ধির ক্রিয়াত্মক সাধকের সাধনা তাই দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। গুরুবাদী ও জ্ঞানবাদী সালাতের অপরিহার্যতা কোরানের মতো লালনসঙ্গীতেও সর্বত্র পরিব্যক্ত। সালাত প্রক্রিয়ার সাহায্যে জন্মান্তরবাদের পরিচয়জ্ঞান সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং বিষয়দর্শনের উপর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। লালন শাঁইজির ভাষা বাক্য রূপকের মুখোশে আবৃত আদিধরনকরণের হোসাইনী কোরান। সর্বযুগের নবি, অবতার, রসুল, অলি আল্লাহগণের ভাষা ভেদ ইশারার পরদা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। লালনতত্ত্বে অর্থাৎ কোরানুল হাকিমে অনেক কথাই রূপক করে ব্যবহার করা হয়েছে। রূপক অর্থ বুঝে লালন পাঠ ও শ্রবণ করলে গভীরতর জীবনদর্শন উপলব্ধি করা যাবে এবং মনের সৌন্দর্যবোধ তথা নান্দনিক উৎকর্ষ সাধিত হবে। শাঁইজির মতে:

> মুর্শিদ জানায় যারে মর্ম সেই জানিতে পায়।
> জেনে শুনে রাখে মনে সে কি কাউরে কয় ॥

শাঁইজি নদীয়ার কথ্য ঢঙে তাঁর কোরানতত্ত্বসার প্রচার করলেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম সে গূঢ় অর্থ উপলব্ধির ক্ষমতা অতিউচ্চস্তরের দু চারজন মহাজ্ঞানী-মহাজন ব্যতীত গড়পড়তা পণ্ডিত, কাঠমোল্লা-পাদ্রিদের হয় না। এ ভাষা রহস্যলোকের মহাভাবময় ভাষা। ফকির লালন শাহ্ 'আপনি বাজান আপনি বাজেন আপনি মজেন সেই রবে'। রসুলাল্লাহ্ বলেন: 'আমিই হেদায়েত দাতা এবং আমিই হেদায়েত গ্রহীতা '।

বারো.

ফকির লালন শাঁইজির সাহিত্য 'মানুষবর্ত' তত্ত্বসাহিত্য। মানুষবর্ত অর্থ মানুষের মুক্তিপথ। মানবমুক্তির শাশ্বত তত্ত্বকথা প্রকাশ ও তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশসাধনই তাঁর প্রধান সৃষ্টিলীলা। 'তত্ত্ব' বলতে সাধুগণ বুঝে থাকেন যা মূলসত্তা; যেমন: অলঙ্কারের তত্ত্ব হলো সোনা, আয়নার তত্ত্ব হলো পারদ, কলসির তত্ত্ব হলো মাটি, পালঙ্কের তত্ত্ব হলো কাঠ ইত্যাদি। শাঁইজির সাহিত্য মানে 'হিতের সহিত' সদাবিরাজমান থাকার কালজয়ী অটলক্ষমতা। প্রতিটি বস্তুর বাইরের আকারবিকার তার মূল স্বরূপ নয়, খোলস মাত্র। বস্তুর ভেতরের গুণ বা আলোটাই তার মূল স্বরূপ। সব সত্তা বা সৃষ্টির মূল বা তত্ত্ব আছে। মানুষ সৃষ্টির মূলতত্ত্ব হলো নূর তথা জ্যোতিস্বরূপ নূরে মোহাম্মদী।

নূরেতে কুল আলম পয়দা
আবার বলে পানির কথা
নূর কি পানি বস্তু জানি লালন ভাবে তাই ॥

তত্ত্বগানে শাঁইজির ত্রিতত্ত্বের প্রথমতত্ত্ব তাই নূরতত্ত্ব, কোরানুম মোবিনের সৃষ্টিতত্ত্বও নূরতত্ত্ব। এ নূর আল্লাহর জাতিনূর যা থেকে মানব সৃষ্টি হয়। 'নূর কি পানি বস্তু জানি' অর্থাৎ মানব বীর্য নূরেরই ধারক। এ নূরকে শাঁইজি 'নীর'ও বলেছেন। আবার সম্যক গুরুকে 'আল্লাহর অফুরন্ত রহমতের পানি'ও বলা হয়েছে কোরানে। এটা 'অসীম জ্ঞানসমুদ্র' ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কোরানের সূরা বাকারায় 'বীর্য সংরক্ষণকারিকে স্বয়ং একটি জ্ঞানপাত্র'রূপে মহিমান্বিত হরা হয়েছে। মানবসৃষ্টির মূল উপাদান এ জাতনূরের উৎস সম্যক গুরু সর্বযুগে একজন নবি বা রসুল পর্যায়ের সিদ্ধপুরুষ। তাঁকেই কোরানে বলা হয়েছে 'নূর মোহাম্মদ' যিনি নূরে মোহাম্মদীর মূলাধার। তাঁর নূর থেকে সমগ্র সংসারের উৎপত্তি। অর্থাৎ নূরে মোহাম্মদী থেকেই সব সৃষ্টিজগত উৎপাদিত হচ্ছে।

পঞ্চনূরী পঞ্চ অঙ্গে
দাঁড়িয়েছিলো প্রেরতরঙ্গে

আলিফ লাম মিম কোন অঙ্গে
তখন খেলকা তহবন্দ ছিলো না।

কিংবা,

জাত এলাহি ছিলো জাতে
কী রূপে এলো সেফাতে
লালন বলে নূর চিনিলে যতো মনের অন্ধকার ॥

আরবি ভাষায় সূর্য নারী বা সৃষ্টির প্রতীক এবং চন্দ্র হলো স্রষ্টা তথা পুরুষের প্রতীক। সূর্য থেকে রশ্মি বা আলো নিয়ে চন্দ্রের বিকাশ। সূর্য মহানবির এবং চন্দ্র মাওলা আলীর প্রতীকস্বরূপ। সব মানুষ যে মূল ব্রহ্মস্বরূপ নূরে মোহাম্মদ থেকে আগত এ সত্য তারা ভুলে থাকে, আপন মূলসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিষয়মোহে নিজেদের শুধু দেহগত জীব হিসেবে ধারণা করে। দেহসর্বস্ব মোহের উপর মানুষকে বিজয়ী করে তোলার জন্যে ফকির লালন শাঁই নূরসাধনকে ফকিরির প্রধান কর্তব্যরূপে উপস্থিতভাবে বিশ্লেষণ করেন।

ও ভাণ্ডে আছে কতো মধুভরা খান্দানে মিশ গা তোরা।
নবিজির খান্দানে মিশলে আয়নার পৃষ্ঠে লাগবে পারা ॥
যেদিন জ্বলে উঠবে নূর তাজেল্লা এই অধর মানুষ যাবে গো ধরা।
আল্লাহ্ নবি দুই অবতার এক নূরেতে মিলন করা ॥

ঐ নূর সাধিলে নিরঞ্জনকে অমনই যাবে ধরা।
ফকির লালন বলে শাঁইর চরণে ভেদ পাবে না মুরশিদ ছাড়া ॥

সম্যক গুরু নবির নূরের মহান বংশীধারি। একজন সম্যক গুরুর চরণ আশ্রয় করে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ মানসিক সমর্পণের মাধ্যমে 'নবির খান্দানে' মিলে একাকার হয়ে যেতে হয়। তখনই আত্মদর্শন দ্বারা মূলসত্তা নূর মোহাম্মদকে আপন সত্তার আয়নায় প্রজ্জ্বলিত রূপে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় সাধকের পক্ষে। আল্লাহর জাতিনূর এই 'অধর মানুষ' যার যার মোর্শেদের দেয়া সাধনার দ্বারা যেদিন পরিপূর্ণ দর্শন করা যাবে তখনই সাধকমনে এ প্রত্যয় সুদৃঢ় হয় যে, সম্যক গুরুর দেহটা হলেন নবি এবং তাঁর মন বা চেতনলোক হলেন আল্লাহ্। 'দুই অবতার' আল্লাহ-নবি 'এক নূরে' আপন সদ্গুরুর মধ্যে চিরন্তন ধারায় প্রবহমান রয়েছে। সালাতসাধনার আত্মদর্শন দ্বারা এ নূররহস্য উদ্ঘাটন হয়ে গেলে সাধক একজন 'অনন্ত মোহাম্মদের অনন্ত বংশধর একজন মোহাম্মদ' হয়ে ওঠেন।

কোরানুল হাকিমে সুরা নেসা'র ৪৩ নং বাক্যে যারা 'মোমিন' বা 'সত্যদ্রষ্টা' হবার প্রারম্ভিক সাধনায় লিপ্ত আছে এমন সাধককে বলা হচ্ছে: 'নেশাগ্রস্ত অবস্থায়

থাকো বলে, তোমরা কখন কী বলছো তা জানতে বুঝতে পারো না'। মন কখন কী বলে, কোথায় ধেয়ে চলে, তার খবর মোমিন ব্যতীত অন্যলোক মোটেই জানে না। এমনকি আমানুগণও সে বিষয়ে যত্নবান থাকে না। এজন্যে তাদের মন দেহমোহনির্ভর তথা দুনিয়ার লোভে নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকে। তাই চেষ্টা করলেও তারা সালাতের নিকটবর্তী হতে পারে না। সালাতবিহীন লোক সত্যসন্ধানী হতে পারে না। নূর বা আল্লাহর অসীম রহমতের পানি নিম্নোক্ত চারটি অবস্থায় অবশ্য পাওয়া যাবে না: যথা:

১. মানসিক দীর্ঘ অসুস্থতা থাকলে।

২. মন দেহের আপন হালের খবর না রেখে বাইরে ভ্রমণরত থাকলে অর্থাৎ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিরামহীনভাবে ঘুরলে।

৩. অসীম বা অফুরন্ত পায়খানা অর্থাৎ অসীম বস্তুমোহ থেকে মনের আগমন শেষ না হলে, অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরে একই রূপ বস্তুমোহ থেকে অর্থাৎ দীর্ঘ অজ্ঞানতা থেকে আসতে থাকলে।

৪. অসীমভাবে যদি মন তার ভাবের দ্বারা মেয়েলোক স্পর্শ করতে থাকে অর্থাৎ যৌনমোহের বিরতি যদি মনের মধ্যে না ঘটায় তথা বস্তুমোহে যদি সব সময় রমিত হতে থাকে। দেহভোগ সে বাস্তবে করুক বা না করুক, মন যদি এই মোহ থেকে মুক্ত হতে না পারে তা হলে 'আল্লাহর অফুরন্ত রহমতেস্বরূপ পানি' বা নূরের সন্ধান সে পাবে না। এই নূর বা পানি স্বর্গীয় জ্ঞান। অসীম এ জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন বা গোসল না করা পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড ব্যথার জ্বালা পোহাতে হয়।

উপরোক্ত জ্ঞানহীন সংকটময় অবস্থা থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা হিসেবে কোরান যে ব্যবস্থা দান করেন তা হলো, অতএব নফস বা মনকে শুদ্ধ করতে চাইলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে পবিত্র কবরের বা পবিত্র উন্নত মাটির (কামেল মোর্শেদ) তায়াম্মুম করতে হবে। কোরানে কোথাও 'অজু' কথাটি নেই, সেখানে আছে তায়াম্মুম। 'পবিত্র উন্নত মাটি' অর্থে রূপকভাবে সিদ্ধপুরুষ কামেল গুরুকে বোঝানো হয়েছে। গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করে 'গুরুভাব' দ্বারা সম্মুখ চেহারা এবং হাত দ্বারা কর্মের কলুষ বা মনের অপবিত্রতা মুছে নিতে হবে। 'চেহারা' অর্থে ইন্দ্রিয়গুলোর অভিব্যক্তিসমূহ এবং হাত বলতে দেহমনের শক্তি-সামর্থ্যকে প্রতীকরূপে বোঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গুরুভাবের দ্বারা দেহমনকে চালিত করলে পথের কলুষকালিমা মনে দাগ কাটতে পারে না। সাধারণ মানুষের জন্যে এ ব্যবস্থা দেয়া হয়নি। বিশ্বাসের মহড়াকারি সাধক এ পর্যায়ে উপনীত হয়ে থাকনে। অতএব তাকে কামেল গুরুর প্রত্যক্ষ আশ্রয়গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। 'ইমাম' কথাটি থেকে 'তায়াম্মুম' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। ইমাম অর্থ নবির আদর্শপতাকাবাহী সিদ্ধপুরুষ, তাঁর একই নূরের দর্পণ 'মাওলা'কে চিন্তা ও কর্মের সামনে দাঁড় করানো হয় বা প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'তায়াম্মুম' শব্দের অর্থ

হলো, কাউকে আদর্শরূপে চিন্তা ও কর্মের সামনে রাখা এবং সদা তদ্‌ময় (তন্ময়) হয়ে থাকা। তন্ময় ও তায়াম্মুম একার্থবোধক ভাব। মানে সদাই গুরুময় 'লা' হালে জাগ্রত থাকা।

তেরো.

যিনি সমস্ত সৃষ্টির নূরসত্তা বা কেন্দ্রস্বরূপ তিনিই নবি। খ্রিস্টানগণ বলে থাকেন, যিশুখ্রিস্টের নূর থেকেই সমস্ত সৃষ্টি– একান্ত সত্যকথা এটি। আমরা কোরান-হাদিসমতে জানতে পাই, রসুলাল্লাহ (আ.) আল্লাহর নূর হতে এবং তাঁর নূর থেকে সমস্ত সৃষ্টি। 'নূরে মোহাম্মদী' 'আদিসৃষ্টি' 'তাঁকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না' ইত্যাদি। খ্রিস্টানগণের উক্তি এবং আমাদের উক্তির মধ্যে বিবাদের কোনো কারণ নেই। সমস্ত নবিই আল্লাহ থেকে একই আলো নিয়ে এসেছেন। এবং একই আলোর বিকাশ যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ মহামানবগণের মধ্যে প্রকাশ লাভ করে আসছে। আল্লাহর অতিপ্রিয় স্বর্গীয় এ মহান আলোকে 'নূরে মোহাম্মদী' নামে জানান দেয়া হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো এর নাম কি হওয়া উচিত? 'নূরে ইসা' (Light of christ) 'নূরে মোহাম্মদী' (Light of Mohammed) অথবা আর কোনো নামে? যিনি সকল পূর্বতন নবি ও অলিগণের সরদার এবং যাঁর মধ্যে এসে এই মহানূরের বিকাশ মানবীয় পূর্ণতা পেলো তাঁরই নামানুসারে এই নূরের নামায়ণ হওয়া উচিত। এ যুক্তি সবাই স্বীকার করবে, যে মহামানবের মধ্যে এসে এই নূরের মানবীয় বিকাশ পূর্ণতা লাভ করলো ফলে যার উছিলায় মানুষ তা পরিপূর্ণরূপে ও অতিসহজে লাভ করার সুযোগ পেলো এবং যিনি হলেন সমগ্র সৃষ্টির মূর্ত রহমত বা রহমতুল্লিল আলামিন তাঁরই নামানুসারে এ মহানূরের নামকরণ 'নূরে মোহাম্মদী' হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

'মোহাম্মদ' অর্থ প্রশংসিত। এই নূর আল্লাহ কর্তৃক প্রশংসিত। আল্লাহ্ স্বয়ং ও ফেরেস্তাগণ এই নূরের উপরই 'সালাত' করেন অর্থাৎ তাঁর এই নূরের সংযোগ তাঁর বান্দাগণকে দান করার কর্মে ব্যস্ত থাকেন। অতএব, নূরে মোহাম্মদী নামকরণের দ্বারা হযরত ইসা আলাইহে সালাতু আস্‌সালামের মর্যাদার কোনো মর্যাদাহানি তো হতেই পারে না বরং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধিই পায়। অবশ্য খ্রিস্টানগণ রসুলাল্লাহকে (আ.) নবি বলেই স্বীকার করতে চায় না। তারা এখনো হয়তো বাইবেলে বর্ণিত 'মসি'র আগমন অপেক্ষায় আছে। বাইবেলের সেই সুসমাচার এবং সেই মহান প্রকাশ যে রসুলাল্লাহই স্বয়ং এসত্য সাম্প্রদায়িক দুর্বলতার কারণে তারা স্বীকার করে উঠতে পারছেন না– এই যা সমস্যা। নূর মোহাম্মদ মানুষ মোহাম্মদের বর। যুগে যুগে একজন কামেল গুরুই ভক্তজনের উপাস্য তথা আপন নূর মোহাম্মদ বররূপে আছেন।

চৌদ্দ.

অপারের কাণ্ডার নবিজি আমার ভজনসাধন বৃথাই গেলো নবি না চিনে।
আউয়াল আখের বাতেন জাহের নবি কখন কোনরূপ ধারণ করে কোনখানে ॥

'নবিতত্ত্ব' ফকির লালন শাহর দ্বিতীয় তত্ত্ব বা দ্বৈতলীলা। আল্লাহর নূর থেকে নবির নূর। নবির নূর থেকে সারা সৃষ্টি ব্যাপ্ত বা প্রকাশিত হয়েছে। 'কলম' হৃদয়ের কথা প্রকাশের অবলম্বন। সমস্ত সৃষ্টি জগত নূর মোহাম্মদরূপী সূক্ষ্ম বিজ্ঞানময় কলম থেকে আগত হয়েছে এবং হচ্ছে। এটাই আল্লাহর আত্মপ্রকাশের মহান কলম। এ কলম থেকে যা কিছু লিখিত হচ্ছে তা-ই সৃষ্টি এবং তা আল্লাহর অভিব্যক্তিস্বরূপ আল কলম এবং আল কলমে যা কিছু লেখে তথা যা কিছু বিকশিত সৃষ্টি করে থাকে তার সবই 'নুন' এর স্বাক্ষী-প্রমাণ। কোরানে 'নুন' হরফটি হলো নবি, নূরনবি বা নূরের পরিচায়ক। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি নূরনবির পরিচয়।

আসমান জমিন জলাদি পবন
যে নবির নূরেতে সৃজন
কোথায় ছিলো নবিজির আসন

নবি পুরুষ কি প্রকৃতি আকার তখনে ॥ নবিতত্ত্ব কোরানের বিভিন্ন সূরায় যেমন রূপক ভাষায় ও সাংকেতিক 'নুন' হরফ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তেমনই মহানবির ঔরসজাত পুত্রদেরও 'নুন' অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন: "তৈয়ব-তাহের হাদী অর্থাৎ শুদ্ধ ও পবিত্রকারী পথ প্রদর্শক। হে শুদ্ধ ও পবিত্রকারী পথ প্রদর্শক, আমরা তোমার কোরান নাজেল করিনি তোমার দুঃখের কারণ হবার জন্যে"।- আল কোরান ২০ : ১-২।

'নুন' মানে জন্মসূত্রে নবুয়তপ্রাপ্ত নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক সদ্‌গুরু দুনিয়াবাসীর হেদায়েতের জন্যে মাটির পৃথিবীতে আগমন করলে তাঁকে বহু দুঃখকষ্ট অবশ্য নীরবে সহ্য করতে হয়। মনুষ্য জাতি থেকে অকারণে অত্যাচার অবিচার তাঁর উপর এসে পড়লেও হেদায়েতকর্মের মহড়া প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দেয়ার জন্যে এবং আদর্শ সৃষ্টি করার প্রয়োজনে নবি পর্যায়ের হাদীব্যক্তিকে বহু পরিশ্রম ও দুঃখকষ্ট অন্যলোকের শিক্ষার স্বার্থে নিজেকে বরণ করে নিতে হয়। সেজন্যে কোরানে মোহাম্মদ (আ,)-এর রব মোহাম্মদকে তথা সর্বযুগের সকল মহামানবকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন: 'তোমাকে দুঃখ দেয়ার জন্যে কোরান মজিদের এ নির্দেশগুলো দেয়া হয়নি। মানুষের খাতিরে যদি তোমাকেও তা প্রতিপালনের দুঃখ সহ্য করে নিতে হয় এজন্যে তুমি দুঃখিত হয়ো না।

তৈয়ব-তাহের হাসান হোসাইন হলেন কোরানের 'তা-সিন'। ইনারা কোরানের পরিচয় এবং স্পষ্ট কেতাব, একটি হেদায়েত এবং মোমিনদের জন্যে

সুসংবাদ যারা সালাত দাঁড় করে এবং জাকাত দেয় এবং তাহারা আগেরাতের সঙ্গে (বা আখেরাতের দ্বারা) একিন করে। -কোরান ২৭ : ১-৩।

যাঁরা দ্রুত ক্রমোন্নতি লাভ করে চরম পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন তাঁরা কোরানের জ্যান্ত পরিচয়। এবং তাঁরাই স্পষ্ট কেতাব। নূরে মোহাম্মদীর মাধ্যমে বিচিত্র সৃষ্টিরূপে স্রষ্টার বিকাশ-বিজ্ঞানকেই কেতাব বলা হয়, কোনো কাগজে ছাপানো বইকে নয়। উচ্চমানের বিশিষ্ট সাধক ব্যক্তির উপর এ কেতাবজ্ঞান নাজেল হওয়ার বিষয়টি সর্বকালের একটি চিরন্তন ব্যবস্থা। কেতাব অর্থ তাই 'বিশ্ব প্রকৃতির সামগ্রিক বিকাশ বিজ্ঞান'। মহাপুরুষগণ কেতাবের অধিকারী হয়ে নিজেরাই বুদ্ধ'কেতাব' হয়ে যান।

সর্বকালে 'তৈয়ব-তাহের-হাসান-হোসাইন' এ শ্রেণীর মহান মানুষ জগতবাসীর জন্যে স্বয়ং এক একটি হেদায়েত। এবং তাঁরা সেসব মোমিনের জন্যে সুসংবাদবাহক যাঁরা সালাত দাঁড় করেন এবং তাঁরা তাঁদের আখেরাতের সঙ্গে আত্মপ্রত্যয় সহকারে অবস্থান নিয়েছেন অর্থাৎ এলহামের সংযোগে এসে মানবজীবনের শেষ পর্যায়ে পৌছেছেন। যার পর আর দুঃখে আসতে হবে না। আখেরাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেই একিন অর্থাৎ পূর্ণআত্মপ্রত্যয়ের জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ হয়ে থাকে। কোরানে 'আখেরাত' অর্থ পরবর্তী কাল। গুরুভক্ত আমানু তথা সাধকের জন্যে তার 'এলহাম' থেকে আরম্ভ করে মোমিন বা মুক্ত হওয়া পর্যন্ত কালকে আখেরাত বলে। অপরদিকে গুরু অস্বীকারকারি কাফেরের আখেরাত হলো তার পুনর্জন্ম বা পরবর্তী শাস্তিপূর্ণ জীবনকাল। মহানবির চিরকালীন বংশধরের মধ্যে যিনি সত্যদ্রষ্টা বা সাদেক হয়ে থাকেন তাঁর দিকে একটি কেতাব নাজেল হয়। কেতাবপ্রাপ্ত অর্থাৎ সৃষ্টি রহস্যজ্ঞানের বিকশিত ধারক-বাহক সত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণই কেবল সমাজের জন্যে সত্যিকার পথ প্রদর্শক বা হাদী। কোরানের উপদেশ: "হে সাদেক মোমিনগণের সঙ্গে সকল প্রকার মানুষ কোনোরূপ মিল রক্ষা করে না বিধায় কেতাব থেকে একটি সংকোচভাবের উদয় হওয়া সত্যদ্রষ্টা প্রচারকের জন্যে স্বাভাবিক। তথাপি তোমরা প্রচারকাজে সংকোচবোধ কোরো না। যতোটুকু সম্ভব মানুষের কল্যাণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাও অর্থাৎ নবির সর্বকালীন অখণ্ড মিশন তথা সত্যধর্মের পতাকা আরো উপরে তুলে ধরো। নবুয়তের সাথে হেদায়েতের সম্বন্ধ তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নবুয়ত 'খতম' মানে নবুয়তের সত্যায়ন, সিলমোহর দান. স্বীকৃতি বা পূর্ণতাপ্রাপ্তি ইত্যাদি। এসব অর্থ বাদ রেখে 'খতম' নামক অত্যন্ত সূক্ষ্ম অর্থপূর্ণ শব্দটির অর্থ বলতে নিছক 'শেষ' বা 'সর্বশেষ' বলাটা এখন ধর্মীয় রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। যে একচোখা ধারণাপ্রসূত সুন্নি-শিয়া-অহাবি তেহাত্তর কাতার চুয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত। ধর্মের রাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক ধ্বজাধারি কাঠমোল্লা-মুন্সি-মৌলভিরা খতমে নবুয়তের হিক্কা তুলে প্রায় অজ্ঞান।

লালন শাহ্‌র বাক্যে তাদের বাড়াবাড়ি প্রকাশ্যভাবে নাকচ হয়ে যায়। শাঁইজি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন:

আপনি খোদা আপনি নবি আপনি হন আদম সফি
অনন্ত রূপ করে ধারণ কে বোঝে তাঁর লীলার কারণ
নিরাকারে শাঁই নিরঞ্জন মুর্শিদরূপ হয় ভজনপথে ॥

পনেরো.

মহানবির উচ্চতর মহাজ্ঞানের দরজা, তাঁর নবুয়ত, বেলায়েত ও রেসালতের সুযোগ্য অধিকারী, রসুল বা নিয়োজিত প্রতিনিধি মাওলা আলী (করমুল্লাহ্)। কিন্তু ওমর, আবু বকর, ওসমান, আয়েশা, আবু সুফিয়ান, মাবিয়া গং গোত্রীয় চক্রান্তে রসুলতত্ত্ব তথা নবির আদর্শিক মোকামের অধিবাসী বা আহ্‌লে বাইতের আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব মানে কোরান জোর করে কেড়ে নেয়। এর মধ্যে দিয়ে অবৈধ ক্ষমতালোভী কয়েমি স্বার্থের পূজারীরা মাওলা আলীকে চরমভাবে উপেক্ষা-অগ্রাহ্য-অমর্যাদা করায় 'রেসালত' তথা রসুলতত্ত্ব বিষয়টিই ব্যাপক মুসলিম জনমন থেকে একপ্রকার নির্বাসিত করে দেয়া হয়েছে। কারবালায় মারিয়াপুত্র কুখ্যাতএজিদ নবিবংশের গৌবর ইমাম হোসাইনকে হৃদয় বিদারক পন্থায় হত্যার দ্বারা মোহাম্মদী ইসলামকে জগত থেকে একেবারে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো বলা যায়। কিন্তু জাগতিক রাজত্বের মোহবুদ্ধি দিয়ে কি আধ্যাত্মিক রাজত্বহরণ করা যায়? জগতবাসী স্বীকার করুক বা না করুক নবি-রসুলের নূরের রসুলতত্ত্ব সর্বযুগে ছিলেন এবং এখনো আছেন এবং ভবিষ্যতেও বিরাজমান থাকবেন। কাল কালান্তরে তাঁরা অবশ্যই উপস্থিত আছেন সম্যক গুরুরূপে। মোহাম্মদ রসুলের সময় থেকেই রসুলের বংশধরগণ হলেন কেতাবের এবং কোরানের পরিচয়। আলে রসুল ব্যতীত আর কেউই কেতাব অথবা কোরানের কোনো পরিচয়জ্ঞান রাখে না। গত প্রায় দেড় হাজার বছরে আলে রসুল বা আহ্‌লে বাইতগণ ছাড়া কেউ প্রমাণ করে দেখাতে পারেনি যে কোরান একটি অসাম্প্রদায়িক ও সার্বজনীন জীবনদর্শন। কথায় কোরান প্রকাশ করা হলেও তা মানুষের কাছে অপরিচিত। লালন শাহ্ একজন 'আলে রসুল' জ্যান্ত বিশেষ কোরান। সুতরাং তাঁর মধ্যে সবাই কোরানের পরিচয়ই প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত দেখতে পায়। তাঁর কর্মকাণ্ড, বাক্যালাপ, গীতবাদ্যনৃত্য সবই অখণ্ড কোরানেরই মূর্তরূপ প্রকাশ। 'আল কেতাব' তথা মানবেব জীবনরহস্য তাঁর শ্রবণ ও দর্শনের নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্ট। 'নবির রেসালত সর্বকালে চলমান আছে' এর জীবন্ত প্রমাণ পৃথিবীবাসীদের জানান দিতেই লালন শাহ 'ফকির' নাম ধরে আসেন।

"আলে রসুল বা রসুলের বংশধর– তাঁরা হলেন বিজ্ঞানময় আল কেতাবের নিদর্শন। এটা কি মানুষের জন্যে আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয় যে, আমরা তাদের

মধ্য থেকে একজনের দিকে অহি করেছি: 'মানুষকে সাবধান করো এবং যারা বিশ্বাসকারী তাদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে তাদের রবের কাছে সত্যে প্রতিষ্ঠিত অবস্থান'। কাফেরেরা বলে: 'নিশ্চয় ইনি অবশ্য স্পষ্ট যাদুকর'।"

রসুলতত্ত্ব একটি কেতাব যা তাঁর পরিচয়ের হুকুমত চালনা করে, তারপর বিজ্ঞানী জ্ঞাতা হতে ফয়সালা অর্থাৎ সমাধান দান করে। –আল কোরান ১০ : ১-২।

মাওলা আলী (আ.) রসুলরূপে সমগ্র আলমের 'মাওলা' অর্থাৎ প্রভু গুরু, Vested Lord। তিনি শুধু মোমিন বা বিশ্বাসকারীগণের মাওলা নন, বরং তিনি সমগ্র আলমের জন্যে আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত মাওলা। মাওলা আলীকে অস্বীকারকারী লোক নবিকে এবং আল্লাহকেও অগ্রাহ্যকারী হিসেবে 'মোহাহেদ কাফের'। 'আলী' অর্থ সর্বোচ্চ। তিনি যেদিকে ঘোরেন ধর্মও সেদিকে মোড় নেয়। সর্বযুগে আপন রসুলতত্ত্বের তথা নূরের বংশধরগণের মধ্য দিয়ে 'আলী' উপস্থিত আছেন। লালন শাহ তাই একজন 'আলী'। তাঁর কালামই এ পরিচয়ের পতাকা বহন করে:

ভুলো না মন কারো ভোলে।
রসুলের দ্বীন সত্য মানো ডাকো সদাই আল্লাহ বলে ॥

খোদাপ্রাপ্তি মূলসাধনা
রসুল বিনে কেউ জানে না
জাহেরবাতেন উপাসনা রসুল হতে প্রকাশিলে ॥

দেখাদেখি সাধলে যোগ
বিপদ ঘটবে বাড়বে রোগ
যেজন শুদ্ধসাধক সে রসুলের ফরমানে চলে ॥

অপরকে বুঝাইতে তামাম
করেন রসুল জাহেরা কাম
বাতেনে মশগুল মোদাম কারো কারো জানাইলে ॥

যেইরূপ মুর্শিদ সেইরূপ রসুল
যে ভজে সে হয় মকবুল
সিরাজ শাঁই কয় লালন কি কুল পাবি মুর্শিদ না ভজিলে ॥

ষোলো.

পৃথিবীর আদিধর্মোৎসের দেশ 'ভারত'। আবরের সাথে ভারতের বাণিজ্য যোগাযোগ ও লেনদেনের সম্বন্ধ ইতিহাস প্রাচীন। অবতারবাদের ধারণা ভারত থেকেই আরবে আসে। আরবদের যাপিত জীবনে এখনো প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম-

সংস্কৃতির প্রাচীন অবশেষ বদ্ধমূল হয়ে আছে। যেমন বাস্তব উদাহরণ দেয়া যায়, এখনো অহাবি রাজতন্ত্রের খোদ সৌদি আরবে উলুধ্বনি দেয়া ও তুলসি পাতার ব্যবহার পারিবারিক বিবাহ অনুষ্ঠানের রীতিমতো অপরিহার্য অঙ্গ। ভারতীয় শব্দ 'ব্রহ্মা' ও আবরি 'আব্রাহাম' বা ইব্রাহিমে পরিমার্জিত হলেও সুগভীর উৎসগত ও অর্থগত বিচারে কি একার্থক নয়? যিনি কৃষ্ণ তিনিই কি করিম নন? অনার্য 'নারায়ণ' কীভাবে 'শিব' 'বিষ্ণু' হয়ে ভারতে 'কৃষ্ণ'রূপ ধরেন ভারতীয় পুরাণপুঞ্জে তার অনেক ইঙ্গিত আছে।

ভারতের মানস জগত আদিকাল থেকেই বৈশিষ্টপূর্ণভাবে গুরুদেবতা বা অবতারবাদ বা অতিমানববাদের পূজারী। রাম আর কৃষ্ণ ঈশ্বরের দুইরূপ বহু সহস্র বছর ধরে ভক্তি-পূজার উপাস্য। প্রাচীন ভারতীয় দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। দুই অবতার, রামায়ণে 'রাম' আর মহাভারতে পাণ্ডব 'কৃষ্ণ'। বৈদিক সংহিতায় সূর্য, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তির অপ্রাকৃত অধিদেবতাদের উপাসনামন্ত্র আছে। উপনিষদে মেলে নিরাকার ব্রহ্ম যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন নানা আকাররূপে। মহাকাব্যের এ অবতারগণ হলেন পরম ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যস্থতাকারী অতিমানব।

ইসা নবির জন্মের এক হাজার বছরেরও আগেকার এ মহাকাব্য মূলত অবতারকেন্দ্রিক। অবতার বা মাধ্যম ব্যতীত কোনো দেশে কোনো কালেও আল্লাহর সত্যধর্ম প্রকাশ পায়নি। সনাতন ধর্ম বহু অবতারের ধর্ম। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন: "যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, কুধর্মের অভ্যুদয় ঘটে তখনই আমি দেহধারণ করি। আমার সাধুস্বভাবী ভক্তদের উদ্ধার বা রক্ষা করতে এবং দুর্জন বা অত্যাচারীদের বিনাশ করার মাধ্যমে আমি সত্যধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

–ভগবদ্‌গীতা ॥ ৪র্থ অধ্যায় ॥ শ্লোক ৭-৮।

মহাভারতে হিন্দুদর্শনের বিশেষতত্ত্ব হলো অবতারবাদ মানে আদি সাম্যবাদী নারায়ণলীলা ধ্বংস করে আগ্রাসী বৈদিক বিষ্ণুলীলার অবশেষের উপর কৃষ্ণলীলার প্রতিষ্ঠা। অবতারবাদকে কেন্দ্র করে মহাভারতে ভীষ্মের আত্মত্যাগ, যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা ও ক্ষমা, পাণ্ডবদের ন্যায়নিষ্ঠা, বলশালীদের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করার আগ্রহ, কৌরবপক্ষে কর্ণের দানশীলতা বহু বহু কাল ধরে ভারতীয় হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে আছে সাহিত্যে-শিল্পে-ধর্মতত্ত্বে।

সনাতন ভারতীয় মনে গুরুতত্ত্বের গভীর প্রভাব রয়েছে। এখানে ঈশ্বর বা ভগবান নিজেকে এমনরূপে প্রকাশ করেন যা ব্যাপক মানুষের মনে স্থায়ীভাবে রেখাপাত করেছে। ঈশ্বর মানুষের রূপ ধরে মানুষের কাছে আসেন, তার সাথে একই সমান্তরালে এসে দাঁড়ান। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের এ নররূপে নারায়ণলীলা

নামান্তরে কৃষ্ণলীলা থেকে মূলচারিত্র্যে পৃথক বলে ভাবেন না ফকির লালন শাহ। আরব্য-পারস্যবাহিত মোহাম্মদী ইসলামের নবিতত্ত্ব-রসুলতত্ত্বের সাথে কৃষ্ণতত্ত্বকে একীভূত করে সর্বকালীন সর্বজনীন শান্তির ধর্মদণ্ডকেই সব ভাষিক-কালিক-দেশিক সীমান্ত ছাড়িয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরেন।

ভাগবতদর্শন 'বিষ্ণুপুরাণ'দর্শনের সমধর্মী। বিশ্ব বিষ্ণুর প্রকাশ, এবং শাশ্বত সত্য ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভাগবৎ সেকথা বলে। মহাভারতের কৃষ্ণলীলাতত্ত্ব তাই রাজনৈতিক ঘটনাও বটে। ভাগবতে ঈশ্বরের অবতাররূপে কৃষ্ণ আগমনের তত্ত্বটি তাই গুরুত্বপূর্ণ । তাতে যদিও বলা হয়েছে, অবতার অসংখ্য তবু কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অবতাররূপে দেখা হয়ে থাকে। এখানকার অধিকাংশ পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ আর তার ভক্তদের কাহিনী। পনেরো শতকের কৃষ্ণলীলা শ্রীচৈতন্যের আপন রাধারূপের একতরফা প্রকাশভঙ্গিমা পরিণামহীন অরাজনৈতিক উল্লম্ফন।

মহাভারতের অবতার কৃষ্ণ উপনিষদিক 'ব্রহ্মতত্ত্ব'কে নতুন করে জারি করেন। কখনো তিনি সর্বব্যাপী ব্রহ্মের হয়েও কথা বলেন। আবার কিন্তু কথা বলেন ঠিক মানুষের মতোই, তিনি অর্জুনের বন্ধু, উদ্ধবের সহায়। কিন্তু নদীয়ার নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণলীলায় কীর্তিত চরিত্র পরীক্ষা করতে শাঁইজি ভিন্নভাব সন্ধানী হলেন। ফকির লালন তাকে ফকিরি বললেও তাঁর বিশেষায়িত কৃষ্ণলীলায় তিনি তাঁর পূর্বকালীন লীলাকীর্তনে নব্যকৃষ্ণের সাথে পৌরাণিক কৃষ্ণের অসঙ্গতিগুলো সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন নানা চরিত্রেব মুখ দিয়ে তোলেন। এটি তাই একচোখা গৌড়ীয় কৃষ্ণলীলা মোটেও নয়। শাঁইজি সর্বকালের সর্বজনের সকল আত্মদর্শনমূলক ধর্মকে ইসলাম বা শান্তিধর্ম বলে প্রচার করেন। কোরানে কোথাও মানুষকে ধর্ম বর্ণ গোত্র বিচারে পৃথক করে দেখা হয়নি। বরং ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে মূলত দুই শ্রেণীতে ভাগ করে দেখা হয়েছে। জ্ঞানী এবং মূর্খরূপে।

শাঁইজি যে অখণ্ড ভাবরাজ্যে বাস করেন সেখানে রাম ও রহিমে দ্বৈত্ববোধ নেই। তিনি নূরতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব ও রসুলতত্ত্ব যে অখণ্ডধারায় প্রকাশ করেন ঠিক একই ভাবা থেকেই কৃষ্ণলীলা, গোষ্ঠলীলা, নিমাইলীলা, গৌরলীলা বা নিতাইলীলার বিস্তার ঘটান তাঁর সঙ্গীতে।

'লীলা' অর্থ সৃষ্টি। স্রষ্টা যখন সৃষ্টির মধ্যে আকার সাকারে আগমন করেন তার নামই 'কৃষ্ণলীলা'। এক কৃষ্ণের অনেক রূপ বা নাম (গুণ)। তিনি 'যুগে যুগে সম্ভবামি'। একই অখণ্ড মূলসত্তা মোর্শেদরূপে যিনি জগতে কালাকালে অবতীর্ণ হয়ে কুমর্ধ তথা শেরেক সংহারের জন্যে ভক্তের মন কর্ষণ দ্বারা আকর্ষণ করে চলেন। লালনলীলার অন্ত নাই আর। তাই এক কৃষ্ণলীলারই বহুপ্রকাশ গোষ্ঠলীলা, নিমাইলীলা গৌরলীলা ও নিতাইলীলায়। সকল মহাপুরুষই বদ্ধজীব জনগণকে প্রকৃতির মোহবন্ধন থেকে উদ্ধারের কর্ষণশক্তি (আকর্ষণ) তথা

প্রেমশিক্ষাদান করেন। তাই কানাই বিনে গীত নেই। সম্যক গুরু বিনে শ্রীকৃষ্ণ কোথায়। গুরুকে জগতপতিরূপে ভক্তের যে আরাধনা তা লিঙ্গভিত্তিক 'কৃষ্ণরাধা'র স্থূল ভেদাভেদমূলক ধারণার ভিত্তি ভেঙে দেয় এখানে:

হতে চাও হজুরের দাসী।
মনে গলদ ভরা রাশি রাশি ॥

জানো না প্রেম উপাসনা
জানো না সেবা সাধনা
সদাই দেখি ইতরপনা প্রিয় রাজি হবে কিসি ॥

কেশ বেঁধে বেশ করিলে কি হয়
রসবোধ না যদি রয়
রসবতী কে তারে কয় মুখে কেবল কাষ্ঠহাসি ॥

কৃষ্ণপদে গোপী সুজন
করেছিলো দাস্যসেবন
সিরাজ শাঁই কয় তাই কি লালন পারবি ছেড়ে সুখ বিলাসী ॥

সুতরাং অখণ্ড লালনসঙ্গীতে সেমেটিক ও ভারতীয় ধর্মকে শাঁইজি অনেক নদীখাত থেকে টেনে এক সমুদ্রধারায় এনে আত্মদর্শনমুখি সব ধর্মকে আল্লাহর দ্বীন বা সত্য দ্বীন তথা দ্বীনে ইসলামের রঙে রঞ্জিত করেন। কোরানে মানবজাতিকে এক অখণ্ড আলোকে দেখা হয়েছে। তাই হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরূপে কোথাও বিচ্ছিন্ন করেনি। কোরান মানুষকে মূলত জ্ঞানী এবং মূর্খ এ দু'ভাগে বিচার করেন।

ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে কোনো হিন্দুপুরাণেই 'রাধা' নামক শব্দের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এ বাংলাদেশের বাংলাভাষারই কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে 'রাধা' নামক চরিত্র উদ্ভাবন করেন। এ রাধা নামটি মূলত কবিকল্পিত একটি রূপকল্প (Image) বা মূর্ত বিগ্রহ।

'কৃষ্ণ' নামক শব্দটি এসেছে প্রাচীন ভারতীয় 'কর্ষণ'কর্ম থেকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মগত যতোগুলো কাহিনি, পুরাণ বা আখ্যান পাওয়া যায় তার সবই ভারতীয় কৃষি সভ্যতা লালিত গুরুদেবতারূপেরই প্রকাশ-বিকাশ।

'শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্তন' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যকীর্তন অনেকে পদকর্তাই করেছেন, যার আকর বা মূল উৎস হলো 'মহাভারত'। 'গীতগোবিন্দ' থেকে আরম্ভ করে কালে কালে অখণ্ড বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে অনেক সাহিত্যিকই 'শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্তন' করে গেছেন। সুফি-ফকির সাধক-মোহান্তগণ মোর্শেদমুখি যে প্রেমভক্তিভাব থেকে নবি-রসুলকীর্তন করেছেন সেই একই ভাবোদয় থেকে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও করেছেন। পরিশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের

হাতে পড়ে তা আর এক রকম পরিণতি পায়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কৃষ্ণালীলার সাথে রাজনৈতিক শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ মহাভারত আখ্যানে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণরূপের সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণতর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে শক্তি ও শক্তিমানতত্ত্বে আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে রাধাকে 'শক্তি' বা 'প্রকৃতি' এবং শ্রীকৃষ্ণকে 'শক্তিমান' বা 'পুরুষ'—এমনতর দ্বৈতচরিত্রে একীভূত অর্থাৎ ভেদঅভেদতত্ত্ব ধারণায় প্রকাশ করেন। যদিও পুরাণে শক্তিতত্ত্বের যে সংজ্ঞা তথা বর্ণনা রয়েছে গৌড়ীয় শক্তিতত্ত্ব তা থেকে বহু যোজন দূরে অবস্থিত। পুরাণের শক্তি ও শক্তিমানতত্ত্ব অর্থাৎ শক্তিদেবীর যে ধারণা তার সাথে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কোনো মিলই নেই। আবার শ্রীচৈতন্যের রাধাকৃষ্ণময় যে ভক্তিভাব তার সাথে ভারতীয় আদিভক্তিবাদের কোনোরূপ সম্বন্ধ নেই বললেই চলে। কারণ আদিভক্তিবাদ পুরোটাই রাজনৈতিক। গৌড়ীয় ভক্তিবাদ হলো ভাগবতধর্মের সরলীকৃত একটি পার্শ্বরূপ মাত্র। পৌরাণিক ধারণামূলক চরিত্রের বাইরে শ্রীকৃষ্ণের অতিমানবীয় চরিত্রের এক ধরনের মিথস্ক্রিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক দেবতা নন। বৈদিক ধর্মের পালনকর্তা হলেন বিষ্ণু। শ্রীকৃষ্ণের যে মূল চারিত্র্যলক্ষণ তথা গুণাগুণ আমরা পাই আদিতে অনার্য বা দ্রাবিড় দেবতা 'নারায়ণ'এর মধ্যেই তা সম্পূর্ণ দেখি। প্রাচীন ভারতবর্ষে পারস্যের আর্য আগ্রাসনের ফলে 'নারায়ণ'দেবের উপাসক তথা নারায়ণী সম্প্রদায়ের গুণাবলি প্রথমে বৈদিক দেবতা 'বিষ্ণু' পরে 'শিব' নামের উপর আরোপ করা হয়। বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে নারায়ণের সাথে বিষ্ণু আর শিবের গুণাবলি আরোপিত হলো। যদিও নারায়ণী সম্প্রদায়ের বস্তুমুখি গুণাগুণ অর্থাৎ উৎপাদক ও উৎপাদনের মধ্যে প্রত্যক্ষ যে দৈহিক-মানসিক সম্বন্ধ আর সমন্বয় তার ঠিক বিপরীতেই আর্যশাসিত বৈদিক দেবতাদের গুণাগুণ অদৈহিকতায় পর্যবসিত করা হলো।

ভগবদ্গীতায় যিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্র। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দীর্ঘকালব্যাপী আর্যশাসন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে অনুপস্থিত থাকায় অর্থাৎ বৌদ্ধযুগ, পালযুগ, সেনযুগের পর সুলতানী ও মুঘল শাসনামলের রাজনৈতিক উত্থানপতনে রাজনৈতিক শ্রীকৃষ্ণের গুরুত্ব অনেকটাই ম্লান হয়ে পড়ে।

আর্য আমলে আদি নারায়ণী সম্পদায় যখন আক্রান্ত হয়ে পড়ে সে আক্রমণের বিরুদ্ধে অনার্য অর্থাৎ নারায়ণী সম্প্রদায় ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো। কিন্তু আর্যদের বৈদিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের দীর্ঘকালীন যুদ্ধ-বিগ্রহ আর নির্মম দমন-পীড়নের দ্বারা নারায়ণী সম্প্রদায় ক্রমে ক্ষমতাহারা-কোণঠাসা হয়ে পড়তে থাকে এবং পরিশেষে তারা বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাগবত সম্প্রদায়, সাত্বত সম্প্রদায় এবং পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়। ভাগবত সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম বৈদিক শাসন ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ

করে। ফলে এদের হাত দিয়ে ভগবদ্গীতা প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ভাগবত সম্প্রদায়ের 'আদিভাগবত' ধর্ম বহু আগেই বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের আগ্রাসনে সম্পূর্ণ খারিজ হয়ে যায়। যার প্রকৃত গুণাগুণ কেবল বহাল থাকে পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে। পঞ্চরাত্র মানে পঞ্চজ্ঞান । 'রাত্র' অর্থ জ্ঞান। ভাগবত সম্প্রদায়কে প্রথমে আদি নারায়ণী সম্প্রদায়ই বলা হতো। এর দ্বারা কোনো একজন গুরুদেবতা ব্যক্তিত্বকে বোঝানো হতো না, বোঝানো হতো একটি সামাজিক সমতাভিত্তিক গোষ্ঠীবদ্ধ সম্প্রদায়কে। 'ভগবত' অর্থ 'যারা ভাগ পায়' অথবা 'যাদের ভাগ করে দেয়া হয়েছে' অথবা 'যে সামগ্রিকতা থেকে অংশ পায়'। এ অভেদ সম্বন্ধ 'যে দেয় এবং যে নেয়'–এ উভয়ার্থেকে নারায়ণের সাথে এক করে আমরা দেখতে পাই। নর + আয়ণ = নারায়ণ। 'নর' অর্থ মানুষ এবং 'আয়ণ' অর্থ স্থান। অর্থাৎ মানুষ বা নর যে জায়গায় যায় অথবা যে জায়গার ভাগ পায় তাকেই ভাগবত বলা হয়।

ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের যে ভক্তিবাদ তা বস্তু তথা রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ভাববাদমাত্র। বস্তুকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণের মহাভারতীয় যে পূর্বপরিচয় তা ইতিমধ্যে ভূলুণ্ঠিত। যে কারণে 'ভক্তি' শব্দটি নির্বস্তুক করার মধ্য দিয়ে মূলত যে লীলাচক্র গড়ে ওঠে তাকেই আমরা শ্রীচৈতন্যের 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' বলতে পারি। পূর্বভাবে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণই রাধাকে আলম্বন করছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবে এসে দেখা যায়, খোদ শ্রীচৈতন্য রাধা চরিত্র ধারণ করে কৃষ্ণকেই উল্টো আলম্বন করছেন।

নির্বস্তুক শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র ভাগবত আখ্যানে চরিত্রায়েণের মাধ্যমে একদিকে বৈদিক-রাজনৈতিক শ্রীকৃষ্ণের আধিপত্য বহাল থাকে। অপরদিকে ভাগবত ধর্মের ভক্তিবাদ এবং আদি নারায়ণী সম্প্রদায়ের ভক্তিবাদ থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদকে একটি বিচ্ছিন্ন বা ভিন্নতর চরিত্র দান করে। কালক্রমে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদ বস্তুকে অবলম্বন না করায় ভাগবদ্গীতার কৃষ্ণচরিত্রই শেষ পর্যন্ত গৌড়ীয় ভক্তিবাদকে আত্তীকরণ করে ফেলে। এখানেই ফকির লালন শাহের ব্যতিক্রমী সুরটি আমরা শুনতে পাই তাঁর শ্রীকৃষ্ণলীলায়।

ফকির লালন শাহ্ কখনো শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের রূপকাল্পিক ধারণাতন্ত্রের ভেতর থেকে দেখেননি। আবার শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় রাধাভাবে আকুল হয়েও শাঁইজি তা বোঝেননি। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছেন সেই 'আদিধরন'টির মধ্য দিয়ে যে পর্যায়ে কবিকল্পিত শ্রীকৃষ্ণের কিংবা বৈদিক শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূণটিও যেখানে জন্মায়নি–একেবারে সেই শূন্য পর্যায় থেকে। তিনি দেখলেন সেই বিন্দুটি থেকে যেখানে মানুষের দৈহিক ইন্দ্রিয়ের *সাথে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যকার অভেদ সম্বন্ধসূত্র অটুট থাকে সর্বকালে। কী সেই* সম্বন্ধ? ফকির লালন বলছেন :

অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি তাঁর কী আছে কভু গোষ্ঠখেলা।
ব্রহ্মরূপে সে অটলে বসে লীলাকারি তাঁর অংশকলা ॥

শাঁইজি 'অনাদির আদি' বলতে কী বোঝান? মানব সভ্যতার সেই আদিধরন মানে নারায়ণী সাম্যধর্ম যেখানে উৎপাদক ও উৎপাদনের মধ্যে কোনো মধ্যসত্ত্বভোগীর অস্তিত্বই থাকে না। বস্তু তথা উৎপাদনের বিপরীতে মালিক বা উৎপাদকের মধ্যবর্তী দেয়াল বা মুদ্রা মানে টাকার মতো মধ্যসত্ত্বভোগীর অস্তিত্ব আজকের বাজার ব্যবস্থায় মাধ্যমরূপে কঠিন বিভাজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারায়ণী অনাদি উৎপাদন ব্যবস্থায় কোনোরূপ মধ্যসত্ত্বভোগীর অস্তিত্বই থাকে না। যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীভূমির উৎপাদনমুখিতার মধ্যে কোনো বিভাজনরেখা নেই। এ কারণেই শাঁইজির প্রশ্ন 'তাঁর কি আছে কভু গোষ্ঠখেলা'। 'গো' শব্দটির অনেক অর্থ থেকে আমরা মূলত দুটি ভাবার্থ খুঁজে নিতে পারি; যথা :

১. গো = ইন্দ্রিয়
২. গো = সূর্য

অখণ্ড নিয়মে সূর্যের উদয়বিলয় প্রকৃতির উপর তার কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তারের দ্বারা ভূপৃষ্ঠে প্রত্যক্ষ উৎপাদন সম্পর্কেরই প্রমাণ। ফকির লালন শাঁইজি এই সৃষ্টি-স্রষ্টার প্রত্যক্ষ সম্পর্কেরও অনেক উপরে স্থাপন করেছেন শ্রীকৃষ্ণকে। কেন না উদয়ের সাথেই বিলয়ের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত, যেমন উৎপাদনের সাথে অনুৎপাদনের সম্পর্ক এবং বিচ্ছিন্নতা বা বন্ধ্যাত্বও। এ হলো মানুষের চিন্তার সেই আদিধরন যে ধরন উৎপাদন, ভোগ এবং তার বিস্তার প্রক্রিয়ার একটি পূর্বাবস্থা। যে অবস্থা উদয়বিলয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়, নিরপেক্ষ বা The No বা লা মোকাম অবস্থা। মানসিক সেই মোহশূন্য অবস্থাকে ঠিক অর্থে ধারণ না করতে পারার কারণে বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের ভ্রান্তি সম্বন্ধেও শাঁইজি সজাগ:

কৃষ্ণদাশ পণ্ডিত ভালো
কৃষ্ণলীলার সীমা দিলো
তার পণ্ডিতী চূর্ণ হলো টুনটুনি এক পাখির কাছে।

বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যায়
অমনই আমার মন মনুরায়
লালন বলে কবে কোথায় এমন পাগল কে দেখেছে ॥

সতেরো.

গুরু লালন ফকিরের সঙ্গীত শুধু কথার ক্যারিসমা আর সুরের কালোয়াতিভরা চাতুরি নয়। আজকাল খোলাবাজারে বাণিজ্যিক ঘোলাস্রোতে অন্যগানের সাথে

তালগোল পাকিয়ে লোকেরা লালনসঙ্গীত শুনতে-গাইতে অভ্যস্ত হলেও শাঁইজির কোরান-কালামের গভীর দিক নির্দেশনা অন্য গান লেখকদের চেয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। আমাদের দেশে ইদানিং মস্ত নামকরা পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে স্বঘোষিত 'শাহ' কি 'ফকির' খেতাবধারীদেরও 'লালনগীতি' 'লালনসমগ্র' 'লালনসঙ্গীত' ইত্যাদি নামে বিকৃত সঙ্গীত সঙ্কলন বার করতে দেখি। সব শেয়ালের এক আওয়াজ। এরা কেউই শাঁইজির 'লা' শিক্ষাদীক্ষার আলোকে তাঁর কথার ধারাবাহিক স্তর বা দেশ অনুসারে সাজাতে না জানার ব্যর্থতার ফলে পাঠক-সাধকগণ তাদের সম্পাদিত লালনসঙ্গীতগুলো পড়ে চিন্তার গোলমালে পড়ে। গুরুতর এই বিপদের দিকটি মাথায় রেখে প্রথম থেকেই আমরা ফকির লালন শাহের সঙ্গীতমালা তাঁর নির্ধারিত পথ-পদ্ধতি অনুসরণে যথাসাধ্য সাজানোর চেষ্টা করেছি।

সাধুজগতে শাঁইজি লালন ফকিরের সুফিসাধনার রহস্যকে বলা হয় 'চব্বিশ চন্দ্রভেদতত্ত্ব'। যাতে মানবসৃষ্টির আদিঅনাদি সকল রহস্যভাষ্য নিহিত রয়ে গেছে। মাতৃজরায়ুর মধ্যে পিতৃবীর্যের মিলনোত্তর বিন্দুরূপ স্পন্দন থেকে আদিরূপ তথা শিশুর আকার গঠনের পরিপূর্ণতা। শেষে ভূমিষ্ঠ হওয়া, সংসারধর্মে পিতামাতার অধীনে বড় হতে হতে যখন দেহ যৌবনপ্রাপ্ত হয় তারপর গুরুপাঠ ও দীক্ষাগ্রহণের দ্বারা স্থূলদেশ থেকে প্রবর্তদেশে প্রবেশ, প্রবর্তদেশ থেকে সম্যক গুরুর প্রদর্শিত পথ-পদ্ধতি অনুসরণক্রমে সাধকদেশে উত্তরণ এবং পরিশেষে পর্যায়ক্রমিক সাধকদেহের ধাপসমূহ পার হয়ে সিদ্ধিদেশ থেকে মহাসিদ্ধির পূর্ণসিদ্ধদেহ লাভ করে অমর হন। সিদ্ধপুরুষগণ পরিপূর্ণ দিব্যজ্ঞানী অর্থাৎ সর্ববিষয়ের ত্রিকালজ্ঞ দ্রষ্টা ও শ্রোতা।

শাঁইজির প্রবর্তিত ধারাবাহিক দেশক্রম সম্বন্ধে ইতেপূর্বে আর কেউ গবেষণার সৎসাহস করেনি। তাতে লালন শাঁইজির দর্শনচর্চার পথ-পদ্ধতি সম্বন্ধে শুধু সাধারণ লোকেদেরই নয়, সাধক-ভক্ত সমাজেও বিভ্রান্তির জাল জঞ্জাল কম বাড়েনি। এ গ্রন্থে তাই সবিশেষ গুরুত্বে বিস্তারিত ভূমিকা ব্যাখ্যাসহ চারদেশের মূলসঙ্গীত আমরা বিন্যস্ত করেছি।

স্থূলদেশ, প্রবর্তদেশ, সাধকদেশ ও সিদ্ধিদেশ– এ চারদেশের প্রতিটি দেহেরই পৃথক পৃথক দেশ, কাল, পাত্র, আশ্রয়, আলম্বন ও উদ্দীপন রয়েছে। আছে অভিমান। অতিগোপনএ গূঢ়তত্ত্বকে বলা হয় 'লালন শাহের চব্বিশ চন্দ্রভেদতত্ত্ব'। বহুজন্মের কর্ম আর জ্ঞানের ক্রমোন্নয়ন অনুসারে একে একে সর্বদেশ অতিক্রম করতে হয়। পূর্বসুকৃতি ব্যতীত লালনের ঘরে রাতারাতি সাধনসিদ্ধির উপায় কোনোকালে নেই। সাধু জগতের এটাই বিখ্যাত বিধান। সম্যক গুরুর অধীনে দেশপর্যায় অনুসারে যার যার সাধনপ্রক্রিয়ায় ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হতে হয়। সেজন্য এক বা কয়েক জন্মও লেগে যেতে পারে। সাধনার

দেশক্রম প্রসঙ্গে সাঁইজির দৃষ্টিভঙ্গি এখানে প্রামাণ্যরূপে উপস্থাপিত হলো ; যেমন:

আগে পাত্র যোগ্য না করে যেজন সাধন করে।

সে তো প্রেমী নয় তারে কামী কয়
হেতুইচ্ছায় করে পিরিত
পায় না হিত তার হয় বিপরীত
যেমন গাভীর ভাণ্ডে গোরোচনা
গাভী তার মর্ম জানে না শুষ্ক মিশে সদা বিন্দু ঝরে ॥

জলন্ত অনলে যদি
ঘৃত রাখে নিরবধি
তবে জানি সাধকের গতি
যেমন দুগ্ধেতে কলস পুরি
লয়ে রাখে গঙ্গারারি
সে ক্ষুদ্র অপরাধী তাই পড়ে প্রমাদে সুরাস্পর্শে অপবিত্র করে ॥

না হতে প্রবর্তের দিশা
আগে করে সিদ্ধির আশা
পুরায় না তার মনের আশা
যেমন অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে হলো সেই দশা
ভাবুকজনা না শুনলে মানা লালন বলে সে মাথা দিয়ে উল্টে পড়ে ॥

আবার,

আগে গুরুরতি করো সাধনা।
ভববন্ধন কেটে যাবে আসাযাওয়া রবে না ॥

প্রর্বতের গুরু চিনো
পঞ্চতত্ত্বের খবর জানো
নামে রুচি হলে জীবে কেন দয়া হবে না ॥

প্রবর্তের কাজ না সারিতে
চাও যদি মন সাধু হতে
ঠেকবে যেয়ে মেয়ের হাতে লম্পতে আর সারবে না ॥
প্রবর্তের কাজ আগে সারো
মেয়ে হয়ে মেয়ে ধরো
সাধকদেশে নিশানা গাড়ো রবে ষোলো'আনা ॥

থেকো শ্রীগুরুতে নিষ্ঠারতি
ভজনপথে রেখো মতি
আঁধার ঘরে জ্বলবে বাতি অন্ধকার আর রবে না ॥

মেয়ে হয়ে মেয়ের বশে
ভক্তিসাধন করো বসে
আদি চন্দ্র রাখো কসে তাঁরে কেউ ছেড়ো না ॥

ডুবো গিয়ে প্রেমানন্দে
সুধা পাবে দণ্ডে দণ্ডে
লালন কয় জীবের পাপখণ্ডে আমার মুক্তি হলো না ॥

অথবা,

কোন রাগে কোন মানুষ আছে মহারসের ধনী
চন্দ্রে সুধা পদ্মে মধু যোগায় রাত্রদিনই ॥

সাধক সিদ্ধি প্রবর্তগণ
তিনরাগ ধরে আছে তিনজন
এ তিন ছাড়া রাগ নিরূপণ জানলে হয় ভাবিনী ॥

মৃণাল গতি রসের খেলা
নব ঘাট নব ঘাটেলা
দশম যোগে বারি গোলা জেগে রয় আযোনি ॥

সিরাজ শাঁইয়ের আদেশে লালন
বলছে বাণী শোনরে এখন
ঘুরতে হবে নাগর দোলন না জেনে মূলবাণী ॥

লালনসাধনর মার্গ বা দেশ বা স্তর চার প্রকার। যথা : ১. স্থূলদেশ (শরিয়ত), ২. প্রবর্তদেশ (তরিকত), ৩. সাধকদেশ (মারেফত) ৪. সিদ্ধিদেশ (হকিকত)। প্রতিটি দেশের রয়েছে ছয়টি করে লক্ষণ। যথা : দেশ, কাল, পাত্র, আশ্রয়, আলম্বন ও উদ্দীপন।

	স্থূলদেশ	প্রবর্তদেশ	সাধকদেশ	সিদ্ধিদেশ
দেশ	স্থূলদেহে বৈষয়িক অবস্থা	অনিত্যদেহে নিত্যব্রহ্মবোধ	সৃষ্টি ও মূলসত্তায় একাত্মতাবোধ	ভবরূপ বিমুক্তদেহ (নির্বাণসত্তা)
কাল	প্রকৃতির অধীন (বাহ্য বিভাজনে)	অহংবিমুক্তসত্তা (গুরুর অধীন)	গুরুবাক্য চর্চা আরম্ভ (মনদেহ সমন্বয়)	গুরুবাক্যে বিলীন হবার প্রথম হাল (বা দশা)
পাত্র	সাধকদেহের পূর্বাবস্থা	সম্যক গুরু বা কামেল মোর্শেদ	গুরুরসের রসিক	প্রজননহীন প্রকৃতিভাবাপন্ন সত্তা
আশ্রয়	সংসারধর্ম	গুরুবাক্যে আশ্রয় (প্রথম পর্যায়)	প্রকৃতিস্বরূপ	প্রকৃতিভাবে অরূপে বিলীন
আলম্বন	স্থূলচর্চা বাহ্যধর্ম	গুরুনাম স্মরণ	গুরুভাবে ভাবীসত্তা	সর্বকুলে বিনম্রতা
উদ্দীপন	প্রামাণিক গ্রন্থ পুস্তিকাদি পাঠ	সম্প্রদায় গুরু	মান্য আদি গুরুধারা	সম্প্রদায়ে সর্বরূপ সচেতনা

দেশ, কাল, পাত্র, আশ্রয়, আলম্বন ও উদ্দীপনবিষয়ক বর্ণনা: সাধনমার্গের স্থূল, প্রর্বত, সাধক ও সিদ্ধি এ চারটি স্তর যেমন আছে তেমনই আবার প্রত্যেক দেশস্তরে নিম্নোক্ত চারস্তর বা দেশান্তরের অভিমানও আছে; যথা:

১. স্থূল স্তরে: স্থূলদেশের স্থূল, স্থূলদেশের প্রবর্ত, স্থূলদেশের সাধক ও স্থূলদেশের সিদ্ধি অভিমান আছে।

২. প্রবর্ত স্তরে: প্রবর্তদেশের স্থূল, প্রবর্তদেশের প্রবর্ত, প্রবর্তদেশের সাধক ও প্রবর্তদেশের সিদ্ধি অভিমান আছে।

৩. সাধক স্তরে: সাধকদেশের স্থূল, সাধকদেশের প্রবর্ত, সাধকদেশের সাধক ও সাধকদেশের সিদ্ধি অভিমান আছে।

৪. সিদ্ধি স্তরে: সিদ্ধিদেশের স্থূল, সিদ্ধিদেশের প্রবর্ত, সিদ্ধিদেশের সাধক ও সিদ্ধিদেশের সিদ্ধি অভিমান আছে।

স্থূলদেশের কর্মকাণ্ড হলো সংসারধর্মের আজ্ঞাবর্তী হয়ে পিতামাতার সংস্কার অনুসারে কাজকর্ম করে চলা, শাঁইজির স্থূলদেশিক সঙ্গীতশ্রবণ, গুরুগণের জীবনী ও বাণী চিন্তা করা এবং ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করার মধ্য দিয়ে প্রবর্তদেশের জন্যে আগ্রহবোধ তৈরি করা। *বিস্তারিত দেশভূমিকা ২৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।*

প্রবর্তদেশের কর্মকাণ্ড হলো মনোদেহকে নতুনভাবে সৎকর্ম, শুদ্ধজ্ঞান ও ধ্যানের ধারায় পরিশুদ্ধির সূচনা করা, সম্প্রদায় গুরুর চরণাশ্রয়ে দেহকে নিত্যকর্ষণ দ্বারা নূরতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব ও রসুলতত্ত্বধারার ক্রমবিকাশসাধন। এর দ্বারা চেতনা সম্পাদনপূর্বক গুরুনাম স্মরণের মাধ্যমে হেরাগুহাসাধনার প্রথম ধাপ আয়ত্ত করা যায়। *বিস্তারিত দেশভূমিকা ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।*

সাধকদেশের কর্মকাণ্ড হলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার একাত্মতাপূর্ণ তৌহিদ পর্যায়ে উত্তরণের মাধ্যমে গুরুরসের রসিক হওয়া। গুরুরসময় প্রকৃতিস্বরূপ শক্তি আত্তীকরণের দ্বারা গুপ্ত রহস্যজগত বিহার করে জীবন জগতের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সকল বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞানবান তথা আত্মজ্ঞানী হয়ে ওঠা। এবং পর্যায়ক্রমে আদিধরনে প্রত্যাবর্তনের জন্যে চিত্ত ও চেতনার সমন্বয়সাধনা। *বিস্তারিত দেশভূমিকা ৩২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।*

সিদ্ধিদেশের চরম পর্যায় হলো মহাসিদ্ধি তথা সকল বন্ধন থেকে মুক্তি, বিশুদ্ধি বা চিরনির্বাণ লাভ করা যা একান্ত অর্জনীয় 'লা' সাধনসিদ্ধির সার্থকতা। তাই কোনোরূপ ভাষা-বাক্প্রতিমায় এই সূক্ষ্মতম পরম স্তর কখনো প্রকাশযোগ্য নয়। অনির্বচনীয় এই লোকোত্তর মহাসত্যকে লোকভাষায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সাধ্যাতীতভাবেই অসম্ভব। *বিস্তারিত দেশভূমিকা ৪৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।*

এ দেশন্তরগত অভিমানগুলোর চরম ধাপ বা স্তর মোহাম্মদী পর্যায়ের ব্যক্তিত্বকে বলা হয় 'মহাসিদ্ধিদেশ'। জ্ঞানআগুনে সিদ্ধ হয়ে খাঁটি সোনার মানুষ হয়ে গেছেন তাঁরা। তাঁদের পরিশুদ্ধ জ্ঞানপরশে আরো সোনার মানুষ তৈরি হয় যুগে যুগে। যদিও সংখ্যার বিচারে তাঁদের অনুপাত এতো স্বল্প যেন কোটিতে গুটি। সম্যক লালনজ্ঞানী সিদ্ধসাধুব্যক্তি ছাড়া যাঁদের কেউ ঠিকমতো চিনতে পারে না। তাঁর শানমান সম্বন্ধে সাধন জগতের বাইরের কোনো অভক্ত লোককে বলে বোঝানো যায় না। কারণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে জীবন্ত ও প্রায়োগিকভাবে বর্তমান বিষয়। যার যার আপনাপন পূর্বজন্ম, কর্ম ও জ্ঞানদেশ অনুসারে গুপ্তসুপ্ত রহস্য ভাণ্ডারের অবাক কারবার।

আঠারো.

শাঁইজি লালন প্রায় সমস্ত সঙ্গীতে নিজেকে এমন দৈন্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেন কেন–এর আসল তাৎপর্য কি? এতে কোনো গূঢ়রহস্য লুকিয়ে আছে তা সুধীরভাবে না ভেবেই আত্মজ্ঞানে মূর্খ বেশির ভাগ লোক শাঁইজির দোষখুঁত ধরে বসে। লালন শাহ তাঁর গানের শেষাংশের ভনিতায় নিজেকে অবোধ, দীনহীন, অধীন, অপার, পামর, মহাগোলে পড়া, লাল (লালা) পড়া, বেলিল্লা, চটামারা (চটকবাজ), নিরানন্দ, জ্ঞানহারা ভাবুক, ভগ্নদশা, অন্ধ, বোকা, দাহরিয়া, পাতালগামী, ফাঁকে ফেরা, ফ্যারে পড়া ইত্যাদি অপ্রিয় পরিচয় বা বিশেষণগুলো নিজের নামের আগে পিছে বসান।

ফকির লালন শাহ যদি সতিসত্যি এমনই হীন এবং জ্ঞানহীন হয়ে থাকেন তাহলে কীভাবে আমাদের সত্য সুপথে চলার, আমিত্বহীন হবার, কলুষিত দেহমন পরিশুদ্ধ করার জ্ঞানদান করতে পারলেন? শিক্ষকের যদি এমন অবস্থা হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা কোথায় যায়। এর মধ্যেই আমাদের জন্যে বড় শিক্ষণীয় রহস্যলীলা লুকিয়ে আছে।

পৃথিবীর সব জ্ঞান ফকির লালনের করায়ত্তে। তিনি অখণ্ড সৃষ্টিজগতের শিক্ষাদীক্ষা গুরু। পৃথিবীর জ্ঞানহারা সকল মানুষকে সত্যপথের সন্ধান দিতেই তিনি মানবরূপ ধরে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর অখণ্ড আহাদ জগত তথা সৃষ্টি জগতে সকল জীব তারই অংশকলা বা অঙ্গ। তাই অখণ্ড আহাদের সাথে অখণ্ড আহাদ হয়ে বিরাজ করেন শাঁইজি। তাঁর তরিকার নাম 'চিশতীয় অহাদানিয়া'।

আমাদের মানবীয় আমিত্ব বিনাশ করে সম্যক গুরুর চরণে আত্মসমর্পণপূর্বক 'আমি ও আমার' – এ ক্ষুদ্র ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার শিক্ষামূলক দৃষ্টান্তের আঘাত দিয়ে শাঁইজি লালন বারবার আপন গুরুকে উর্ধ্বে তুলে নিজেকে এতো খাটো করে দেখান। এটা আমাদের চিন্তা ও চর্চার পক্ষে একটি বড় গাইড লাইন। যেমন:

গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান যার।
অধোপথে গতি হয় তার ॥

সম্যক গুরু লালন শাহ কোনো সাধারণ মানুষ নন, একজন আলে মোহাম্মদ। আমরা তাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ করে স্থূল আমিত্ব বিসর্জনের পথে সার্থক হতে পারি, সেই মহৎ শিক্ষাদানের স্বার্থে নিজেকে সম্পূর্ণ ফানা ফিল্লা করে দেন। এ শিক্ষা চরিত্রগত করা মানেই কোরানের নির্দেশিত আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হওয়া।

দ্বিতীয়ত, সৃষ্টি জগতের তথা অখণ্ড আহাদ জগতে তিনি একজন সিদ্ধপুরুষরূপে সমগ্র মানবদানবের পরিত্রাণকারী, পতিতপাবন গুরু। ভক্তদের ক্ষুদ্রতা, অজ্ঞতা, দোষত্রুটি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ। অধম পাপীতাপী মানুষের দায়ভার নিজের কাঁধে টেনে নেন। তাই দেখা যায়, পতিতপাবন পরমেশ্বর হয়েও তিনি নিজেকে ভক্তের ভনিতায় আবৃত করছেন। এর মধ্য দিয়ে শাঁইজি জানাতে চান, জগতের সব সৃষ্টিই তিনি। ভক্ত ও ভগবানে দূরত্বের সীমানা ভেঙ্গে চুরমার করে দেন। সব মানুষের মধ্যেই তিনি প্রভুগুরু হয়ে বিরাজ করছেন। কিন্তু জগতবাসী ক্ষুদ্র আমিত্বের আবরণ তথা শেরেক দিয়ে তাঁকে আড়াল করে রেখেছে। সম্যক গুরু লালনের চরণে সেজদা তথা আত্মসমর্পণ করলে তিনি আমাদের ভেতরে জাগ্রত হয়ে উঠবেন।

সুতরাং আমরা লালনসঙ্গীত শ্রবণ ও অনুধাবনকালে কখনো যেন কেউ শাঁইজির ভনিতা সোজা শুনে উল্টো না বুঝি, কখনো যেন সিরাজ শাহ ও লালন শাহকে বিচ্ছিন্নজ্ঞানে না ভাবি। তিনি তাঁর গুরুকে যেমন মহত্তম হোদায়েতদাতা রূপে উপস্থিত করছেন, আমরাও ফকির লালনচরণ দাসরূপে তাঁর সেবাপূজনের প্রেমদায় হৃৎকমলে উজ্জ্বল করি।

তৃতীয়ত, মানুষরূপে আল্লাহকে চেনা-জানা-মানার বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। বেদ-পুরাণ-শাস্ত্রবাক্য পরিত্যাগ করা। ইটকাঠের মন্দির-গির্জা-মসজিদ নামক

স্থূল সব ধর্মশালা বর্জন এবং এ ব্যবস্থার রক্ষক-ভক্ষক পুরোহিত-পাদ্রি-মৌলভিদের হাতছানি উপেক্ষা করে সম্যক গুরুর পাদপদ্মে নিহিত মহারত্নভাণ্ডারে ডুব দেবার মধ্যেই আছে মানবজনমের চরম ও পরম সার্থকতা। তাই শাঁইজি লালন অহঙ্কারী লোকদের অহম্‌ত্যাগের শিক্ষাদাতারূপে আগে নিজেকেই নিজে উৎসর্গ করেন।

চতুর্থত, যখন তিনি বলেন 'আমি কিছু নই' বা 'না' বুঝতে হবে তাঁর মধ্যেই সবকিছু রয়েছে। প্রাচ্যে এ সাধুরহস্য অতিপ্রাচীন। যিনি প্রচলিত সব থিসিসের অ্যান্টিথিসিস হয়ে দাঁড়ান 'তিনিই তিনিময়' হয়ে উঠেন সিনথিসিসে পৌঁছালে। অতএব আমাদের লালনজ্ঞান কোনো খণ্ডত্বের তথা সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রবুদ্ধির কাছে পরাজিত হতে পারেন না যদি আমরা শাঁইজির শুদ্ধধারায় আমিত্বের 'নফি' তথা 'নিহিকর্ম' তথা 'লা'এর সাধুভাব আপন চিন্তা ও চরিত্রে প্রতিফলিত করতে পারি।

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন গো শাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে তার জাতের বিচার নাই ॥
সবাই শাঁইজির , শাঁইজি সবার।

উনিশ.

আদিকালের নবি-রসুলগণের মতো ফকির লালন শাহ্ কোনো তত্ত্বকথা কোথাও লিখে যাননি। তাঁর এলহামলব্ধ মহৎ বাণী সুরের আশ্রয়ে প্রকাশ করেছেন। ভক্তগণ সে সুরবাণী শুনে মনেপ্রাণে ধারণ করে পরে লিখেছেন। তাই স্মৃতি ও শ্রুতি লালনসঙ্গীতের মূল সংরক্ষণাগার। গত দুশো বছরের ধারাবাহিকতায় ভক্তগণ বংশপরম্পরায় শাঁইজির সঙ্গীত মুখে মুখে গাইতে গাইতে চর্চিত রেখেছেন। ভক্তদের তত্ত্বজ্ঞান তথা কোরানজ্ঞানের উপলব্ধিগত তারতম্যের কারণে কথার ফাঁক ফোঁকরে অনেক ভুলভ্রান্তি ঢুকে পড়েছে, অনেক জায়গায় দৃষ্টিকটু দাগও লেগেছে – এ সত্যকথা অস্বীকার করা যাবে না। আবার অতিভক্তির মাদকতায় অন্য কোনো মহতের গানের দু চারটি ভনিতা পাল্টে শাঁইজির নামে যে চালানোর চেষ্টা হয়নি- তাও না। তার চেয়ে বড়ো কথা, লালন শাহের এমন অনেক গভীরতাস্পর্শী বিরল সঙ্গীত এখনো অর্ধলুপ্ত বা অবলুপ্ত অবস্থায় প্রবীণ সাধুগণের স্মৃতিসত্তায় বেঁচে আছে মাঝে মধ্যে এখনো সাধুসঙ্গে সেগুলো শোনা যায়। কিন্তু কোনো লালনসঙ্গীত গ্রন্থে সেগুলো সঙ্কলিত করার উদ্যোগ নেননি সংগ্রাহকগণ । আমরা এ সংকলনে তেমনই অর্ধশতাধিক গান এই প্রথমবারের মতো উদ্ধার করে এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি।

ফকির লালন শাহর সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট দর্শন ও প্রকাশের বিশেষ ধরন রয়েছে। সবার উপর তাঁর কোরানদর্শনের একটা নিজস্ব বিশেষ প্রকাশভঙ্গি

লক্ষণীয়। আত্মদর্শনের সাহায্যে শাঁইজির আদিধারার সঙ্গীতে নিহিত শুদ্ধতা যেমন নিশ্চয় আহরণ করা যায় তেমনই গায়ক বা লোকসমাজের আরোপতি সংস্কার বা বিকৃতির জঞ্জাল থেকেও সেগুলোকে পৃথক করা যায়। আমরা গুরুমুখি আত্মদর্শনের মাধ্যমে লালনসঙ্গীত সঙ্কলন ও সংস্কার করতে সচেষ্ট থেকেছি। এতেজনপ্রিয়তালোভী পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের কোনো চেষ্টা হয়নি। আবার অতিভক্তির প্রগলভতায় ভ্রান্তির জোয়ারেও গা ভাসাইনি আমরা। এককভাবে এ সঙ্গীত সংকলনের উদ্যোগ নেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত প্রবীণ সাধুজন ও নবীন গবেষকদের মিলিত প্রচেষ্টায় 'সম্পাদনা পরিষদ' এর তত্ত্বাবধানে সংগৃহীত সমস্ত গান চূড়ান্ত করা হয়।

তবু প্রথম সংস্করণে কিছু মুদ্রণ ত্রুটি ও অসঙ্গতি থাকবে ন-এমন জোর দাবি আমরা করি না। এ ব্যাপারে সকলের মতামত পেলে এ 'অখণ্ড লালনসঙ্গীত' গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণ আরো নিখুঁত ও নির্ভুল হয়ে উঠবে ভবিষ্যতে, এ আশা করি।

অখণ্ড ভারতবর্ষে পঞ্চদশ শতকের শেষে এবং ষষ্টদশ শতকের প্রথম দিকে উত্থান ঘটেছিলো আরেক লালনের। তাঁর নাম কবীর। লালন শাঁইজির গানেও তাঁর স্বীকৃতি আছে। তাঁর সাথে লালন জীবন ও মূল্যায়নের অনেক অদ্ভুদ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। লালনের মতো কবীরও কোনো গান কেখনো লেখেননি, শুধু গেয়ে গেছেন। ভক্তেরা শুনে শুনে সেগুলো কণ্ঠস্থ করে রেখেছিলেন। এভাবে মুখে মুখে প্রায় পাঁচশো বছর ভক্তদের বংশপরম্পরায় চালু থাকায় সেগুলোর কোথাও কোথাও বিকৃতি বা 'বাড়তি কথা' ঢুকে পড়েছিলো।

অসাম্প্রদায়িক ইতিহাসবিদ ও সাধুপ্রেমী গবেষক শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে শান্তি নিকেতনে অবস্থানকালে তাঁর স্মৃতিশ্রুতিবাহিত কবীরের অগ্রন্থিত গানগুলো সঙ্কলিত গ্রন্থকারে প্রকাশ করেছিলেন। লোকমুখে শ্রুত এসব গান ক্ষিতিমোহন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের সময় সংগ্রহ করেছিলেন। মোট চার খণ্ডে বাংলা ভাষান্তরসহ 'কবীর' সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯১০-১১ সালে। এ সংগ্রহ থেকে একশো দোহা রবীন্দ্রনাথ বেছে নিয়ে ১৯১৫ সালে ইংরেজি ভাষায় ভাষান্তরসহ প্রকাশ করেছিলেন নোবেল পুরস্কার পাবার কিছুদিন পর।

'কবীর'সঙ্গীত সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশের পর ক্ষিতিমোহনের এ কাজটির খাঁটিত্ব নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছিলো, বেড়েছিলো বিতর্ক। অন্য যারা কবীরের দোহাগান সঙ্কলন করেছেন তারাও কেউ বিতর্কের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। ভক্ত হোন আর পণ্ডিত হোন, পুরনো রত্ন সংগ্রহের কাজে যিনিই চেষ্টা করেছেন তার নামে কমবেশি কলঙ্ক হয়েছে। কবীরের গানের খাঁটিত্ব নিয়ে যারা প্রশ্নমুখর ছিলেন তারা কবীরের আসল পরিচয় বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন। মুসলমান জোলা

কবীরকে তাঁর হিন্দুভক্তরা 'ভক্তিমাল' নামক গ্রন্থে ব্রাহ্মণ হিন্দু কুলোদ্ভব পরিবারের সন্তান বলে যে চরম মিথ্যাচার দ্বারা ভারতব্যাপী পরিচয় বিভ্রান্তির সংকটে ফেলা হয়েছিলো, যেমনটি ঘটেছে ফকির লালনের ক্ষেত্রেও।

বলতে দ্বিধা নেই, কবীর ও লালনের অখণ্ড কোরানদর্শন জগতের সামনে তুলে ধরার আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অতীতের যে কোনো চেয়ে আজ বেশি জরুরি। শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং সাম্প্রদায়িকতামুক্ত অখণ্ড বিশ্ব প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই নয়, মানুষকে কলুষিত বস্তুবাদের বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে আত্মদর্শনমুখি করে তোলার পথেও যার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। অন্তত একচোখা একাডেমিক গবেষকেরা নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক নানা প্রথাবহির্ভূত আচারবিচার অনুসন্ধানের নামে লালনচর্চাকে হাইলাইট করতে নেমে তাঁর আসল পরিচয়, সাত্ত্বিক সাধনা ও লোকোত্তরদর্শনকে সম্পূর্ণ বিতর্কিত করে রেখেছে। আমাদের এ প্রচেষ্টা সেসব অগভীর ও বিকৃত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে শাঁইজির শুদ্ধসত্তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তাই তাঁকে তাঁরই নির্দেশিত শুদ্ধপথে পুনরুদ্ধারে এ সংগ্রহ, সঙ্কলন ও সম্পাদনাকর্মের আর কোনো বিকল্প ছিলো না।

সাধক-পাঠকগণ 'অখণ্ড লালনসঙ্গীত' পাঠ ও পুনর্পাঠের মধ্য দিয়ে শতশতবর্ষের অজ্ঞতা, অবহেলা, বিকার ও বিভ্রমের জটাজাল থেকে নিজেরা মুক্ত হয়ে বিশ্ববাসীকেও মুক্ত হতে সাহায্য যোগালে আমাদের লালনসাধনা সার্থক হবে।

পরিশেষে এ সুদীর্ঘ গবেষণা, সঙ্কলন ও সম্পাদনারকর্মে সংযুক্ত সম্পাদকমণ্ডলীর সহৃদয় সদস্য যথাক্রমে ডা. শামসুল আলম ভাণ্ডারী, ফকির দেলোয়ার হোসেন শাহ্, ফকির হোসেন আলী শাহ্, ওস্তাদ মশিউর রহমান, শাহ্ রওশন ফকির, ফকির আবদুস সাত্তার শাহ্, ফকির আশরাফ শাহ্, গোঁসাই পাহ্লভী ও মোস্তাক আহ্মাদ সর্বাত্মক সহযোগিতা না করলে এ কাজ আমার একার পক্ষে করা সম্ভবপর ছিলো না। সুহৃদ জামাল আহমেদ, কফিল উদ্দিন মাহমুদ, খলিফা হাবিবুর রহমানের সহায়তার কথাও সেসাথে উল্লেখ করতে হয়। অক্ষরন্যাসের কাজে শহিদুল ইসলাম রনি দিনরাত যে কঠোর শ্রম দিয়েছেন সে কথাও ভোলার নয়।

রোদেলা'র প্রকাশক রিয়াজ খান এ গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে যে দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন তা তার প্রকাশনার মান ও মুদ্রণপারিপাট্য থেকে পাঠক সহজেই। সবাইকে শুভেচ্ছা।

আবদেল মাননান

■, ঢাকা

সূচিপত্র

নূ র ত ত্ত্ব

র সু ল ত ত্ত্ব

কৃ ষ্ণ লী লা

গো ষ্ঠ লী লা

নি মা ই লী লা

গৌ র লী লা

গ

চ

জ

ধ

ন

প

ব

ভ

ম

য

নি তা ই লী লা

স্থূ ল দে শ

প্র ব র্ত দে শ

প

ফ

ব

হ

সা ধ ক দে শ

অ

আ

ন

প

ব

ভ

সি দ্ধি দে শ

নৃতত্ত্ব

তত্ত্বভূমিকা

আল্লাহ মন ও দেহের জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির দৃষ্টান্ত যেমন একটি প্রদীপদানি, তার মধ্যে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাচের ভিতরে। কাচটি যেন উজ্জ্বল তারকার মতো, প্রজ্জ্বলিত হয় বর্ধিষ্ণু একটি জয়তুন বৃক্ষ থেকে, যা পূর্বের নয়, পশ্চিমেরও নয় অর্থাৎ এরূপ স্থানকালজয়ী মহাপুরুষ উদয়অস্তের উর্ধ্বলোকে থাকেন। এ প্রদীপের (অর্থাৎ এ প্রদীপের) তেল অবিরাম আলো দানের কৌশল করে, যদিও আগুন তাকে স্পর্শ করে না। আলোর উপরে আলো। আল্লাহ তাঁর নূরের জন্যে হেদায়েত করেন যে অবিরাম ইচ্ছা করে এবং আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্তের আঘাত দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের সাথে জ্ঞানবান।

আল-কোরান ॥ সূরা : নূর ॥ বাক্য ৩৫

নিশ্চয়ই আল্লাহ থেকে এক উজ্জ্বল জ্যোতি (নূর) এবং সুস্পষ্ট একটি উজ্জ্বল নিদর্শন তোমাদের কাছে এসেছে।

আল-কোরান ॥ সূরা : মায়েদা ॥ বাক্য : ১৫

হে ইনসানগণ (গুরুভক্তগণ) নিশ্চয় তোমাদের রব থেকে তোমাদের নিকট চিরআগমন হয়েছে একটি নিদর্শন/প্রমাণ এবং তোমাদের দিকে আমরা পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট একটি জ্যোতি বা আলো (নূর)।

আল-কোরান ॥ সূরা : নেসা ॥ বাক্য : ১৭৪

হে মোহাম্মদ, আপনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের একমাত্র রহমতস্বরূপ প্রেরিত।

আল-কোরান ॥ সূরা : আম্বিয়া ॥ বাক্য : ১০৭

নূর অর্থাৎ আলো বা জ্যোতি একাধারে চেতনা, আল্লাহ, জ্ঞান, ঈশ্বর, সৌন্দর্য, আনন্দ, বোধ ইত্যাদির মূর্ত প্রকাশ। কোরান বলছেন: 'আমি গুপ্ত ছিলাম, আমার বাঞ্ছা হলো, তাই আমি ব্যক্ত হলাম'। এ নূরই সর্বসৃষ্টির মূল। আল্লাহ নিজেই জাত নূর। তিনিই স্রষ্টা। তিনি চান যাঁরা তাঁকে জানেন, তাঁদের মধ্য দিয়ে নিজেকে

জানতে। সৃষ্টি মূলত স্রষ্টার প্রকাশ। সবার আগে তিনি প্রকাশিত হন নিজের কাছে। তারপর সেই জ্যোতির বিকিরণ বা বিকাশ ঘটে। প্রকাশ বা প্রকট হওয়ার প্রক্রিয়া যেখানে বর্তমান সেখানেই চোখ ও আলোর কেন্দ্রিক গুরুত্ব।

পৃথিবীর সকল ধর্মতত্ত্বের মূলতত্ত্ব এই নূর বা রশ্মি বা জ্যোতি বা আলো। প্রত্যেক বস্তু (দেহ) এবং বিষয়ের (মন) মধ্যে মূলবস্তুরূপে আগুন বা আলো নিহিত আছে। যে কোনো বস্তুকে ভেঙেচুরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলে শেষ পর্যন্ত আলোই পাওয়া যায়। মানুষ সৃষ্টিজগতের আর সব আকার থেকে উত্তম সৃষ্টি। এ মানবদেহকে সাধক সাধনার সাহায্যে প্রাকৃতিক নিয়মে ভেঙে যাবার আগে চূর্ণ করতে পারলে আল্লাহর জাত নূর প্রত্যক্ষ ও সূক্ষ্মভাবে তিনি দর্শন করতে পারেন। কোরানের পরিভাষায় এ সাধনার নাম আকবরি হজ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম আত্মদর্শন। শুদ্ধিমার্গের সাধকের ওয়াজ্‌দ বা উন্মাদনা হলো সূর্যের অনুপস্থিতিতেও আগুনে পরিবর্তিত হওয়ার ক্ষমতা। তৌহিদ বা অখণ্ড মূলসত্তার সাথে একীভূত হওয়ার চরম পর্যায়ে সাধক আল্লাহর জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হয়ে যান। কোরানের সুরা আর রহমানের চতুর্থ বাক্য এইরূপ : 'সূর্যটি এবং চন্দ্রটি হিসাবের সহিত চলমান' এ কথার ভাবার্থ হলো, সৌরজগতের সমস্ত কর্মকাণ্ডের পরিচালক বা নিয়ন্ত্রক হলো সূর্য। তাই সূর্য রসুলের প্রতীকস্বরূপ। কারণ নূরে মোহাম্মদী থেকেই সব সৃষ্টি উৎপাদিত হচ্ছে। অপর পক্ষে চন্দ্র হলো মাওলা আলীর প্রতীক। সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করেই চন্দ্র সূর্যের অনুপস্থিতিতে আলো দান করে থাকে। চন্দ্রের অস্তিত্ব এবং আলো সূর্য থেকে প্রাপ্ত।

আরবি ভাষায় সূর্য স্ত্রীলিঙ্গ এবং চন্দ্র পুংলিঙ্গ। রসুলের নূর থেকে সকল সৃষ্টি প্রকাশিত ও বিকশিত হচ্ছে। তাই তিনি নূর মোহাম্মদরূপে সৃজনশীল। সেজন্যে তাঁর প্রতীক স্ত্রীলিঙ্গ রূপেই প্রকাশিত। চন্দ্র পৃথিবী থেকে ছুটে গিয়ে সৃজনশীলতা থেকে মুক্ত হয়েছে। সম্যক গুরুর চেতনাবলয়ে আশ্রিতগণ তথা জান্নাতবাসীগণ মন থেকে বিষয়মোহ মানে শেরেক উচ্ছেদ করে সাধনার মাধ্যমে যখন সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হয়ে যান তখন তাঁরা আর মানসিক দিক থেকে সৃজনশীল থাকেন না। আধ্যাত্মিক মহাশক্তির অর্থাৎ 'কাফ'শক্তির অধিকারী হয়ে তাঁরা আল্লাহর উচ্চতম পরিষদের সদস্যরূপে উন্নীত হন। তাঁরাই কেবল পুরুষ। তাঁদের নেতা হলেন মাওলা আলী। চন্দ্র ও সূর্য এই অর্থে সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতীক অর্থাৎ আহাদরূপ ও সামাদরূপের প্রতীক।

ফকির লালন শাহ তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টির মূলে নূরতত্ত্বময় মহাসত্যকে সবার উপর ঠাঁই দিয়েছেন কোরান অনুসারে। আল্লাহ তথা চেতনাময় এই নূর থেকে আকর ব্যক্তিত্বস্বরূপ নবি ও রসুলগণ প্রকাশিত-বিকশিত হন যুগ যুগান্তরে।

সৃষ্টিরহস্যের প্রধান উৎস জ্যোতি বা নূর। নূরের অনন্তধারা যে কেমন তা কথায় বা লেখায় কখনো সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না। স্থূলদৃষ্টিতে সব মানুষ

আকাশে বজ্রবিদ্যুতের চমক দেখলেও তা যেমন ক্ষণিক ঝলক দিয়ে অমনি অদৃশ্য হয়ে যায়, কোনোভাবেই ধরে রাখা যায় না তেমনই মানবসত্তায় নিহিত সূক্ষ্ম নূর প্রবাহ স্থূল অঙ্গ বা দুর্বল ইন্দ্রিয় দিয়ে সাধারণ মানুষ দেখতে অক্ষম। নূরের এ অনির্বচনীয় সূক্ষ্ম দ্রুতি বা দ্যুতি মানবীয় ভাষা-বাক্যে তাই বোঝানো যায় না। এখানে শাঁইজি 'নূর কী' ভক্তদের এ ঔৎসুক্য ভরা প্রশ্নের উত্তর জানাতে এসে নিজেই প্রশ্ন তোলার ভঙ্গিমায় রহস্য স্পষ্ট করেন: 'বলবো কী সেই নূরে ধারা'। আবার ঠিক পরের বাক্যে 'নূরেতে নূর আছে ঘেরা' একথা জানান দিয়ে বলছেন বিজলি বা বজ্রপাতের ঝলকানির মতো এ নূররূপ মূলসত্তা ধরে-ছুঁয়ে দেখবার মতো কোনো বাহ্যবস্তুই নয়, এটা চিন্ময় (চিৎ+ময়) স্বরূপশক্তি। জাতি নূর আল্লাহ সেফাতি নূর সৃষ্টি দিয়ে আবৃত হয়ে আছেন। অর্থাৎ সম্যক গুরু রসুলাল্লাহ সেই নূরের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি সেই নূর বা প্রজ্ঞার মূল উৎস। পুরুষ ও প্রকৃতির মূলাধার হলেন রসুলাল্লাহ। সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পিত সাধক তার ইন্দ্রিয়পথ দিয়ে আগত প্রতিটি বিষয়ের মোহ তথা শেরেক থেকে মনকে মুক্ত করে গুরুর সহযোগিতায় যখন জন্মচক্র থেকে মুক্ত হয়ে কাফশক্তির অধিকারী 'পুরুষ' হয়ে যান তখন তিনি চন্দ্রের মতো সৃষ্টিরহিত ও স্নিগ্ধস্বরূপ একজন 'আলী' তথা সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রতীক। তাঁরা ব্যতীত আর সমস্ত অস্তিত্বই প্রকৃতি তথা নারী। সূর্য ও চন্দ্র এক নূর আরেক নূরকে ঘিরে আছে। এ ঘেরাও থেকে বেরিয়ে যাওয়া মানে 'পুরুষোত্তম' সত্যশিব হয়ে ওঠা।

নূরের ভেদ বা জ্ঞান যেখানে অকূল সমুদ্রের মতো অসীমান্তিক বা অসীম সেখানে কথা বা শব্দ কি বাক্য খুবই সীমাবদ্ধ। আলোর গতি শব্দের গতির চেয়ে সীমাহীন শক্তিশালী। সম্যক গুরুর কাছে মানবীয় খণ্ড আমিত্বের পরিপূর্ণ উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে সাধক যখন কর্ম, জ্ঞান ও প্রেমভক্তির শক্তিতে আত্মহারা দেওয়ানা হয়ে যান তখনই সদ্‌গুরু নিবেদিতপ্রাণ ভক্তের মনোলোকে নূরে মোহাম্মদীর পুনর্জাগরণ ঘটান।

কোরানে সম্যক গুরুকে অভিহিত করা হয়েছে 'সিরাজুম মুনিরা' বলে। এ কথার অর্থ হলো তিনি একজন প্রদীপ্ত প্রদীপ। একটি প্রদীপ থেকে আলো নিয়ে যেরূপে অসংখ্য প্রদীপ আলোকপ্রাপ্ত বা আলোকিত হয় সেভাবে একজন পূর্ণতত্ত্ব মহাপুরুষ বা অলি একাধিক মহাপুরুষ বা অলিআল্লাহ তৈরি করতে পারেন। আল্লাহই নূর মোহাম্মদ। নূর মোহাম্মদ সীমার (দেহ) মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বা প্রকাশ্যে এসে কামেল মোর্শেদ রূপে আপন পরিচয় ব্যক্ত করেন এবং জীবশ্রেষ্ঠ মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে মোহবন্ধন তথা প্রকৃতি থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা দান করেন এবং আপন চেহারা দান করে পুরুষরূপে বরণ করে নেন।

শাঁইজির মূল বা প্রধান তত্ত্ব কোরানের নূরতত্ত্ব যা সৃষ্টির মূলরহস্য। আল্লাহ যখন গুপ্ত এবং অব্যক্ত ছিলেন তখন তাঁর কোনো প্রশংসা বা কীর্তন ছিলো না। তাঁর প্রশংসার প্রকাশ তখনো আরম্ভ হয়নি। তিনি নুর। নূরে মোহাম্মদীরূপে যখন

আত্মপ্রকাশ করলেন তখন তা হলো তাঁর সকল প্রশংসার আধার। সমস্ত সৃষ্টি নূরে মোহাম্মদি হতে এসেছে এবং আসছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসার মূলাধার হলেন নূরে মোহাম্মদি।

নূরে মোহাম্মদি কোনো একটি ব্যক্তি নন, অসংখ্য জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের মূলাধার। সেই ব্যক্তিত্বের মৌলিক অর্থাৎ সাধারণ নাম হলো 'মোহাম্মদ' অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক প্রশংসিত। 'মোহাম্মদ গোষ্ঠী' তাঁরা প্রত্যেকেই এক একজন মোহাম্মদ, হোন তা আদিতে বা অন্তে, অতীতে বা বর্তমানে। মোহাম্মদ গোষ্ঠীর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহর (আ.) পুত্র মোহাম্মদ হলেন সৃষ্টির নিকট প্রেরিত প্রধান নেতা এবং স্রষ্টার সর্বপ্রধান প্রতিনিধি। মোহাম্মদ আল্লাহর প্রকাশিত সমস্ত প্রশংসার অধিকারী এবং তিনিই হলেন আল্লাহর উচ্চতম পরিষদের সভাপতি।

আল্লাহর জাতি নূর হলো রুহ । নূরে মোহাম্মদির একচ্ছটা আলো প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে বিরাজ করে। রুহ যখন আলোর মূর্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকে হুর বলে। হুরের চেহারা মানুষের আপন আলোকিত সূক্ষ্ম চেহারা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এটাই সাধনা জগতে আত্মদর্শনের চরম পর্যায়। আপন প্রচ্ছন্ন হুরের সঙ্গে মিলনের মধ্যেই মানব জীবনের চরম সার্থকতা।

মানবদেহ আল্লাহর ঘর বা প্রাসাদ। এ প্রসাদের গোপন রানী হয়ে হুর বিরাজ করছেন। 'হুর' কোরানে স্ত্রীলিঙ্গে প্রকাশিত। এজন্যে সুফি সাধকগণ তাঁদের মাসুককে প্রেয়সী, রানী ইত্যাদি নামে সম্বোধন করে থাকেন। বৈষ্ণবগণ বলেন শ্রীরাধিকা জিউ।

হুরের সঙ্গে মিলনলাভের পূর্ব পর্যন্ত কোনো মানুষ অথবা জিন হুরকে স্পর্শ করার যোগ্যতা রাখে না। অর্থাৎ হুরের সংস্পর্শে আসতে পারে না। বরং হুর গোপন কক্ষে আবদ্ধ এবং অজ্ঞাতই থেকে যান। রুহ জাগ্রত হয়ে দৃশ্যমান হলে তাকে বলা হয় 'হুর'। হুরপ্রাপ্ত ব্যক্তির হুর অন্য সবার জন্যে দৃশ্যমান নয়। এ হলো আত্মদর্শনলব্ধ ব্রহ্মস্বরূপ।

সুফি সম্রাট ফকির লালন শাহ্ রুহকে 'অচিন পাখি' বলে ডাকেন। প্রতিটি মানবদেহ বা খাঁচার মধ্যে বন্দি অবস্থায় নূরে মোহাম্মদী রুহরূপে 'হুর' তথা 'অচিন পাখি' সুপ্ত-গুপ্তরূপে আছেন জাগ্রত হয়ে মানবসত্তার সাথে মিলনের অপেক্ষায়। দেহাতীত কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ অবিরাম সালাতকর্মে আত্মনিয়োগ করলে আপন অদৃশ্য আলোকিত মূর্তি হুর বা অচিন পাখির সাথে সাধকের প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধিত হয়। এটা একান্তই অর্জনীয় বিষয়। অবিরাম 'লা'এর অনুশীলন করে তাঁকে জাগ্রত করতে হয়। বিষয়মোহের সব শেরেক থেকে তাঁকে মুক্তি দিতে হয়। স্থূল আমিত্ব বা শেরেক হলো দেহ কারাগার বা খাঁচা।

সাধক নফসের উপর মোহাম্মদী নূরের একটি বিকাশমান অবতরণকে রুহ বলে। রুহ নাজেল হলে তা নফসের উপর কর্তা হয়ে যায়। রুহ সৃষ্টির অন্তর্গত নয়, এটি সৃজনীশক্তির অধিকরী। রুহ রহস্যময়। তাঁর পরিচয় ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। রুহপ্রাপ্তি দ্বারা সাধকের আত্মপরিচয়ের পূর্ণতা আসে। প্রভুগুরুর ভাবমূর্তি Image of The Lord Guru সাধকের আপনচিত্তের উপর অধিষ্ঠানকে 'রুহ নাজেল' বলে আখ্যায়িত করেন কোরান।

নূরে মোহাম্মদীর মূর্ত অবতরণকে রুহ বলা হয়। রুহ যখন সাধকের আপন রূপে মূর্তিমান হয়ে দৃশ্যমান হয় তা হুর নামে আখ্যায়িত। আপন আলোকিত মূর্তিকে হুর বলে। হুরদর্শন আত্মদর্শনের নামান্তর। সুফিগণ বলেন:' গুরুর চেহারা, গুরুর ভাব ও গুরুর বাণী যখন সাধক চিত্তে অঙ্কিত হয় তখন তাঁকে রুহ বলে'। অর্থাৎ গুরুরূপ, গুরুভাব এবং গুরুবাণী যে শক্তিরূপে সাধক চিত্তে অঙ্কিত হয়ে যায় তাঁকে রুহ বলে। অপরদিকে, সাধকচিত্তে রুহরূপে অঙ্কিত ভাব যখন সাধকের প্রতিমুহূর্তের প্রত্যেকটি কর্মধারায় বাস্তব রূপ নেয় তখন সে সাধককেই হুর বলা হয়েছে।

Divine character and qualities attained in the person of a Mohammed is Noor-E-Mohammadi. যে কোনো একজন মোহাম্মদ দ্বারা অর্জিত স্বর্গীয় চরিত্র এবং গুণাবলিকেই নূরে মোহাম্মদী বলে। "আউয়ালুনা মোহাম্মদ, আখেরুনা মোহাম্মদ, আওসাতুনা মোহাম্মদ, কুল্লানা মোহাম্মদ" অর্থাৎ মহানবি বলছেন: 'আমাদের আদি মোহাম্মদ, আমাদের শেষ মোহাম্মদ, আমাদের মধ্য হলো মোহাম্মদ, আমাদের সবাই মোহাম্মদ'। সম্যক গুরুরূপে সর্বযুগেই মোহাম্মদ সশরীরে উপস্থিত ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। আল্লাহর আপন চরিত্রই সৃষ্টির মধ্যে মহাগুরুর অভিব্যক্তিরূপে যুগে যুগে যে সকল বিকাশ সাধিত হয়ে থাকে তা-ই নূরে মোহাম্মদী। পরম গুণাবলির অপ্রকাশিত রূপ হলেন নিরাকার আল্লাহ এবং প্রকাশিত অবস্থায় সম্যক গুরুজি হলেন জাহের আল্লাহ। নূরে মোহাম্মদী বিকাশ লাভের জন্যেই সমগ্র সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছে। শাঁইজির পদে পদে সে ঝঙ্কারই বাজে।

০১.
অজান খবর না জানিলে কিসের ফকিরি।
যে নূরে নূরনবি আমার তাঁহে আরশ বারি ॥

বলবো কি সেই নূরের ধারা নূরেতে নূর আছে ঘেরা।
ধরতে গেলে না যায় ধরা যৈছেরে বিজরি ॥

মূলাধারের মূল সেহি নূর নূরের ভেদ অকূল সমুদ্দুর।
যার হয়েছে প্রেমের অঙ্কুর ঝলক দেয় তারই ॥

সিরাজ শাঁই বলেরে লালন আপন দেহের করো অন্বেষণ।
নূরেতে নীর করে মিলন থেকোরে নিহারী ॥

০২.
আজ আমি জানতে এলাম সাধু তোমার দ্বারে।
কোন নূরে হয় নবি পয়দা আদম হয় কোন নূরে ॥

অন্ধকার ধন্ধকার কুওকার নিরাকার আকার সাকার দীপ্তকারে।
এহি তো সপ্তম কারে শাঁইজি আমারে ॥

সৃষ্টি করে নবিজিরে পাঠালেন তাঁরে দ্বীন জারিতে।
না ছিলো আসমানজমিন পবনপানি দিনরজনী আল্লাহ্ ছিলো কোন কারে ॥

আল্লাহ্ ছিলো একা সঙ্গে নাহি ছিলো সখা।
কার সঙ্গে হলো দেখা ঘুরে ফিরে ॥

আরো এগারো কার ছিলো জানগে সাধু তার খবর বলো।
লালন বলে না বলিলে ছাড়বো না তোমারে ॥

০৩.
আজ আমি নূরের খবর বলি শোনরে মন।
পাক নূরে হয় নবি পয়দা খাক নূরেতে আদমতন ॥

এগোরো কারেতে শুনি সপ্তম দিনের মানে।
চাররঙ ধরে দিনরজনী করলাম কারের বিবরণ ॥

না ছিলো আসমানজমি দিনরজনী আলকে হয় একা গনি।
তাঁর নূরে হয় মা জননী তার সাথে হলো মিলন ॥

দক্ষিণে দ্বারে গঠিলেন শাঁই নামটি তার স্বরূপবাজার।
সে বাজারে বেচাকেনা করে এ নয়জন
লালন বলে তোলাদারি খোদে খোদা মহাজন ॥

০৪.

আল্লাহ্‌র বান্দা কিসে হয় বলো গো আজ আমায়।
খোদার বান্দা নবির উম্মত কী করিলে হওয়া যায় ॥

আঠরো হাজার আল্লাহ্‌র আলম কতো হাজার কালাম কয়।
সিনা সফিনায় কয় হাজার রয় কয় হাজার এই দুনিয়ায় ॥

কতো হাজার আহ্‌মদ কালাম তাঁহার খবর কও আমায়।
কোন্ সাধনে নূর সাধিলে সিনার কালাম হয় আদায় ॥

গোলামি করিলে পরে আল্লাহ্‌র ভেদ পাওয়া যায়।
লালন বলে আহাদ কালাম দিবেন কি শাঁই দয়াময় ॥

০৫.

ওগো তোমার নিগূঢ়লীলা সবাই জানে না।
নিরঞ্জন যে প্যাঁচের ধারা বোঝা গেলো না ॥

না ছিলো নূরের বিন্দু না ছিলো নিরাকার সিন্ধু।
তখন আমার দীনবন্ধু আওয়াজ করে এ ভেদ বলতে মানা ॥

পঞ্চনূরি পঞ্চঅঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলো প্রেমতরঙ্গে।
আলিফ লাম মিম কোন অঙ্গে তখন খেলকা তহবন্দ ছিলো না ॥

খেলকা ছিলো মায়ের উদরে নেংটা এলাম ভাবসাগরে।
লালন বলে বিচার করে তখন লজ্জা শরম ছিলো না ॥

০৬.

ও ভাণ্ডে আছে কতো মধুভরা খান্দানে মিশ গা তোরা।
নবিজির খান্দানে মিশলে আয়নার পৃষ্ঠে লাগবে পারা ॥

যেদিন জ্বলে উঠবে নূর তাজেল্লা এই অধর মানুষ যাবে গো ধরা।
আল্লাহ নবি দুই অবতার এক নূরেতে মিলন করা ॥

ঐ নূর সাধিলে নিরঞ্জনকে অমনি যাবে ধরা।
ফকির লালন বলে শাঁইর চরণে ভেদ পাবা না মুরশিদ ছাড়া ॥

০৭.

কারে শুধাবো মর্মকথা কে বলবে আমায়।
যার কাছে যাই সে রাগ করে কথার অন্ত নাহি পাই ॥

একদিন শাঁই নিরাকারে ভেসেছিলেন ডিম্বভরে।
কীরূপ ছিলো তার ভিতরে শেষে কীরূপ হয় ॥

সেতারা রূপ ছিলো কখন গহনা রূপ পাক পাঞ্জাতন।
আকার কি নিরাকার তখন সেই দয়াময় ॥

জগতপতি সোবাহানে বরকতকে মা বললেন কেনে।
তাঁর পতি কি নয় সেজনে লালন ফকির কয় ॥

০৮.

জান গা নূরের খবর যাতে নিরঞ্জন ঘেরা।
নূর সাধিলে নিরঞ্জনকে যাবেরে ধরা ॥

আল্লাহর নূরে নবির জন্ম হয় সে নূর গঠলেন অটলময় আরশ কাঙ্গুরা।
নূরের হিল্লোলে পয়দা নূর জহুরা ॥

আছে নূরের শ্রেষ্ঠ নূর সে জানে সুচতুর জীব যাঁরা।
নূরেতে মোকাম মঞ্জিল উজালা করা ॥

নিভিবে যেদিন নূরের বাতি ঘিরবে এসে কালদ্যুতি চৌমহলা।
লালন বলে থাকবে পড়ে খাকের পিঞ্জিরা ॥

০৯.

জানা উচিত বটে দুটি নূরের ভেদ বিচার।
নবিজি আর নিরূপ খোদা নূর কী রূপে হয় নূর প্রচার ॥

নবির যেমন আকার ছিলো তাই তাঁহার নূর চোয়ালো।
নিরাকারে কী প্রকারে নূর চোয়ালো ঐ খোদার ॥

আকার বলিতে খোদা শরিয়তে নিষেধ সদা কাফের বলে গাল দেয় তারে।
তবে নিরাকারে নূর চোয়ালো প্রমাণ কী গো তার ॥

জাত এলাহি ছিলো জাতে কী রূপে এলো সেফাতে।
লালন বলে নূর চিনিলে যেতো মনের অন্ধকার ॥

১০.

দেখো দেখো নূর পেয়ালা আগে থেকেই কবুল কর।
নিজ জান পরিচয় করে দেখো খোদা বলছো কার ॥

নূর মানে নিজ নবির আত্মা আপনার কলবে আছে তা।
হায়াতে সেই মোহাম্মদা জিন্দা এই চারযুগের উপর ॥

চিনতে যদি পারো সেই নবি এলেম হাসেল, সেইজনের হবি।
তোমার এই দ্বীনের খুবি প্রকাশ হবে দীপ্তকার ॥

ডুব না জেনে ডুবতে চাওরে মন সমুদ্রে ভেসে বেড়াও কলাগাছ যেমন।
সিরাজ শাঁই কয় অবোধ লালন গুরুচরণ সার কর ॥

১১.

না ছিলো আসমানজমিন পবনপানি শাঁই তখন নিরাকারে।
এলাহি আল আলমিন সিদরাতুল একিন কুদরতি গাছ পয়দা করে ॥

গাছের ছিলো চার ডাল হলো হাজার সাল।
এক এক ডাল তাঁর এতোই দূরে ॥

সত্তর হাজার সাল ধরে গাছের 'পরে সাধন করে।
বারিতলার হুকুম হলো নূর ঝরিল ঝরিয়ে দুনিয়া সৃষ্টি করে ॥

একদিনে শাঁই ডিম্বভরে ভেসেছিলো একেশ্বরে।
লালন বলে হায় কী খেলা কাদির মাওলা করেছে লীলে অপার পারে ॥

১২.

নিরাকারে একা ছিলো হুহুঙ্কারে দোসর হলো।
গুপ্তকথা বলতে আমায় কতো নিষেধ করেছিলো ॥

হুহুংকার ছাড়িলে যখন খুলে গেলো নূরের বসন।
সে নূরি বরকতকে তখন মা বোল বলে ডেকেছিলো ॥

খুলিলেন মা হাতের কঙ্কণী বসন কেন খুলিলেন আপনি।
হাসান হোসাইন কানের বালি নবি আলী এই পাঁচজন হলো ॥

কুদরতে হয় নূর সিতারা তাইতে মা তোর নাম জহুরা।
লালন হয়ে দিশেহারা জহুরা রূপ প্রকাশিল ॥

১৩.

নিরাকারে দুইজন নূরী ভাসছে সদাই।
ঝরার ঘাটে যোগান্তরে হচ্ছেরে উদয় ॥

একজন পুরুষ একজন নারী ভাসছে সদাই বরাবরই।
[illegible]ওয়ালা সদর বাড়ি যোগ তাতে দেয় ॥

[illegible]জনা আবেশে হয় দেখাশোনা।
[illegible] সেই ভাগ্যোদয় ॥

যে চিনেছে দুই নূরীকে সিদ্ধি হবে যোগে যোগে
লালন ভেঁড়ো প'লো ফাঁকে মনেরই দ্বিধায় ॥

১৪.
নীরে শুনি নিরঞ্জন হলো।
নূর ছিলো কি পাঁজাপাঁজা এরা কোন্ নূরে এলো ॥

কোন্ নূরে হয় আসমানজমিন কোন্ নূরে হয় পবনপানি।
কোন্ নূরে ভাসিলেন গনি সে নূরে কোন্ নূর আসিল ॥

তুয়া নামে রক্ত পয়দা কোন্ নূরে গঠিল খোদা।
আরশ কুরসি মোহাম্মদা কোন্ নূর জুদাই করিল ॥

আদম বলো কোন্ নূরে হয় মা হাওয়া কি সে নূরে নয়।
কয় রতি নূর ঝরে কোথায় ইহার ভেদ খুলে বলো ॥

মোহাম্মদ যে নূরে হয় খাতুনে জান্নাত কি সে নূরে নয়।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমার দেখো কোথা নূরের বসতি ছিলো

১৫.
শাঁইর নিগূঢ়লীলা বুঝতে পারে এমন সাধ্য নাই।
শাঁইয়ের নিরাকারে স্বরূপ নির্ণয় ॥

একদিনে শাঁই নিরাকারে ভেসেছিলো ডিম্বুভরে।
ডিম্বু ভেঙ্গে আসমানজমিন গঠিলেন দয়াময় ॥

নূরের দিরাকের উপরে নূরনবির নূর পয়দা করে।
নূরের হুজরার ভিতরে নূরনবির সিংহাসন রয় ॥

যে পিতা সেই তো পতি গঠলেন শাঁই আদম সফি।
কে বোঝে তাঁর কুদরতি কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় ॥

ধরাতে শাঁই সৃষ্টি করে ছিলেন শাঁই নিগুম ঘরে।
লালন বলে সেই দ্বারে জানা যায় শাঁইয়ের নিগূঢ় পরিচয় ॥

১৬.
শাঁইর লীলা দেখে লাগে চমৎকার।
সুরতে করিল সৃষ্টি আকার কি নিরাকার ॥

আদমেরে পয়দা করে খোদ সুরতে পরওয়ারে।
মুরাদ বিনে সুরত কীসে হইল সে হঠাৎকার ॥

নূরের মানে হয় কী প্রকার কি বস্তু সেই নূর তাঁহার।
নিরাকারে কি প্রকারে নূর চুয়ায়ে হয় সংসার ॥

আহ্মদ রূপে পরওয়ার দুনিয়ার দিয়েছে ভার।
লালন বলে শুনে দেলে সেও তো বিষম ঘোর আঁধার ॥

১৭.

শুনি গজবে বারি দোজখ করেন তৈরি।
কোন নূরেতে বেহেস্ত দোজখ খবর কও তারই ॥

কথা বলতে জবর কও না খবর কোন নূরে বেহেস্তখানা
যেদিন ভেসেছিলেন আপে বারি পাঁচজনাকে সঙ্গে করি
কার আগে কার পয়দা করলেন রব্বানা ॥

কুদরত কুদরত বলে যারে সে ভেদ কে বুঝতে পারে
কেবল জানে দুই একজনা
লালন বলে কী হইল আমার মনের ঘোর গেলো না ॥

নবিতত্ত্ব

তত্ত্বভূমিকা

তিনি (ইসা নবি) বললেন: নিশ্চয় আমি আল্লাহর দাস। আমাকে কেতাব দেয়া হয়েছে এবং নবি বানানো হয়েছে।

এবং যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে বানিয়েছেন বরকতওয়ালা (বর্ধিষ্ণু) এবং আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে সালাত ও জাকাত শিক্ষা দেয়ার জন্যে।

আল কোরান ॥ সূরা : মরিয়ম ॥ বাক্য : ৩০-৩১

নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবির উপর সালাত করেন এবং তাঁকে প্রদক্ষিণ করেন।

আল কোরান ॥ সূরা আহ্‌যাব ॥ বাক্য : ৫৬

হে নবি, আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের অনুসরণ করো।

আল কোরান ॥ সূরা : আলে ইমরান ॥ বাক্য : ৩২

অস্তিত্বের কেন্দ্রের সহিত যিনি আছেন তিনি নবি। দেহ ও মনের এবং এই দুইয়ের মধ্যখানে যা কিছু আছে তার কেন্দ্রবিন্দুর সাথে যিনি আছেন তিনি নবি। আরবি 'নাবা' শব্দ হতে হয়েছে নবি। নাবা অর্থ খবর। নবি অর্থ খবরদাতা। কোরানের পরিভাষাগত অর্থে নবি হলেন আল্লাহর খবরদানকারি ব্যক্তি। অতএব একজন নবি হলেন আল্লাহর মনোনীত বিশেষ পর্যায়ের একজন হাদী, পথহারাদের জন্যে তিনি সত্য-সুপথ প্রদর্শনকারী, হিতোপদেশদাতা মহান গুরু। প্রত্যেক জাতি তার নবির দ্বারাই বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে।

আল্লাহর নূর থেকে নবির নূর। নবির নূর থেকেই সারা সৃষ্টি। নবি তাই কেন্দ্রবিন্দু। নবিগণ সর্বযুগে আল্লাহর প্রতিনিধি তথা অবতার-মহাপুরুষ হয়ে জগতে অবতরণ করেন। নবি তথা গুরু ব্যতীত আল্লাহর কোনো দৃশ্যমান আকার-সাকার অস্তিত্ব নেই।

আল্লাহ্ নবিদের সর্বোত্তম অবস্থানে একত্রিত করে রেখেছিলেন। তিনি তাঁদের সম্মানিত পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারসূত্রে গর্ভাশয়সমূহে শুদ্ধার্থে সংশোধনের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। যখনই তাঁদের মধ্যে একজন পূর্বসুরীর

তিরোধান হতো তাঁর অনুবর্তী আরেক জন আল্লাহর দ্বীনের জন্যে উঠে দাঁড়াতেন।

মহানবির (সা.) আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ এ ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বিশিষ্ট মূল উৎস ও সর্বোৎকৃষ্ট পবিত্র মাটি থেকে বের করে আনেন। যে শুদ্ধবীজ অর্থাৎ বৃক্ষ থেকে অন্য নবিদের বের করে এনেছিলেন এবং তাঁর মনোনীত প্রতিনিধিরূপে প্রকাশ করেছিলেন, সেই একই পবিত্র মাটি ও বৃক্ষ থেকে তিনি মহানবিকে এনেছিলেন ধরাপৃষ্ঠে।

নবির জ্ঞানগত নিরবিচ্ছিন্ন ধারা হচ্ছে তত্ত্ব ও চর্চার সমন্বয়ে প্রবহমান সর্বোত্তম ধারা। সর্বকালীন এ ধারা অবশ্য সমস্ত সংশয়-সন্দেহের উর্ধ্বে। দীর্ঘকালীন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যাঁর ধারা এখনো ক্রিয়াশীলররূপে অস্তিত্বমান। নবির জ্ঞাতিগণ সর্বোত্তম এবং তাঁর বৃক্ষ সর্বোচ্চ গুণমণ্ডিত বৃক্ষ। এ বৃক্ষ সুনামের মধ্যে জন্মেছিলো এবং বিশেষ গুণরাজির মধ্যে বিকশিত হয়। এর শাখাগুলো সুউচ্চ এবং এর ফল সাধারণের নাগালের বাইরে অর্থাৎ কেউ তাঁদের সমকক্ষ হবার যোগ্য নয়।

মহানবি সমস্ত নবির তথা গুরুগণের মধ্যমণি। তিনি সবার নেতা যারা তাঁর সত্যকে অনুশীলন করে তিনি তাদের জন্যে আলোকবর্তিকা। পূর্ববর্তী নবিগণ থেকে দীর্ঘকাল বিরতির পর আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেন যখন মানুষ ভুল-ভ্রান্তি ও অজ্ঞান-অন্ধকারে নিপতিত ছিলো।

কোনো নবিকেই কখনোই আমাদের মতো মানুষ বলা চলবে না। কেন না নবিগণকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী-অহাবি কাফের ছাড়া অন্য কেউই তাঁদেরকে আমাদের মতো মানুষ বলেননি। অবৈধ রাজতন্ত্রের আশীর্বাদপুষ্ট প্রচলিত কোরানের তফসির ও অনুবাদে যেখানেই মহানবিকে আমাদের মতো মানুষরূপে চিত্রিত করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। এটি সাম্রাজ্যবাদী-অহাবি রাজতান্ত্রিক প্রচার চক্রান্তমাত্র।

নবিদের নীতি ও দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে তাঁদের অত্যুচ্চ ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত কয়েকটি অপবাদ কাফের ও মোনাফেকরা উপস্থাপন করে থাকে; যথা: ১. নবি আমাদের মতো মানুষ। ২. নবিগণ মিথ্যাশ্রয়ী। ৩. কবি। ৪. অন্য হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (যদিও নবিগণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো শিক্ষাপ্রাপ্ত নন)। ৫. নবিগণ যাদুকর (তাঁদের অন্তর্নিহিত খোদায়ি শক্তির বিকাশ দেখে তা মিথ্যায়িত করার জন্যে তাঁদের যাদুকর হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে)। ৬. নবিগণ জিনগ্রস্ত বা পাগল (প্রকৃতপক্ষে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রই জিনমুক্ত হয়ে থাকেন)।

শাঁইজি লালনের নবিতত্ত্বের সারাংশ হলো, নবি তথা সম্যক গুরু ছাড়া খোদার কোনো প্রকাশ আদিতেও ছিলো না, অনাগত ভবিষ্যতেও থাকবে না।

সমস্ত কালের উপর তিনি জীবন্ত আছেন। নবির জ্ঞানপ্রবাহ 'আবহায়াত' চিরকাল ধরে তাঁর আদর্শিক গৃহের বংশধরগণের মাধ্যমে প্রবাহিত এবং জীবন্ত আছে। নবির মনোজগত বা চেতনাপ্রবাহ হলেন আল্লাহ। আল্লাহর প্রকাশ্য দেহরূপধারী অস্তিত্ব হলেন নবি। "আপনি খোদা আপনি নবি / আপনি হন আদম সফি / অনন্তরূপ করে ধারণ / কে বোঝে তাঁর লীলার কারণ / নিরাকারে শাঁই নিরঞ্জন / মুর্শিদরূপ হয় ভজনপথে"। আহাদজগতে আহমদ হয়ে তিনি সর্বকালীন ও সর্বজনীন সম্যক গুরুরূপে উপস্থিত আছেন। সামান্য চর্মচোখে দেখেও তাঁকে চেনে না। কেবল সত্যদ্রষ্টা বিশেষ জ্ঞানীগণের কাছে মূর্তরূপে সর্বযুগে অবতীর্ণ হয়ে তিনিই আকার-সাকারে আল কোরানের বিকাশ। মহানবি আল্লাহর উচ্চতম পরিষদের প্রধান এবং অন্য নবিগণ সেই পরিষদের সদস্য। শাঁইজির নবিতত্ত্ব তাই অতিনিগূঢ়।

১৮.
অপারের কাণ্ডার নবিজি আমার
ভজন সাধন বৃথাই গেলো দ্বীনের নবি না চিনে।
আউয়ালআখের জাহেরবাতেন নবি কখন কোনরূপ ধারণ করেন কোনখানে ॥

আসমান জমিন জলাদি পবন যে নবির নূরেতে সৃজন।
কোথায় ছিলো নবিজির আসন নবি পুরুষ কি প্রকৃতি আকার তখনে ॥

আল্লাহ্ নবি দুটি অবতার গাছে বীজ দেখি তার প্রচার।
সুবুদ্ধিতে করো বিচার গাছ বড় কি ফলটি বড় বড় দাও জেনে ॥

আত্মতত্ত্বে ফাজেল যেজনা সে জানে নবির নিগূঢ় কারখানা।
রসুলরূপে প্রকাশ রব্বানা লালন বলে দরবেশ সিরাজ শাঁইর গুণে ॥

১৯.
আলিফ লাম মিমেতে কোরান তামাম শোধ লিখেছে।
আলিফে আল্লাহজি মিম মানে নবি লামের হয় দুই মানে
এক মানে হয় শরায় প্রচার আরেক মানে মারফতে ॥

তার দরমিয়ানে লাম আছে ডানে বাম আলিফ মিম দুইজনে।
যেমন গাছ বীজ অঙ্কুর এইমতো ঘুর না পারি বুঝিতে ॥

ইশারার বচন কোরানেরই মানে হিসাব করো এইদেহেতে।
পাবি লালন সব অন্বেষণ ঘুরিসনে ঘুরপথে ॥

২০.
আহাদে আহ্মদ এসে নবি নাম কে জানালে।
যে তনে করিল সৃষ্টি সে তন কোথায় রাখিলে ॥

আহাদ মানে পরওয়ার আহমদ নাম হলো যাঁর।
জন্মমৃত্যু হয় যদি তাঁর শরার আইন কই চলে ॥

নবি যাঁরে বলিতে হয় উচিত বটে তাই জেনে লয়।
নবি পুরুষ কি প্রকৃতি কায় সৃষ্টির সৃজনকালে ॥

আহাদ নামে কেন ভাই মানবলীলা করিলেন শাঁই।
লালন তবে কেন যায় অদেখা ভাবুক দলে ॥

২১.
আয় গো যাই নবির দ্বীনে।
দ্বীনের ডঙ্কা বাজে শহর মক্কা মদিনে ॥

নবি তরিক দিচ্ছেন জাহের বাতেনে যথাযোগ্য লায়েক জেনে।
রোজা আর নামাজ ব্যক্ত এহি কাজ গুপ্তপথ মেলে ভক্তির সন্ধানে ॥

অমূল্য দোকান খুলেছেন নবি যে ধন চাইবি সে ধন পাবি।
বিনা কড়ির ধন সেধে দেয় এখন না লইলে আখেরে পস্তাবি মনে ॥

নবির সঙ্গে ইয়ার ছিলো চারিজন চারজনকে দিলেন চারমতে যাজন।
নবি বিনে পথে গোল হলো চারমতে লালন বলে তোরা গোলে পড়িসনে ॥

২২.
আয় চলে আয় দিন বয়ে যায় যাবি যদি নিত্যভুবনে।
সংসার অসার কেন ভুলে আছো মায়ার বন্ধনে ॥

বুঝে দেখো ভাই সকলই অনিত্য নবি নামে স্বয়ং সনাতন সত্য।
সেই নামে অধমে ভাবে শান্তি পাই এইজীবনে ॥

বিকট শমন সতত নিকটে পদে পদে তোমায় ঘিরে হে সংকটে।
বিপদে আপদে পাপী নিরাপদ হয় কোন স্মরণে ॥

ধরো ধরো ভাই নবি প্রাণকান্ত নিরাপদ হবে জীবনান্ত।
নাই ভয় শমন সেথায় লালন হবি নিত্যসুখে সুখি যেখানে ॥

২৩.
ইসলাম কায়েম হয় যদি শরায়।
কী জন্যে নবিজি রহে পনেরো বছর হেরাগুহায় ॥

পঞ্চবেনায় শরা জারি মৌলভিদের তম্বি ভারি।
নবিজি কী সাধন করি নবুয়তি পায় ॥

না করিলে নামাজ রোজা হাসরে হয় যদি সাজা।
চল্লিশ বছর নামাজ কাজা করেছেন রসুল দয়াময় ॥

কায়েম উদ্ দ্বীন হবে কিসে অহর্নিশি ভাবছি বসে।
দায়েমি নামাজের দিশে ফকির লালন জানায় ॥

২৪.
ঐহিকের সুখ কয়দিনের বলো।
ঐ যে দেখতে দেখতে দিন ফুরালো ॥

হলো আসলে ভুল পাকিলোরে চুল।
সুখের তরে ঘুরে ঘুরে বৃথা তোমার জনম গেলো

ভিন্ন ভিন্ন ভাবছো সবে নিত্যসুখে সুখি হবে।
এমন সুখের লেগে নবির তরিকে এখন চলো ॥

ইহকালে ভোগ করে সুখ পরে যদি হলো অসুখ।
এমন সুখের ফল কী আছে লালন বলে ধর্মের জন্যে অসুখ ভালো ॥

২৫.
কী আইন আনিলেন নবি সকলের শেষে।
রেজাবন্দি সালাত জাকাত পূর্বেও তো জাহের আছে ॥

ইসা মুসা দাউদ নবি বেনামাজি নহে কভি।
শেরেক বেদাত তখনো ছিলো তবে নবি কি জানালেন এসে ॥

জব্বুর তৌরা ইঞ্জিল কেতাব বাতিল হলো কিসের অভাব।
তবে নবি কী খাস পয়গম্বর আমি ভেবে না পাই দিশে ॥

ফোরকানের দরজা ভারি কিসে হলো বুঝতে নারি।
তাই না বুঝে অবোধ লালন বিচারে গোল বাঁধিয়েছে ॥

২৬.
কীর্তিকর্মার খেলা কে বুঝতে পারে।
যে নিরঞ্জন সে-ই নূরনবি নামটি ধরে ॥

গঠিতে শাঁই সয়াল সংসার একদেহে দুইদেহ হয় তাঁর।
আহাদে আহ্‌মদ নাম দেখো বিচারে ॥

চারিতে নাম আহ্‌মদ হয় মিম হরফ তাঁর নফি কেন কয়।
সে কথাটি জানাও আমায় নিশ্চিত করে ॥

এ মর্ম কাহারে শুধাই ফ্যাসাদ ঝগড়া বাঁধায় সবাই।
লালন বলে স্থূল ভুলে যাই তার তোড়ে ॥

২৭.
কোন খান্দানে নবিজি মুরিদ হয় বলো দ্বীন দয়াময়।
আছে চিশতীয়া কাদেরিয়া নক্সবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া মুর্শিদ কয় ॥

নূরী জহুরী জব্বুরী সত্তরী চার পেয়ালা নবি পায়।
আলী, আবু বকর, ওমর, ওসমান কোন পেয়ালা কারে দেয় ॥

এক চন্দ্র লক্ষ লক্ষ তারা আসমান ছেয়ে রয়।
অমাবস্যা লাগলে চন্দ্র কোন জায়গায় লুকায় ॥

সিরাজ শাঁই কয় অবোধ লালন নূর পেয়ালা কারে কয়।
চেতনমানুষ ধরে নফি এজবাত লেহাজ করে জানতে হয় ॥

২৮.

খোদ খোদার প্রেমিক যেজনা।
মুর্শিদের রূপ হৃদয়ে রেখে করে আরাধনা ॥

আগে চাই রূপটি জানা তবে যাবে খোদাকে চেনা।
মুর্শিদকে না চিনলে পরে হবে না তোর ভজনা ॥

আগে মনকে নিষ্ঠা করো নবিনামের মালা গাঁথো।
অহর্নিশি চেতন থাকো করো কালযাপনা ॥

সিরাজ শাঁইয়ের চরণ ভুলে অধীন লালন কেঁদে বলে।
চরণ পাই যেন অন্তিমকালে আমায় ফেলো না ॥

২৯.

খোদার বান্দা নবির উম্মত হওয়া যায় যাতে
নবির তরিক নেয় উম্মত জাহেরায় পুসিদাতে॥

ধর্ম পর্দায় বান্দা জাহেরায়
খোদার হুকুম ফরজ আদায় দেখো পঞ্চবেনাতে
তলবে দুনিয়া তলবে মাওলায় দুই তলব তাতে ॥

বান্দার দেল পুসিদাতে রয়
খোদাবান্দা আরশেতে হয় দেখো কালামউল্লাতে
আরশ ছেড়ে খোদা তিলার্ধ নয় রয় তালেবুল মাওলাতে ॥

আকার বান্দা সাকার রূপ খোদা
আকারে সাকারে মিলে হয় দেখা নিরাকারেতে
অনন্ত রূপ আকার এক রূপ সাকার রয় সর্বঘটেতে ॥

বান্দার রূপ খোদ খোদা হয়
আল্লাহ্ আদম বান্দাতে রয় পাক পাঞ্জাতন যাতে
ভেদ জেনে বান্দা লালন দেয় সেজদা খোদার রূপেতে ॥

৩০.

ডুবে দেখ দেখি মন কী রূপ লীলাময়।
যাঁরে আকাশপাতাল খুঁজি এদেহে সে বর্ত রয় ॥

লামে আলিফ লুকায় যেমন মানুষে শাঁই আছে তেমন।
তা নইলে কি সব নূরীতন আদমতনে সেজদা জানায় ॥

শুনতে পাই চার কারের আগে শাঁই আশ্রয় করেছিলো রাগে।
সেইবেশে অটল রূপ ঝেপে মানব লীলা জগতে দেখায় ॥

আহাদে আহ্‌মদ হলো মানুষে শাঁই জন্ম নিলো।
লালন মহাগোলে প'লো লীলার অন্ত না পাওয়ায় ॥

৩১.
ডুবে দেখ নবির দ্বীনে নিষ্ঠা হয়ে মন।
নইলে ঘিরবে এসে কাল শমন ॥

সাকারে নয় লীলায় ছিলো চার তরিকা তখন হলো।
কুদরতির 'পর আসন ছিলো কুদরতি বুঝবি কেমন ॥

শাঁইকে যে না চেনে তারে নৌকায় নেবে কেনে।
ফেলে দেবে ঘোর তুফানে মরবি তখন ॥

ছোট মুখে যায় না বলা এতোই শাঁইয়ের আজব লীলা।
সিরাজ শাঁই কয় দমের মালা জপোরে লালন ॥

৩২.
দস্তখত নবুয়ত যাহার হবে।
কী করিলে ফানা ফিল্লা সকল ভেদ জানা যাবে ॥

পুসিদার ভেদ জানতে পারলে নবুয়ত তার এমনই মেলে।
কেতাব কোরানে না ধরিলে দেল কোরানে সব পাবে ॥

বারো লাখ চব্বিশ হাজার বহিছে দেখো দম সবাকার।
ঊনকোটি ছাপ্পান্ন হাজার পশমে এই দেহটি হবে ॥

জুয়োখেলায় মত্ত হলে কাঁদিতে হবে সব হারালে।
লালন বলে আমার ভাগ্যে না জানি কী ঘটিবে ॥

৩৩.
দয়া করে অধমেরে জানাও নবির দ্বীন।
তুমি দয়া না করিলে হয় না চরণে একিন ॥

শুনি নবি চার মোজাহাবে
চারজন ইয়ার ছিলো নবিজির তাবে
নবি কোন সময়ে তাদের সাথে করিলেন জাহেরার চিন ॥

শুনি নবি চারি খান্দানে
শরিয়ত তরিকত মারফত হাকিকত আনলো কোনখানে
কি রূপেতে গম্য মন সবাই নেন দ্বীনের মোমিন ॥

গুরুর চরণে না হলো মতি
দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়ে কী হবে আমার গতি
লালন বলে কাতর হালে শোধ হলো না ঋণ ॥

৩৪.

দ্বীনদুনিয়ায় অচিনমানুষ আছে একজনা।
কাজের বেলায় পরশমণি অসময়ে তাঁরে চেনো না ॥

নবি আলী এই দুইজনা কলেমাদাতা কুল আরেফিনা।
বেতালিমে মুরিদ সে না পীরের পীর হয় সেজনা ॥

একদিনে শাঁই নিরাকারে ভেসেছিলেন একেশ্বরে।
অচিনমানুষ পেয়ে তাঁরে দোসর করলেন তৎক্ষণা ॥

যে তাঁরে জেনেছে দড়ো খোদার ছোট নবির বড়ো।
লালন বলে নড়োচড়ো সে বিনে কুল পাবা না ॥

৩৫.

নজর একদিক দিলে আর একদিকে অন্ধকার হয়।
নূর নীর দুটি নিহার কোনটারে ঠিক রাখা যায় ॥

নবি আইন করলেন জগতজোড়া সেজদা হারাম খোদা ছাড়া।
সামনে মুর্শিদ বরজোখ খাড়া সেজদার সময় থুই কোথায় ॥

সকল রাবেতা বলে বরজোখ লিখলো দলিলে।
তুমি কারে থুয়ে কারে নিলে একমনে দুই কই দাঁড়ায় ॥

যদি বেলায়েতের হতো বিচার ঘুঁচে যেতো মনের আঁধার।
লালন ফকির এধারওধার দোধারাতে খাবি খায় ॥

৩৬.

নবি এ কী আইন করিলেন জারি।
পিছে মারা যায় আইন তাই ভেবে মরি ॥

শরিয়ত আর মারেফত আদায়
নবির হুকুম এই দুই সদাই
শরা শরিয়ত মারেফত নবুয়ত বেলায়েত জানতে হয় গভীরই ॥

নবুয়ত অদেখা ধ্যান বেলায়েত রূপের নিশান
নজর একদিক যায় আর দিক আঁধার হয়
দুইরূপে কোনরূপ ঠিক ধরি ॥

শরাকে সরপোষ লেখা যায়
বস্তু মারফত ঢাকা আছে তায়
সরপোষ থুই কী তুলে দিই ফেলে লালন তেমনই বস্তু ভিখারি ॥

৩৭.
নবি চেনা রসুল জানা ও দিনকানা তোর ভাগ্যে জোটে না।
আল্লাহ্ মোহাম্মদ নবি তিনে হয় একজনা ॥

কোথায় আল্লাহ কোথায় নবি কোথায় সে ফাতেমা বিবি।
লেহাজ করলে জানতে পাবি প্রেম করেছে এ তিনজনা ॥

যে খোদ সেই তো খোদা আকৃতি-নাম করলেন জুদা।
তাই তো হলেন মোহাম্মদা বিবির কাছে হয় দেনা ॥

চৌদ্দ ভুবন রয় চৌদ্দ ভাগে তিন বিবি তার কলেমার আগে।
এগারো জন দাস্যভাবে ফকির লালন করে উপাসনা ॥

৩৮.
নবিজি মুরিদ কোন ঘরে।
কোন কোন চার ইয়ার এসে চাঁদোয়া ধরে ॥

যাঁর কালেমা দ্বীন দুনিয়ায় সে মুরিদ হয় কোন কালেমায়।
লেহাজ করে দেখো মনুরায় মুর্শিদতত্ত্ব অথৈ গভীরে ॥

উতারিল তাঁরে কোন পেয়ালা জানিতে উচিত হয় নিরালা।
অরুণ বরুণ জ্যোতির্মালা কোন যোগাশ্রয়ে সাধ্য কারে ॥

ময়ূরময়ূরীলীলে কোন যোগাশ্রয়ে প্রকাশ করিলে।
সিরাজ শাঁই ইশারায় বলে লালন ঘুরে ম'লি বুদ্ধির ফ্যারে ॥

৩৯.
নবিজি মুরিদ হইল ফানা ফাইয়া কুনে।
বেখুদি পেয়ালা নবি খাইলেন কি জন্যে ॥

চার পেয়ালা দুনিয়ায় শুনি।
কোন পেয়ালা খাইলেন তিনি জন্মে নবি ম'লেন কি কারণে ॥

আমেনার উদরে বলো কী প্রকারে নবির জন্ম হলো।
লালন বলে এ কী হলো কোরানে কি তাই শুনি ॥

৪০.
নবি দ্বীনের রসুল নবি খোদার মকবুল
ঐ নাম ভুল করিলে পড়বি ফ্যারে হারাবি দুই কুল ॥

নবি পাঞ্জেগানা নামাজ পড়ে
সেজদা দেয় সে গাছের উপরে সেই না গাছে ঝরে পড়ে ফুল
সেই ফুলেতে মৈথুন করে দুনিয়া করলেন স্থুল ॥

নবি আউয়ালে আল্লাহর নূর
দুওমেতে তওবার ফুল তিনমেতে ময়নার গলার হার।
চৌথমেতে নূর সিতারা পঞ্চমে ময়ূর ॥

আহাদে আহ্‌মদ বর্ত
জেনে করো তাঁহার অর্থ হয় না যেন ভুল।
ফকির লালন ভেদ না বুঝে হলো নামকূল ॥

৪১.
নবি না চিনলে কি আল্লাহ্ পাবে।
নবি দ্বীনেরই চাঁদ দেখ না ভেবে ॥

যাঁর নূরে হয় সয়াল সংসার
কলির ভাবে আজ নবি পয়গম্বর
হাটের গোলে তাঁরে মন চিনলি না ভবে ॥

বাতেনের ঘরে নূরনবি পুরুষ কি প্রকৃতি ছবি
পড়ো দেলকোরান
করো তাঁর বিধান মনের আঁধার দূরে যাবে ॥

বোঝা কঠিন কুদরতি খেয়াল নবিজি গাছ শাঁইজি তাঁর ফল
যদি সে ফল পাড়ো
ঐ গাছে চড়ো লালন কয় কাতরভাবে ॥

৪২.
নবি না চিনলে সে কি খোদার ভেদ পায়।
চিনিতে বলেছেন খোদে সেই দয়াময় ॥

যে নবি পারের কাণ্ডার জিন্দা সে চারযুগের উপর।
হায়াতুল মুরসালিন নাম তাঁর সেইজন্য কয় ॥

যে নবির হলো ওফাত সে নবিই আনফাসের সাথ করবেন সাক্ষাত।
লেহাজ করে জানলে নেহাত যাবে মনের সংশয় ॥

যে নবি আজ সঙ্গে তোর চিনে মন তাঁর দাওন ধরো।
লালন বলে যদি কারো পারের সাধ হয় ॥

৪৩.

নবি বাতেনেতে হয় অচিন।
নূর তাজাল্লা হবেরে যেদিন ॥

যারে বলি এই অটল নবি দ্বীন দুনিয়ার যোগ মিশায়ে করেছেন খুবি।
যাঁর মরণ নাই কোন কালে তাঁরে চেনো মন অতিগহিন ॥

মনের উপর নড়েচড়ে নীরে ক্ষীরে যোগ মিশায়ে ভাসলেন কাদেরে।
হলো নূর সে অধর রসে পুরা তাঁরে ডাকো রব্বুল আলামিন ॥

সূরা ইয়াসিনের বিভাব হবে যেদিন মিম আল্লাহ বারিতালা ঐ চিনারেই চিন।
লালন বলে সে ভেদ জানো যেদিন হবে আইনাল একিন ॥

৪৪.

নবি মেরাজ হতে এলেন ঘুরে।
বলেন না ভেদ কারো তরে ॥

শুনে আলী কহিছেন তখন দেখে এলেন আল্লাহ্ কেমন।
নবি কয় ঠিক তোমার মতন করো আমল আমি বলো যারে ॥

এসে আবু বকর বলে আল্লাহ্ কেমন দেখে এলে।
রূপটি কেমন দেবেন বলে নবি বলেন তুমি দেখো তোমারে ॥

তারপর কহিছে ওমর কেমন আল্লাহ্‌র আকার প্রকার।
নবি কয় ঠিক তোমার আকার আইনাল হক তাই কোরান ফুকারে ॥

পরে জিজ্ঞাসিল ওসমান গনি আল্লাহ কেমন বলেন শুনি।
নবি কয় যেমন তুমি তেমন ঠিক পরওয়ারে ॥

নবি মেরাজে গিয়ে যে ভেদ তিনি এলেন নিয়ে।
নবিজি যা বুঝাইল চারজনা চারমতে প'লো লালন প'লো মহাগোলে ॥

৪৫.
নবি সাবুদ করে লও চিনে।
তাঁর কালেমা সাবুদ হবে দেখবি নয়নে ॥

যাঁর কলেমা পড়ো তাঁরে লও চিনে।
যে নবি সঙ্গে ফিরে তাঁরে লও জেনে ॥

যে নবি করবেন পার জিন্দা সে চারযুগের উপর।
হায়াতুল মুরসালিন নাম তাঁর সেইজন্যে ॥

'লা কুম দ্বীনু কুম' এ কথা বলে কোরানে।
কোন নবির কেমন আইন জানবি তাঁর মানে ॥

কোন নবির হলো ওফাত কোন নবি হয় বান্দার হায়াত।
কোন নবি হলো কাণ্ডারি দেখো মদিনে ॥

সিরাজ শাঁই বলেরে লালন নবি চিনো আগে।
কলেমা সাবুদ হলে যাবি নিত্যভুবনে ॥

নাম শুনে চেনে যারা নবির ইয়ার তারা।
না দেখে চিন্‌বি তোরা কেমনে ॥

৪৬.
নবির আইন পরশরতন চিনলি না মন দিন থাকিতে।
সুধার লোভে গরল খেয়ে মরলিরে বিষজ্বালাতে ॥

নূরনবিজির তরিকা ধরো রোজা করো নামাজ পড়ো।
নবির তরিক না ধরিলেরে ঠেকবি পদে পদে ॥

নিরাশ মানুষের কথা শুনে মনে লাগে ব্যথা।
লালন বলে ভাঙবে মাথা পড়বিরে কাঠমোল্লার হাতে ॥

৪৭.
নবির আইন বোঝার সাধ্য নাই।
যার যেমন বুদ্ধিতে আসে বলে বুঝি তাই ॥

বেহেস্তের লায়েক আহাম্মক সবে তাই শুনি হাদিস কেতাবে।
এমতো কথার হিসাবে বেহেস্তের গৌরব কিসে রয় ॥

সকলে বলে আহাম্মক বোকা আহাম্মক পায় বেহেস্তে জায়গা।
এতো বড়ো পূর্ণধোঁকা কে ঘুঁচাবে কোথা যাই ॥

রোজা নামাজ বেহেস্তের ভজন তাই করে কি পাবে সে ধন।
বিনয় করে বলছে লালন থাকতে পারে ভেদ মুর্শিদের ঠাঁই।.

৪৮.
নবির তরিকতে দাখিল হলে সকলই জানা যায়।
কেনরে মন কলির ঘোরে ঘুরছো ডানে বাঁয় ॥

আউয়ালে বিসমিল্লাহ্ বর্ত মূল জানো তার তিনটি অর্থ।
আগমে বলেছে সত্য সে ভেদ ডুবে জানতে হয় ॥

নবি আদম খোদ বেখোদা এ তিন কভু নাহি জুদা।
আদমে করিলে সেজদা আলকজনা পায় ॥

যথায় আলক মোকাম বারি সফিউল্লাহ্ তাঁহার সিঁড়ি।
লালন বলে মনের বেড়ি লাগাওরে মুর্শিদের পায় ॥

৪৯.
নবির নূরে সয়াল সংসার।
আবহায়াতে আহাদ নূরী জিন্দা চারযুগের উপর ॥

অচিন দলে আদ্যমূল তুয়াগাছে তওবার ফুল।
যার হয়েছে সেই ফুলের উল চৌদ্দ ভুবন হয় দীপ্তকার ॥

খোদ বীজে বৃক্ষ নবি সেই নূরে হয় আদম সফি।
রপ্তে নূরের ছবি এলোরে আবদুল্লাহর 'পর ॥

একভাণ্ডে জীব ও পরম ভিন্নরূপ ধরনকরণ।
সিরাজ শাঁই বলেরে লালন মুর্শিদরূপে পরওয়ার ॥

৫০.
নিগূঢ়প্রেম কথাটি তাই আজ আমি শুধাই কার কাছে।
কোন প্রেমেতে আল্লাহ্ নবি মেরাজ করেছে ॥

মেরাজ ভাবের ভুবন গুপ্ত ব্যক্ত আলাপ হয়রে দুইজন।
কে পুরুষ আকার কি প্রকৃতি তার শাস্ত্রে প্রমাণ কী রেখেছে ॥

কোন প্রেমের প্রেমিকা ফাতেমা করেন শাঁইকে পতি ভজনা।
কোন প্রেমের দায় ফাতেমাকে শাঁই মা বোল বলেছে ॥

কোন প্রেমে গুরু হয় ভবতরী কোন প্রেমে শিষ্য হয় কাণ্ডারি।
না জেনে লালন প্রেমের উদ্দীপন প্রেম করে মিছে ॥

৫১.
পড়ো নামাজ আপনার মোকাম চিনে।
মোর্শেদ ধরে জানতে হবে নবির মিম্বর আছে কোনখানে ॥

লা ইলাহা কলেমা পড়ো ইল্লাল্লাহু দম শুমারে ধরো।
দম থাকিতে আগে মরো বোরাকে বসিয়ে বামে ॥

ঘুঁচে যাবে এশকের জ্বালা জেগে উঠবে নূর তাজাল্লাহ্।
সামনে দাঁড়ায়ে মাওলা নিরিখ রেখো মুর্শিদ কদমে ॥

আপনার আপনি চেনা যাবে নামাজের ভেদ তবে পাবে।
ছয় লতিফা হাসিল হবে পড়ো নামাজ দমে দমে ॥

সিরাজ শাঁই দরবেশে বলে শোনরে লালন বলি খুলে।
শেরেকি হয় দলিলে নিরাকারে সেজদা দিলে ॥

৫২.
পড়ো মনে ইবনে আবদুল্লাহ্।
পড়িলে যাবে জীবের মনের ময়লা ॥

একরা বিসমে রাব্বিকা আছে সূরা ত্রিশ পারা নবিজি তা পড়ে না।
জিবরাইল তা শোনে না মোহর নবুয়ত দিলেন খোদাতালা ॥

হেরা পর্বত গুহাতে বসেছিলেন নবি মোরাকাবা-মোশাহেদাতে।
সেথায় জিবরাইল হয় হাজির খেলাফত দিলেন মালেক আল্লা ॥

নবির পৃষ্ঠে মোহর নবুয়ত রয় আশেকে আকাশ দেখে ভক্তগণকে কয়
লালন বলে এ ভেদ জানলে যাবে মনের ত্রিতাপজ্বালা ॥

৫৩.
ভজো মুর্শিদের কদম এইবেলা।
চার পেয়ালা হৃৎকমলে ক্রমে হবে উজ্জালা ॥

নবিজির খান্দানেতে পেয়ালা চারিমতে।
জেনে লও দিন থাকিতে ওরে আমার মনভোলা ॥

কোথায় আবহায়াত নদী ধারা বয় নিরবধি।
সে ধারা ধরবি যদি দেখবি অটলের খেলা ॥

ওপারে ছিলাম ভালো এপারে কে আনিল।
লালন কয় তাঁরে ভুলে করো না অবহেলা ॥

৫৪.

ভজোরে জেনে শুনে নবির কলেমা কালেন্দা আলী হন দাতা।
ফাতেমা দাতা কী ধন দানে ॥

নিলে ফতেমার শরণ ফতেহ্ হয় করণ।
আছে ফরমান শাঁইর জবানে ॥

সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করলেন সবারই যুগে যুগে মাতা হন যুগেশ্বরী।
সুযোগ না বুঝিয়ে কুযোগে মজিয়ে জীব মারা গেলো ঘোর তুফানে ॥

শুনেছি মা তুমি অবিম্বধারী বেদান্তের উপর গম্ভু তোমারই।
তোমার গম্ভু বোঝা ওরে মন আমার ভুলে রইলাম ভবের ভাবভূষণে ॥

সাড়ে সাত পন্তি পথের দাঁড়া আদ্যপন্তি তার আদ্য মূলগোড়া।
সিরাজ শাঁইর চরণ ভুলেরে লালন অঘাটেতে মারা যাচ্ছে কেনে ॥

৫৫.

ভবে কে তাঁহারে চিনতে পারে।
এসে মদিনায় তরিক কে জানায় এ সংসারে ॥

সবাই বলে নবি নবি নবিকে নিরঞ্জন ভাবি।
দেল ঢুঁড়িলে জানতে পাবি আহ্মদ নাম হলো কারে ॥

যার মর্ম সে যদি না কয় কার সাধ্য সে জানতে পায়।
তাইতে আমার দ্বীন দয়াময় মানুষরূপে ঘোরে ফেরে ॥

নফি এজবাত যে বোঝে না মিছেরে তার পড়াশোনা।
লালন কয় ভেদ উপাসনা না জেনে চটকে মারে ॥

৫৬.

মন কি ইহাই ভাবো আল্লাহ পাবো নবি না চিনে।
কারে বলিস নবি নবি তাঁর দিশে পেলিনে ॥

বীজ মানে শাঁই বৃক্ষ নবি দেল ঢুঁড়িলে জানতে পাবি।
কী বলবো সেই বৃক্ষের খুবি তাঁর একডালে দ্বীন আর একডালে দোনে ॥

যে নূরে হয় আদম পয়দা সেই নবির তরিক জুদা।
নূরের পেয়ালা খোদা দিলেন তাঁরে খোদ অঙ্গ জেনে ॥

চার কারের উপরে দেখো আশ্রয় করে ছিলেন কে গো।
পূর্বাপরের খবর রাখো জানবি লালন নবির ভেদ মানে ॥

৫৭.

মনের ভাব বুঝে নবি মর্ম খুলেছে।
কেউ ঢাকা দিল্লি হাতড়ে ফেরে কেউ দেখে কাছে ॥

সিনা আর সফিনার মানি ফাঁকাফাঁকি দিনরজনী।
কেউ দেখে মত্ত কেউ শুনে মত্ত কেউ আকাশ ধেয়েছে ॥

সফিনায় শরার কথা জানাইলে যথাতথা।
কারো সিনায় সিনায় ভেদ পুসিদায় বলে গিয়েছে ॥

নবুয়তে নিরাকার কয় বেলায়েতে বরজোখ দেখায়।
অধীন লালন প'লো পূর্ণ ধোকায় এই ভেদ মাঝে ॥

৫৮.

মুর্শিদ বিনে কী ধন আর আছেরে মন এই জগতে।
যে নামে শমন হরে তাপিত অঙ্গ শীতল করে
ভববন্ধনজ্বালা যায় গো দূরে জপো ঐ নাম দিবারাতে ॥

মুর্শিদের চরণের সুধা পান করিলে যাবে ক্ষুধা
করো নাকো দেলে দ্বিধা যেহি মুর্শিদ সেহি খোদা
ভজো অলিয়েম মোর্শেদা আয়াত লেখা কোরানেতে ॥

আপনি আল্লাহ্ আপনি নবি আপনি হন আদম সফি
অনন্ত রূপ করে ধারণ কে বোঝে তাঁর লীলার কারণ
নিরাকারে শাঁই নিরঞ্জন মুর্শিদরূপ হয় ভজনপথে ॥

কুল্লে সাইয়ুন মোহিত আর কুল্লে সাইয়ুন কাদির
পড়ো কালাম লেহাজ করো তবে সে ভেদ জানতে পারো
কেন লালন ফাঁকে ফেরো ফকিরি নাম পাড়াও মিথ্যে ॥

৫৯.

মুর্শিদের ঠাঁই নে নারে তাঁর ভেদ বুঝে।
এ দুনিয়ায় সিনায় সিনায় কী ভেদ নবি বিলিয়েছে ॥

সিনার ভেদ সিনায় সফিনার ভেদ সফিনায়।
যে পথে যার মন হলো ভাই সেই সে পথে দাঁড়িয়েছে ॥

কুতর্ক আর কুস্বভাবী তারে গুপ্তভেদ বলে নাই নবি।
ভেদের ঘরে দিয়ে চাবি শরামতে বুঝিয়েছে ॥

নেকতন বান্দারা যতো ভেদ পেলে আউলিয়া হতো।
নাদানেরা শূল চাঁচিত মনসুর হাল্লাজ তার সাবুদ আছে ॥

তফসিরে হোসাইনী নাম তাই ঢুঁড়ে মসনবি কালাম।
ভেদ ইশারায় লেখা তামাম লালন বলে নাই নিজে ॥

৬০.
মেরাজের কথা শুধাই কারে।
আদমতন আর নিরাকারে মিললো কেমন করে ॥

নবি কি ছাড়িল আদমতন কি বা আদম রূপ হইল নিরঞ্জন।
কে বলিবে সে অন্বেষণ এই অধীনেরে ॥

নয়নে নয়ন বুকে বুক উভয় মিলে হইল কৌতুক।
তবে দেখলো না সে রূপ নবির নজরে ॥

তুণ্ডে তুণ্ড করিল কাহার সেই কথাটি শুনতে চমৎকার।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমার বোঝো জ্ঞানদ্বারে ॥

৬১.
লা ইলাহা কলেমা পড়ো মোহাম্মদের দ্বীন ভুলো না।
নবির কলেমা পড়লে পরে পুনর্জনম আর হবে না ॥

নবি সে পারের কাণ্ডার পারঘাটাতে করবেন পার।
হেন নবি না চিনিলে হয়ে থাকবি দিনকানা ॥

রোজা রাখো নামাজ পড়ো কলেমা হজ জাকাত করো।
তবে হবি পার দাখিল হবি বেহেস্তখানা ॥

সিরাজ শাঁই দরবেশে বলে সেই মানুষ নিহার হলে।
লালন কয় অন্তিমকালে পাই যেন শাঁইয়ের চরণখানা ॥

৬২.
শুনি নবির অঙ্গে জগত পয়দা হয়।
সেই যে আকার কী হলো তার কে করে তার নির্ণয় ॥

আবদুল্লাহ্‌র ঘরে বলো সেই যে নবির জন্ম হলো।
মূলদেহ তাঁর কোথায় ছিলো একথা কারে বা শুধাই ॥

কী রূপেতে নবিজির জান বাবার বীজে যুক্ত হন।
শুনেছি আবহায়াত নাম হাওয়া নাই সেথায় ॥

এক জানে দুই কায়া ধরে কেউ পাপ কেউ পুণ্যি করে।
কী হবে তার রোজ হাসরে বিচারের সময় ॥

নবির ভেদ যে পায় একক্রান্তি ঘুঁচে যায় তার সকল ভ্রান্তি।
দৃষ্ট হয় তার আলকপন্তি লালন ফকির কয় ॥

রসুলতত্ত্ব

তত্ত্বভূমিকা

বলো: হে ইনসানগণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রসুল যাঁর জন্যে মন এবং দেহের রাজত্ব। তিনি ব্যতীত নারী উপাস্য আজীবন নির্ভরযোগ্য নয়। তিনি জীবনদান করেন এবং মৃত্যুদান করেন ; সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সহিত ইমানের কাজ করো। যারা আল্লাহ ও রসুলের সহিত ইমানের কাজ করে এবং তাঁর অনুসরণ করে তবেই তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে।

আল কোরান ॥ সূরা আরাফ ॥ বাক্য : ১৫৮

আলে রসুল (সম্যক গুরুর সর্বকালীন ভক্ত বা পুত্রগণ) তাঁরা হলেন আল কেতাবের (অর্থাৎ মানবদেহের) এবং একটি স্পষ্ট বা প্রকাশ্য কোরানের পরিচয়।

নিশ্চয় আমরা স্মরণ ও সংযোগ নাজেল করি। এবং আমরাই তার সংরক্ষণকারী। নিশ্চয় আমরা আপনার অনুমোদনে প্রাচীন দলগুলোর জন্যে পাঠিয়েছিলাম সংযোগ। এবং তাদের কাছে একজন রসুলও আসে নাই যাঁর সাথে ওরা উপহাস করে নাই। ঐরূপে আমরা অপরাধীদের অন্তরে উপহাসপ্রবণতা স্বভাবগত করে দিই।

আল কোরান ॥ সূরা হিজর॥ বাক্য : ১, ৯,১০,১১,১২

কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার বিশিষ্ট পদ্ধতি যিনি নিজের জীবনে পদ্ধতিস্ত করেছেন তিনিই রসুল। রসুল অর্থ প্রতিনিধি। কোরানের পরিভাষাগত অর্থে, আল্লাহর প্রতিনিধি তথা কোনো নবির মনোনীত প্রতিনিধি। নবির প্রতিনিধিত্ব আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের শামিল। প্রত্যেক নবি একজন রসুল। কিন্তু প্রত্যেক রসুল নবি নন। মহানবি ব্যতীত প্রত্যেক নবি প্রথমত রসুল ছিলেন, তারপর নবি হয়েছিলেন। কোরানে উল্লিখিত হয়েছে: রসুলান নাবিয়া, সিদ্দিকান নবিয়া। অর্থাৎ রসুল নবি, সিদ্দিক নবি। অর্থাৎ প্রথমত রসুল ছিলেন, পরে নবি পর্যায়ে উন্নীত হলেন। প্রথমে সিদ্দিক ছিলেন, পরে নবি হয়েছিলেন।

মহানবি (সা.) ইহধাম ত্যাগের পূর্বে মাওলা আলীকে (আ.) তাঁর প্রতিনিধি অর্থাৎ রসুলরূপে মনোনীত ও অভিষিক্ত করে যান। কিন্তু নবির বায়াতভঙ্গকারি ওমর, আবু বকর, ওসমান প্রমুখ নবির উপস্থিতিতে মাওলা আলীর হাতে বায়াত বা আনুগত্য স্বীকার করেছিলো। মহানবি পর্দা গ্রহণের সাথে সাথেই ওরা বায়াতভঙ্গ করে ওরা মাওলা আলীর বিরুদ্ধে তথা নবির আহলে বাইতের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। মহানবির রেসালাত তথা মাওলাইয়াত উৎখাত

করে কুচক্রীরা চালু করে ভোটাভুটির খেলাফত। যার জ্বালায় পৃথিবী এখনো জ্বলছে।

আল্লাহর হুকুমত চালনা করার একমাত্র ন্যায়সঙ্গত অধিকারী হলেন রসুলের আদর্শবাহী বংশধরগণ। তাঁরা ব্যতীত আল্লাহর বিধান অন্যলোকের পরিচালনায় কখনোই কার্যকর হতে পারে না। মহাবিজ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর মনোনীত জীবনবিধানের সবদিক সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত পরমজ্ঞানী হলেন সর্বযুগের রসুলতত্ত্বের ধারকগণ। তাঁরা সব সমস্যার সমাধান আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞাত হতে পারেন। তাঁরা শাসনকর্তারূপে নিয়োজিত না থাকলে পৃথিবীর মানুষ সববিষয়ে; যথা: অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষের দাসে পরিণত হয়ে যায়।

সর্বযুগেই আলে রসুল অর্থাৎ রসুলতত্ত্বের ধারক-বাহকগণ হলেন কেতাবের এবং স্পষ্ট কোরানের পরিচয়। আলে রসুল ব্যতীত আর কেউই কেতাব তথা কোরানের কোনো পরিচয়জ্ঞানই রাখে না। কথায় কোরান প্রকাশ করা হলেও তা মানুষের কাছে অপরিজ্ঞাত। একজন আলে রসুল জ্যান্ত একটি কোরান। সুতরাং তাঁর মধ্যে কোরানের পরিচয় প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত দেখতে পায় সবাই। তাঁর কর্মকাণ্ড এবং বাক্যালাপ সবই কোরানের মূর্ত প্রকাশ। অতিসূক্ষ্ম জীবনরহস্য তাঁর অতীন্দ্রিয় শ্রবণ ও দর্শনের কাছে সুস্পষ্ট।

রসুল ও আলে রসুলগণ অনন্ত রসুলতত্ত্বের বিকাশমান সত্তা। উচ্চ পর্যায়ের মহান ব্যক্তিত্ব থেকে নিম্ন পর্যায়ের মানুষের কাছে প্রেরিত রবের নির্দেশকে 'নাজেল' বলে। আলে রসুলগণ কেতাবওয়ালা অর্থাৎ সৃষ্টিরহস্যের বিকাশবিজ্ঞানধারি। তাঁদের কর্তব্য হলো, রব থেকে প্রাপ্ত নির্দেশকে জনগণের কাছে পৌছে দেয়া। কিন্তু জনগণের অধিকাংশই বিশ্বাসের অনুশীলন করে না। মানুষ গ্রহণ করুক বা না করুক সর্বপ্রকার ধর্মীয় নির্দেশ কেতাবপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণ থেকেই আসে। কেতাবপ্রাপ্তগণ সবাই আলে রসুল। মহানবির আগমনে নবুয়ত 'খতম' অর্থাৎ সত্যায়ন বা সীলমোহর করা হলো বা সম্পন্ন হলো। কিন্তু রেসালত শেষ করা হয়নি। নিরন্তর এ ধারা অনাদিকাল পর্যন্ত চলতেই থাকবে। মহানবির বংশের চৌদ্দজন ইমামই (আহলে বাইত) শুধু আল্লাহ এবং শেষনবি কর্তৃক মনোনীত রসুলরূপে আগমন করেননি বরং পূর্ণতাপ্রাপ্ত সকল অলিও মোহাম্মদের (আ) আল এবং তাঁর মনোনীত আল্লাহর রসুলরূপে মানব সমাজে প্রকাশিত হয়ে চলেছেন। সুরা ইয়াসিনে উল্লিখিত তিনজন রসুলকে এশিয়া মাইনরের আন্তাকিয়া নামক নগরে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্যে একই সময়কালে পাঠানো হয়েছিলো (৩৬ : ১৩-১৬)। তাঁরা নবি ইসা (আ.) কর্তৃক প্রেরিত রসুল। একজন রসুল নবি নাও হতে পারেন, কিন্তু কেউ নবি হলে তিনি একজন রসুলও বটে। সাঁইজির রসুলতত্ত্ব তাই অতীন্দ্রিয় রহস্যলোকের লীলাবিলাস।

৬৩.

আছে আল্লাহ্ আলে রসুলকলে তলের উল হলো না।
অজান এক মানুষের করণ তলে করে আনাগোনা ॥

আল্লাহ আহ্লাদিনীরে দুইরূপে নৃত্য করে।
দুইরূপ মাঝার রূপ মনোহর সে রূপ কেউ বলে না ॥

নারী পুরুষ নপুংসকরে তাঁহার তুলনা হয় তাঁহারে।
সে রূপ অন্বেষণ জানে সেইজন শক্তি উপাসনা ॥

শক্তিহারা ভাবুক যে কপট ভাবের উদাসী সে।
লালন বলে তার জ্ঞানচক্ষু আঁধার রাগের পথ চেনে না ॥

৬৪.

আশেক বিনে রসুলের ভেদ কে আর পোছে।
জিজ্ঞাসিলে খলিফায় কয় রসুল বলেছে ॥

মাশুকে যে হয় আশেকী খুলে যায় তার দিব্যআঁখি।
নফসে আল্লাহ নফসে নবি দেখবে অনা'সে ॥

যিনি মোর্শেদ রসুলাল্লাহ সাবুদ কোরান কালামাল্লাহ।
আশেকে বলিলে আল্লাহ তাও হয় সে ॥

মোর্শেদের হুকুম মানো দায়েমি নামাজ জানো।
রসুলের ফরমান মানো লালন তাই রচে ॥

৬৫.

এমন দিন কি হবেরে আর।
খোদা সেই করে গেলো রসুলরূপে অবতার ॥

আদমের রুহ্ সেই কেতাবে শুনিলাম তাই।
নিষ্ঠা যার হলোরে ভাই মানুষ মোর্শেদ করে সার ॥

খোদ সুরতে পয়দা আদম এও জানা যায় অতিমরম।
আকার নাই যার সুরত কেমন লোকে বলে তাও আবার ॥

আহ্মদ নাম লিখিতে মিম নফি হয় তাঁর কিসেতে।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তাতে কিঞ্চিৎ নজির দেখো তাঁর ॥

৬৬.

করিয়ে বিবির নিহার রসুল আমার কই ভুলেছেন শাঁই রব্বানা।
জাত সেফাতে দোস্তি করে কেউ কাহারে ভুলতে পারে না ॥

খুঁজে তার মর্মকথা পাবি কোথা রসুল চৌদ্দ নিকাহ্ কই করেছে।
চৌদ্দ ভুবনের পতি চৌদ্দ বিবি করেছে তাঁর দেখো নমুনা ॥

সেফাতে এসে নবি তিনটি বিবি সুসন্তানের হয়েছে মা।
আলিফ লাম মিমে দেখো না ও দিনকানা তিনজন বিবি সৈয়দেনা

আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজ লয়ে সাত সমুদ্রের খবর লও না।
না পেয়ে তার আদিঅন্ত হয়ে সান্ত বসে আছে কতোজনা ॥

লালন কয় বুঝবারই ভুল করে কবুল দেখো না নবি সাল্লে আলা।
আগমে নিগম যিনি গুণমণি তাঁর সাথে আর কার তুলনা ॥

৬৭.

তোমার মতো দয়াল বন্ধু আর পাবো না।
দেখা দিয়ে ওহে রসুল ছেড়ে যেও না ॥

তুমি হও খোদার দোস্ত অপারের কাণ্ডারি সত্য।
তোমা বিনে পারের লক্ষ্য আর তো দেখি না ॥

আসমানী এক আইন দিয়ে আমাদের সব আনলেন রাহে।
এখন মোদের ফাঁকি দিয়ে ছেড়ে যেও না ॥

আমরা সব মদিনাবাসী ছিলাম যেমন বনবাসী।
তোমা হতে জ্ঞান পেয়েছি আছি সান্ত্বনা ॥

তোমা বিনে এরূপ শাসন কে করবে আর দ্বীনের কারণ।
লালন বলে আর তো এমন দ্বীনের বাতি জ্বলবে না ॥

৬৮.

তোরা দেখরে আমার রসুল যার কাণ্ডারি এইভবে।
ভবনদীর তুফানে তার নৌকা কি ডোবে ॥

ভুলো না মন কারো ধোঁকায় চড়ো সে তরিকার নৌকায়।
বিষম ঘোর তুফানের দায় বাঁচবি তবে ॥

তরিকার নৌকাখানি ইশ্‌ক নাম তার বলে শুনি।
বিনে হাওয়ায় চলছে অমনি রাত্রিদিনে ॥

সেই নৌকাতে যদি না চড়ি কেমনে দেবো ভবপাড়ি।
লালন বলে এহি ঘড়ি দেখ নারে ভেবে ॥

৬৯.

দিবানিশি থেকোরে সব বাহুঁশিয়ারই।
রসুল বলে এ দুনিয়া মিছে ঝকমারি ॥

পড়িলে আউজুবিল্লাহ দূরে যাবে লানতুল্লাহ।
মুর্শিদ রূপ যে করে হিল্লা শংকা যায় তারই ॥

জাহের বাতেন সব সফিনায় পুসিদার ভেদ দিলাম সিনায়।
এমনই মতো তোমরা সবাই বলো সবারই ॥

অসৎ অভক্তজনা তারে গুপ্তভেদ বলো না।
বলিলে সে মানিবে না করবে অহঙ্কারই ॥

তোমরা সব খলিফা আউলিয়া রইলে যে যা বোঝো দিও বলে।
লালন বলে রসুলের এই নসিহত জারি ॥

৭০.

দেলকেতাব খুঁজে দেখো মোমিন চাঁদ তাতে আছেরে সকল বয়ান।
ইব্রাহিম খলিলউল্লাহ মসালা নামে আস্তা খাতুনে মোকাম ॥

খোদা যেদিন হজ ভেজিবে সেদিন মসজিদের নিশান উঠিবে।
ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে হবে যদি করেন আল্লাহ মেহেরবান ॥

ইসা মুসা দাউদ রসুল খোদার কাজে আছে মকবুল।
ফরমান করিতে কবুল পড়ছে সদাই দেলকোরান ॥

ইঞ্জিল তৌরা জব্বুব কোরান চারি জায়গায় চারের বয়ান।
বলে তাই ফকির লালন খুঁজলে পাবে সকল সমাধান ॥

৭১.

ধড়ে কোথায় মক্কা মদিনে চেয়ে দেখ নয়নে।
ধড়ের খবর না জানিলে ঘোর যাবে না কোনোদিনে ॥

ওয়াহাদানিয়াতের রাহা ভুল যদি মন করো তাহা।
হুজুরে যেতে পথ পাবে না ঘুরবি কতো ভুবনে ॥

উপরওয়ালা সদর বারি অচিনদেশে তাঁর কাচারি।
সদাই করে হুকুম জারি মক্কায় বসে নির্জনে ॥

চারি রাহায় চারি মকবুল ওয়াহাদানিয়াতে রসুল।
সিরাজ শাঁই কয় না জেনে উল লালনরে তুই ঘুরিস কেনে ॥

৭২.
পাক পাঞ্জাতন নূরনবিজি চারযুগে হইলেন উদয়।
একসঙ্গে পাঁচটি তারা থাকে সেই আকাশের গায় ॥

হাসান হোসাইন কানের বালি গলায় হার হন হযরত আলী।
ছেরের মুকুট হযরত রসুল মাঝখানে ফাতেমা রয় ॥

পাক পাঞ্জাতন সঙ্গে নিয়ে ভাসছেন মোর্শেদ আল্লাহ্ নিরাকারে।
ইমাম হাসান হোসাইন ফাতেমা আলী কেউ কাউকে ছাড়া নয় ॥

আছেন পাক পাঞ্জাতন আত্মা পাঁচজন।
সে আত্মা দিয়ে করো আত্মসাধন ফকির লালন তাই কয় ॥

৭৩.
ভুলো না মন কারো ভোলে।
রসুলের দ্বীন সত্য মানো ডাকো সদাই আল্লাহ্ বলে ॥

খোদাপ্রাপ্তি মূলসাধনা রসুল বিনে কেউ জানে না।
জাহের বাতেন উপাসনা রসুল হতে প্রকাশিলে ॥

দেখাদেখি সাধলে যোগ বিপদ ঘটবে বাড়বে রোগ।
যেজন হয় শুদ্ধসাধক সেই রসুলের ফরমানে চলে ॥

অপরকে বুঝাতে তামাম করেন রসুল জাহেরা কাম।
বাতেনে মশগুল মোদাম কারো কারো জানাইলে ॥

যেরূপ মুর্শিদ সেইরূপ রসুল যে ভজে সে হয় মকবুল।
সিরাজ শাঁই কয় লালন কি কুল পাবি মুর্শিদ না ভজিলে ॥

৭৪.
মকরুম বলে শাঁই রব্বান্না আমি আদম গড়ি কেমনে।
কোথা পাই তাঁর নকশা নমুনা আমি দেখিনি যা জীবনে ॥

আল্লাহ্ বলেন মকরুমেরে চেয়ে দেখো আরশ 'পরে।
সত্তর হাজার পর্দার আড়ে উঠলো ছবি গোপনে ॥

মকরুম বানালো দেহ সেথা বানাতে না পারে মাথা।
মোকাম মিমের গিলাফেতে ঢুকলো রুহ্ গোপনে ॥

গিলাফেতে ঢুকলো যখন আদমের ভেতরে ছিলো কোনজন।
লালন কয় তাঁর মাথার গঠন আমার মুর্শিদ বিনে কে জানে ॥

৭৫.
মদিনায় রসুল নামে কে এলোরে ভাই।
কায়াধারী হয়ে কেন তাঁর ছায়া নাই ॥

ছায়াহীন যাঁর কায়া ত্রিজগতে তাঁরই ছায়া।
এই কথাটির মর্ম লওয়া অবশ্যই চাই ॥

কী দেবো তুলনা তাঁরে খুঁজে পাইনে এ সংসারে।
মেঘে যাঁর ছায়া ধরে অত্যন্ত ধূপের সময় ॥

কায়ার শরিক ছায়া দেখি ছায়া নেই সে লা শরিকি।
লালন বলে তাঁর হকিকি বলিতে ডরাই ॥

৭৬.
মানবদেহের ভেদ জেনে করো সাধনা।
দেলকোরান না জানিলে আয়াতকোরান পড়লে কিছু হবে না ॥

মুণ্ডুতে মিম আলো হে জে মগজে ছিলো।
তে জেতে দুই কান জানা গেলো আইন গাইন দুই নয়না ॥

অধর যুগলে লাম মিম সর্বাঙ্গে আলিফের চিন।
আরো দুই বাহুতে সিন ছিন মুখেতে বে'র গঠনা ॥

লাম আলিফ নাসিকাখানি ছেতে দুইকণ্ঠ জানি।
জিমে হয় জেকেরের খনি হেতে হাড়ের গঠনা ॥

ফেতে ফাঁপরা পানি পুরা কাফেতে কলিজা ঘেরা।
আরো বড় কাফ নাভিতে মোড়া জেতে দমের ঠিকানা ॥

তোয়া জোয়া তিল্লিতে ছিলো সোয়াত দোয়াত হৃদে রাখিল।
নফসেতে নু হরফ হলো রূপেতে ভেদ যায় জানা ॥

টিমটে মারি হামজা ঘরে জেনে লও মুর্শিদের দ্বারে।
দাল জাল দুই জানুর পরে দলিলে তার নিশানা ॥

দশ হরফ সাধনের গতি সাধনে জ্বলে জ্ঞানের বাতি।
নিষ্ঠায় রেখো রতিমতি করো গুরু ভজনা ॥

লাহুত নাসুত মালকুত জবরুত ছয় লতিফা এইদেহে মজুদ।
লালন কয় দিয়েছে মাবুদ এই অজুদে কেন খোঁজো না ॥

৭৭.
মুখে পড়োরে সদাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।
আইন ভেজিলেন রসুলাল্লাহ্ ॥

লা ইলাহা নফি যে হয় ইল্লাল্লাহ সেই দ্বীন দয়াময়।
নফি এসবাত ইহারে কয় সেই তো এবাদতুল্লাহ ॥

লা শরিক জানিয়া তাঁকে পড়ো কালাম দেলে মুখে।
মুক্তি পাবি থাকবি সুখে দেখবিরে নূর তাজাল্লাহ ॥

নামের সহিত রূপ ধেয়ানে রাখিয়ে জপো।
বেনিশানায় যদি ডাকো চিনবি কি রূপ কে আল্লাহ ॥

বলেছেন শাঁই আল্লাহ নূরি এই জিকিরের দরজা ভারি।
সিরাজ শাঁই তাই কয় ফুকারি শোনরে লালন বেলিল্লাহ্ ॥

৭৮.

মোহাম্মদ মোস্তফা নবি প্রেমের রসুল।
যে নামে সব পাগলিনী জগত হয় আকুল ॥

ইশ্‌কে আল্লাহ্ ইশ্‌কে রসুল ইশ্‌কেতে হয় জগতের মূল।
ইশ্‌ক বিনা ভজনসাধন সবকিছু হয় ভুল ॥

গরিবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন আবদুল কাদের মহিউদ্দিন।
শাহ্ জালাল শাহ্ মাদার সকলে নেয় তাঁর চরণের ধূল ॥

কেয়ামত বিচারের দিনে আল্লাহ নেবে মোমিন চিনে।
সিরাজ শাঁই কয় প্রেমের গুণে লালন পাবি অকূলের কূল ॥

৭৯.

যেজন সাধকের মূলগোড়া।
বেতালিম বেমুরিদ সে যে ফিরছে সদাই বেদছাড়া ॥

গুপ্ত নূরে হয় তাঁর সৃজন গুপ্তভাবে করে ভ্রমণ।
নূরেতে নূরনবির গঠন সেই কথাটি দেশজোড়া ॥

পীরের পীর দস্তগীর হয় মুর্শিদের মুর্শিদ বলা যায়।
চিনতে যদি কেউ তাঁরে পায় সেই পাবে পথের গোড়া ॥

কেউ তারে কয় মূলাধরের মূল মুর্শিদ বিনে জানবে কি তার উল
লালন ভনে ভেদ না জেনে ঝকমারি তার বেদপড়া ॥

৮০.

রসুল কে চিনলে পরে খোদা পাওয়া যায়।
রূপ ভাঁড়ায়ে দেশ বেড়ায়ে গেলেন সেই দয়াময় ॥

জন্ম যাঁহার এই মানবে ছায়া তাঁর পড়ে নাই ভূমে।
দেখ দেখি তাই বর্তমানে কে এলো এই মদিনায় ॥

মাঠে ঘাটে রসুলেরে মেঘে রয় যে ছায়া ধরে।
জানতে হয় তা লেহাজ করে জীবের কি সেই দরজা হয় ॥

আহ্‌মদ নাম লিখিতে মিম হরফ কয় নফি করতে।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোকে কিঞ্চিৎ নজির দেখাই ॥

৮১.

রসুল কে তা চিনলে নারে।
রসুল পয়দা হলেন আল্লাহ্‌র নূরে ॥

রসুল মানুষ চিনলে পরে আল্লাহ্ তাঁরে দয়া করে।
দেল আরশে আল্লাহ্ নবি দু'জনাতে বিহার করে ॥

নয়নে না দেখলাম যাঁরে কী মতে ভজিব তাঁরে।
নিচের বালু না গুণিয়ে আকাশ ধরছো অন্ধকারে ॥

রসুল মানুষের সঙ্গ নিলে যম যাতনা যেতো দূরে।
লালন বলে রসুলেরে না চিনে পড়েছি ফ্যারে ॥

৮২.

রসুল যিনি নয়গো তিনি আবদুল্লাহ্‌র তনয়।
আগে বোঝো পরে মজো নইলে দলিল মিথ্যা হয় ॥

মোহাম্মদ আবদুল্লাহর ছেলে রজঃবীজে জন্ম নিলে।
আমেনাকে মা বলিলে প্রকাশ হলেন মদিনায় ॥

তাঁর চার সন্তান চার সন্ততি গণনা এই হলো সৃষ্টির বাসনা।
তিন বিবি হয় সৈয়দেনা এগারোটি বাদ পড়ে রয় ॥

মোহাম্মদ জন্মদাতা নবি হলেন ধর্মপিতা।
লালন বলে সৃষ্টির লতা আল্লাহতে মিশে রয় ॥

৮৩.

রসুল রসুল বলে ডাকি।
রসুল নাম নিলে পরম সুখে থাকি ॥

মক্কায় গিয়ে হজ করিয়ে রসুলের রূপ নাহি দেখি।
মদিনাতে গিয়ে দেখি রসুল মরেছে তাঁর রওজা এ কী ॥

কূল গেলো কলঙ্ক হলো আর দিতে কী আছে বাকি।
দ্বীনের রসুল মারা গেলে কেমন করে দুনিয়ায় থাকি ॥

হায়াতুল মুরসালিন বলে কোরানেতে লেখা দেখি।
সিরাজ শাঁই কয় অবোধ লালন রসুল চিনলে আখের পাবি ॥

৮৪.

রসুলের সব খলিফা কয় বিদায়কালে।
গায়েবি খবর আর কি পাবো তুমি আজ চলে গেলে ॥

কোরানের ভিতর সে তো মোকাত্তায়াত হরফ কতো।
মানে কও তার ভালমতো ফেলো না গোলে ॥

মহাপ্যাঁচ আইন তোমার বুঝে ওঠে কী সাধ্য কার।
কি করিতে কী করি আর সহি না বুঝলে ॥

আহাদ নামে কেন আপি মিম দিয়ে মিম করো নফি।
কী তার মর্ম কও নবিজি লালন তাই বলে ॥

কৃষ্ণলীলা

লীলাভূমিকা

কৃষ্ণদাশ পণ্ডিত ভালো
কৃষ্ণলীলার সীমা দিলো
তার পণ্ডিতী চূর্ণ হলো টুনটুনি এক পাখির কাছে।

বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যায়
অমনই আমার মন মনুরায়
লালন বলে কবে কোথায় এমন পাগল কে দেখেছে ॥

ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে কোনো হিন্দুপুরাণেই 'রাধা' নামক শব্দের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এ বাংলাদেশের বাংলাভাষারই কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে 'রাধা' নামক চরিত্র উদ্ভাবন করেন। এ রাধা নামটি মূলত কবিকল্পিত একটি রূপকল্প (Image) বা মূর্ত বিগ্রহ।

'কৃষ্ণ' নামক শব্দটি এসেছে প্রাচীন 'কর্ষণ'কর্ম থেকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মগত যতোগুলো কাহিনি, পুরাণ বা আখ্যান পাওয়া যায় তার সবই ভারতীয় কৃষি সভ্যতা লালিত গুরুদেবতারূপেরই প্রকাশ-বিকাশ।

'শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্তন' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যকীর্তন অনেকে পদকর্তাই করেছেন, যার আকর বা মূল উৎস হলো 'মহাভারত'। 'গীতগোবিন্দ' থেকে আরম্ভ করে কালে কালে অখণ্ড বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে অনেক সাহিত্যিকই 'শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্তন' করেছেন। সুফি-ফকির সাধক-মোহান্তগণ মোর্শেদমুখি যে প্রেমভক্তিভাব থেকে নবি-রসুলকীর্তন করেছেন সেই একই ভাবোদয় থেকে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও করেছেন। পরিশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের হাতে পড়ে তা আর এক রকম পরিণতি পায়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কৃষ্ণালীলার সাথে রাজনৈতিক শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ মহাভারত আখ্যানে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণরূপের সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণতর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে শক্তি ও শক্তিমানতত্ত্বে আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে রাধাকে 'শক্তি' বা 'প্রকৃতি' এবং শ্রীকৃষ্ণকে 'শক্তিমান' বা 'পুরুষ'–এমনতর দ্বৈতচরিত্রে একীভূত অর্থাৎ ভেদঅভেদতত্ত্ব ধারণায় প্রকাশ করেন। যদিও পুরাণে শক্তিতত্ত্বের যে সংজ্ঞা তথা বর্ণনা রয়েছে গৌড়ীয় শক্তিতত্ত্ব তা থেকে বহু যোজন দূরে অবস্থিত। পুরাণের শক্তি ও শক্তিমানতত্ত্ব অর্থাৎ শক্তিদেবীর যে ধারণা তার সাথে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কোনো মিলই নেই। আবার শ্রীচৈতন্যের রাধাকৃষ্ণময় যে ভক্তিভাব তার সাথে

ভারতীয় আদিভক্তিবাদের কোনোরূপ সম্বন্ধ নেই বললেই চলে। কারণ আদিভক্তিবাদ পুরোটাই রাজনৈতিক। গৌড়ীয় ভক্তিবাদ হলো ভাগবতধর্মের সরলীকৃত একটি পার্শ্বরূপ মাত্র। পৌরাণিক ধারণামূলক চরিত্রের বাইরে শ্রীকৃষ্ণের অতিমানবীয় চরিত্রের এক ধরনের মিথস্ক্রিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক দেবতা নন। বৈদিক ধর্মের পালনকর্তা হলেন বিষ্ণু। শ্রীকৃষ্ণের যে মূল গুণাগুণ আমরা পাই আদিতে অনার্য বা দ্রাবিড় দেবতা 'নারায়ণ'এর মধ্যে দেখি সেই চারিত্রলক্ষণ। প্রাচীন ভারতবর্ষে পারস্যের আর্য আগ্রাসনের ফলে 'নারায়ণ'দেবের উপাসক তথা নারায়ণী সম্প্রদায়ের গুণাবলি প্রথমে বৈদিক দেবতা 'বিষ্ণু' পরে 'শিব' নামের উপর আরোপ করা হয়। বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে নারায়ণের সাথে বিষ্ণু আর শিবের গুণাবলি আরোপিত হলো। যদিও নারায়ণী সম্প্রদায়ের বস্তুমুখি গুণাগুণ অর্থাৎ উৎপাদক ও উৎপাদনের মধ্যে প্রত্যক্ষ যে দৈহিক-মানসিক সম্বন্ধ আর সমন্বয় তার ঠিক বিপরীতেই আর্যশাসিত বৈদিক দেবতাদের গুণাগুণ অদৈহিকতায় পর্যবসিত করা হলো।

ভগবদ্গীতায় যিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্র। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দীর্ঘকালব্যাপী আর্যশাসন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে অনুপস্থিত থাকায় অর্থাৎ বৌদ্ধযুগ, পালযুগ, সেনযুগের পর সুলতানী ও মুঘল শাসনামলের রাজনৈতিক উত্থানপতনে রাজনৈতিক শ্রীকৃষ্ণের গুরুত্ব অনেকটাই ম্লান হয়ে পড়ে।

আর্য আমলে আদি নারায়ণী সম্পদায় যখন আক্রান্ত হয়ে পড়ে সে আক্রমণের বিরুদ্ধে অনার্য অর্থাৎ নারায়ণী সম্প্রদায় ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো। কিন্তু আর্যদের বৈদিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের দীর্ঘকালীন যুদ্ধ-বিগ্রহ আর নির্মম দমন-পীড়নের দ্বারা নারায়ণী সম্প্রদায় ক্রমে ক্ষমতাহারা-কোণঠাসা হয়ে পড়তে থাকে এবং পরিশেষে তারা বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাগবত সম্প্রদায়, সাত্বত সম্প্রদায় এবং পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়। ভাগবত সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম বৈদিক শাসন ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ফলে এদের হাত দিয়ে ভগবদ্গীতা প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ভাগবত সম্প্রদায়ের 'আদিভাগবত' ধর্ম বহু আগেই বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের আগ্রাসনে সম্পূর্ণ খারিজ হয়ে যায়। যার প্রকৃত গুণাগুণ কেবল বহাল থাকে পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে। পঞ্চরাত্র মানে পঞ্চজ্ঞান । 'রাত্র' অর্থ জ্ঞান। ভাগবত সম্প্রদায়কে প্রথমে আদি নারায়ণী সম্প্রদায়ই বলা হতো। এর দ্বারা কোনো একজন গুরুদেবতা ব্যক্তিত্বকে বোঝানো হতো না, বোঝানো হতো একটি সামাজিক সমতাভিত্তিক গোষ্ঠীবদ্ধ সম্প্রদায়কে। 'ভগবত' অর্থ 'যারা ভাগ পায়' অথবা 'যাদের ভাগ করে দেয়া হয়েছে' অথবা 'যে সামগ্রিকতা থেকে অংশ পায়'। এ অভেদ সম্বন্ধ 'যে দেয় এবং যে নেয়'–এ উভয়ার্থেকে নারায়ণের সাথে এক করে আমরা দেখতে পাই। নর+আয়ণ=নারায়ণ। 'নর' অর্থ মানুষ এবং

'আয়ণ' অর্থ স্থান। অর্থাৎ মানুষ বা নর যে জায়গায় যায় অথবা যে জায়গার ভাগ পায় তাকেই ভাগবত বলা হয়।

ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের যে ভক্তিবাদ তা বস্তু তথা রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ভাববাদমাত্র। বস্তুকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণের মহাভারতীয় যে পূর্বপরিচয় তা ইতিমধ্যে ভূলুণ্ঠিত। যে কারণে 'ভক্তি' শব্দটি নির্বস্তুক করার মধ্য দিয়ে মূলত যে লীলাচক্র গড়ে ওঠে তাকেই আমরা শ্রীচৈতন্যের 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' বলতে পারি। পূর্বভাবে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণই রাধাকে আলম্বন করছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবে এসে দেখা যায়, খোদ শ্রীচৈতন্য রাধা চরিত্র ধারণ করে কৃষ্ণকেই উল্টো আলম্বন করছেন।

নির্বস্তুক শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র ভাগবত আখ্যানে চরিত্রায়েণের মাধ্যমে একদিকে বৈদিক-রাজনৈতিক শ্রীকৃষ্ণের আধিপত্য বহাল থাকে। অপরদিকে ভাগবত ধর্মের ভক্তিবাদ এবং আদি নারায়ণী সম্প্রদায়ের ভক্তিবাদ থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদকে একটি বিচ্ছিন্ন বা ভিন্নতর চরিত্র দান করে। কালক্রমে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদ বস্তুকে অবলম্বন না করায় ভাগবদ্গীতার কৃষ্ণচরিত্রই শেষ পর্যন্ত গৌড়ীয় ভক্তিবাদকে আত্তীকরণ করে ফেলে। এখানেই ফকির লালন শাহর ব্যতিক্রমী সুরটি আমরা শুনতে পাই তাঁর শ্রীকৃষ্ণলীলায়।

ফকির লালন শাহ কখনো শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের রূপকাল্পিক ধারণাতন্ত্রের ভেতর থেকে দেখেননি। আবার শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় রাধাভাবে আকুল হয়েও শাঁইজি দেখেননি। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছেন সেই 'আদিধরন'টির মধ্য দিয়ে যে পর্যায়ে কবিকল্পিত শ্রীকৃষ্ণের কিংবা বৈদিক শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূণটিও যেখানে জন্মায়নি তেমন শূন্য পর্যায় থেকে। তিনি দেখলেন সেই বিন্দুটি থেকে যেখানে মানুষের দৈহিক ইন্দ্রিয়ের সাথে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যকার অভেদ সম্বন্ধসূত্র অটুট থাকে সর্বকালে। কী সেই সম্বন্ধ? ফকির লালন বলছেন:

অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি তাঁর কী আছে কভু গোষ্ঠখেলা।
ব্রহ্মরূপে সে অটলে বসে লীলাকারি তাঁর অংশকলা ॥

শাঁইজি 'অনাদির আদি' বলতে কী বোঝান? মানব সভ্যতার সেই আদিধরন মানে নারায়ণী সাম্যধর্ম যেখানে উৎপাদক ও উৎপাদনের মধ্যে কোনো মধ্যসত্ত্বভোগীর অস্তিত্বই থাকে না। বস্তু তথা উৎপাদনের বিপরীতে মালিক বা উৎপাদকের মধ্যবর্তী দেয়াল বা মুদ্রা মানে টাকার মতো মধ্যসত্ত্বভোগীর অস্তিত্ব আজকের বাজার ব্যবস্থায় মাধ্যমরূপে কঠিন বিভাজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারায়ণী অনাদি উৎপাদন ব্যবস্থায় কোনোরূপ মধ্যসত্ত্বভোগীর অস্তিত্বই থাকে না। যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীভূমির উৎপাদনমুখিতার মধ্যে কোনো বিভাজনরেখা

নেই। এ কারণেই শাঁইজির প্রশ্ন 'তাঁর কি আছে কভু গোষ্ঠখেলা'। 'গো' শব্দটির অনেক অর্থ থেকে আমরা মূলত দুটি ভাবার্থ খুঁজে নিতে পারি; যথা:

১. গো = ইন্দ্রিয়
২. গো = সূর্য

অখণ্ড নিয়মে সূর্যের উদয়বিলয় প্রকৃতির উপর তার কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার ভূপৃষ্ঠে প্রত্যক্ষ উৎপাদন সম্পর্কেরই প্রমাণ। ফকির লালন শাঁইজি এই সৃষ্টি-স্রষ্টার প্রত্যক্ষ সম্পর্কেরও অনেক উপরে স্থাপন করেছেন শ্রীকৃষ্ণকে। কেন না উদয়ের সাথেই বিলয়ের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত, যেমন উৎপাদনের সাথে অনুৎপাদনের সম্পর্ক এবং বিচ্ছিন্নতা বা বন্ধ্যাত্বও। এ হলো মানুষের চিন্তার সেই আদিধরন যে ধরন উৎপাদন, ভোগ এবং তার বিস্তার প্রক্রিয়ার একটি পূর্বাবস্থা। যে অবস্থা উদয়বিলয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়, নিরপেক্ষ বা The No বা লা মোকাম অবস্থা। মানসিক সেই মোহশূন্য অবস্থাকে ঠিক অর্থে ধারণ না করতে পারার কারণে বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের ভ্রান্তি সম্বন্ধেও শাঁইজি সম্পূর্ণ সজাগ।

৮৫.

অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি তাঁর কি আছে কভু গোষ্ঠখেলা।
ব্রহ্মরূপে সে অটলে বসে লীলাকারি তাঁর অংশকলা ॥

সত্য সত্য সরল বৃহদাগমে কয় সচ্চিদানন্দ রূপ পূর্ণব্রহ্ম হয়।
জন্মমৃত্যু যাঁর এই ভবের 'পর সে তো নয় কভু স্বয়ং নন্দলালা ॥

পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ রসিক যেজন শক্তিতে উদয় শক্তিতে সৃজন।
মহাভাবে সর্বচিত্ত আকর্ষণ বৃহদাগমে তাঁরে বিষ্ণু বলা ॥

গুরু কৃপাবলে কোনো ভাগ্যবান দেখেছে সে রূপ পেয়ে চক্ষুদান।
সেরূপ নিহারী সদা যে অজ্ঞান লালন বলে সে তো প্রেমেতে ভোলা ॥

৮৬.

আজ কী দেখতে এলি গো তোরা বল না তাই।
ওর আর সে কানাই নাই নন্দের ঘরে সে ভাবও নাই ॥

কানাই হেন ধন হারিয়ে আছি সদাই হত হয়ে।
বলরে কোনদেশে গেলে আমি সে নীলরতন পাই ॥

ধনধরা গজবাজি তাতে মন না হয় রাজি।
ওরে আমার কানাইলালের জন্যে প্রাণ আকুল সদাই ॥

কী হবে অন্তিমকালে সে কথাটি রইলাম ভুলে।
অধীন লালন কয় এ মায়াজাল কাটার কী উপায় ॥

৮৭.

আজ ব্রজপুরে কোন পথে যাই ওরে বলরে তাই।
আমার সাথের সাথী আর কেহ নাই ওরে কেহই নাই ॥

কোথা রাধে কোথা কৃষ্ণধন কোথারে তার সব সখীগণ।
আর কতোদিনে চলিলে সে চরণ পাই ॥

যাঁর লেগে মুড়ি এহি মাথা তাঁরে পেলে যায় মনের ব্যথা।
কী সাধনে সে চরণে পাইব ঠাঁই ॥

তোরা যতো স্বরূপগণেতে বর দে গো কৃষ্ণচরণ পাই যাতে।
অধীন লালন বলে কৃষ্ণলীলের অন্ত নাই ॥

৮৮.

আমার মনের মানুষ নাই যেদেশে সেদেশে আর কেমনে থাকি।
সখী এদেশেতে ঝরে আমার আঁখি ॥

দেশের লোকের মন ভালো না কৃষ্ণের কথা কইতে দেয় না।
সদাই আমার মন উতালা ঘরে মন কেমনে রাখি ॥

জানো নারে প্রাণ গোবিন্দ আমার হইল কপাল মন্দ।
প্রাণ করছে উড়ু উড়ু হায় কী করি
লালন বলে আপন ভুলে প'লাম পরের চোখই ॥

৮৯.
আমি কার ছায়ায় দাঁড়াই বলো।
হায়রে বিধি মোর কপালে কি ইহাই ছিলো ॥

কালার রূপে নয়ন দিয়ে প্রেমানলে ম'লাম জ্বলে।
ওরে বিধি এ কী হলো আমার কাঁদতে কাঁদতে জনম গেলো ॥

জগতে হয় যতো ব্যাধি নিদানে হয় তাহার বিধি।
আমার এ ব্যাধির নাই আর ঔষধই প্রাণের বন্ধু কোথায় রইল ॥

প্রাণের মানুষ কোথায় লুকালো আর আমার লাগে না ভালো
আমার দেহলতা দিনে দিনে শুকাইল
ফকির লালন বলে রাধার কপাল ভালো ॥

৯০.
আমি যাঁর ভাবে আজ মুড়েছি মাথা।
সে জানে আর আমি জানি আর কে জানে মনের কথা ॥

মনের মানুষ রাখবো মনে বলবো না তা কারো সনে।
ঋণ শুধিব কতোদিনে মনে সদাই সেহি চিন্তা ॥

সুখের কথা বোঝে সুখী দুঃখের কথা বোঝে দুঃখী।
পাগল বিনে পাগলের কি বোঝে মনের ব্যথা ॥

যারে ছিদাম যা তুইরে ভাই আমার বদ্‌হাল শুনে কাজ নাই।
বিনয় করে বলছে কানাই লালন পদে রচে তা ॥

৯১.
আর আমারে মারিসনে মা।
বলি মা তোর চরণ ধরে ননী চুরি আর করবো না ॥

ননীর জন্যে আজ আমারে মারলি গো মা বেঁধে ধরে
দয়া নাই মা তোর অন্তরে স্বপ্নেতে গেলো জানা ॥

পরে মারে পরের ছেলে কেঁদে যেয়ে মাকে বলে।
মা জননী নিঠুর হলে কে বোঝে শিশুর বেদনা ॥

ছেড়ে দে মা হাতের বাঁধন যায় যেদিক এই দুনয়ন মন।
পরের মাকে ডাকবে এখন লালন তোর গৃহে আর থাকবে না ॥

৯২.
আর আমায় কালার কথা বলো না।
ঠেকে শিখলাম কালারূপ আর হেরবো না ॥

যেমন ও কালা ওর মনও কালা
ওর প্রেমের এই শিক্ষে বেড়ায় ব্যঞ্জন চেখে লজ্জা করে না ॥

এক মন কয় জায়গায় বিকায়
লজ্জায় মরে যাই অমন প্রেম আর করবো না ॥

যেমন চন্দ্রাবলি তেমন রাখাল অলি থাকে দুজনা
শুনে রাধার বোল লালনের বোল সরে না ॥

৯৩.
আর আমায় বলিস নারে শ্রীদাম ব্রজের কথা।
যার কারণে পেয়েছিরে ভাই প্রাণে ব্যথা ॥

ছিলো মনের তিনটি বাঞ্ছা
নদীয়ায় সাধবো আছে ইচ্ছা প্রেমঋণে গাঁথা
সেই কারণে নদে ভুবনে জাগে হৃদয়লতা ॥

ছিদামরে ভাই বলি তোরে
ফিরে যা ভাই আপন ঘরে কে বোঝে এই প্রাণের ব্যথা
মনের কথা প্রাণের ব্যথা আর বলবো না তা ॥

যার কারণে বইরে বাদা
শোন বলিরে ছিদাম দাদা ও সে নন্দপিতা
তাই ভেবে বলছে লালন ধন্যরে যশোদা ॥

৯৪.
আর কতোকাল আমায় কাঁদাবি ও রাইকিশোরী।
আমি তো তোমার চরণের অনুগত ভিখারি ॥

ও রাই তোমার জন্যে গোলোক ছেড়েছি
সকল ছাড়িয়ে মানবদেহ ধরেছি আর কী বাকি আছেরে
এ ভাব করিয়ে স্মরণ তুমি দাও হে চরণ আপাততঃ প্রাণ শীতল করি ॥

বনে বনে ধেনু চরায় কে বা রাই
তোমার চন্দ্রবদন হেরিব মনে অন্য আশা নাই ঐ রূপ জাগে যখন অন্তরে
তখন উদাস মনে ঘুরি বনে বনে আবার মুগ্ধমনে বাজাই বাঁশরী ॥

তোমার পদে সব সঁপেছি কী আর বাকি রেখেছি
নিজহাতে দাসখত লিখে দিয়েছি তাইতে বলি তোমারে
লালন ভনে ললিতা বিশাখা বিহনে তুই তারে পায় ধরালি প্যারী ॥

৯৫.

আর কি আসবে সেই কেলেশশী এই গোকুলে।
তাঁরে চেনে না গোকুলবাসী কী ভোলে ॥

ননীচোরা বলে অমনি করে বাঁধে নন্দরাণী।
নানারূপ অপমানি করিলে ॥

অনাদির আদি গোবিন্দ তাঁরে রাখাল বানায় নন্দ।
আরো রাখালগণ তাঁর স্কন্ধে চড়িলে ॥

হারালে চায় পেলে লয় না ভবজীবের ভ্রান্তি যায় না।
লালন কয় দৃষ্ট হয় না এই নরলীলে ॥

৯৬.

আর তো কালার সে ভাব নেইকো সই।
সে না ত্যাজিয়ে মদন প্রেমপাথারে খেলছে সদাই প্রেমঝাঁপুই ॥

অগুরু চন্দন ভূষিত সদাই সেই কালাচাঁদ ধুলায় লুটায়।
থেকে থেকে বলছে সদাই শাঁই দরদী কই গো কই ॥

সংসার বৃদ্ধি আদি যার আঁচলা ঝোলা গেরুয়া কৌপিন সার।
প্রভু শেষলীলা করিলেন প্রচার আনকা আইন দেখ না ঐ ॥

বেদবিধি ত্যাজিয়ে দয়াময় কী নতুন ভাব আনলেন নদীয়ায়।
অধীন লালন বলে আমি সে তো ভাব জানিবার যোগ্য নই ॥

৯৭.

এ কী লীলে মানুষলীলে দেখি গোকুলে।
হরি নন্দ ঘোষের বাদা মাথায় নিলে ॥

রাখালের উচ্ছিষ্ট খায় একদিন ব্রহ্মা দেখতে পায়।
তাতে রুষ্ট হয় ভারি ধেনুবৎস হরে লয় পাতালে ॥

কোন প্রেমে সে দীন দয়াময় নারীর চরণ নিলো মাথায়।
লীলা চমৎকার বোঝা হলো ভার অপার হয়ে অধীন লালন বলে ॥

৯৮.
এখন কেনে কাঁদছো রাধে নির্জনে।
ও রাধে সেকালে মান করেছিলে সে কথা তোর নাই মনে ॥

ও রাধে কেনে করো মান ও কুঞ্জে আসে না যে শ্যাম
জলে আগুন দিতে পারি বৃন্দে আমার নাম
ও রাধে হাত ধরে প্রাণ সপেঁছিলে কেমনে ॥

চলো আমরা সব সখী মিলে একটি বনফুল তুলে
বিনে সূতায় মালা গেঁথে দেবো শ্যামের গলে
লালন কয় শ্যাম হয়ে বসবো রাধার ডানে ॥

৯৯.
এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে কে বা না মজেছে সখী।
কারো কথা কেউ বলে না আমি একা হই কলঙ্কী ॥

অনেকেতে প্রেম করে এমন দশা ঘটে কারে।
গঞ্জনা দেয় ঘরেপরে শ্যামের পদে দিয়ে আঁখি ॥

তলে তলে তলগোজা খায় লোকের কাছে সতী কওলায়।
এমন সৎ অনেক পাওয়া যায় সদর যে হয় সেই পাতকী ॥

অনুরাগী রসিক হলে সে কি ডরায় কুল নাশিলে।
লালন বেড়ায় ফুচকি খেলে ঘোমটা দিয়ে চায় আড়চোখি ॥

১০০.
ঐ কালার কথা কেন বলো আজ আমায়।
যার নাম শুনলে আগুন জ্বলে অঙ্গ জ্বলে যায় ॥

তুমি বৃন্দে নামটি ধরো জলে অনল দিতে পারো।
রাধাকে ভোলাতে তোর এবার বুঝি কঠিন হয় ॥

যে কৃষ্ণ রাখাল অলি তাঁরে ভোলায় চন্দ্রাবলি।
সে কথা আর কারে বলি ঘৃণায় আমার জীবন যায় ॥

শতেক হাঁড়ির ব্যঞ্জন চাখা রাই বলে ধিক তারে দেখা
লালন বলে এবার বাঁকা সোজা হবে মানের দায় ॥

১০১.
ওগো বৃন্দে ললিতে।
আমি কৃষ্ণহারা হলাম জগতে ॥

ও সখীরে চলো চলো বনে যাই
বন্ধুর দেখা নাই বৃন্দাবন আছে কতো দূরে
ছাড়িয়া ভবের মায়া দেহ করিলাম পদছায়া
ললিতে তাঁর পায়ের ধ্বনি শুনিতে ॥

আগে সখী পিছে সখী
শত শত সখী দেখি সব সখীর কর্ণে দেখি সোনা
নদীর কূলে বাজায় বাঁশি কপালি তিল তুলসী
রাধিকার বন্ধু হয় কোনজনেতে ॥

বনের পশু যারা
আমার থেকে ভালো তারা সঙ্গে লয়ে থাকে আপন পতিরে
তারা পতির সঙ্গে করে আহার পতির সঙ্গে করে বিহার
লালন বলে মজে থাকো আপনার পিরিতে ॥

১০২.
ওগো রাইসাগরে নামলো শ্যামরাই।
তোরা ধর গো হরি ভেসে যায় ॥

রাইপ্রেমের তরঙ্গ ভারি
তাতে ঠাঁই দিতে কি পারবেন হরি
ছেড়ে রাজত্ব প্রেমে উন্মত্ত কৃষ্ণের ছিন্ন কাঁথা উড়ে গায় ॥

চার যুগেতে ঐ কেলেসোনা
তবু শ্রীরাধার দাস হতে পারলো না
যদি হতো দাস যেতো অভিলাষ তবে আসবে কেন নদীয়ায় ॥

তিনটি বাঞ্ছা অভিলাষ করে
হরি জন্ম নিলেন শচীর উদরে
সিরাজ শাঁইর বচন ভেবে কয় লালন সে ভাব জানলে প্রেমের রসিক হয়

১০৩.
ও প্রেম আর আমার ভালো লাগে না।
তোমার প্রেমের দায়ে জেল খাটিলাম তবু ঋণশোধ হলো না ॥

একদিন তো গিয়েছিলাম সেই যমুনার ঘাটে
কতো কথা মনে প'লো গো পথে
আমি রাধে সারানিশি কাঁদিয়া বেড়াই তবু তো দেখা দিলে না ॥

তোমার সঙ্গে প্রেম করিয়ে হলো জ্বালা
সে প্রেমের জন্যে গাঁথিলাম বিনে সূতার মালা
প্রেম বিলায় কি ছালা ছালা সেটা মনে থাকে না ॥

সে প্রেমের মূল্য দিতে কুলমান যায়
তারে বুঝি গো রাখা হলো দায়
তাই লালন কয় শ্যামরাইয়ের প্রেম বুঝি আর হলো না ॥

১০৪.
করে কামসাগরে এই কামনা।
দান করিয়ে মধু কুলের কুলবঁধূ পেয়েছে বঁধু কেলেসোনা ॥

করে কঠোর ব্রত ক্ষীরোদার কূলে কুল ভাসিয়ে দিয়েছে অকুলে
সেই কুলের কাঁটা করিলে যে কুলটা
গোপীকুলের যতো ব্রজাঙ্গনা ॥

গেলো গেলো কুল করিলে ভুল অকুল পাথারে ভাসায়ে দুকুল
কেঁদে হয় আকুল পেলো না সে কুল
কুলে এসে কুল ধ্বংস করো না ॥

করিয়ে ঘটা বাঁধাইলে যে ল্যাটা এখন সবাই মা'র তোরে ঝাঁটা
তাই লালন ভনে মরেছে বঁধু নিজগুণে
কুল ভেঙে অকুলে যেয়ে করলো মহাঘটনা ॥

১০৫.
কাজ নাই আমার দেখে দশা।
ব্রজের যতো ভালবাসা সার হলো যাওয়াআসা ॥

পরনেতে পরিব কৌপিন অঙ্গেতে চৈতন্যের চিন।
কাঁদি আমি ঐদিন বলে মনে আমার বড় বাঞ্ছা ॥

কেউ কারো সঙ্গে না যাবে সঙ্গের সাথী করে লবে।
এলামরে নদীয়ার ভাবে খেলবো এবার প্রেমের পাশা ॥

ভুলি নাই ভাই ওরে ছিদাম সকল কথা তোরে কইলাম।
লালন বলে নদেয় এলাম হইনে যেন নৈরাশা ॥

১০৬.
কানাই একবার ব্রজের দশা দেখে যারে।
তোর মা যশোদা কী হালে আছেরে ॥

শোকে তোর পিতা নন্দ কেঁদে কেঁদে হলো অন্ধ
গোপীগণ সব হয়ে ধন্ধ রয়েছে হারে ॥

বালক বৃদ্ধ-যুবাদি নিরানন্দ নিরবধি।
না দেখে চরণনিধি তোরেরে ॥

না শুনে তোর বাঁশির তান পশুপাখি উচাটন।
লালন বলে ছিদাম হেন বিনয় করে ॥

১০৭.
কার ভাবে এ ভাব তোরে জীবন কানাই।
করে বাঁশি নাই মাথে চূড়া নাই ॥

ক্ষীর সর ননী খেতে বাঁশিটি সদাই বাজাতে।
কী অসুখ পেলে তাতে ফকির হলি ভাই ॥

অগুরু চন্দনাদি মাখিতে নিরবধি।
সেই অঙ্গ ধূলায় অদ্ভুতই এখন দেখতে পাই ॥

বৃন্দাবন যথার্থ বন তুই বিনে হলোরে এখন।
মানুষলীলা করবে কোনজন লালন ভাবে তাই ॥

১০৮.
কার ভাবে এ ভাব হারে জীবন কানাই।
রাজরাজ্য ছেড়ে কেন বেহাল দেখতে পাই ॥

ভেবে তোর ভাব বুঝিতে নারি
আজ কিসের কাঙ্গাল আমার অটল বিহারী
ছিলো অগুরু চন্দন যে অঙ্গে ভূষণ
সে অঙ্গ আজ কেন লুণ্ঠিত ধূলায় ॥

ব্রহ্মাণ্ড ভাবুক যাঁরে ভাবিয়ে
আজ সে ভাবুক কার ভাব লয়ে

এ কী অসম্ভব ভাবনা সম্ভবে কোনজনা
মরি মরি ভাবের বলিহারি যাই ॥

অনুভাবে ভেবে কতোই করি সার
শ্যামচাঁদের উত্তম কী চাঁদ আছে আর
করে চাঁদে চাঁদহরণ সেই বা কেমন
ভক্তিবিহীন লালন বসে ভাবে তাই ॥

১০৯.
কালা বলে দিন ফুরালো ডুবে এলো বেলা।
সদায় বলো কালা কালা॥

কালা কালা বলে কেন হয়েছে উতালা।
গোপনে সে গাঁথে মালা,প্রকাশিলে জ্বালা ॥

ও কালাতো কালা নয় ঐ কালার কীরূপ হয়
কৃষ্ণকালা কেন ভুলে রইলে ও রে মনভোলা ॥

সে কালা তো জন্ম লয় না দেবকীর ঘরে,
ষোলোশো গোপিনীলীলা নাহি করে থাকে সে একেলা ॥

কালা মহাগুণমণি চৌদ্দ হাতে শস্ত্রপাণি
যে জানে সেই গুণবাখানি কালাকালে সেই তো কালা ॥

মথুরায় হয় কৃষ্ণ রাজা অর্জুন তাঁহারই প্রজা।
সুভদ্রা ভগ্নী তাহার, অভিমন্যুর কেমন জ্বালা ॥

কালার ঘরে বাতি জ্বলে অন্ধকার হয় উজালা।
ফকির লালন বলে সে কালার নাম আসলে লা শরিকালা।'

১১০.
কালো ভালো নয় বা কিসে বলো সবে।
বিচার করে দেখতে গেলে কালোই ভালো বলবে শেষে

কৃষ্ণ ছিলো গৌরবরণ বুকে দেখো কালীর চরণ।
সোনাবরণ লক্ষ্মী ঠাকুরিনী বিষ্ণুর চরণ টিপিতেছে ॥

কালো পাঠার মাংস ভালো দুধ ভালো গাই হলে কালো।
আবার দেখো কালো কোকিল মধুবতানে কুহু কুহু ডাকিতেছে

কালো চুলে শোভে নারী সাদা হলে হয় সে বুড়ি।
লালন বলে রসের বুড়ো দেখো সাদা চুলে কলপ ঘসে ॥

১১১.
কী ছার মানে মজে কৃষ্ণধনকে চেনো না।
থাক থাক ওগো প্যারী দুদিন বাদে যাবে জানা ॥

কৃষ্ণেরে কাঁদালে যতো তুমিও কাঁদিবে ততো।
ধারা শোধ চিরদিন তো প্রচলিত আছে কিনা ॥

যখন বলবে কোথায় হরি এনে দে গো সহচারী।
তখন যে সাধলাম প্যারী তা কি মনে জানো না ॥

বাড়াবাড়ি হইলে ক্রমে কুঘটেতে আটক নযকর্মে।
লালন কয় পাষাণ ঘাম্মে শুনে বৃন্দের বন্দনা ॥

১১২.
কী ছাব রাজত্ব করি।
গোপাল হেন পুত্র আমার অক্রুর এসে করলো চুরি ॥

মিছে রাজা নামটি আছে লক্ষ্মী সে তো গা তুলেছে।
যে হতে গোপাল গিয়েছে সেই হতে অন্ধকার পুরী ॥

শোকানলে চিত্ত মাঝার কার বা বাড়ি কার বা ঘর।
একা পুত্র গোপাল আমার করে গেলো শূন্যাকারি ॥

নন্দ যশোদার ছিলো অক্রুর মুনি বিষম কালো।
প্রাপ্ত কৃষ্ণ হরে নিলো লালন কয় এ দুঃখ ভারি ॥

১১৩.
কৃষ্ণপ্রেমের পোড়াদেহ কী দিয়ে জুড়াই বলো সখী।
কে বুঝিবে অন্তরের ব্যথা কে মোছাবে আঁখি ॥

যেদেশে গেছে বন্ধু কালা
সেদেশে যাবো নিয়ে ফুলের মালা
আমি ঘুরবো নগর গায়ে যোগিনী বেশে
সুখ নাই যে মনে গো সখী ॥

তোমরা যদি দেখে থাকো কালারে
বলে দাও গো তাঁর খবর আমারে
নইলে আমি প্রাণ ত্যাজিব যমুনার জলে
কালাচাঁদ করে গেলো আমায় একাকী ॥

কালাচাঁদকে হারায়ে হলাম যোগিনী
কতো দিবানিশি গেলো কেমনে জুড়াই প্রাণই
ল্যালন বলে কর্মদোষে না পেলে রাই
কালার যুগল চরণ কেঁদে হবে কী ॥

১১৪.
কৃষ্ণ বলে শোন লো গোপীগণ।
তোদের বসন চুরি করি কী কারণ আমার শর্ত করো না পালন ॥

এখন কেন করো ছলনা রাধে তোমার বসন দেবো না।
তোমার মধ্যে আছে শ্রীমতি শোনো কি গতিতে হবে মিলন ॥

প্রেমে মত্ত হয়েছি তাতে তুমি যারে পারো মিলাতে।
শোন লো বৃন্দেদ্যুতি যার বসন তাকে দেবো খুশি হলে মন ॥

গোপীরা যখন উলঙ্গিনী হয় তাই কি আর প্রাণে সয়।
ময়ূর যেমন মেঘ দেখে খুশি হয় তেমনি খুশি কৃষ্ণ হয় রচে লালন ॥

১১৫.
কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগী।
সেই বটে শুদ্ধ অনুরাগী ॥

মেঘের জল বিনে চাতক যেমন অন্যজলের নহে ভোগী।
তেমনই কৃষ্ণভক্তজন একান্ত কৈট মনে কৃষ্ণের লাগি ॥

স্বর্গসুখ নাহি চায় সে মিশিতে না চায় সাযুজ্যে।
তাঁর ভাবে সে বুঝায় স্পষ্ট কেবল কৃষ্ণসুখের সুখী ॥

কৃষ্ণপ্রেম যার অন্তরে তার কী করণ সেই তা জানে।
অধীন লালন বলে আমার সুখৈশ্বর্য কারবার মন বিবাগী ॥

১১৬.
কে বোঝে কৃষ্ণের অপার লীলে।
ব্রজ ছেড়ে কে মথুরায় রাজা হলে ॥

কৃষ্ণ রাধা ছাড়া তিলার্ধ নয় ভারতপুরাণে তাই কয়।
তবে কেন ধনী দুর্জয় বিচ্ছেদে জগত জানালে ॥

নিগম খবর জানা গেলো কৃষ্ণ হতে রাধা হলো।
তবে কেন এমন হলো আগে রাধা পিছে কৃষ্ণ বলে ॥

সবে বলে অটল হরি সে কেন হয় দণ্ডধারি।
কিসের অভাব তাঁরই ঐ ভাবনা ভেবে ঠিক না মেলে ॥

কৃষ্ণলীলার লীলা অথৈ থৈ দেবে কেউ সে সাধ্য নাই।
কি ভাবিয়ে কী করে যাই লালন বলে প'লাম বিষম ভোলে ॥

১১৭.
গোপালকে আজ মারলি গো মা কোন পরানে।
সে কি সামান্য ছেলে তাই ভাবলি মনে ॥

দেবের দুর্লভ গোপাল চিনে না যার ফ্যারের কপাল।
যে চরণ আশায় শ্মশানবাসী হয় দেবাদিদেব শিব পঞ্চাননে ॥

একদিন যার ধেনু হরে নিলো ব্রহ্মা পাতালপুরে।
তাতে ব্রহ্মা দোষী হয় সবাই জানতে পায় তুমি জানো না এই বৃন্দাবনে ॥

যোগেন্দ্র মহেন্দ্রাদি যোগসাধনে না পায় নিধি।
সেই কৃষ্ণধন তোমারই পালন লালন বলে এ কী ঘোর এখানে ॥

১১৮.
চেনে না যশোদারাণী।
গোপাল কি সামান্য ছেলে ধ্যানে যারে পায় না মুনি ॥

একদিন চরণ ঘেমেছিল তাইতে মন্দাকিনী হলো।
পাপহরা সুশীতল সে মধুর চরণ দুখানি ॥

বিজলী বাঞ্ছিত সে ধন মানুষরূপে এই বৃন্দাবন।
জানে যতো রসিক সুজন সে কালার গুণখানি ॥

দেবের দুর্লভ গোপাল ব্রহ্মা তাঁর হরিল গোপাল।
লালন বলে আবার গোপাল কীর্তি গোপাল করলে শুনি ॥

১১৯.
ছিঃ ছিঃ লজ্জায় প্রাণ বাঁচে না।
ভরা কলসের জল ঢলে যেন পড়ে না ॥

রাধে লো তোরে করিরে মানা কদমতলায় আর যেও না।
কদমতলা গেলে তোমার বসন আর থোবে না ॥

রাধে লো তোরে করিরে মানা কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করো না।
কৃষ্ণের সঙ্গে করলে প্রেম সর্বসখী গছবে না ॥

রাধে লো তোরে করিরে মানা কালার সঙ্গে কথা বলো না।
লালন বলে সর্বাঙ্গ বেঁধে দেবে তোমায় ছাড়বে না ॥

১২০.
জয়কেতে শ্যাম দাঁড়িয়ে কেন কৃষ্ণপানে চেয়ে।
সকাল বেলা ওঁকে ছুঁয়ে কে মরিবে নেয়ে ॥

যে ডাকে যায় তারই কাছে বেড়ায় গোপা নেচে নেচে
আর কি উহার গোপন আছে গেছে এঁটো হয়ে
এঁটোপাতা কে চেটে খাবে কোন হায়াতে মেয়ে ॥

ধনী বলে ও ললিতে বল গে ওকে উঠে যেতে
কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে লাজের মাথা খেয়ে
আমরা জায়গায় ছড়াকাঠি দিয়ে আনি যে বয়ে ॥

আমার হাড় করেছে কালি চাইলে উহার রূপের ডালি
লয়ে যাক চন্দ্রাবলি খাবে ধুয়ে ধুয়ে
লালন বলে সকালবেলা ভাসিয়ে তরী ম'লাম বটে বেয়ে ॥

১২১.
তাঁরে কি আর ভুলতে পারি আমার এই মনে দিয়েছি মন যে চরণে।
যেদিকে ফিরি সেদিকে হেরি ঐ রূপের মাধুরী দুই নয়নে ॥

তোরা বলিস চিরকালো কালো নয় সে চাঁদের আলো
সে-ই কালাচাঁদ নাই আর এমন চাঁদ
সে চাঁদের তুলনা তাঁরই সনে ॥

দেবাদিদেব শিবভোলা তাঁর গুরু সেই চিকনকালা
তোরা বলিস চিরকাল তাঁরে গোরাখাল
কেমন রাখাল জান গে বেদ-পুরাণে ॥

সাধে কি মজেছে রাধে সেই কালার প্রেমফাঁদে
সে ভাব তোরা কী জানবি বললে কি মানবি
লালন বলে শ্যামের গুণ গোপীরাই জানে ॥

১২২.
তুমি যাবে কিনা যাবে হরি জানতে এসেছি তাই।
ব্রজ হতে তোমায় নিতে পাঠিয়েছেন রাই ॥

শাল পাগড়ি মাথায় দিয়ে মথুরাতে রাজা হয়ে।
তুমি আছো ভুলে কুব্জারে পেয়ে শ্রীরাধার কথা মনে নাই ॥

আমি বৃন্দে নামটি ধরি তুমি যাবে কিনা যাবে হরি।
তোমার হাতে দিয়ে প্রেমডুরি বেঁধে নেবো হায় ॥

রাইপ্রেমের তরঙ্গ ভারি ফকির লালন বলে আহা মরি
হরি আর শাঁইয়ের মাঝে কোনো তফাৎ নাই ॥

১২৩.
তোমা ছাড়া বলো কবে রাই।
সেই কারণ্যলোভে ভেসেছিলাম একাই ॥

সঙ্গ লয়ে হে তোমারই তুমি হবে আমার আধারী।
মনে তোমারই স্মরণ করি বটপত্ররূপে ভেসেছিলাম তাই ॥

তোমারই কারণে গোষ্ঠে গোচারণে নন্দের বাদা বয়ে মাথায়।
সদাই বলি মনের সুখে জয় জয় রাধে বৃন্দাবনে সদা বাঁশি বাজাই ॥

পরেতে গোলোকে পরম পুলকে মহারাসলীলা করি দুইজনে।
সে মহারসের ধনী বিনোদিনী লালন বলে সে হরি নন্দের কানাই ॥

১২৪.
তোমরা আর আমায় কালার কথা বলো না।
ঠেকে শিখলাম গো কালোরূপ আর হেরবো না ॥

যেমন রূপ কালো তেমনই উহার মন কালো।
পরলাম কলঙ্কের হার তবু তো ও কালার মন পেলাম না ॥

প্রেমের কি এই শিক্ষে বেড়ায় ব্যঞ্জন চেখে লজ্জা করে না।
ঘৃণায় মরে যাই এমন প্রেম আর করবো না ॥

যেমন চন্দ্রাবলি তেমনই রাখাল অলি থাক সে দুইজনা সনে।
লালন কয় রাধার বোল সরে না ॥

১২৫.
তোর ছেলে গোপাল সে যে সামান্য নয় মা।
আমরা চিনেছি তাঁরে বলি মা তোরে তুই ভাবিস যা ॥

কার্য দ্বারা জ্ঞান হয় যে সেই অটল চাঁদ নেমেছে ব্রজে।
নইলে বিষম কালিদহে বিষের জ্বালায় বাঁচতো না ॥

যেজন বাঞ্ছিত সদাই তোর ঘরে মা সেই দয়াময়।
নইলে কি গো বাঁশীর সুরে ধার ফিরে গঙ্গা ॥

যেমন ছেলে গোপাল তোমার অমন ছেলে আর আছে কার।
লালন বলে গোপালের সঙ্গে যে গোপাল হয় মা ॥

১২৬.
দাঁড়া কানাই একবার দেখি।
কে তোরে করিল বেহাল হলিরে কোন দুঃখের দুঃখী ॥

পরনে ছিল পীতম্বরা মাথায় ছিল মোহনচূড়া।
সে বেশ হইলি ছাড়া বেহাল বেশ নিলি কোন সুখই ॥

ধেনু রাখতে মোদের সাথে আবাই আবাই ধ্বনি দিতে।
এখন এসে নদীয়াতে হরির ধ্বনি দাও এ ভাব কী ॥

ভুল বুঝি পড়েছে ভাই তোর আমি সেই ছিদাম নফর।
লালন কয় ভাব শুনে বিভোর দেখলে সফল হতো আঁখি ॥

১২৭.
ধন্যভাব গোপীর ভাব আ মরি মরি।
যাতে বাঁধা ব্রজের শ্রীহরি ॥

ছিলো কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এমন যে করে ভজন যেভাবে তাইতে হয় তারই।
সে প্রতিজ্ঞা আর না রইলো তাঁর করলো গোপীর ভাবে মনচুরি ॥

ধর্মাধর্ম নাই সে বিচার কৃষ্ণসুখে সুখ গোপীকার হয় নিরন্তরই।
তাইতে দয়াময় গোপীর সদয় মনের ভ্রমে তা জানতে নারি ॥

গোপীভাব সামান্য বুঝে হরিকে না পেলো ভজে শ্রীনারায়ণী।
লালন কয় এমন আছে কতোজন বলতে হয় দিন আখেরি ॥

১২৮.
ধর গো ধর সখী আজ আমার এ কী হলো।
আমার প্রাণ যেন কেমন করে উলো উলো ॥

আমি কেন এলাম যমুনার ঘাটে ঐ কালারূপ দেখলাম গো তটে।
আমার কাঁখের কলসি কাঁখে রইলো দু নয়নের জলে কলসি ভরে গেলো ॥

ও কালার উরু বাঁকা ভুরু বাঁকা ময়ূরপঙ্খি নাও উড়ায় প্রাণসখা।
তাতে আছে আমার নাম লেখা আমি কেন পাই না দেখা সখীরে বলো ॥

আমায় দংশিল গৌরাঙ্গ ফণী বিষ নামে না ও সজনী।
দেহ বিষে জর্জর প্রাণ কাঁপে থরথর লালন বলে বিষে অঙ্গ হলো কালো ॥

১২৯.

নামটি আমার সহজ মানুষ সহজ দেশে বাস করি।
বলি সদা রাধা রাধা রাধার প্রেমে ঘুরি ফিরি ॥

আমি ক্ষণেক থাকি স্বরূপ দেশে
আবার বেড়াই হাওয়ার মিশে
ভক্তের উদ্দেশে শতদলে মিশে ঘৃত ছানা পান করি ॥

আমি অযোধ্যার রাম গোপীগণের শ্যাম
যেভাবে যখন ডাকে সেভাবে পুরাই মনষ্কাম
ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছি তাই শান্তিরসে ভর করি ॥

আমাকে ধরা সহজ নয় আমি যশোদার কানাই
ভক্তের মনরক্ষা করতে গো ধেনু চরাই
ভক্ত ছাড়া নয়কো আমি সুবাতাসেতে ঘুরি ॥

আমি রাই ক্ষীরোদরসে ভক্তে থাকি মিশে
ভক্তির পরীক্ষা হলে পায় সে অনা'সে
ফকির লালন হলো অপদার্থ চরণদানের ভিখারি ॥

১৩০.

নারীর এতো মান ভাল নয় গো কিশোরী।
যতো সাধে শ্যাম ততো বাড়াও মান মান বাড়াও ভারি ॥

ধন্যরে তোর বুকেরই জোর কাঁদাও তুমি জগদীশ্বর করে মান জারি।
ইহার প্রতিশোধ নিবেন কি সেই শ্রীহরি ॥

ভাবে বুঝলাম দড় শ্যাম হইতে মান বড় হলো তোমারই।
থাকো থাকো প্যারী দুদিন বাদে জানা যাবে জারিজুরি ॥

তোমরা কে দেখেছো কোথায় নারী পুরুষকে পায়ে ধরায় সে কোন নারী।
রাগে কয় বৃন্দে ফকির লালন কী জানে তারই ॥

১৩১.
প্রেম করা কী কথার কথা।
হরিপ্রেমে নিলো গলে কাঁথা ॥

একদিন রাধে মান করিয়ে ছিলেন ধনী শ্যাম ত্যাজিয়ে।
মানের দায়ে শ্যাম যোগী হয়ে মুড়ালে মাথা ॥

আর এক প্রেমে মজে ভোলা শ্মাশানে মশানে করে খেলা।
গলে শুদ্ধ হাড়ের মালা দেখতে পাগল অবস্থা ॥

রূপ-সনাতন উজির ছিলো প্রেমে মজে ফকির হলো।
লালন বলে তেমনই জেনো শুদ্ধ সে প্রেমের ক্ষমতা ॥

১৩২.
প্রেম করে বাড়িল দ্বিগুণ জ্বালা।
ছল করে প্রাণ হরে নিলো কালা ॥

সখীরে আমি যখন বাঁধতে বসি ও সে কালা বাজায় বাঁশি।
মন হয় যে তখন উদাসী কী করি ভেবে মরি এ কী করিল কালা ॥

সখীরে আমার লাগি ঐ না কালা প্রেমের হাট বসালো কদমতলা।
কদমতলায় করেছি কতো লীলা তাইতে হলো বুঝি জীবন কালা ॥

সখীরে শুইলে স্বপনে দেখি শ্যাম কাছে বসে ধরে আঁখি।
হেঁসে হেঁসে বলছে কথা চাঁদমুখি
লালন বলে রাই পরিয়েছিলো শ্যামের গলে মালা ॥

১৩৩.
প্রেমবাজারে কে যাবি তোরা আয় গো আয়।
প্রেমের গুরু কল্পতরু প্রেমরসে মেতে রয় ॥

প্রেমবাজ মদনমোহন নিহেতুপ্রেম করে সাধন।
শ্যামরাধার যুগল চরণ প্রেমের সহচরী গোপীগণ গোপীর দ্বারে বাঁধা রয় ॥

অবিন্দু উথলিয়ে নীর পুরুষপ্রকৃতি হয় কার।
দোহার প্রেমশৃঙ্গার মেতে উভয়ের শেষে লেনাদেনা হয় ॥

নির্মল প্রেম করে সাধন শঙ্খরসে করে স্থিতি সামান্য রতিসাধন।
সিরাজ শাঁই বলে শোনরে লালন তাতে শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গময় ॥

১৩৪.
প্রেম শিখালাম যারে হাত ধরি।
দেখো দেখো সজনী দিবারজনী তার প্রেমে এখন জ্বলে মরি ॥

ওরে মন প্রেম শিখাইলি যারে সে প্রেম তোরে বাঁধিয়া মারে।
নয়নে নয়নে সন্ধানে স্মরণে মরমে বেঁধেছে এ কুলের নারী ॥

অস্ত্রাঘাতের ব্যথা শুকাইলে যায় প্রেমাঘাত করে জীবন সংশয়।
তবু জীবন যায় না সে দেখে দিবানিশি করে জ্বালাতন আমারই ॥

আগে নাহি জানি এমন হবে বাঘ শিকারীকে বাঘে ধরে খাবে।
অনুরাগের বাঘে খেলো লালনেরে যেমন গর্ভে ধরে অসৎনারী ॥

১৩৫.
প্যারি ক্ষমো অপরাধ আমার।
মানতরঙ্গে করো পার ॥

তুমি রাধে কল্পতরু ভাবপ্রেমরসের গুরু।
তোমা বিন অন্য কারো না জানি জগতে আর ॥

পূর্বরাগ অবধি যারে আশ্রয় দিলে নৈরাকারে।
অল্পদোষে এ দাসেরে ত্যাজলে কি পৌরুষ তোমার ॥

ভালমন্দ যতোই করি তথাপি প্রেমদাস তোমারই।
লালন বলে মরি মরি হরির এ কী ঋণ স্বীকার ॥

১৩৬.
বড় অকৈতব কথা ওরে ছিদাম সখা।
ষড়ৈশ্বর্য ত্যাজ্য করে ধূলায় অঙ্গমাখা ॥

ব্রজপুরে নন্দের ঘরে ছিলামরে ভাই কারাগারে।
তাইতে আমি এলাম ছেড়ে নদীয়ায় এসে দেখা ॥

অগুরু চন্দন এখন সব দিয়েছি রাধার কারণ।
এই অঙ্গে সেই অঙ্গের জীবন আছে চন্দ্রমুখা ॥

রাধাপ্রেমের ঋণের কাঙ্গাল বৃন্দাবন ত্যাগ করে নন্দলাল।
মনের দুঃখে বলছে লালন আমার কেবল রফা ॥

১৩৭.
বিদায় কর গো উহার নামে মোর কাজ নাই।
গতকাল নিশি রাখালরাজ ছিলো কোথায় ॥

যমুনার জলে আমি স্নান করতে যাবো না
মাথায় আছে কালো কেশ তাও রাখবো না
কালো কাজল ভালো নয় যেজনা নয়নে দেয়
কালসাপে দংশিলে বিষে অঙ্গ জ্বলে যায় ॥

কালো কোকিলের ধ্বনি না শুনিব কর্ণে
ঘ্যানোর ঘ্যানোর কথা না শুনিব শ্রবণে
যে কবে কালার কথা তার সঙ্গে মোর নাহি কথা
যে দেবে অন্তরে ব্যথা সইবে না এ যুগের রাই ॥

কালার সাথে প্রেম করে জনম গেলো কাঁদিতে
জন্মাবধি অপরাধী হলাম কালীর পদেতে
দেহ করলাম সমর্পণ তবু পাইনে কালার মন
মান ভাঙ্গিতে মন ভেঙ্গে যায় লালন ভনে তাই ॥

১৩৮.
ব্রজলীলে এ কী লীলে।
কৃষ্ণ গোপীকারে জানাইলে ॥

যারে নিজশক্তিতে গঠলেন নারায়ণ আবার গুরু বলে ভজলে তার চরণ
এ কী ব্যবহার শুনতে চমৎকার জীবের বোঝা ভার ভূমণ্ডলে ॥

লীলা দেখে কম্পিত ব্রজধাম নারীর মান ঘুঁচাতে যোগী হলেন শ্যাম।
দুর্জয় মানের দায় বাঁকা শ্যামরায় নারীর পাদপদ্ম মাথায় নিলে ॥

ত্রিজগতের চিন্তা শ্রীহরি আজ কি নারীর চিন্তায় হলেন গো হরি।
অসম্ভব বচন ভেবে কয় লালন রাধার দাসখতে শ্যাম বিকাইলে ॥

১৩৯.
ভেবো না ভেবো না ও রাই আমি এসেছি।
আমি যে তোমায় বড় ভালবাসি ॥

তুমি ভালবাসো মনে মনে আমি বাসি তোমায় প্রাণে প্রাণে।
শয়নে কি স্বপনে তোমায় না হেরিলে বৃন্দাবনে ছুটে আসি ॥

খুঁজলে পাবে কোথা বনে আসাযাওয়া আমার নিষ্ঠুর মনে।
কখনো থাকি শ্রীবৃন্দাবনে কখনো গোচারণে কখনো বাজাই বাঁশি ॥

মনে করো ও কমলিনী তুমি তো প্রেমের সোহাগিনী।
তাইতে লালন ভনে প্রেমকাহিনি রাইপ্রেমে মগ্ন দিবানিশি ॥

১৪০.
মন জান গা যা সেই রাগের করণ।
যাতে কৃষ্ণবরণ হলো গৌরবরণ ॥

শতকোটি গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম রসরঙ্গে।
সে যে টলের কার্য নয় অটল না বলায় সে আর কেমন ॥

রাধাতে কী ভাব কৃষ্ণের কী ভাবে বশ গোপীর সনে।
সে ভাব না জেনে সে রঙ্গ কেমনে পাবে কোনজন ॥

শুদ্ধরসের উপাসনা না জানিলে রসিক হয় না।
লালন বলে সে যে নিগূঢ়করণ ব্রজে অকৈতব ধন ॥

১৪১.
মনরে সামান্যে কি তাঁরে পায়।
শুদ্ধপ্রেম ভক্তিরবশ কৃষ্ণ দয়াময় ॥

কৃষ্ণের আনন্দপুরে কামী লোভী যেতে নারে।
শুদ্ধভক্তির ভক্তের দ্বারে সে চরণ নিকটে রয় ॥

বাঞ্ছা থাকলে সিদ্ধি মুক্তি তারে বলে হেতুভক্তি।
নিহেতুভক্তির রীতি সবেমাত্র দীননাথের পায় ॥

ব্রজের নিগূঢ়তত্ত্ব গোঁসাই শ্রীরূপেরে সব জানালে তাই।
লালন বলে মুরশিদ সাধলে সেইমতো রসিক মহাশয় ॥

১৪২.
মনের কথা বলবো কারে।
মন জানে আর জানে মরম মজেছি মন দিয়ে যাঁরে ॥

মনের তিনটি বাসনা নদীয়ায় করবো সাধনা।
নইলে মনের বিয়োগ যায় না তাইতে শ্রীদাম এ হাল মোরে

কটিতে কৌপীন পরবো করেতে করঙ্গ নেবো।
মনের মানুষ মনে রাখবো কর যোগাবো মনের শিরে ॥

যে দায়ের দায়ে আমার এমন রসিক বিনে বুঝবে কোনজন।
গৌর হয়ে নন্দের নন্দন লালন কয় তা বিনয় করে ॥

১৪৩.
মা তোর গোপাল নেমেছে কালিদয়।
সে যে বাঁচে এমন সাধ্য নয় ॥

কালিদায় কমল তুলতে দিলি কেন গোপালকে যেতে।
মরে সে নাগের হাতে বিষ লেগে গোপালের গায় ॥

কালকূটি কালনাগ যারা কালিদয় আছে তারা।
বিষে অঙ্গ জরাজরা বিষেতে তার প্রাণ যায় ॥

কংসের কমলের কারণ কালিদায় মরিল নীলরতন।
লালন বলে পুত্রের কারণ বাঁচে না যশোদা মায় ॥

১৪৪.
মাধবীবনে বন্ধু ছিলো সই লো।
বন্ধু আমার কেলেসোনা কোন বনে লুকালো ॥

মাধবীলতার গায় মাধবীলতার ছায়।
দেখো দেখো সই লতায় পাতায় বন্ধুরূপে আলো ॥

কৃষ্ণপ্রেমের এমনই ধারা করিল আমায় পাগলপারা।
হলাম জাতকুল মানহারা এ কেমন বিষম জ্বালা হলো ॥

নাম ধরে বাজায় বাঁশি অকুল বিজনেতে বসি।
ঐ শোনো কী বলে বাঁশি কোন বনে বাজিল সই লো ॥

আমায় দিয়েছে কেবল ফাঁকি প্রাণটা শুধু আমার আছে বাকি।
ফকির লালন বলে বন্ধুর লাগি অন্তর পুড়ে ছাই হলো ॥

১৪৫.
মান করো না ওগো রাধে তোমায় করি মানা।
মান করলে ইহকালে তোমার কাছে কেউ যাবে না ॥

আমরা যতো বৃন্দে সখী সবাই বলি যুগল দেখি।
সেজন্যে তো কাছে থাকি মনে বুঝে তাও দেখো না।

আমার কথা না রাখিলে আমি নিশ্চয় যাবো চলে।
কাঁদতে হবে পদতলে তখন ফিরে আর আসবো না ॥

মানের গোড়ায় ছাই পড়বে রাই মনে একবার ভেবে দেখো তাই
লালন কয় বলছে সখী সবাই বেহাল হবে সুহাল হবে না ॥

১৪৬.
মান ছেড়ে দাও ওগো রাধে কৃষ্ণ কেঁদে যায়।
কৃষ্ণ গেলে ইহাকালে তোমার কোনো গতি নাই।

কৃষ্ণের প্রতি মান করেছো কোনটা মনে ভেবেছো সেটা শুনতে চাই।
তোমার মানের গোড়া যায় না ছেঁড়া নিজগুণে কাটো রাই ॥

যতো কথা বলি আমি মনে বুঝে দেখো তুমি ভালোর জন্যে বলি সদাই।
আমার কথা রদ করো না বারংবার তা কই তোমায় ॥

তুমি ধনী মান ছেড়ে দাও কৃষ্ণপানে স্বচক্ষে চাও দেখো সে তোমারই নিশ্চয়
লালন বলে দাসীরে বেহাল করো চিরকাল কেবল সে মানের দায় ॥

১৪৭.
যাও হে শ্যাম রাইকুঞ্জে আর এসো না।
এলে ভালো হবে না ॥

গাছ কেটে জল ঢালো পাতায় এ চাতুরি শিখলে কোথায়।
উচিত ফল পাবে হেথায় তা নইলে টের পাবে না ॥

করতে চাও শ্যাম নাগরালি যাও যথা সেই চন্দ্রাবলি।
এ পথে পড়েছে কালি এ কালি আর যাবে না ॥

কেলেসোনা জানা গেলো উপরে কালো ভিতরে কালো।
লালন বলে উভয় ভালো করি উভয় বন্দনা ॥

১৪৮.
যাবোরে ও স্বরূপ কোনপথে।
স্বরূপ আয়রে আয় এসে আমায় ব্রজের পথ বলে দে ॥

যাঁর জন্যে ঝুরে নয়ন তাঁরে কোথা পাবো এখন।
যাবো আমি শ্রীবৃন্দাবন না পারি আর পথ চিনতে ॥

দেখবো সেই নন্দের কুমার মনে সাধ হয়রে আমার।
মিনতি করি তোমায় পথের উদ্দেশ জানতে ॥

একবার ঐ গোকুলের চাঁদ দেখে জুড়াই নয়নের সাধ।
লালন বলে হে গৌরাঙ্গ রূপচাদ কেঁদে আকুল হই চিতে ॥

১৪৯.
যাঁর ভাবে আজ মুড়েছি মাথা।
সে জানে আর আমি জানি আর কে জানে মনের কথা ॥

মনের মানুষ রাখবো মনে বলবো না তা কারো সনে।
ঋণ শুধিব কতদিনে মনে আমার এহি চিন্তা ॥

সুখের কথা বোঝে সুখী দুখের কথা বোঝে দুখী।
পাগল বোঝে পাগলের বোল অন্যে কি বোঝে তা ॥

যারে ছিদাম তোরা দুই ভাই আমার বদ্‌হাল শুনে কাজ নাই।
বিনয় করে বলছে কানাই লালন পদে রচে তা ॥

১৫০.
যে অভাবে কাঙ্গাল হলাম ওরে ছিদাম দাদা।
আমার ধড়া চূড়া মোহন বেনু সব নিয়েছে রাধা ॥

খত লিখিলাম নিজ হস্তে ললিতা বিশাখার সাথে খতের সই তাতে।
কিঞ্চিৎ মতে শোধ করিলাম খতে উশুল না দেয় রাধা ॥

শ্রীরাধার ঋণ শুধিবার তরে এলাম ডোর কোপনি পরে রাধার ঋণের তরে।
কাঁদি সেইদিন দিন বলে সেইদিন রাধা না দেয় দেখা ॥

প্রেমের দায়ে মত্ত হয়ে নিজ শিরে বাদা বয়ে এলাম নিজালয়ে।
সিরাজ শাঁই বলে ওরে লালন জয় জয় বলো রাধা ॥

১৫১.
যে দুঃখ আছে মনে ওরে ও ভাই ছিদাম।
সেই দুঃখের দুখ না হলো সুখ তাইতে নদেয় এলাম ॥

যদি দেখা পাইতাম হারে সকল কথা কইতাম তারে ওরে কইতাম।
বড় আশা ও ভাই সখা আমি তাইতে আসিলাম ॥

শোনরে ভাই ছিদাম নফর দুঃখ শুনে কাজ নাই তোর নাই আমার স্থান।
নূতন সাধন করবো এখন তাইতে ডোর কোপিন পরিলাম ॥

দেবের দেব বাঞ্ছা সে ধন কোথায় গেলে পাবো এখন বলো ভাই সুদাম।
লালন সেই আশায় আছে আজ যদি তাঁরে পেতাম ॥

১৫২.
যে ভাব গোপীর ভাবনা।
সামান্য জ্ঞানের কাজ নয় সে ভাব জানা ॥

বৈরাগ্যভাব বেদের বিধি গোপীভাব অকৈতব নিধি।
ডুবলো তাহে নিরবধি রসিকজনা ॥

যোগীন্দ্র মনীন্দ্র যাঁরে পায় না যোগ ধ্যান করে।
সেহি কৃষ্ণ গোপীর দ্বারে হয়েছে কেনা ॥

যে জন গোপী অনুগত জেনেছে সেই নিগূঢ়তত্ত্ব।
লালন বলে যাতে কৃষ্ণ সদাই মগ্না ॥

১৫৩.
রইসাগরে ডুবলো শ্যামরাই।
তোরা ধর গো হরি ভেসে যায় ॥

রাইসাগরে তরঙ্গ ভারি ঠাঁই দিতে পারবেন কি শ্রীহরি।
ছেড়ে রাজস্ব প্রেমের উদ্দেশ্য ছিন্ন কাঁথা উড়ে গায় ॥

চার যুগে ঐ কেলেসোনা শ্রীরাধার দাস হতে পারলো না।
যদি হতো দাস মিটতো মনের আশ আসতো না আর নদীয়ায় ॥

তিনটি বাঞ্ছা অভিলাষ করে প্রভু জন্ম নিলো শচীর উদরে
সিরাজ শাঁইয়ের বচন মিথ্যা নয় লালন সে ভাব জানলে রসিক হয় ॥

১৫৪.
রাধার কতো গুণ নন্দলালা তা জানে না।
কিঞ্চিৎ জানলে তো লম্পতে ভাব থাকতো না ॥

করে সে পিরিতি নাই তার সুরীতি কুরীতি ছলনা।
বলে রাই সত্য দেখি অন্য ভাবনা ॥

যদি মন দিলে রাধারে ওরে শ্যাম কুজারে স্পর্শ করতো না।
একমন কয় জায়গায় বেচে তাও তো জানলাম না ॥

চন্দ্রাবলির সনে মত্ত কোন রসরঙ্গে ভেবে দেখো না।
তেমনি অনন্ত ভ্রান্ত শ্যামের যায় জানা ॥

জানলে প্রেম গোকুলে লইত না কাঁথা গলে নদীয়ায় আসতো না।
অধীন লালন কয় করো এ বিবেচনা ॥

১৫৫.
রাধার তুলনা পিরিত সামান্যে কেউ যদি করে।
মরেও না মরে পাপী অবশ্য যায় ছারেখারে ॥

কোন প্রেমে সেই ব্রজপুরী বিভোরা কিশোরকিশোরী।
কে পাইবে গন্ধ তারই কিঞ্চিৎ ব্যক্ত গোপীর দ্বারে ॥

গোপী অনুগত যারা ব্রজের সে ভাব জানে তারা।
কামের ঘরে শড়কী মারা মরায় মরে ধরায় ধরে ॥

পুরুষপ্রকৃতি স্মরণ থাকতে কি হয় প্রেমের করণ।
সিংহের দায় দিয়ে লালন শৃগালের কাজ করে ফেরে ॥

১৫৬.

ললিতা সখী কই তোমারে মন দিয়েছি যাঁরে।
লোকে বলে বলুক মন্দ লোকের কথায় যাবো না ফিরে ॥

তোমরা সখী বুঝাও যতো
মন আমার পাগলের মতো না দেখিলে তাঁরে
আমি ভুলিব মনে করি অন্তর যে ভোলে না মোরে ॥

আমি যখন রাঁধতে বসি
কালা তখন বাজায় বাঁশী নিকুঞ্জকাননে
আমার শ্বাশুড়ি ননদি ঘরে কেমন করে যাই বাইরে ॥

ঐ কালা কী মন্ত্রে মন ভোলালো
এখন আমার ঘরে থাকা দায় হলো বলো সখী কী করিরে
লালন বলে তাইতে রাধা কুলশীলে যাবে না ঘরে সে ফিরে ॥

১৫৭.

শুনে মানের কথা চম্পকলতা মাথা যায় ঘুরে।
চোরের মতো বুদ্ধিহত দাঁড়িয়ে আছি তার দ্বারে ॥

দুঃখের কথা বলবো কী ছাই কথায় কথায় মান করে রাই
নারীলোকের বুদ্ধি তো নাই মানের দায়ে শুধু কেঁদে ফিরে ॥

এতো মান ভাঙ্গাতে সাধাসাধি সয় কি আসিয়া বিষমুখিরে বুঝাও তো সখী।
লালন বলে এতো মান কিসে তার দেখি থৈ মিলে না রাধার মানসাগরে ॥

১৫৮.

সকালবেলা চিকন কালা এলে কী মনে করে।
তুমি এলে হে নিশিজাগা রাধার দ্বারে ॥

তোমার আশাতেরে ভাই আমরা গোপীগণ সবাই।
মনের সুখে বাসরঘর সাজাই ওহে রাখালরাজ মজালে কুলবঁধু রাধারে ॥

শ্যাম তোমার বুঝবে কে লীলে বলো তো গতনিশি কার কুঞ্জেতে ছিলে।
তোমার বদনবিধ শুকায়ে গেছে শ্যাম তোমার দিয়েছে দফা মেরে ॥

পোহায়ে গেছে নিশি ও শ্যাম তুমি হয়েছো দোষী।
আর বাজাইও না ভুয়ো বাঁশি লালন বলে কিশোরী বসে আছে মানভরে ॥

১৫৯.
সেই কালাচাঁদ নদেয় এসেছে।
ও সে বাজিয়ে বাঁশি ফিরছে সদাই কুলবতীর কুলনাশে ॥

মজবি যদি কালার পিরিতি আগে জান গো যা তার কেমন রীতি।
প্রেম করা নয় প্রাণে মরা অনুমানে বুঝিয়েছে ॥

ঐ পদে কেউ রাজ্য যদিও দেয় তবু কালার মন নাহি পাওয়া যায়
রাধা বলে কাঁদছে এখন তারে কতো কাঁদিয়েছে ॥

ব্রজে ছিলো জলদ কালো কী সাধনে গৌর হলো।
লালন বলে চিহ্ন কেবল দুই নয়ন বাঁকা আছে ॥

১৬০.
সেই কালার প্রেম করা সামান্যের কাজ নয়।
ভালো হয় তো ভালোই ভালো নইলে ল্যাটা হয় ॥

সামান্যে এই জগতে পারে কি সেই প্রেম যাজিতে।
প্রেমিক নাম পাড়িয়ে সে যে দুকুল হারায় ॥

একপ্রেমের ভাব অশেষ প্রকার প্রাপ্তি হয় সে ভাব অনুসার।
ভাব জেনে ভাব না দিলে তার প্রেমে কি ফল পায় ॥

গোপী যেমন প্রেমাচারী যাতে বাঁধা বংশীধারী।
লালন বলে সে প্রেমেরই ধন্য জগতময় ॥

১৬১.
সে প্রেম জানে কি সবাই।
যে প্রেমে সেই লীলাখেলা গোপীর আশ্রয় ॥

সেই প্রেমের করণ করা কামের ঘরে নিষ্কাম যারা।
নিহেতু প্রেম অধর ধরা ব্রজগোপীর ঠাঁই ॥

প্রকৃতিসেবার বিধান গোপী ভিন্ন জানতে কে পান।
প্রাপ্তি হয় সে গোলোক ধাম যুগল ভজন তাই ॥

গোপীর প্রেমে হয় মহাজন যাতে বাঁধা মদনমোহন।
লালন বলে সে প্রেম এখন আমার ভাগ্যে নাই ॥

১৬২.
সে ভাব সবাই কি জানে।
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা গোপীর সনে ॥

গোপী বিনে জানে কে বা শুদ্ধরস অমৃত সেবা।
পাপপুণ্যের জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণ দরশনে ॥

গোপী অনুগত যারা ব্রজের সে ভাব জানে তারা।
নিহেতু প্রেম অধর ধরা গোপীদের মনে ॥

টলে জীব অটলে ঈশ্বর তাইতে কি সে রসিক নাগর।
লালন বলে রসিক বিভোর রস ভিয়ানে ॥

১৬৩.
সে যেন কী করলো আমায় কী যেন দিয়ে।
আমি সইতে নারি কইতে নারি সে আমার কী গেছে নিয়ে ॥

ঘরে গুরুগঞ্জন বাইরে সমাজবন্ধন।
আর কতোকাল এভাবে আর যাবো সয়ে ॥

অতৃপ্ত নয়নের আশা লজ্জাভয় রমণীর ভূষা।
যে প্রেমের বিষে লাগলো নেশা কাকে বলি বুঝায়ে ॥

বিরহ যাতনা সয়ে থাকি মনের জলে ভিজাই আঁখি।
কে আছে ব্যথার ব্যথী লালন কয় কাঁদে হিয়ে ॥

গোষ্ঠলীলা

লীলাভূমিকা

অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি তাঁর কী আছে কভু গোষ্ঠখেলা।
ব্রহ্মরূপে সে অটলে বসে লীলাকারি তাঁর অংশকলা ॥

ভোর হয়েছে। সূর্য উঠেছে। ফুল ফুটেছে বনে বনে। পাখিরা ডাকছে। জগতের উৎপাদন কাজ শুরু হয়েছে আবার। প্রত্যুষের সূর্যোদয়, ফুলফোটা, পাখির কলধ্বনির মতো গোপবালক বা রাখাল ছেলেরা মাঠে যাবে। সেখানে গোচারণ খেলা। এ গোষ্ঠ বিহারের মাঠে রাখালেরা যাচ্ছে। এ ভ্রমণ তারা শূন্য রাখতে নারাজ। কারণ যে রাখে সেই রাখাল। তাই তারা সেখানে খেলাচ্ছলে শ্যামের সাথে মিলিত হতে চাইছে যেখানে অনন্তের মানুষর রূপ সাজটি তারা দেখতে চায়। তাদের উপকরণ অতিসামান্য পীতধরা ও বনফুল মালা মাত্র। কিন্তু গোপবালকেরা পেয়েও গোপালকে হারায়। কারণ যিনি হরি মুরারি, কৃষ্ণ, গোবিন্দ গোপাল তিনি চিরশিশু, শেরেকবিহীন শুদ্ধসত্তা। যিনি সব সময় সর্বত্র আনন্দেময়, তাঁকে কোনো মাঠে বনে বা বড়ো জায়গায়, ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের মধ্যে খুঁজতে গেলে হারাতে হয়। শাইজি লালন যাকে বলছেন 'অনাদির আদি' তাঁর কোনো গোষ্ঠখেলা নেই। তিনি ব্রহ্মারূপে অটল মোকামে চির প্রতিষ্ঠিত।– এ হলো লালন শাঁইজির গোষ্ঠলীলার একটি দিক।

অন্যদিকে 'গোষ্ঠ' শব্দটি এসেছে 'গো' থেকে। 'গো' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষভাবে সৌরজগতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। খণ্ড মানবদেহ অখণ্ড মহাবিশ্বদেহের সাথে এক সুতোয় বাঁধা। একটি থেকে অন্যটি আপাতদৃষ্টে পৃথকবোধ হলেও মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। ফকির লালন শাঁইজির গোষ্ঠলীলা অন্ধকার বা অজ্ঞান অবস্থা থেকে জ্ঞান জাগরণ তথা সূর্যোদয়ের রূপকমণ্ডিত সূক্ষ্মভাবকে আলম্বন করে। 'গোষ্ঠ' মানে ইন্দ্রিয় জগত। যদিও রূপকার্থে জননী যশোদা, পুত্র কানাই এবং বলাই, শ্রীদাম, সুবল প্রমুখ গোপবালকদের উপস্থিতি এ লীলায় চরিত্ররূপে ব্যক্ত হয়েছে তথাপি লালন ফকিরের গোষ্ঠলীলা সূক্ষ্ম ভাবার্থে সর্বকালীন রসতত্ত্বের আঙ্গিকে মৌলিক মানবলীলার ভূমিকা মাত্র। শাঁইজির এ রসাত্মক গোষ্ঠভূমিকা প্রচলিত ধার্মিকতা, রাজনৈতিকতা, সামাজিকতা ও পারিবারিকতার বহু উর্ধ্বের অখণ্ড ভাব সঞ্চারী।

তাই ফকির লালন শাহী গোষ্ঠলীলা রসোত্তীর্ণ চিরন্তন বিষয়। এখানে খণ্ডিত-গৌড়ীয় কোনো অর্থান্তর ঘটালে শাঁইজির সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন হয়ে পড়বে। সেটা নেহাত সংকীর্ণতা-সাম্প্রদায়িকতার পরিচায়ক। স্থানকালপাত্র, সমাজ, রাজনীতির বহু উপরে 'রসজ্ঞান'। এমন রসোত্তীর্ণ শিল্পকে সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ধার্মিক খড়্গ দিয়ে বিচ্ছিন্ন করতে নেমে রসশূন্য আলেম-বুদ্ধিজীবীগণ তথা কাঠমোল্লা-গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ক্ষুদ্রতায় পর্যবসিত করে ছাড়ে শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈয়াকরণ-আলঙ্কারিক শাস্ত্রীগণ তাদের জ্ঞানবুদ্ধির মাপকাঠিতে বিচার করতে গিয়ে এক প্রকার বন্দি করে ফেলেন শ্রীকৃষ্ণকে। অতএব আমরা লালন শাঁইজির গোষ্ঠলীলা ভূমিকাকে গ্রহণ করি রসতত্ত্বের সূক্ষ্ম আঙ্গিকেও।

গোষ্ঠলীলা শ্রীকৃষ্ণের দেহলীলা বা জগতলীলা। নানা নামে ও রূপে এ লীলাই সর্বযুগে জারি আছে। প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তিতে উত্তরণের প্রয়াসই সম্যক গুরুর গোষ্ঠলীলা। 'গো' বা 'গোষ্ঠ' বলতে রূপকার্থে প্রবৃত্তিনির্ভর ইন্দ্রিয়কে তথা জীবজগতকে বোঝানো হয়েছে। জীবের প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করার মাধ্যমে কুধর্ম থেকে সুধর্মে উন্নীত করার প্রয়োজনে কৃষ্ণতত্ত্বই গোবিন্দ-গোপাল রাখালবেশে জগতে অবতীর্ণ হন যুগে যুগে।

গোষ্ঠলীলা শাঁইজির বাৎসল্য ও সখ্যরসের লীলা। যুগে যুগে শ্রীকৃষ্ণের অবতারলীলা বিচিত্র। সাধারণের বোধবুদ্ধির পক্ষে তা অত্যন্ত বিড়ম্বনাপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। শ্রীকৃষ্ণে পঞ্চরসলীলা এক একটি সম্বন্ধ দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাঁর পঞ্চরস হলো: শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস ও মধুররস বা উন্নত উজ্জ্বল রস। একেকটি রসে নিহিত রয়েছে এক এক মাহাত্ম্য। সংসারচক্রে ভ্রমণ করতে করতে ভক্ত এক একটি রসের সান্নিধ্য লাভ করে থাকে।

শান্তরস কামনাহীন ভক্তিরস। যারা শান্তরসের তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণমাত্রই ব্রহ্ম-সুখানুভূতিরূপে অনুভূত হন। যারা দাস্য-ভাগবতভক্ত তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ পরম আরাধ্যতম দেবতারূপে বিরাজমান। যারা মায়াবদ্ধ অজ্ঞলোক তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ অতিসাধারণ নরশিশুরূপে প্রতীয়মান। শ্রীবৃন্দাবনের পূতচরিত্র বালকগণের কাছে লীলারঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ নিত্য অশেষ রকমের ক্রীড়া-কৌতুকের বান্ধব, খেলার সাথী।

সখ্যরসকে বলা হয়েছে বিশ্রম্ভ-প্রধান। 'বিশ্রম্ভ' শব্দের অর্থ অভেদ-মনন। সাখ্যরসের এমন সামর্থ্য যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখাদের একটি অভিন্নতর বোধ জাগিয়ে দেয়। সখাদের কাছে তার নিজদেহ ও কৃষ্ণদেহে বিন্দুমাত্র ভেদবুদ্ধি থাকে না। নিজের পা নিজের গায়ে ঠেকলে যেমন উদ্বেগের কারণ হয় না,

কৃষ্ণের গায়ে ঠেকলেও তেমন উদ্বিগ্ন হয় না। আমার উচ্ছিষ্ট আমার মুখে খাওয়া যা, কৃষ্ণমুখে খাওয়াও তাই। এ দুইমুখে কোনো ভেদবুদ্ধি কৃষ্ণসখার অন্তরে জাগেই না। এ অভিন্ন মননই সখ্যপ্রেমের প্রাণস্বরূপ।

সখ্যরসের সখা কৃষ্ণকে নিজের সমান মনে করে। ছোট বা বড়ো মনে করতে পারে না। কৃষ্ণ কোনো অন্যায় করতে পারেন বা ভুল করতে পারেন এমন ভাবনা সখা তথা গোপবালকদের মনেই আসে না। কৃষ্ণকে শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন, উপদেশ দেয়া দরকার, অন্যায় কাজের জন্যে শাসন করা আবশ্যক- এমন চিন্তা রাখাল বালকগণ তথা সখ্যরসের প্রিয়গণের হৃদয়ে কখনো জাগে না। এ ভাবরস বাৎসল্যরসের রত্নভাণ্ডে সংরক্ষিত।

শুদ্ধ বাৎসল্যরসে নিমজ্জিত নন্দরাজ ও যশোদা জগত পালককে বালক মনে করেন। স্বয়ম্ভুকে ক্ষুদ্র মনে করেন, ঔরসজাত পুত্রজ্ঞান করেন। অনাবিল গুণের খনিকে বহুবিধ দোষত্রুটির জন্যে তাড়ন, এমনকি দাড়ি দ্বারা উদখূলে বেঁধে পর্যন্ত রাখেন। উদ্‌খূল অর্থ ঢেঁকি। ঠিক সময়ে উপযুক্তরূপে শাসিত না হলে পরিণত বয়সে গোপাল অত্যন্ত দুর্দমনীয় হয়ে উঠবে। সুতরাং আমি জননী, তাকে শাসন করা আমার একান্ত কর্তব্য- এ ভাবনাই যশোদারকে কৃষ্ণশাসনে উদ্যোগী করে। এ অধিকার সখ্যরসের ভক্তের নেই।

যেমন আবেশ জনকজননীর, ঠিক তেমন আবেশ বালক গোপালের। বাৎসল্যরসের মহাবিষ্টতায় ভগবান আপন ভগবত্তহারা হয়ে বালকরূপে লীলা আস্বাদন করেন। নিজের কৃত অন্যায়ের জন্যে লজ্জিত, শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হন। শাসন-ভর্ৎসনা এড়ানোর জন্যে কখনো মিথ্যাভাষণ করেন, কখনো বা দ্রুত পলায়নপর হন। এরূপে ভগবানের আপনহারা ভাবটি পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হয় বাৎসল্যরসের উদ্বেলিত সাগরে।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মার শিরস্থিত মুকুটের মণিকিরণে নিয়ত উদ্ভাসিত শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ। সেই শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠের পথে গোপরাজ নন্দের পিছু পিছু তাঁর জুতো মাথায় করে ছুটতে থাকেন। ফকির লালন স্বয়ং জগত স্বামী শ্রীকৃষ্ণবরণ বলেই গোষ্ঠলীলায় বাৎসল্য ও সখ্যরসের উদ্ভাষণ ঘটাতে অনবদ্য বিভূতি প্রদর্শন করেন। গোষ্ঠলীলারও পর্ব বিভাগ আছে। প্রথমে পূর্বগোষ্ঠ। শ্রীদাম, সুদাম প্রমুখ গোপবালক প্রত্যুষে এসে গোপালকে আহ্বান্ করে গোষ্ঠে গমনের জন্যে। কিন্তু মা যশোদা প্রাণপ্রিয় পুত্রকে আপন কোলে আগলে রাখতে চান। কারণ গোচারণে বনে গেলে হিংস্র জীব জন্তুর ভয়, যদি গোপাল কোনো বিপদের সম্মুখিন হন তাই গোষ্ঠে যেতে দিতে তিনি নারাজ। কেননা, স্বপ্ন তিনি জেনেছেন, কৃষ্ণ বনে গিয়ে নিরুদ্দেশ হবেন। গোষ্ঠবালকদের অনুনয়-বিনয় জননী যশোধার কাছে গোপালকে তাদের সঙ্গে গোচরণে যেতে দেবার জন্যে। এ পর্ব হলো পূর্বগোষ্ঠ।

এরপর গৃহ থেকে গোচারণ ক্ষেত্রে গমনকালে সূচিত হয় মধ্যগোষ্ঠ তথা কৃষ্ণের অন্তর্ধানপর্বের গূঢ় রহস্যলীলা।

গুপ্ত বৃন্দাবনে নিরুদ্দেশ হবার পর গোপালকে সন্ধানের যে আকুল তীব্রতা ও রহস্য তাই অভিব্যক্ত হয় উত্তর গোষ্ঠে।

সমগ্র গোষ্ঠলীলার সারমর্ম হলো স্থূলদেহ ছেড়ে সূক্ষ্মদেহে শ্রীকৃষ্ণের আত্মদর্শনগত মহাভাবলোকে উত্তরণ জগতের জন্যে পারিত্রিক শিক্ষাপর্ব। বহির্মুখি স্থূল ইন্দ্রিয়জগত থেকে অন্তর্মুখি অতীন্দ্রিয় জগতে উল্লম্ফনেরই রূপক আভাস। এর মর্মগভীরে নিহিত অখণ্ড দেহমনে আত্মদর্শনের সূক্ষ্মপ্রেমলীলা কেবল শুদ্ধরসিক চিত্তই আস্বাদন করতে পারেন, সর্বসাধারণ নয়।

১৬৪.
ও মা যশোদে তাই আর বললে কি হবে।
গোপালকে যে এঁটো দিই মা যে ভাব ভেবে ॥

কাঁধে চড়ায় কাঁধে চড়ি যে ভাব ধরায় সেই ভাব ধরি।
এ সকল বাসনা তাঁরই বুঝেছি পূর্বে ॥

মিঠার লোভে এঁটো দেই মা পাপপুণ্যির জ্ঞান থাকে না।
গোপাল খেলে হই সান্ত্বনা পাপপুণ্যি কে ভাবে ॥

গোপালের সঙ্গে যে ভাব বলতে আকুল হই মা সেসব।
লালন বলে পাপপুণ্যি লাভ ভুলে যাই গোপালকে সেবে ॥

১৬৫.
ও মা যশোদে তোর গোপালকে গোষ্ঠে লয়ে যাই।
সব রাখাল গেছে গোষ্ঠে বাকি কেবল বলাই কানাই ॥

ওঠোরে ভাই নন্দের কানু বাথানেতে বাঁধা ধেনু
গগনে উঠিল ভানু আর তো নিশি নাই
কেন মায়ের কোলে ঘুমায়ে র'লি এখনো কি তোর ঘুম ভাঙ্গে নাই ॥

গোচারণে গোষ্ঠের পথে কষ্ট নাই মা গোষ্ঠে যেতে
আমরা সবাই স্কন্ধে করে গোপাল লয়ে যাই
তোর গোপালের ক্ষুধা হলে দণ্ডে দণ্ডে ননী খাওয়াই ॥

আমরা যতো রাখালগণে ঘুরি সবে বনে বনে
সারাদিন জনে জনে যতো ফল যে পাই
ফকির লালন বলে রাখালে ফল খেয়ে মিঠে হলে তোর গোপালকে খাওয়ায় ॥

১৬৬.
কোথায় গেলি ও ভাই কানাই।
সকল বন খুঁজিয়ে তোরে নাগাল পাইনে ভাই ॥

বনে আজ হারিয়ে তোরে গৃহে যাবো কেমন করে।
কী বলবো মা যশোদারে ভাবনা হলো তাই ॥

মনের ভাব বুঝতে নারি কী ভাবের ভাব হয় তোমারই।
খেলতে খেলতে দেশান্তরী ভাবেতে দেখতে পাই ॥

আজ বুঝি গোচারণ খেলা খেললে নারে নন্দলালা।
লালন বলে চরণবালা পাই না বুঝি ঠাঁই ॥

১৬৭.
কোথায় গেলিরে কানাই প্রাণের ভাই।
একবার এসে দেখা দেরে দেখে প্রাণ জুড়াই ॥

কোন দোষে ভাই গেলি তুইরে আমাদের সব অনাথ করে।
দয়ামায়া তোর শরীরে কিছুই কি নাই ॥

শোকে তোর পিতা নন্দ কেঁদে কেঁদে হলো অন্ধ।
আর সব নিরানন্দ ধেনু গাই ॥

পশুপাখি নরাদি নিরানন্দ নিরবধি।
লালন শুনে শ্রীদামোক্তি বলে তাই ॥

১৬৮.
গোষ্ঠে চলো হরি মুরারি।
লয়ে গোধন গোষ্ঠের কানন চলো গোকুলবিহারী ॥

ওরে ও ভাই কেলেসোনা চরণে নূপুর নে না।
মাথায় মোহন চূড়া দে না ধড়া পড়ো বংশীধারী ॥

তুই আমাদের সঙ্গে যাবি বনফল সব খেতে পাবি।
আমরা ম'লে তুই বাঁচাবি তাই তোরে সঙ্গে করি ॥

যে তরাবে এই ত্রিভুবন সেহি যাবে গোষ্ঠের কানন।
ঠিক রেখো মন অভয়চরণ লালম ঐ চরণের ভিখারী ॥

১৬৯.
গোপাল আর গোষ্ঠে যাবে না।
যারে যা বলাই তোরা সবে যা ॥

কুস্বপন দেখেছি যে গোপাল যেন হারিয়েছে।
বনে বনে ফিরছি কেঁদে খুঁজে পেলাম না ॥

অভাগিনীর আর কেহ নাই সবে মাত্র একা কানাই।
সে ধনহারা হইয়ে বলাই কিসের ঘরকন্না ॥

বনে আছে অসুরের ভয় কখন যেন কী দশা হয়।
দিবারাতে তাইতে সদায় সন্দেহ মেটে না ॥

ভেবে ও পবিত্র বচন শুনে খেদে ঝোরে লালন।
কী ছলে তাঁর গমনাগমন দিশে হলো না ॥

১৭০.
তোর ছেলে যে গোপাল সে সামান্য নয় মা।
আমরা চিনেছি তাঁরে বলি মা তোরে তুই ভাবিস যা ॥

কার্য দ্বারা জ্ঞান হয় যে অটল চাঁদ নেমেছে ব্রজে।
নইলে বিষম কালিদয় বিষের জ্বালায় বাঁচতো না ॥

যে ধন বাঞ্ছিত সদাই তোর ঘরে মা সেই দয়াময়।
নইলে কি গো তাঁর বাঁশির স্বরে ধার ফেরে গঙ্গা ॥

যেমন ছেলে গোপাল তোমার অমন ছেলে আর আছে কার
লালন বলে যে গোপালের অঙ্গে গোপাল হয় মা ॥

১৭১.
বনে এসে হারালাম কানাই।
কী বলবে মা যশোদায় ॥

খেললাম সবে লুকোলুকি আবার হলো দেখাদেখি।
কানাই গেলো কোন মুল্লুকি খুঁজে নাহি পাই ॥

শ্রীদাম বলে নেবো খুঁজে লুকাবে কোন বন মাঝে।
বলাই দাদা বোল বুঝে সে দেখা দে না ভাই ॥

সুবল বলে প'লো মনে বলেছিলো একইদিনে।
যাবে গুপ্ত বৃন্দাবনে গেলো বুঝি তাই ॥

খুঁজে খুঁজে হলাম সারা কোথায় গেলি মনচোরা।
আর বুঝি দিবি না ধরা লালন বলে এ কী হলো হায় ॥

১৭২.
বলাই দাদার দয়া নাই প্রাণে।
গোষ্ঠে আর যাবো না মাগো দাদা বলাইয়ের সনে ॥

ক্ষুধাতে প্রাণ আকুল হয় মা ধেনু রাখার বল থাকে না।
বলাই দাদা বোল বোঝে না কথা কয় হেনে ॥

বড় বড় রাখাল যাঁরা বনে বসে থাকে তাঁরা।
আমায় করে জ্যান্তে মরা ধেনু ফিরানে ॥

বনে যেয়ে রাখাল সবাই বলে: এসো খেলি কানাই।
হারিলে স্কন্ধে বলাই চড়ে তখনে ॥

আজকের মতো তোরাই যারে আমি যাবো না বনে।
খেলবো খেলা আপন মনে লালন তাই ভনে ॥

১৭৩.
বলরে বলাই তোদের ধর্ম কেমন হারে।
তোরা বলিস সব রাখাল ঈশ্বরই গোপাল মানিস কইরে ॥

বনে যতো বনফল পাও এঁটো করে গোপালকে দাও।
তোদের এ কেমন ধর্ম বল সেই মর্ম আজ আমারে ॥

গোষ্ঠে গোপাল যে দুঃখ পায় কেঁদে কেঁদে বলে আমায়।
তোরা ঈশ্বর বলিস যাঁর কাঁধে চড়িস তাঁর কোন বিচারে ॥

আমাকে বুঝারে বলাই তোদের তো সেই ভাব দেখি নাই।
লালন বলে তাঁর ভাব বোঝা ভার এ সংসারে ॥

১৭৪.
সকালে যাই ধেনু লয়ে।
এই বনেতে ভয় আছে ভাই মা আমায় দিয়েছেন কয়ে ॥

আজকের খেলা এই অবধি ফিরারে ভাই ধেনু আদি।
প্রাণে বেঁচে থাকি যদি কাল আবার খেলবো আসিয়ে ॥

নিত্য নিত্য বন ছাড়ি সকালে যেতাম বাড়ি।
আজকে আমাদের দেখে দেরি মা আছে পথপানে চেয়ে ॥

বলেছিলো মা যশোদে কানাইকে দিলাম বলাইয়ের হাতে।
ভালোমন্দ হলে তাতে লালন কয় কী বলবে যেয়ে ॥

নিমাইলীলা

অখণ্ড লালনসঙ্গীত- ১৩

লীলাভূমিকা

সাঁইজির কৃষ্ণলীলারই নবোদ্ভাষণ নিমাইলীলায়। কৃষ্ণমাধুর্যের অমৃত সিন্ধু নিমাইলীলার মাধুরী-চাতুরীতে হরিপুরুষের উদয়। কৃষ্ণলীলা ও নিমাইলীলা একটির সাথে অপরটির চিন্ময় আনন্দরসের সম্বন্ধ চিরায়ত এবং অতিসূক্ষ্ম ভাব সঞ্চারক। কলিযুগে নাম অর্থাৎ গুণরূপে যিনি নিমাই তিনিই কৃষ্ণ অবতার।

'নিমাই' নামটি শচী মাতার দান। নিম মানে তিক্ততা। নিমের তিক্ততার সাথে মায়ের আদরের 'আই' যুক্ত হয়ে নাম দাঁড়াল নিমাই। নিম তেতো বলে যমেরও অপ্রিয়। যমের মুখে যা অপ্রিয় প্রেমীর জিহ্বায় সেই তো পবিত্র প্রেম ডাক।

শ্রীচৈতন্যদেবের শৈশব-বাল্য-কৈশোর নাম নিমাই বলেই ফকির লালন শাহ্ তাঁর আদ্যলীলার নামায়ণ ঘটান তাই নিমাইলীলায়।

শচীমায়ের সদ্যপ্রসূত শিশু নিমাই মাতৃস্তন্য অপবিত্র বলে স্তন্যপান করলেন না। শচীমাতা সদ্যজাত শিশুর অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁদতে লাগলেন। তখন এক বিলাসিনী বললেন: "ইহা ষষ্ঠির খেলা, ইহাকে বৃক্ষের উপর রাখ"। শচীমাতা শিশুকে নিমবৃক্ষে রাখলেন। পরে আচার্য শচীর কানে 'হরে কৃষ্ণ' মন্ত্র শোনালে শিশু স্তন্যপান করলেন। আচার্য বললেন: বালকের নাম আমি রাখলাম নিমাই। এ নামে বোধ লয়।

নিমাইয়ের মাতা শচীদেবী। পিতা জগন্নাথ মিশ্র। 'বিশ্বম্ভর' ও 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' তাঁর নামান্তর। ঈশ্বরপুরী তাঁর দীক্ষাগুরু এবং কেশব ভারতী তাঁর সন্ন্যাস মন্ত্রদাতা। ইনি অবিভক্ত ভারতে ধর্মবর্ণ, জাতপাত, উচ্চনীচ, আচারবিচারের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি অতিক্রম দ্বারা প্রবর্তন করেন প্রেমময় হরিনাম সংকীর্তনের। জগাই-মাধাই উদ্ধার, যবন হরিদাসের প্রতি কৃপা প্রভৃতি তাঁর বিশ্বজনীন মহাপ্রেমের স্মারক। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ তাঁর প্রধান পার্ষদ ও গোবিন্দ ছিলেন সেবক।

সন্ন্যাসী হবার আগে নিমাই ছিলেন সংস্কৃত টোলের পণ্ডিত। সত্যসন্ধান ও সত্য অধিষ্ঠানের জন্যে তিনি সব ত্যাগ করে পরম নামব্রহ্ম ধারণ করেন। শ্রীহট্ট (সিলেট) থেকে নদীয়া পর্যন্ত তিনি যে সর্বকুলপ্লাবী ভাবান্দোলনের বিস্তার ঘটান

মহাভাবাবেশে সর্বভারতে আজ পর্যন্ত তার তুলনা বিরল। প্রেমধর্মের উত্তুঙ্গ ভাবরসে তিনি সনাতন ধর্মের অচলায়তনে নতুন প্রাণ প্রবাহিত করেন। এতে বড়ো বিপ্লব কি এমনি এমনি হয়। এর জন্যে তাঁকে শচী মাতার স্নেহবন্ধন, স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার পিছুটান ছিন্ন করে, সব আরাম-আয়েশ, বেশভূষণ ত্যাগ করে ফকির হয়ে গলায় কাঁথা নিয়ে নেমে আসতে হয়েছিলো ঘর ছেড়ে পথে। নদীয়ায় তাঁর উত্থানপর্বের পবিপ্রেক্ষিত ফকির লালন শাঁইজির নিমাইলীলায় উদ্ভাসিত। ফকিরির কর্তব্য পালনে পার্থিব-সাংসারিক সব দায় পায়ে ঠেলে বেরিয়ে পড়তে হয়। "নদীয়া ভাবের কথা / অধীন লালন কী জানে তা / হা হুতাশে শচীমাতা/ বলে নিমাই দেখা দেরে" কিংবা "মার বুকে প্রবোধ দিয়া / নিমাই যায় সন্ন্যাসী হইয়া / লালন বলে ধন্য হিয়া / ঘটলো কী সামান্য জ্ঞানে"। সামান্য ও বিশেষ জ্ঞানের পার্থক্য নির্ণয় কবা না গেলে নিমাই লীলার মাহাত্ম্য বোঝা ভার।

কলির জীবকে উদ্ধার করতে জগতবন্ধু নিমাইরূপী শ্রীকৃষ্ণ পথে নামলেন কালের প্রবাহকে সত্যধর্মের দিকে গতিদান করতে। বিভেদ-বিভাজন কন্টকিত মানব সমাজকে সুপথের নির্দেশনা দিতেই মর্ত্যে তাঁর অবতরণ। আত্মসুখ, গরিমা, বৈভব সব ত্যাগ করে তিনি আত্মঘাতি বিলাসের ছদ্মবেশী হিংসাবৃত্তির মূলে আঘাত হানলেন অতুলনীয় অতিমানবীয় ঐশ্বর্যে। ইন্দ্রিয়বাদী ঐহিকতার কলুষ-কালিমা মোচন করতে হিংসাবৃত্তির প্রতিষেধক হিসেবে তিনি সামনে একটিই পথ দেখালেন, তা হলো ভগবতপ্রেমলব্ধ সর্বজীবহিতৈষী প্রেম। আজ থেকে প্রায় সাতশ বছর আগে নিমাই সন্ন্যাসীর এ ভাববিপ্লবের মূলে নিহিত আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা বিধৃত হয়েছে ফকির লালনের মহাপ্রেমময় নিমাইলীলায়। এ সত্য স্থানকাল ছাপিয়ে চিরকালীন মানবধর্মের উজ্জ্বল প্রামাণ্যরূপেই প্রতিভাত।

১৭৫.
এ ধন যৌবন চিরদিনের নয়।
অতিবিনয় করে নিমাই মায়েরে কয় ॥

কেউ রাজা কেউ বাদশাগিরি ছেড়ে কেউ নেয় ফকিরি।
আমি এ নিমাই কী ছার নিমাই হাল ছেড়ে বেহাল লয়েছি গায় ॥

কোনদিন পবন বন্ধ হবে এইদেহ শ্মশানে যাবে।
কোঠাবালাঘর কোথা রবে কার লোভ লালসে কেবল দুকূল হারায় ॥

রও শচীমাতা গৃহে যেয়ে আমারে বিসর্জন দিয়ে।
এই বলে নিমাই ধরে মায়ের পায় ফকির লালন বলে ধন্য ধন্য নিমাই ॥

১৭৬.
কানাই কার ভাবে তোর এ ভাব দেখিরে।
ব্রজের সে ভাব তো দেখি নারে ॥

পরনে ছিলো পীত ধড়া মাথায় ছিলো মোহন চূড়া করে বাঁশিরে।
আজ দেখি তোমার করঙ্গ কোপ্‌নি সার ব্রজের সে ভাব কোথায় রাখলিরে ॥

দাসদাসী ত্যাজিয়ে কানাই একা একাই ফিরছেরে ভাই কাঙ্গালবেশ ধরে।
ভিখারি হলি কাঁথা সার করলি কিসের অভাবেরে ॥

ব্রজবাসীর হয়ে নিদয় আসিয়ে ভাই এই নদীয়ায় কী সুখ পাইলিরে ॥
লালন বলে আর কার বা রাজ্য কার আমি সব দেখি আজ মিছেরে ॥

১৭৭.
কী কঠিন ভারতী না জানি।
কোন প্রাণে আজ পরালো কৌপিনী ॥

হেন ছেলে ফকির হয় যার শত শত ধন্য সে মা'র।
কেমনে রয়েছে সে ঘর ছেড়ে সোনার গৌরমণি ॥

পরের ছেলের দেখে এ হাল শোকানলে আমরা বেহাল।
না জানি আজ শোকে কী হাল জ্বলছে উহার মা জননী ॥

যে দিয়েছে এ কৌপনী ডোর তাঁরে বিধি দেখাইত মোর।
ঘুঁচাইত মনের ঘোর লালন বলে কিছু বাণী ॥

১৭৮.
কী ভাব নিমাই তোর অন্তরে।
মা বলিয়ে চোখের দেখা তাতে কি তোর ধর্ম যায়রে ॥

কল্পতরু হওরে যদি তবু মাবাপ গুরুনিধি।
এ গুরু ছাড়িয়া বিধি কে তোরে দিয়েছে হারে ॥

আগে যদি জানতে ইহা তবে কেন করলে বিহা।
এখন সেই বিষ্ণুপ্রিয়া কেমনে রাখিব ঘরে ॥

নদীয়াভাবের কথা অধীন লালন কি জানে তা।
হা-হুতাশে শচীমাতা বলে নিমাই দেখা দেরে ॥

১৭৯.
কে আজ কৌপিন পরালো তোরে।
তার কি দয়ামায়া কিছু নাই অন্তরে ॥

একপুত্র তুইরে নিমাই অভাগিনীর আর কেহ নাই।
কি দোষে আমায় ছেড়েরে নিমাই ফকির হলি এমন বয়সেরে ॥

মনে ইহা ছিলো তোরই হবিরে নাচের ভিখারি।
তবে কেন বিয়ে করলি পরের মেয়ে কেমনে আজ আমি রাখবো তারে ॥

ত্যাজ্য করে পিতামাতা কী ধর্ম আজ জানবি কোথা।
মায়ের কথায় চল কোপীন খুলে ফেল লালন কয় যেরূপ তাঁর মায়ে কয়রে ॥

১৮০.
ঘরে কি হয় না ফকিরি।
কেন হলিরে নিমাই আজ দেশান্তরী ॥

ভ্রমে বারো বসে তেরো বনে গেলে হয়।
সেও তো কথা নয় মন না হলে নির্বিকারি ॥

মন না মুড়ে কেশ মুড়ালে তাতে কি রতন মেলে।
মন দিয়ে মন বেঁধেছে যেজন তারই কাছে সদাই বাঁধা হরি ॥

ফিরে চলরে ঘরে নিমাই ঘরে সাধলেও হবে কামাই।
বলে এইকথা কাঁদে শচীমাতা ফকির লালন বলে লীলে বলিহারি ॥

১৮১.
দাঁড়ারে তোরে একবার দেখি ভাই।
এতোদিনে তোরে খুঁজে পাইনিরে কানাই ॥

ষড়ৈশ্বর্য ত্যাজ্য করে এলিরে ভাই নদেপুরে।
কী ভাবের ভাব তোর অন্তরে আমায় সত্য বল তাই ॥

তোর লেগে যশোদা রাণী হয়ে আছে পাগলিনী।
ও সে হায় নীলমণি নীলমণি সদাই ছাড়ছে হাঁই ॥

দৃষ্ট করে দেখো তুমি তোমার শ্রীদাম নফর আমি।
লালন বলে কেঁদে আখি ভাবের বলিহারি যাই ॥

১৮২.
ধন্য মায়ের নিমাই ছেলে।
এমন বয়সে নিমাই ঘর ছেড়ে ফকিরী নিলে ॥

ধন্যরে ভারতী যিনি সোনার অঙ্গে দেয় কৌপিনী।
শিখাইলে হরির ধ্বনি করেতে করঙ্গ নিলে ॥

ধন্য পিতা বলি তাঁরই ঠাকুর জগন্নাথ মিশ্রী।
যাঁর ঘরে গৌরাঙ্গ হরি মানুষরূপে জন্মাইলে ॥

ধন্যরে নদীয়াবাসী হেরিল গৌরাঙ্গশশী।
যে বলে সে জীবসন্ন্যাসী লালন কয় সে ফ্যারে প'লে ॥

১৮৩.
ধন্যরে রূপ সনাতন জগত মাঝে।
উজিরানা ছেড়ে সে না ডোর কৌপিনী সার করেছে ॥

শাল দোশালা ত্যাজিয়ে সনাতন কৌপনী কাঁথা করিল ধারণ।
অন্ন বিনে শাক সেবন সে জীবনরক্ষা করিয়েছে ॥

সে ছাড়িয়ে লোকের আলাপন একা প্রাণী কোনপথে ভ্রমণ।
বনপশুকে শুধায় ডেকে কোন পথে যায় ব্রজে ॥

সে হা হা প্রভু বলিয়ে আকুল হয় অমনি অঘাটে অপথে পড়ে রয়।
লালন বলে এমনই হালে গুরুর দয়া হয়েছে ॥

১৮৪.
ফকির হলিরে নিমাই কিসের দুঃখে।
খাবি দাবি নাচবি গাইবি দেখবো চোখে ॥

একা পুত্র তুইরে নিমাই অভাগীর তো আর কেহ নাই।
তোর বিনে আর জীবন জুড়াই কারে দেখে ॥

যে আশা মনে ছিলো সকলই নৈরাশ্য হলো।
কে তোরে কৌপিন পরলো মায়াত্যাগে ॥

শুনে শচীমাতার রোদন অধৈর্য হয় দেবতাগণ।
লালন বলে কী কঠিন মন নিমাই রাখে ॥

১৮৫.
বলরে নিমাই বল আমারে।
রাধা বলে আজগুবি আজ কাঁদলি কেন ঘুমের ঘোরে ॥

সেই যে রাধার কী মহিমা বেদাদিতে নাইরে সীমা।
ধ্যানে যারে পায় না ব্রহ্মা ও তুই কী রূপে জানলি তাঁরে ॥

রাধে তোমার কে হয় নিমাই সত্য করে বলো আমায়।
এমন বালক সময় এ বোল কে শিখালো তোরে ॥

তুমি শিশু ছেলে আমার মা হয়ে ভেদ পাইনে তোমার।
লালন কয় শচীর কুমার জগত করলো চমৎকারে ॥

১৮৬.
যে ভাবের ভাব মোর মনে।
সেই ভাবের ভাব আছে বলবো না তা কারো সনে।

জন্মের ভাগী অনেকজনা কর্মের ভাগী কেঁউ তো হয় না।
কাঁদি সেইদিনের কান্না বাঁধা ওই রাধার ঋণে ॥

ঘরের বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া রেখে এলাম ঘুমাইয়া।
নিতাই এসে জল ঢালিয়া শান্ত করবে আকুল প্রাণে ॥

মায়ের বুকে প্রবোধ দিয়া নিমাই যায় সন্ন্যাসী হইয়া।
লালন বলে ধন্য হিয়া ঘটলো কি সামান্যজ্ঞানে ॥

১৮৭.
শচীর কুমার যশোদায় বলে।
মা তোমার ঘরের ছেলে বলে অবহেলায় হারালে ॥

রাধার কথা কী বলবো মা তাঁর গুণের আর নাই সীমা।
মুনি ঋষি ধ্যানী জ্ঞানী না পায় চরণকমলে ॥

তুমি আমার জন্মগুরু রাধা আমার প্রেমকল্পতরু।
জয় রাধানামের গুরু ঘরে ঘরে নাম মাতালে ॥

যাঁর প্রেম সে জানে না লালন কয় তাঁর উপাসনা
অনন্তর অনন্ত করুণা আমি বুঝবো কোন ছলে ॥

১৮৮.
সে নিমাই কি ভোলা ছেলে ভবে।
ভুলেছে ভারতীর কথায় এমন কথা কেন বলো সবে ॥

যখন ব্রজবাসী ছিলো ব্রজের সব ভুলাইল।
সেই না গোরা নদেয় এলো দেখ নদের কারে না ভোলাবে ॥

আপনি হই কপট ভোলা ত্রিজগতের মনছলা।
কে বোঝে তাঁর লীলাখেলা বুঝতে গেলে ভুলে যাবে ॥

তাঁরে ছেলে বলে যে লোকসকল সে পাগল তার বংশ পাগল
লালন কয় আমি এক পাগল গুরুতে বেড়াই গৌর ভেবে ॥

গৌরলীলা

লীলাভূমিকা

শাঁইজির গৌরলীলায় শ্রীকৃষ্ণরূপী নিমাই সন্ন্যাসীই রূপান্তরিত হন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরূপে। এ গোরার আবির্ভাব কলিযুগে। 'গৌর' শব্দের ভাবার্থ হলো উন্নত উজ্জ্বল রস বা মধুররস যিনি বিকশিত করেন অন্ধকার মানববিশ্বে। দুঃখী জীব, দুঃখের পেষণে জর্জরিত তার জীবন। দুঃখ যাবে কী করে জানতে চায় সবাই। কিন্তু কেউ নিজেকে জানতে চায় না। নিজেকে জানা মানে সমগ্র বিশ্বসত্তাকে জানা। আরো নিগূঢ় কথা, জগতের যিনি মূলসত্তা, তিনি যে নিজেকে নিজে জানছেন, তা জানলেই জীব দুঃখবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। নিখিল বিশ্বে যতো কিছু, তার মূলে আছে নিখিলানন্দের আত্মাস্বাদনের আবেগ। ব্রহ্মাণ্ডের যতো বিভূতি তার মূলে রয়েছে রসব্রহ্মের রসের আকুতি।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সচ্চিদানন্দ। কালান্তরে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। ভিন্ন হয়েও অভিন্ন যিনি তিনি শ্রীরাধা, আস্বাদনের চমৎকারিতাই মহারস। এ রস সম্ভোগের চরম পরিণতিই নদীয়া বিনোদিয়া শ্রীগৌর বিশ্বম্ভর। রসব্রহ্মের স্ব-অনুভূতি আজ প্রকটিত হয়েছে এ ধরণীর ধূলিতে। পরমপুরুষের আস্বাদন-বিচিত্রতা আজ মূর্তরূপ পেয়েছে নদীয়ার রাজপথে। ভূমা নেমে এসেছেন ভূমিতে। রসের ছন্দে নেচে চলেছেন নবদ্বীপের বাজারের মধ্য দিয়ে। এ এক অঘটন। বলার কথা নয়। তবু তা ঘটেছে ইতিহাসে।

বিশ্বের যেটি মৌলিক সম্ভোগ, আদি আশ্রয়তত্ত্ব ও বিষয়তত্ত্বের নিবিড় মিলন– সেটির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধিত হয় শ্রীরাধাগোবিন্দের একাত্মতায় শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরে। সে কথাটি জানাতেই ফকির লালন শাঁইজির গৌরাঙ্গলীলায় পুনঃঅবতরণ। জানার কথা মাত্র দুটি। একটি তাঁর নিরুপম বিগ্রহ। অন্যটি তাঁর অফুরন্ত অনুগ্রহ। বিগ্রহটি সোনার গৌরাঙ্গসুন্দর রাধাভাবদ্যুতিময় শ্যামল নাগর। আর অনুগ্রহটি হরিনাম বিতরণে, নামপ্রেমের মালা গেঁথে বেদনাহত জীবের কণ্ঠে সমর্পণে। বস্তুর বাইরের অভিব্যক্তিই দ্যুতি। প্রাকৃত বস্তুর ভেতর-বার ভিন্ন। অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর তা নয়। অপ্রাকৃত কান্তি বস্তুর স্বরূপ থেকে পৃথক কিছু নয়। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে শ্যামবর্ণ তা নিরর্থক নয়। শৃঙ্গাররসের বর্ণই হলো শ্যাম। যিনি শৃঙ্গার রসরাজ মূর্তিধর তিনি শ্যামসুন্দরই হবেন।

অনুরাগের বর্ণটি অরুণ। গাঢ় অনুরাগের বা মহাভাবের বর্ণটি হলো গৌর। মহাভাবময়ী ভানুবালা গৌরাঙ্গী। বর্ণটির অভিব্যক্তি ঘটে ভাবের প্রগাঢ়তায়। মহাভাববতী মোহনভাব অন্তরে গ্রহণ করলে শ্যামের বাইরের কান্তি স্বতই রূপায়িত হবে। মধুররসের বর্ণ শ্যাম বটে, কিন্তু যতক্ষণ তা কাঁচা। রসালো হতে হতে পাকলেই কিন্তু গৌর।

রসের আস্বাদ ভাবে। ভাবের অভিব্যক্তি রসে। নিখিল রসের অধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ। নিখিল ভাবের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা। একই রসব্রহ্ম অখণ্ড থেকেই আস্বাদক এবং আস্বাদ্যরূপে দুভাবে ব্যক্ত। ভাবের পরিপূর্ণতায় রসের পূর্ণ আস্বাদন। মহাভাব ছাড়া রসরাজের সম্ভোগে চরম আনন্দ লাভ হয় না।

রসের বিষয়কে আশ্রয় হতে হয়। শ্রীশ্যামসুন্দরকে শ্রীরাধা হতে হয়। বিলাসের জন্যেই একের দ্বৈত্য। আবার নতুন বৈচিত্রভোগের জন্যে দ্বৈত্যের একত্ব। দ্বৈতের বৈচিত্র্যময় নবরসের অদ্বয় ব্রহ্মই শ্রীবাস অঙ্গনের নাটুয়া বিষ্ণুপ্রিয়েশ শ্রীগৌরহরি।

শান্তিহারা জীব চায় শান্তিময়কে। তাঁকে ছুঁতে চায় অন্তর দিয়েই। কিন্তু কেউ পারে আবার কেউ পারে না। পারে না যারা তাদের জন্যে মানুষের দুয়ারে নেমে আসেন পরাৎপর মহাপুরুষ। করুণায় বিগলিত হয়ে বিলিয়ে দিলেন আপনাকে, আপনার অভিন্ন মহানামকে। দিলেন উজ্জ্বল সুতোয় গেঁথে নামের মালা।

নাম হলো সাধন। প্রেমধন হলো সাধ্য। সাধ্য ও সাধন একত্রীভূত করে দুলিয়ে দিলেন ব্যথাহত মানুষের বুকে। নিভে গেলো অশান্তির দাউ দাউ আগুন। প্রশান্তি পেলো আপামর সবাই আকাশের মতো তাঁর উদার ছায়াতলে। হরিকীর্তনের উন্মাদনায় জাতি জেগে উঠলো নবতর চেতনায়। এ মহাসত্য ফকির লালন শাঁইজি আবার বয়ে আনেন আমাদের শ্রবণ-দর্শনে।

সংকীর্তনের পিতা মহাপ্রভু। হরি, কৃষ্ণ, রাম– এসব নিত্যকালের নাম, নতুন কিছু নয়। কীর্তন কথাটিও নতুন নয়। তবে কী দিলেন জন্মদাতা? নামও ছিলো, কীর্তনও ছিলো। কিন্তু ছিলো না এত মধুরিমা, ছিলো না এতো উন্মাদনা। কীর্তনের পিতা প্রবেশ করিয়ে দিলেন নামের মধ্যে ব্রজমাধুর্য্য। নামাক্ষরের মধ্যে উজ্জ্বল রস প্রবাহিত করে তাঁতে যুগিয়েছেন নতুনতর প্রেরণা।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যখন হরিনাম করেন উদাত্ত কণ্ঠে তখন কেবল মুখেই নাম করেননি। তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে, তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে সেই কীর্তন করেন। তাঁর অন্তরের মধ্যে তিনটি বাঞ্ছার পরিপূর্ণ আস্বাদন, তা কণ্ঠোৎসারিত নামাক্ষরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে।

শব্দে যদি বেদনা থাকে তবেই তা চেতনা জাগাতে পারে। গৌরকণ্ঠের 'কৃষ্ণ' শব্দে আছে বিরহিনী রাধার পুঞ্জিত বেদনা। তাই জীবের হৃদয়ে তা চৈতন্য এনে গৌরের কৃষ্ণচৈতন্য নাম সার্থক করেছে। 'হরি' শব্দ চিরকালই ছিলো। আজ শ্রীগৌরমুখে ঐ নাম যে অভূতপূর্ব আকর্ষণ জাগলো তা চিরসন্নিবিষ্ট হয়ে রইলো নামের অভ্যন্তরে। এটাই দাতা শিরোমনির মহাদান। জীব-ঈশ্বরের সম্বন্ধ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ। অচিন্ত্যঅর্থে কেবল চিন্তার অতীত নয়, চিন্তারাজ্যেরও অতীত। তবে রসের রাজ্যে ভেদাভেদ সম্ভব। জীব তাঁর অংশ বলে ভেদবিশিষ্ট, কিন্তু রসের অনুভূতিতে, ভালোবাসায়, তাঁর সঙ্গে একাত্মতা অনুভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণ রসিক শেখর, অনন্ত রসের সিন্ধু। জীবের সঙ্গে তাঁর রসের সম্বন্ধ হয়। তিনি পুত্র হন, সখা হন, প্রাণবল্লভ হন। যখন প্রাণবল্লভ হন তখন তাঁর সঙ্গে জীবের অভিন্ন মননে একাত্মতা হয়।

লৌকিক জীবনযাপনে যে রকম পতিপত্নীর গভীর মিলনে প্রায় একাত্মতার অনুভূতি হয়, আবার পতিসেবার জন্যে পত্নীর পৃথকত্ববোধও জাগে–অপ্রাকৃত লীলারসের আস্বাদনেও তেমন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের একাত্মতা-অভিন্নতা অনুভূত হয়, আবার শ্রীকৃষ্ণ সেবার জন্যে পৃথকত্বের ভাবনাও জাগে। এ একত্ব ও পৃথকত্ব অচিন্ত্যভাবে মিলিত হয়েছে। একেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বলা হয়। ভেদ + অভেদ = ভেদাভেদ।

ভক্তি প্রগাঢ়ত্বপ্রাপ্ত হয়ে জ্ঞানশূন্য হলে শুদ্ধভক্তিতে পরিণত হয়। শুদ্ধভক্তি গাঢ়ত্বপ্রাপ্ত হয়ে প্রেমভক্তি হয়। প্রেমভক্তি গাঢ়ত্বপ্রাপ্ত হয়ে যখন প্রণয়ভূমিতে উপনীত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের অভিন্ন মনন হয়। এসবই অপরোক্ষ অনুভূতিবেদ্য। বিচার-ভূমিকায় এর অবস্থিতি নেই। 'অখিলরসামৃতমূর্তি'– এটি হলো শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তিনি রসিকেন্দ্রচূড়ামণি।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ শুধু তাত্ত্বিক বা দার্শনিক সিদ্ধান্ত নয়, এটি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের জীবনলীলায় মূর্তিমন্ত হয়েছে। এ দার্শনিক সিদ্ধান্তের মূর্তরূপ (embodiment) হলেন শ্রীগৌরচন্দ্র।

রাধা আরাধিকা। রাধাই শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্য। আরাধ্যআরাধিকা এক অঙ্গে দ্রবীভূত হলেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ। দুই অভিন্ন বলে এটা সম্ভবপর হয়েছে। শ্রীমতী যখন শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলে মিশে একীভূত হয়ে যাচ্ছেন তখন সখী ললিতা তাঁকে স্পর্শ করেন। বলেন: "সখী! এপথে মিলিত হলে পরমানন্দ হবে বটে, কিন্তু পৃথক থেকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরূপদর্শন, চরণসেবন, সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন হবে কী করে?" শ্রীমতী তখন নিবৃত্ত হলেন, আর মিশলেন না। যেটুকু মেশা

বাকী ছিলো, সেটুকু হলেন গদাধর। শ্রীরাধা অখণ্ডবস্তু। তিনি দুখণ্ড হলেন না। মিলিত হবার বাঞ্ছাও পূর্ণ হলো, অমিলিত থেকে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের শাশ্বত বাঞ্ছাও পূর্ণ হলো। এটি চিন্তারাজ্যের অতীত ঘটনা। রসরাজ্যেই এমন ঘটনডো সম্ভব হলো। এটিই অচিন্ত্য ভেদাভেদ। ফকির লালন শাঁইজি এ অচিন্ত্য ভেদাভেদকেই আবার দান করলেন অভেদ রূপ।

১৮৯.
আগে কে জানে গো এমন হবে।
গৌরপ্রেম করে আমার কুলমান যাবে ॥

ছিলাম কুলের কুলবালা প্রেমফাঁসে বাঁধলো গলা।
টানলে তো আর না যায় খোলা বললে কে বোঝে ॥

যা হবার তাই হলো আমার সেসব কথায় কী ফল আর।
জল খেয়ে জাতের বিচার করলে কী হবে ॥

এখন আমি এই বর চাই যাতে মজলাম তাই যেন পাই।
লালন বলে কুল বালাই গেলো ভবে ॥

১৯০.
আজ আমার অন্তরে কী হলো গো সই।
আজ ঘুমের ঘোরে চাঁদ গৌর হেরে আমি যেন আমি নাই ॥

আজ আমার গৌরপদে মন হরিল আর কিছু লাগে না ভালো
আমার সদাই মনের চিন্তা ঐ আমার সর্বস্ব ধন গৌরধন
চাঁদ গৌরাঙ্গ ধন সে ধন কিসে পাই গো তাই শুধাই ॥

যদি মরি গৌর-বিচ্ছেদবাণে গৌর নাম শুনাইও আমার কানে
সর্বাঙ্গে লেখো নামের বই ঐ বর দে গো সবে
আমি জনমে জনমে যেন ঐ গৌরপদে দাসী হই ॥

বন পোড়ে তা সবাই দেখে মনের আগুন কে বা দেখে
আমার রসরাজ চৈতন্য বৈ গোপীর এমনই পড়ে দশা
ও কী মরণদশা অবোধ লালনরে তোর সে ভাব কই ॥

১৯১.
আজ আমায় কোপনী দে গো ভারতী গোঁসাই।
কাঙ্গাল হবো মেগে খাবো রাজরাজ্যের আর কার্য নাই ॥

সদাই যদি নাহি পারি ভিক্ষার ছলে বলবো হরি।
ঐ বাসনা মনে করি হরির গুণ গাই ঠাঁইঅঠাঁই ॥

সাধুশাস্ত্রে জানা গেলো সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভালো।
খাই বা না খাই নিষ্কলহ তাতে যদি মুক্তি পাই ॥

স্বপ্নে যেমন রাজরাজ্য পাই চেতন হলে সব মিথ্যা হয়।
তেমনই যেন সংসারময় লালন ফকির কেঁদে কয় ॥

১৯২.
আর কি আসবে সেই গৌরচাঁদ এই নদীয়ায়।
সে চাঁদ দেখলে গো সখী তাপিত প্রাণ শীতল হয় ॥

চাতকরূপ পাখি যেমন করে সে প্রেম নিরূপণ।
আছি তেমন প্রায় কারে বা শুধাই সে চাঁদের উদ্দিশ কে কয়।

একদিন সে চাঁদ গৌরাঙ্গ গোপীনাথতলায় গেলো।
হারায় সেথায় সোনার নদীয়া সেই হতে অন্ধকার হয় ॥

গৌরচাঁদ এই সচক্ষে যেজনা একবার দেখে।
দুঃখ দূরে যায় ভজনহীন তাই লালন কি তা জানতে পায় ॥

১৯৩.
আর কি গৌর আসবে ফিরে।
মানুষ ভজে যে যা করে গৌরচাঁদ গিয়েছে সেরে ॥

একবার এসে এই নদীয়ায় মানুষরূপে হয়ে উদয়।
প্রেম বিলালে যথাতথায় গেলেন প্রভু নিজপুরে ॥

চারযুগের ভজনাদি বেদেতে রাখিয়ে বিধি।
বেদের নিগূঢ়রসপত্তি সঁপে গেলেন শ্রীরূপেরে ॥

আর কি আসবে অদ্বৈত গোঁসাই আনবে গৌর এই নদীয়ায়।
লালন বলে সে দয়াময় কে জানিবে এ সংসারে ॥

১৯৪.
আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছেন গোরা।
মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপীন পরা ॥

গোরা হাসে কাঁদে ভাবের অন্ত নাই সদাই দীন দরদী বলে ছাড়ে হাঁই।
জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা হয়েছে কী ধনহারা ॥

গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে আপনি মেতে জগত মাতিয়েছে।
হায় কী লীলে কলিকালে বেদবিধি চমৎকারা ॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয় গোরা তার মাঝে এক দিব্যযুগ দেখায়।
লালন বলে ভাবুক হলে সেই ভাব জানে তারা ॥

১৯৫.
আয় কে যাবি গৌরচাঁদের হাটে।
তোরা আয় না মনে হয়ে খাঁটি ধাক্কায় যেন যাসনে চটে ফেটে ॥

প্রেমপাথারে তুফান ভারি ধাক্কা লাগে ব্রহ্মপুরী।
কর্মগুণে কর্মতরী কারো কারো তাতে বেঁচে ওঠে ॥

চতুরালি থাকলে বলো প্রেমযাজনে বাঁধবে কলহ।
হারিয়ে শেষে দুটি কুলও কাঁদাকাটি লাগবে পথে ঘাটে ॥

আগে দুঃখ পাছে সুখ হয় সয়ে বয়ে কেউ যদি রয়।
লালন বলে প্রেমপরশ পায় সামান্য মনে তাই কি ঘটে ॥

১৯৬.
আঁচলা ঝোলা তিলক মালা মাটির ভাঁড় দেবে হাতে।
গৌরকলঙ্কিনী ধনী হোস্‌নে লো কোনোমতে ॥

মোটা মোটা মালা গলে তিলক চন্দন তাঁর কপালে।
থাকতে হবে গাছের তলে মালাতে হবে জল খেতে ॥

বৃন্দাবনের ন্যাড়ান্যাড়ী বেড়ায় ব্রজের বাড়ি বাড়ি।
তারা যোগাড় করে সেবার কাড়ি শাক চচ্চড়ি ওল ভাতে ॥

গৌরপ্রেমের করে আশা দেখে যা আমাদের দশা।
ঘর ছেড়ে জঙ্গলে বাসা কামড়ায় মশামাছিতে ॥

গৌরপ্রেম এমনই ধরন ব্রজগোপীর অকৈতব করণ।
সিরাজ শাঁইয়ের চরণ ভুলেরে লালন বেড়ায় অকূলেতে ॥

১৯৭.
এ কি আমার কবার কথা আপন বেগে আপনি মরি।
গৌর এসে হৃদয়ে বসে করলো আমার মনচুরি ॥

কি বা গৌর রূপ লম্পতে ধৈর্যডুরি দেয় গো কেটে।
লজ্জাভয় সব পলায় ছুটে যখন ঐ রূপ মনে করি ॥

গৌর দেখা দিলো ঘুমের ঘোরে চেতন হয়ে পাইনে তাঁরে।
পালাইলো কোন শহরে নবদলের রাসবিহারী ॥

মেঘে যেমন চাতকেরে দেখা দিয়ে ফাঁকে ফেরে।
লালন বলে তাই আমারে করলেন গৌর বরাবরই ॥

১৯৮.
এনেছে এক নবীন গোরা নতুন আইন নদীয়াতে।
বেদ-পুরাণ সব দিচ্ছে দুষে সেই আইনের বিচারমতে ॥

সাতবার খেয়ে একবার স্নান নাই পূজা তাঁর নাই পাপপুণ্যিজ্ঞান।
অসাধ্যের সাধ্য বিধান বিলাচ্ছে সব ঘাটে পথে ॥

না করে সে জাতের বিচার কেবল শুদ্ধপ্রেমের আচার
সত্যমিথ্যা দেখো প্রচাব সাঙ্গপাঙ্গ জাতঅজাতে ॥

শুনে ঈশ্বরের রচনা তাই বলে সে বেদ মানে না।
লালন কয় ভেদ উপাসনা কর দেখি মন দোষ কী তাতে ॥

১৯৯.
ঐ গোরা কি শুধুই গোরা ওগো নাগরী।
দেখি দেখি ঠাওরে দেখি কেমন শ্রীহবি ॥

শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ মাখা নযন দুটি আঁকাবাঁকা।
মন জেনে দিচ্ছে দেখা ব্রজের হরি ॥

না জানি কোন ভাব লয়ে এসেছে শ্যাম গৌর হয়ে।
ক'দিন বা বাখবে ঢেকে নিজ মাধুরী ॥

যে হোক সে হোক না গোরা করবে কূলের কূলছাড়া।
লালন বলে দেখলো যারা সৌভাগ্য তারই ॥

২০০.
ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামান্যে কি পাববি তোরা।
কুলশীল ইস্তফা দিয়ে হতে হবে জ্যান্তে মরা ॥

থেকে থেকে গোরার হৃদয় কতো না ভাব হয় গো উদয়।
ভাব জেনে ভাব দিতে সদাই জানবি কঠিন কেমন ধারা ॥

পুরুষনারীর ভাব থাকিতে পারবিনে সে ভাব রাখিতে।
আপনার আপনি হয় ভুলিতে যেজন গৌররূপ নিহারা ॥

গৃহে ছিলি ভালই ছিলি গৌরহাটায় কেন মরতে এলি।
লালন বলে কী আর বলি দুকুল যেন হোস্‌নে হারা ॥

২০১.
কাজ কী আমার এ ছারকূলে।
আমার যদি গৌরচাঁদকে মেলে ॥

মনচোরা পাসরা গোরা রায় অকূলের কূল জগতময়।
যে নবকুল আশায় সে কূল দোষায় বিপদ ঘটবে তার কপালে ॥

কূলে কালি দিয়ে ভজিব সই অন্তিমকালের বন্ধু যে ওই।
ভববন্ধুজন কী করবে তখন দীনবন্ধুর দয়া না হইলে ॥

কুলগৌরবী লোক যারা গুরুগৌরব কী জানে তারা।
যে ভাবের লাভ জানা যাবে সব লালন বলে আখের হিসাবকালে ॥

২০২.
কী বলিস্ গো তোরা আজ আমারে।
চাঁদ গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ ফণী দংশিল যার হৃদয় মাঝারে ॥

গৌররূপের কালে যারে দংশায় সে বিষ কি ওঝাতে পায়।
বিষ ক্ষণেক নাই ক্ষণেক পাওয়া যায় ধন্বন্তরী ওঝা যায়রে ফিরে

ভুলবো না ভুলবো না বলি কটাক্ষেতে অমনি ভুলি।
জ্ঞানপবন যায় সকলই ব্রহ্মমন্ত্রে ঝাড়িলে না সারে ॥

যদি মেলে রসিক সুজন রসিকজনার জুড়ায় জীবন।
বিনয় করে বলছে লালন অরসিকের দুঃখ হরে ॥

২০৩.
কে দেখেছে গৌরাঙ্গচাঁদেরে।
সে চাঁদ গোপীনাথ মন্দিরে গেলো আর তো এলো না ফিরে ॥

যাঁর জন্যে কূলমান গেলো সে আমারে ফাঁকি দিলো।
কলঙ্কে জগত রটিল লোকে বলবে কী আমারে ॥

দরশনে দুঃখ হরে পরশিলে পরশ করে।
হেন চন্দ্র গৌর আমার লুকালো কোন শহরে ॥

যে গৌর সেই গৌরাঙ্গ হৃদ মাঝারে আছে গৌরাঙ্গ।
লালন বলে হেন সঙ্গ হলো না কর্মের ফ্যারে ॥

২০৪.
কেন চাঁদের জন্যে চাঁদ কাঁদেরে এই লীলার অন্ত পাইনেরে।
দেখে শুনে ভাবছি বসে সেইকথা কই কারে ॥

আমরা দেখে এই গৌরচাঁদ ধরবো বলে পেতেছি ফাঁদ।
আবার কোন চাঁদেতে এ চাঁদেরও মন হরে ॥

জীবেরে কি ভুল দিতে সবাই গৌরচাঁদ আর চাঁদের কথা কয়।
পাইনে এবার কী ভাব উহার অন্তরে ॥

এ চাঁদ সে চাঁদ করে ভাবনা মন আমার আজ হলো দোটানা।
বলছে লালন প'লাম এখন কী ঘোরে ॥

২০৫.
কোন রসে প্রেম সেধে হরি গৌরবরণ হলো সে।
না জেনে সেই রসের মর্ম প্রেমযাজন কার হয় কিসে ॥

প্রভুর যে মত সেই মত সার আর যতো সব যায় ছারেখার।
তাইতে ঘুরি কিবা করি ব্রজের পথের পাইনে দিশে ॥

অনেকে কয় অনেক মতে ঐক্য হয় না মনের সাথে।
ব্রজের তত্ত্ব পরমার্থ ফিরি তাই জানার আশে ॥

কর্মে থেকে নিষ্কামী হয় আজব একটা এও জানা যায়।
কী মর্ম তায় কে জানতে পায় লালন তাই ভাবে বসে ॥

২০৬.
গোল করো না গোল করো না ওগো নাগরী।
দেখ দেখি ঠাউরে দেখি কেমন ঐ গৌরাঙ্গ হরি ॥

সাধু কী ও যাদুকরী এসেছে এই নদেপুরী।
খাটবে না হেথায় ভারিভুরি তাই ভেবে মরি ॥

বেদ-পুরাণে কয় সমাচার কলিতে আর নাই অবতার।
যে কয় সেই গিরিধর এসেছে নদেপুরী ॥

বেদে যা নাই তাই যদি হয় পুঁথি পড়ে কেন মরতে যায়।
লালন বলে ভজবো সদাই ঐ গৌরহরি ॥

২০৭.
গৌর আমার কলির আচার বিচার কি আইন আনিলে।
কীভাবে হয়ে বৈরাগী গৌর কুলের আচার-বিচার সব ত্যাজিলে ॥

হরি বলে গৌর রাইপ্রেমে আকুল হয় নয়নের জলে বদন ভেসে যায়
দেখে উহার দশা সবাই জ্ঞান নৈরাশা
আপনি কেঁদে জগতকে কাঁদালে ॥

এ ভাবজীবের সম্ভব নয় দেখে লাগে ভয়
চণ্ডালেরে প্রভু আলিঙ্গন দেয় নাই জাতের বোল বলে হরিবোল
বেদ-পুরাণাদি সব ছাড়িলে ॥

গৌর সিংহের হুঙ্কার ছাড়েন বারেবার নদীয়াবাসী সব কাঁপে থরথর
প্রেমতত্ত্ব রাগতত্ত্ব জানালে সব অর্থ
লালন কয় ঘটলো না মোর কপালে ॥

২০৮.
গৌর কি আইন আনিলেন নদীয়ায় এ তো জীবের সম্ভব নয়।
আন্‌কা আচার আন্‌কা বিচার দেখে শুনে লাগে ভয় ॥

ধর্মাধর্ম বলিতে কিছুমাত্র নাইকো তাতে প্রেমের গুণ গায়।
জাতের বোল রাখে না সে তো করলো একাকারময় ॥

শুদ্ধাশুদ্ধ নাই জ্ঞান সাতবার খেয়ে একবার স্নান করে সদাই।
আবার অশুদ্ধকে শুদ্ধ করে জীবে যা না ছোঁয় ঘৃণায় ॥

যবন ছিলো কবীর খাস তাঁরে প্রভুপদে দাস করলে গৌর রাই।
লালন বলে যবনবংশে জামালকে বৈরাগ্য দেয় ॥

২০৯.
গৌরপ্রেম অথৈ আমি ঝাঁপ দিয়েছি তাই।
এখন আমার প্রাণে বাঁচা ভার করি কী উপায় ॥

একেতে প্রেমনদীর জলে ঠাঁই মেলে না নোঙর ফেলে।
বেহুঁশেতে নাইতে গেলে কামকুম্ভীরে খায় ॥

ইন্দ্রবারি শাসিত করে উজানভেটেন বাইতে পারে।
সে ভাব আমার নাই অন্তরে কৈট সাধি কোথায় ॥

গৌরপ্রেমের এমনই ল্যাটা আসতে জোয়ার যেতে ভাটা।
না বুঝে মুড়ালাম মাথা অধীন লালন কয় ॥

২১০.
গৌরপ্রেম করবি যদি ও নাগরী কুলের গৌরব আর করো না।
কুলের লোভে মান বাড়াবি কুল হারাবি গৌরচাঁদ দেখা দেবে না ॥

ফুল ছিটাও বনে বনে মনে মনে বনমালি ভাব জানো না।
চৌদ্দ বছর বনে বনে রামের সনে সীতা লক্ষ্মণ এই তিনজনা ॥

যতোসব টাকাকড়ি এ ঘরবাড়ি কিছুই তো সঙ্গে যাবে না।
কেবল পাঁচ কড়ার কড়ি কলসি দড়ি কাঠখড়ি আর চট বিছানা ॥

গৌরের সঙ্গে যাবি দাসী হবি এটাই মনে কর বাসনা।
লালন কয় মনে প্রাণে একই টানে এই পিরিতে খেদ মেটে না ॥

২১১.
গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু দেখি।
গৌর দেখতে গুরু হারাই কোনরূপে দিই আঁখি ॥

গুরু গৌর রইল দুই ঠাঁই কীরূপে একরূপ করি তাই।
এক নিরূপণ না হলে মন সকলই হবে ফাঁকি ॥

প্রবর্তের নাই উপাসনা আন্দাজে কি হয় সাধনা।
মিছে সদাই সাধুর হাটায় নাম পাড়ায় সাধকই ॥

একরাজ্যে দুইজন রাজা কারে বা কর দেবে প্রজা।
লালন প'লো তেমনই গোলে খাজনা তো রইল বাকি ॥

২১২.
চাঁদ বলে চাঁদ কাঁদে কেনে।
আমার গৌরচাঁদ ত্রিভুবনের চাঁদ চাঁদে চাঁদ ঘেরা ঐ আবরণে ॥

গৌরচাঁদে শ্যামচাঁদেরই আভা কোটি চন্দ্র জিনি শোভা।
রূপে মুনির মন করে আকর্ষণ ক্ষুধাশান্ত সুধা বরিষণে ॥

গোলকের চাঁদ গোকুলেরই চাঁদ নদীয়ায় গৌরাঙ্গ সেহি পূর্ণচাঁদ।
আর কী আছে চাঁদ সে আর কেমন চাঁদ আমার ঐ ভাবনা মনে মনে ॥

লয়েছি এই গলে গৌরচাঁদের ফাঁদ আবার শুনি আছে পরম চাঁদ।
থাক সে চাঁদের গুণ কেঁদে কয় লালন আমার নাই উপায় চাঁদ গৌর বিনে ॥

২১৩.
জান গা যা গুরুর দ্বারে জ্ঞান উপাসনা।
কোন মানুষের কেমন কৃতি যাবেরে জানা ॥

পুরুষ পরশমণি কালাকাল তাঁর কিসে জানি।
জল দিয়ে সব চাতকিনী করে সান্ত্বনা ॥

যাঁর আশায় জগত বেহাল তাঁর কি আছে সকাল বিকাল।
তিলক মন্ত্রে না দিলে জল ব্রহ্মাণ্ড রয় না ॥

বেদবিধির অগোচর সদাই কৃষ্ণপদ্ম নিত্য উদয়।
লালন বলে মনের দ্বিধায় কেউ দেখেও দেখে না ॥

২১৪.
ধর গো ধর গৌরাঙ্গচাঁদেরে।
গৌর যেন পড়ে না বিভোর হয়ে ভূমের উপরে ॥

ভাবে গৌর হয়ে মত্ত বাহু তুলে করে নৃত্য।
কোথায় হস্ত কোথায় পদ ঠাহর নাই তাঁর অন্তরে ॥

মুখে বলে হরি হরি দু'নয়নে বহে বারি।
ঢলঢল তনু তাঁরই বুঝি পড়ামাত্র যায় মরে ॥

কার ভাবে শচীসুতা হালসে বেহাল গলে কাঁথা।
লালন বলে ব্রজের কথা বুঝি পড়েছে মনের দ্বারে ॥

২১৫.
ধন্য মায়ের ধন্য পিতা।
তাঁর গর্ভে জন্মাইল নন্দের কানু গৌরাঙ্গসূতা ॥

ধন্য বলি শ্রীদাম সখা অনেক দিনের পরে দেখা।
আশ্চর্য এই বেঁচে থাকা ধৈর্য ধরতে পারি না তা ॥

ধন্যরে ভারতী ভারি দেখাইল নদেপুরী।
ফুলবিছানা ত্যাজ্য করি গলে নিলো ছেঁড়া কাঁথা ॥

ধন্যরে যশোদার ক্রোড় বেঁধেছিলো জগদীশ্বর।
লালন কয় ভাব শুনে বিভোর বুঝার কিছু নাই ক্ষমতা।

২১৬.
নতুন দেশের নতুন রাজন।
এসেছে এই নদে ভুবন ॥

যাঁর অঙ্গে এই অঙ্গধারণ তাঁরে তো চিনো নাই তখন।
মিছে কেন করছো রোদন ওগো যশোদা এখন ॥

ভাবনা কী আর আছে তোমার তোমার তো গৌরাঙ্গ কুমার
সাঙ্গপাঙ্গ লয়ে এবার শান্ত করি এ ছারজীবন ॥

ভক্তিভক্তের সঙ্গধারী অভক্তের অঙ্গ না হেরি।
লালন কয় সে বিনয় করি আমার কেবল মিছে যাজন ॥

২১৭.
প্রাণগৌররূপ দেখতে যামিনী।
কতো কুলের কন্যে গোরার জন্যে হয়েছে পাগলিনী ॥

সকাল বেলা যেতে ঘাটে গৌরাঙ্গ রূপ উদয় পাটে।
গেরুয়া ধারণ তাঁর করেতে করঙ্গ কটিতে ডোর কোপিনী

আনন্দ আর মন মিলে কুল মজালে এই দুজনে।
তারা ঘরে রইতে না দিলে করেছে পাগলিনী ॥

ব্রজে ছিলো কালোধারণ নদেয় এসে গৌরবরণ।
লালন বলে রাগের করণ দরশনে রূপজপনী ॥

২১৮.
প্রেম কি সামান্যেতে রাখা যায়।
প্রেমে মজলে ধর্মাধর্ম ছাড়তে হয় ॥

দেখরে সেই প্রেমের লেগে হরি দিলো দাসখত লিখে।
ষড়ৈশ্বর্য ত্যাজ্য করে কাঙ্গাল হয়ে ফেরে নদীয়ায় ॥

ব্রজে ছিলো জলদ কালো প্রেম সেধে গৌরাঙ্গ হলো।
সে প্রেম কি সামান্য বলো যে প্রেমের রসিক দয়াময় ॥

প্রেম পিরিতের এমনই ধারা এক মরণে দুইজন মরা।
ধর্মাধর্ম চায় না তাঁরা লালন বলে প্রেমের রীতি তাই ॥

২১৯.
বল গো সজনী আমায় কেমন সেই গৌরগুণমণি।
জগতজনার মন মজায়ে করে পাগলিনী ॥

একবার যদি দেখতাম তাঁরে রাখতাম সে রূপ হৃদয়পুরে।
রোগশোক সব যেতো দূরে শীতল হতো তাপিত প্রাণী ॥

মনমোহিনীর মনোহরা দেখলি কোথায় সেই যে গোরা।
আমায় লয়ে চল গো তোরা দেখে শীতল হই গো ধনী ॥

নদেবাসীর ভাগ্য ভালো গৌর হেরে মুক্তি পেলো।
অবোধ লালন ফাঁকে প'লো না পেয়ে সে চরণখানি ॥

২২০.
বলো স্বরূপ কোথায় আমার সাধের প্যারি
যার জন্যে হয়েছিরে দণ্ডধারী ॥

রামানন্দ দরশনে পূর্বভাব উদয় মনে।
যাবো আমি কার বা সনে সেহি পুরী ॥

কোথায় সে নিকুঞ্জবন কোথায় যমুনা এখন।
কোথায় সে গোপিনীগণ আহা মরি ॥

আর কিরে সেই সঙ্গ পাবো মনের সাধ পুরাইব।
পরমানন্দে রবো ঐরূপ হেরি ॥

গৌরচাঁদ ঐ দিন বলে আকুল হলাম তিলে তিলে।
লালন বলে সেহি লীলে কী যে মাধুরী ॥

২২১.

বুঝবিরে গৌরপ্রেমের কালে আমার মতো প্রাণ কাঁদিলে।
দেখা দিয়ে গৌর ভাবের শহর আড়ালে লুকালে ॥

যেদিনে গৌর হেরেছি আমাতে কী আমি আছি।
কী যেন কী হয়ে গেছি প্রাণ কাঁদে গৌর বলে ॥

তোরা থাক জাতকুল লয়ে আমি যাই চাঁদ গৌর বলে।
আমার দুঃখ না বুঝিলে দেখ এক মরণে না মরিলে ॥

চাঁদমুখেতে মধুর হাঁসি আমি ঐরূপ ভালবাসি।
লোকে করে দ্বেষাদ্বেষী গৌর বলে যাই চলে ॥

একা গৌর নয় গৌরাঙ্গ নয়ন বাঁকা শ্যাম ত্রিভঙ্গ।
এমনই তাঁর অঙ্গসঙ্গ লালন কয় জগত মাতালে ॥

২২২.

ব্রজের সে প্রেমের মরম সবাই কি জানে।
শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ হলো যে প্রেমসাধনে ॥

বিশেষ আর সামান্যরতি উজান চলে মৃণালগতি।
বিশেষে সেধে রতি হয় গো সামান্যে ।

প্রেমসই কমলিনী রাই কমলাকান্তে কামরূপ সদাই।
সাধে প্রেম এই দুজনায় প্রণয় কেমনে ॥

সামান্যে কি হয় রাইরতি দান্ শ্যামরতির কি হয় বিধান।
ফকির লালন বলে তার কী সন্ধান হয় গুরু বিনে ॥

২২৩.

ভজোরে আনন্দের গৌরাঙ্গ।
যদি তরিতে বাসনা থাকে ধরোরে মন সাধুর সঙ্গ ॥

সাধুর গুণ যায় না বলা শুদ্ধচিত্ত অন্তরখোলা।
সাধুর দরশনে যায় মনের ময়লা পরশে প্রেমতরঙ্গ ॥

সাধুজনার প্রেমহিল্লোলে কতো মানিক মুক্তা ফলে।
সাধুগুরু কৃপাবলে দেয় প্রেমময় প্রেমাঙ্গ ॥

একরসে হয় প্রতিবাদী একরসে ঘুরছে নদী।
একরসে নৃত্য করে নিত্যরসের গৌরাঙ্গ ॥

সাধুর সঙ্গগুণে রঙ্গ ধরিবে পূর্বস্বভাব দূরে যাবে।
লালন বলে পাবে প্রাণের গোবিন্দ করোরে সৎসঙ্গ ॥

২২৪.

মনের কথা বলবো কারে।
মন জানে আর জানে মরম মজেছি মন দিয়ে যাঁরে ॥

মনের তিনটি বাসনা নদীয়ায় করবো সাধনা।
নইলে মনের বিয়োগ যায় না তাইতে ছিদাম এ হাল মোরে ॥

কটিতে কৌপীন পরিব করেতে করঙ্গ নেবো।
মনের মানুষ মনে রাখবো কর যোগাব মনের শিরে ॥

যে দায়ের দায় আমার এমন রসিক বিনে বুঝবে কোনজন।
গৌর হয়ে নন্দের নন্দন লালন কয় তা বিনয় করে ॥

২২৫.

মরা গৌর স্বয়ং কার শিক্ষায় বলি।
গৌর বলে হরি বলতে শুনতে পাই তো সকলই ॥

শুধাই যদি কোনোজনও বলে আমি নই চৈতন্য।
সে বাক্য হলে অমান্য কই থাকে গুরু প্রণালী ॥

গুরুবাক্য লঙ্ঘাইলে আন্দাজি পণ্ডিত হলে।
নিকাশী ফাঁস বাঁধবে গলে জেনে শুনে কেন ভুলি ॥

চৈতন্য চেতন সদাই জন্মমৃত্যু তাঁর কিছুই নাই।
লালন ভাবে সে মূল কোথায় কেন বাঁধাই গোলমালই ॥

২২৬.

যদি আমার গৌরচাঁদকে পাই।
গেলো গেলো এ ছার কুল তাতে ক্ষতি নাই ॥

কী ছার কূলের গৌরব করি অকুলের কূল গৌরহরি।
এ ভব তরঙ্গের তরী গৌর গোঁসাই ॥

জন্মিলে মরিতে হবে কূল কি কারো সঙ্গে যাবে।
মিছে কেবল দুদিন ভবে করি কূলের বড়াই ॥

ছিলাম কূলের কুলবালা স্কন্ধে নিলাম আঁচলা ঝোলা।
লালন বলে গৌরবালা আর কারে ডরাই ॥

২২৭.

যদি এসেছো হে গৌর জীব তরাতে।
জানবো এই পাপী হতে ॥

নদীয়া নগরে ছিলো যতোজন সবারে বিলালে প্রেমরত্নধন।
আমি নরাধম না জানি মরম চাইলে না হে গৌর আমা পানেতে

তোমারই সুপ্রেমের হাওয়ায় কাষ্ঠের পুতল নলিন হয়।
আমি দীনহীন ভজনবিহীন অপার হয়ে পড়ে আছি কূপেতে ॥

মলয় পর্বতের উপর যতো বৃক্ষ সকলই হয় সার
কেবল যায় জানা বাঁশে সার হয় না
লালন প'লো তেমনই প্রেমশূন্য চিতে ॥

২২৮.

যে পরশে পরশে পরশ সে পরশ কেউ চিনলে না।
সামান্য পরশের গুণ লোহার কাছে গেলো জানা ॥

পরশমণি স্বরূপ গোঁসাই যে পরশের তুলনা নাই।
পরশিবে যেমন তাই ঘুঁচিবে জঠর যন্ত্রণা ॥

কুমড়ো পোকায় পতঙ্গ যেমন ধরায় যে আপন বরণ।
সপরশে জানিরে মন তেমনই মতোন পরশে সোনা ॥

ব্রজের ঐ জলদ কালো যে পরশে গৌর হলো।
লালন বলে মনরে চলো জানিতে তাঁর উপাসনা ॥

২২৯.

যে প্রেমে শ্যাম গৌর হয়েছে।
সামান্যে তাঁর মর্ম জানা কার সাধ্য আছে ॥

না জেনে সেই প্রেমের অর্থ আন্দাজি প্রেম করছে কতো।
মরণফাঁসি নিচ্ছে সে তো পস্তাবে শেষে ॥

মারে মৎস্য না ছোঁয় পানি হাওয়া ধরে বায় তরণী।
তেমনই যেন প্রেমকরণই রসিকের কাছে ॥

গোঁসাই অনুগত যারা সে প্রেম জানবে তারা।
লালন ফকির নেংটিএড়া প'লো ইন্দ্রিয় লালসে ॥

২৩০.

যে যাবি আজ গৌরপ্রেমের হাটে।
তোরা আয় না মনে হয়ে খাঁটি ধাক্কায় যেন যাসনে চটে ফেটে ॥

প্রেমসাগরের তুফান ভারি ধাক্কা লাগে ব্রহ্মপুরী।
কর্মগুণে ধর্মতরী কারো কারো তাতে বেঁচে ওঠে ॥

মনে চতুরালি থাকলে বলো প্রেমযাজনে বাঁধবে কলহ।
হারিয়ে শেষে দুটি কুল কান্নাকাটি লাগবে পথে ঘাটে ॥

আগে দুঃখ পাছে সুখ হয় সয়ে বয়ে কেউ যদি রয়।
লালন বলে প্রেমপরশ পায় সামান্য মনে তাই কি ঘটে ॥

২৩১.

রাধারাণীর ঋণের দায় গৌর এসেছে নদীয়ায়।
বৃন্দাবনের কানাই আর বলাই ॥

নদে এসে নাম ধরেছে গৌর আর নিতাই।
কবে মা যশোদা বেঁধেছিলো হাত বুলালে জানা যায় ॥

বৃন্দাবনের ননী খেয়ে পেট তো ভরে নাই।
নদে এসে দই চিড়াতে ভুলেছে কানাই।

তুমি কোন ভাবেতে।
কোপনি নিলে সেই কথা বলো আমায় ॥

তুমি কৃষ্ণ হরি দয়াময়।
তোমাকে যে চিনতে পায় অধীন লালন কয় ॥

তুমি ধরতে গেলে না দাও ধরা।
কেবল গোপীগণের মন ভোলাও ॥

২৩২.
শুনে অজান এক মানুষের কথা।
প্রভু গৌরচাঁদ মুড়ালে মাথা ॥

হায় মানুষ কোথায় সেই মানুষ বলে প্রভু হলেন বেহুঁশ।
দেখে সব নদীয়ার মানুষ বলে না তা ॥

কোন মানুষের দায় গৌরপাগল পাগল করলো নদীয়ার সকল।
রাখলো না কারো জাতের বোল প্রেমে একাকার করলে সেথা ॥

যাঁর চিন্তা জগতচিন্তা তাঁর চিন্তা কার চিন্তা।
লালন বলে হলো চিন্তা কার আছে অচিন তা ॥

২৩৩.
সামান্যজ্ঞানে কি তাঁর মর্ম জানা যায়।
যে ভাবে অটল হরি এলো নদীয়ায় ॥

জীব তরাতে অংশ হতে বাঞ্ছা করে নিজে আসিতে।
আরো বাঞ্ছা হয় তাতে অঙ্গদের বাঞ্ছায় ॥

শুনে অঙ্গদের হুহুঙ্কারী এলো কৃষ্ণ নদেপুরী।
বেদের অগোচর তাঁরই সেই লীলে হয় ॥

ধন্যরে গৌর অবতার কলিকালে হলো প্রচার।
কলির জীব পেলো নিস্তার লালন গোল বাঁধায় ॥

২৩৪.
সেই গোরা এসেছে নদীয়ায়।
রাধারাণীর ঋণের দায় ॥

ব্রজে ছিলো কানাই বলাই নদীয়াতে নাম পাড়ালো গৌর নিতাই।
ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ভাণ্ডেতে রয় সে কি ভোলে দই চিড়ায় ॥

ব্রজে খেয়ে মাখনছানা পুরেনি আমায় নদীয়াতে দই চিড়াতে ভুলেছে কানাই
যাঁর বেনুর সুরে ধেনু ফেরে যমুনার জল উজান ধায় ॥

আয় নাগরী দেখবি তোরা নবরসের নবগোরা দেখলে প্রাণ জুড়ায়।
লালন বলে অন্তিমকালে চরণ দেবেন গোসাঁই ॥

২৩৫.
সে কী আমার কবার কথা আপন বেগে আপনি মরি।
গৌর এসে হৃদয়ে বসে করলো আমার মন চুরি ॥

কি বা গৌর রূপ লম্পটে ধৈর্যের ডুরি দেয় গো কেটে।
লজ্জাভয় সব যায় গো ছুটে যখন ঐ রূপ মনে করি ॥

গৌর দেখা দেয় ঘুমের ঘোরে চেতন হয়ে পাইনে তাঁরে।
লুকাইল কোন শহরে নবরূপের রাসবিহারী ॥

মেঘে যেমন চাতকেরে দেখা দিয়ে ফাঁকে ফেরে।
লালন বলে তাই আমারে করলো গৌর বরাবরই ॥

২৩৬.

হরি বলে হরি কাঁদে কেনে ধারা বহে দু নয়নে।
হরি বলে হরি গোরা নয়নে বয় জলধারা
কী ছলে এসেছে গোরা এই নদীয়া ভুবনে ॥

আমরা যতো পুরুষনারী দেখিতে এলাম হরি।
হরিকে হরিল হরি সেই হরি কোনখানে ॥

গৌরহরি দেখে এবার কতো পুরুষনারী ছেড়ে যায় ঘর।
সেই হরি কী করে আবার লালন তাই ভাবে মনে ॥

নিতাইলীলা

লীলাভূমিকা

অনন্তের অবতার নিতাই। অনিত্য বস্তু তথা বাইরের বই-দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে নিত্যবস্তুময় নিতাইলীলার আদ্যপান্ত বুঝতে গেলে বহু বাধা ও দ্বিধার মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে হয়। নিতাইতত্ত্ব অর্থ যাঁর জন্মমৃত্যু নেই। তিনি সর্বযুগে ছিলেন, আছেন এবং অনাদিকাল ধরে চলমান থাকবেন। অনিত্য জীব নিত্যবস্তুর কী বুঝবে? সেজন্যেই তো তাঁর প্রকাশ এক অর্থে অতিমাত্রায় লীলাময়। অন্য অর্থে সুগভীর রহস্যময় কুহেলিকা।

বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' অনুধ্যানপূর্বক প্রতীয়মান হয়, শ্রীনিতাই ও শ্রীগৌরের সম্বন্ধটি অতিগূঢ়। সম্বন্ধটি নিজ গোপ্য অর্থাৎ এমন গোপনতর যা নিজে ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রকাশ করা চলে না এবং তিনি নিজে কৃপা করে না জানালে অন্য কেউ মোটেই তা জানতে পারে না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভু রাঘব পণ্ডিতকে বলেন:

রাঘব তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বৈ ॥

একই গ্রন্থে পুনরায় ব্যক্ত করেন, নিতাই ও গৌর স্বরূপের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। দুই বস্তু একই, কেবল ভক্তিদানের জন্যে তিনি ভক্তের কাছে লীলাবেশে পৃথক হয়েছেন:

এক বস্তু দুই ভাগ ভক্তি বিলাতেই।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতেই ॥
দুই ভাই এই অনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সর্বনাশ ॥

নিতাইগৌর একবস্তু বা একতনু অর্থাৎ নিতাই-গৌর মিলিত একটি স্বরূপের পরিষ্কার ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও ঐ গূঢ় স্বরূপটির নির্দেশ কোথাও দেখা যায় না। গৌরলীলায় এ তথ্য না থাকা অযৌক্তিক কিছু নয়। রাধাকৃষ্ণলীলায় রস মাধুর্যের আস্বাদনে কৃষ্ণের তিন বাঞ্ছা অপূর্ণ থাকে। তার পূর্তি ঘটে রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু গৌরতত্ত্বে যা ব্রজলীলায় পরিস্ফুট নয়। গৌর পার্ষদগণ তা উদ্‌ঘাটিত করেছেন। গৌর-নিতাইলীলায় নামমাধুর্য আস্বাদনে নামী ও নামের চিন্ময় স্বরূপের মধ্যে

অনুরূপভাবে তিনটি বাঞ্ছার অপূরণ এবং নিতাই-গৌর মিলনময় এক স্বরূপে তার পূর্তি-এ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। এ নিতাইগৌর মিলনময় স্বরূপটি যে প্রভু জগতবন্ধু সুন্দর তা গ্রন্থকারের কল্পনাপ্রসূত কোনো তত্ত্ব নয়। সত্য ও ব্রহ্মচর্যের জীবন্ত বিগ্রহ প্রভু জগতবন্ধুর করুণা, লীলাময় গভীর ধ্যান এবং সর্বোপরি জগতবন্ধুর বাণীই এ তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের চাবিকাঠি। ফকির লালন শাহ কৃষ্ণলীলা বিলাসের নদীয়ালীলা স্নাত সে সৌন্দর্যসমগ্রকে তাঁর কীর্তনযোগে আমাদের কাছে প্রণিধানযোগ্য করে তোলেন নতুন ভাবভাষ্যে। নিত্যানন্দ সেই ভাবরসেরই প্রবাহ যা ফকির লালনে এসে শতশত বছর পর নবধারায় প্লাবিত করতে চায় আমাদের শুকনো জ্ঞানকর্ম নির্ভর প্রেমহীন কাষ্ঠ ধর্মাচারকে।

২৩৭.
একবার চাঁদবদনে বলো গোসাঁই।
বান্দার এক দমের ভরসা নাই ॥

কে হিন্দু আর কে যবনের চেলা পথের পথিক চিনে ধরো এইবেলা।
পিছে কালশমন থাকে সর্বক্ষণ কোনদিন বিপদ ঘটাবে ভাই ॥

আমার বাড়ি ঘর বিষয় সদাই ঐরবে দিন গেলোরে তোমার।
বিষয়-বিষ খাবি সে ধন হারাবি এখন কাঁদলে আর কি হবে তাই ॥

নিকটে থাকিতে সে ধন বিষয় চঞ্চলাতে দেখলি নারে মন।
ফকির লালন কয় সে ধন কোথায় রয় আখেরে খালি হাতে যায় সবাই ॥

২৩৮.
কার ভাবে শ্যাম নদেয় এলো।
তাঁর ব্রজভাবে কি অসুসার ছিলো ॥

গোলকেরই ভাব ত্যাজিয়ে সে ভাব প্রভু ব্রজপুরে লয়েছিলো যে ভাব।
এবে নাহি তো সে ভাব দেখি নতুন ভাব এভাব বোঝা জীবের কঠিন হলো ॥

সত্যযুগে সঙ্গে কয় সখী ছিলো ত্রেতায় সঙ্গী সীতা লক্ষ্মী হলো।
ছিলো দ্বাপরের সঙ্গিনী রাধারঙ্গিনী কলির ভাবে তারা কোথায় বলো ॥

কলিযুগের ভাব এ কী বিষম ভাব নাহি ব্রতপূজা নাহি অন্য লাভ।
ছিলো দণ্ডীবেশ দণ্ড কমণ্ডলু তাও নিতাই এসে ভেঙ্গে দিলো ॥

উহার ভাব জেনে ভাব লওয়া হলো দায় না জানি কখন কী ভাবোদয়।
করলেন তিনটি লীলা একা নদীয়ায় লালন ভেবে দিশে নাহি পেলো ॥

২৩৯.
দয়াল নিতাই কারো ফেলে যাবে না।
ধরো চরণ ছেড়ো না ॥

দৃঢ় বিশ্বাস করিয়ে মন ধরো নিতাই চাঁদের চরণ।
পার হবি পার হবি তুফান অপারে কেউ থাকবে না ॥

হরিনামের তরী লয়ে ফিরছে নিতাই নেয়ে হয়ে।
এমন দয়াল চাঁদকে পেয়ে শরণ কেন নিলে না ॥

কলির জীবের হয়ে সদয় পারে যেতে ডাকছে নিতাই।
ফকির লালন বলে মন চলো যাই এমন দয়াল মিলবে না ॥

২৪০.

পার করো চাঁদ আমায় বেলা ডুবিল।
আমার হেলায় হেলায় অবহেলায় দিন তো বয়ে গেল ॥

আছে ভবনদীর পাড়ি নিতাই চাঁদ কাণ্ডারি।
কূলে বসে রোদন করি আমি কি গৌরকূল পাবো ॥

গৌরচাঁদ এসে কূলে বসেছে কুলগৌরবিনী যারা।
কূলে থাকে তারা ও কুল ধুয়ে কি জল খাবো ॥

ও চাঁদ গৌর যদি পাই কুলের মুখে দিয়ে ছাই।
আর তো কিছু না চাই ফকির লালন বলে শ্রীচরণের দাসী হবো ॥

২৪১.

পারে কে যাবি তোরা আয় না ছুটে।
নিতাইচাঁদ হয়েছে নেয়ে ভবের ঘাটে ॥

হরিনামের তরণী যাঁর রাধানামের বাদাম তাঁর।
ভবতুফান বলে ভয় কী রে আর সেই নায়ে উঠে ॥

নিতাই বড়ো দয়াময় পারের কড়ি নাহি সে লয়।
এমন দয়াল মিলবে কোথায় এই ললাটে ॥

ভাগ্যবান যেজন ছিলো সে তরীতে পার হলো।
লালন ঘোর তুফানে প'লো ভক্তি চটে ॥

২৪২.

প্রেমপাথারে যে সাঁতারে তাঁর মরণের ভয় কী আছে।
নিষ্ঠাপ্রেম করিয়ে সে যে একমনে বসে রয়েছে ॥

শুদ্ধপ্রেম রসিকের কর্ম মানে না বেদবিধির ধর্ম।
রসরাজ রসিকের মর্ম রসিক বৈ আর কে জেনেছে ॥

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চেতে হয় নিত্যানন্দ।
যাঁর অন্তরে সদানন্দ নিরানন্দ জানে না সে ॥

পাগল নয় সে পাগলের পারা দুই নয়নে বহে ধারা।
যেন সুরধুনির ধারা লালন কয় ধারায় ধারা মিশে রয়েছে ॥

২৪৩.
রসপ্রেমের ঘাট ভাঁড়িয়ে তরী বেয়ো না।
আইন জানো না বললে মানো না ॥

নতুন আইন এলো নদীয়াতে প্রেমের ঘাটে উচিত কর দিতে।
না জেনে সেই খবর করিলে জোর জবর উচিত সাজায় বাঁচবে না ॥

প্রেমের ঘাটে রাজা নিতাই রাইরাধা রসবতী চুন্নি তাই।
সে ঘাট মাড়িলে পড়িবে দায়মালে এই ঝকমারি করো না ॥

মেড়েছিলো সেই ঘাট শ্যামরাই চালান হলো নদীয়া জেলায়।
লালন ভেবে বলে আমার এই কপালে হয় কী জানি ঘটনা ॥

স্থূলদেশ

দেশভূমিকা

স্থূলদেহ মানে দুর্বল বা মোহগ্রস্থ মানবদেহ। 'স্থূল' অর্থ পিণ্ডাকার। পিতামাতার বিন্দুরূপ শুক্র ও শোণিত একযোগ মিলিত হলে পিণ্ডাকার রূপে যে দেহ ক্রমে বৃদ্ধি পায় তার নাম স্থূলদেহ। স্থূলদেশ বা স্থূলদেহের অর্থ আবার দু প্রকার। প্রথমটি মাতৃগর্ভের মধ্যকার এবং দ্বিতীয়টি ভূমিষ্ঠ হবার পর বহির্জগতের ভাব প্রকাশক। উৎপত্তি বা জন্ম এবং প্রলয় বা মৃত্যু যেখানে আছে তার নাম মায়াময় স্থূলদেশ। স্থূলদেশের কাল হলো বাহ্য বিভাজনে প্রকৃতির অধীন। প্রাকৃতিক তথা দৈহিক এ কালগ্রস্ততাই নামান্তরে স্থূলদেহ। 'স্থূল' অর্থ যে সময়কালে প্রাণবিন্দু পিতামাতার সঙ্গমের মাধ্যমে পিতার বর্জ্য তথা বীর্যরূপে মাতৃগর্ভের অষ্টদলপদ্মে বা জরায়ু কক্ষ মধ্যে স্থিত হয়ে দেহ গঠনক্রিয়ার সূচনা ঘটায় সেই সময়কাল থেকে অনিত্যকাল বা বাহ্য বিভাজনে প্রকৃতির অধীন কাল শুরু হয়।

স্থূলদেশের পাত্র প্রবর্তদেহের পূর্বাবস্থা। এ পূর্বাবস্থা আল্লাহ্র পরীক্ষামূলক অপরিহার্য একটি ব্যবস্থা। যা দিয়ে দেহগঠন কার্য সম্পাদন হয় বা যিনি সৃজন করেন ও সৃজন করান এবং যাঁর দ্বারা দেহ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ পিতামাতার সঙ্গমে যে শক্র-শোণিত সংযোগে জগত বা দেহসৃষ্টি হয় তাঁকে বলা হয় পাত্র সৃষ্টিকর্তা তথা প্রবর্তদেহের পূর্বাবস্থা।

স্থূলদেশের আশ্রয় সংসারধর্ম। সংসারে পিতামাতার স্নেহমায়ায় লালিতপালিত হয়ে সংসারকর্তার আদেশ-নির্দেশের অনুগত থেকে দেহমন বিস্তারের প্রস্তুতিপর্ব।

স্থূলদেশের আলম্বন হলো বাহ্যধর্মচর্চা। লোকপ্রিয়, ভোগবাদী আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মকর্ম; যথা: নামাজ-রোজা বা পূজা-কীর্তনসহ হাদিস-ফেকাহ বা বেদ-বেদান্ত পাঠ দ্বারা ধর্মের যেসব স্থূলচর্চা ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে তাকেই বলা হয় স্থূলদেশের আলম্বন।

স্থূলদেশের উদ্দীপন হলো শাঁইজির স্থূলদেহভিত্তিক সঙ্গীতমালা শ্রবণ, সাধুবাণী স্মরণ যা শ্রবণের মাধ্যমে মোহমায়ান্ধ জীবাত্মা মায়াপাশের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার উদ্দীপনা লাভ করে।

অতএব স্থূলদেশের কর্মকাণ্ড হলো সংসারধর্মের আজ্ঞাবর্তী হয়ে পিতামাতার সংস্কার অনুসারে কাজকর্ম করে চলা, স্থূলদেশিক সঙ্গীত শ্রবণ, চিন্তন এবং স্থূলধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করা।

২৪৪.
আজগুবি বৈরাগ্যলীলা দেখতে পাই।
হাতবানানো চুল দাঁড়িজট কোন্ ভাবুকের ভাবরে ভাই ॥

যাত্রাদলেতে দেখি বেশ করিয়ে হয়রে যোগী।
এসব দেখি জাল বৈরাগী বাসায় গেলে কিছুই নাই ॥

সাধু কি দরবেশের তরে ভক্তিকে ভর্ৎসনা করে।
কী দেখে বেহাল পরে বললে কিছু শুনতে পাই ॥

না জানি এই কলির শেষে আর কতো ঢং যে উঠবে দেশে।
লালন বলে মোর দিন গিয়েছে যে বাঁচবে সে দেখবে ভাই ॥

২৪৫.
আদিকালে আদমগণ এক এক জায়গায় করতেন ভ্রমণ।
ভিন্ন আচার ভিন্ন বিচার তাইতে সৃষ্টি হয় ॥

জানতো না কেউ কারো খবর ছিলো না এমন কলির জবর।
এক এক দেশে ক্রমে ক্রমে শেষে গোত্র প্রকাশ পায় ॥

জ্ঞানী দিগ্বিজয়ী হলো নানারূপ দেখতে পেলো।
দেখে নানারূপ সব হলো বেওকুফ এরূপে জাতির পরিচয় ॥

খগোল ভূগোল নাহি জানতো যার যার কথা সেই বলতো।
লালন বলে কলিকালে জাত বাঁচানো বিষম দায় ॥

২৪৬.
আন্ধাবাজি ধান্ধায় পড়ে আন্দাজি করলি সাধন।
কোন সাধনায় পাবি পরম ধন ॥

ভোগ দিয়ে ভগবান পেলে আল্লাহ পাইতি শিরনিতে।
মক্কায় গিয়ে পেলে খোদা ফিরতি না খালি হাতে ॥

গয়া কাশি বৃন্দাবনে পেলে হরি ফিরতো নারে।
খ্রিস্টান গির্জাঘরে পেলে ঈশ্বর ভুলতো নারে ॥

নগদ পাবার আশা করে পূজো করলি আয়োজন।
নগদ পাওয়া দূরের কথা বাকিতে শুধু যায় জীবন ॥

ফকির লালন বলে লুটাও গুরুর চরণতলে
পাবি সে ধন নিরঞ্জন ॥

২৪৭.

আমি বলি তোরে মন গুরুর চরণ কররে ভজন।
গুরুর চরণ পরমরতন করোরে সাধন ॥

মায়াতে মত্ত হলে গুরুর চরণ না চিনলে।
সত্য পথ হারালে খোয়াবে গুরুবস্তুধন ॥

ত্রিবিনের তীরধারে মীনরূপে শাঁই বিরাজ করে।
কেমন করে ধরবি তাঁরে ওরে অবুঝ মন ॥

মহতের সঙ্গ ধরো কামের ঘরে কপাট মারো।
লালন ভনে সে রূপ দরশনে পাবিরে পরশরতন ॥

২৪৮.

উদয় কলিকালরে ভাই আমি বলি তাই।
হাগড়া বিঁধে ন্যাকড়া ছিঁড়ে লোক বুঝি হাসিয়ে যায় ॥

কারো কথা কেউ শোনে না শঠে শঠে সকল কারখানা।
ছিটেফোঁটা তন্ত্রমন্ত্র কলির ধর্মে দেখতে পাই ॥

কলিতে অমানুষের জোর ভালো মানুষ বানায় চোর।
সমঝে ভবে না চলিলে বখেটের হাতে পড়বে ভাই ॥

মা মরা বাপ বদলানো স্বভাব কলির যুগে দেখি এ ভাব
লালন বলে কলিকালে ধর্ম রাখার কী উপায় ॥

২৪৯.

একবার দেখ নারে জগন্নাথে যেয়ে জাতকুল কেমনে রাখো বাঁচিয়ে।
চণ্ডালে রাঁধিলে অন্ন ব্রাহ্মণে তা খায় চেয়ে ॥

জোলা ছিলো কবীর দাস তাঁর তুড়ানী বারোমাস উঠছে উথলিয়ে।
সেই তুড়ানী খায় যে ধনী সেই আসে দর্শন পেয়ে ॥

ধন্য প্রভু জগন্নাথ চায় না সে জাতবেজাত থাকে ভক্তের অধীন সে।
জাতবিচারী দুরাচারী যায় তারা সব দূর হয়ে ॥

জাত না গেলে পাইনে হরি কী ছার জাতের গৌরব করি ছুঁসনে বলিয়ে
ফকির লালন বলে জাত হাতে পেলে পোড়াতাম আগুন দিয়ে ॥

২৫০.
এমন মানবসমাজ কবে গো সৃজন হবে।
যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান জাতিগোত্র নাহি রবে ॥

শোনায়ে লোভের বুলি নেবে না কেউ কাঁধে ঝুলি।
ইতর আতরাফ বলি দূরে ঠেলে নাহি দেবে ॥

আমির ফকির করে এক ঠাঁই সবার পাওনা পাবে সবাই।
আশরাফ বলিয়া রেহাই ভবে কেহ নাহি পাবে ॥

ধর্ম কুল গোত্র জাতির তুলবে নাকো কেহ জিকির।
কেঁদে বলে লালন ফকির কে মোরে দেখায়ে দেবে ॥

২৫১.
এলাহি আলামিন গো আল্লাহ্ বাদশাহ্ আলমপনা তুমি
ডুবায়ে ভাসাতে পারো ভাসায়ে কিনার দাও কারো
রাখো মারো হাত তোমার তাইতে দয়াল ডাকি আমি ॥

নূহ্ নামে নবিজিরে ভাসালেন অকুল পাথারে
আবার তাঁরে মেহের করে আপনি লাগান কিনারে
জাহের আছে ত্রিসংসারে আমায় দয়া করো স্বামী ॥

নিজাম নামে পাপী সে তো পাপেতে ডুবিয়া রইত
তাঁর মনে সুমতি দিলে কুমতি তাঁর গেলো চলে
আউলিয়া নাম খাতায় লিখিলে জানা গেলো ঐ রহমই ॥

নবি না মানে যারা মোহাম্মেদ কাফের তারা
সেই মোহাম্মেদ দায়মাল হবে বেহিসাবে দোজখে যাবে
আবার কি সে খালাস পাবে লালন কয় মোর কী হয় জানি ॥

২৫২.
এসো পার করো দয়াল আমায় ভবের ঘাটে।
ভবনদীর তুফান দেখে ভয়ে প্রাণ কেঁপে ওঠে ॥

পাপপুণ্যি যতোই করি ভরসা কেবল তোমারই।
তুমি যার হও কাণ্ডারি ভবভয় তার যায় ছুটে ॥

সাধনার বল যাদের ছিলো তারাই কূল কিনারা পেলো।
আমার দিন অকাজে গেলো কী জানি হয় ললাটে ॥

পুরাণে শুনেছি খবর পতিতপাবন নামটিরে তোর।
লালন কয় আমি পামর তাইতে দোহাই দিই বটে ॥

২৫৩.
এসো হে অপারের কাণ্ডারি।
পড়েছি অকূল পাথারে দাও এসে চরণতরী ॥

প্রাপ্তপথ ভুলে এবার ভবরোগে ভুগবো কতো আর।
তুমি নিজগুণে শ্রীচরণ দাও তবে কূল পেতে পারি ॥

ছিলাম কোথায় এলাম হেথায় আবার আমি যাই যেন কোথায়।
তুমি মনোরথের সারথী হয়ে স্বদেশে লও মনেরই ॥

পতিতপাবন নাম তোমার গোসাঁই কতো পাপীতাপী তাইতে দেয় দোহাই
লালন ভনে তোমা বিনে ভরসা কারে করি ॥

২৫৪.
এসো হে প্রভু নিরঞ্জন।
এ ভবতরঙ্গ দেখে আতঙ্কেতে যায় জীবন ॥

তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি অনাদির হও আদ্যশক্তি।
দাও হে আমায় ভক্তির শক্তি যাতে তৃপ্ত হয় ভবজীবন ॥

ধ্যানযোগে তোমারে দেখি তুমি সখা আমি সখী।
মম হৃদয় মন্দিরে থাকি দাও ঐরূপ দরশন ॥

ত্রিগুণে সৃজিলেন সংসার লীলা দেখে কয় লালন তাঁর।
সেদরাতুল মোন্তাহার উপর নূর তাজাল্লার হয় আসন ॥

২৫৫.
কী বলে মন ভবে এলি।
এসে এই মায়ার দেশে তত্ত্ব ভুলে কার গোয়ালে ধুঁয়ো দিলি ॥

ভেঙ্গেছো সরকারি তহবিল সাক্ষী আছে ইস্রাফিল।
হুজুরে হলে হাজির বলতে হবে সত্য বুলি ॥

পেয়ে মদনরসের গোলা ভাঙ্গলি অনুরাগের তালা।
ম'লি তুই দুপুর বেলা চিনিতে মিশালি বালি ॥

ক্ষ্যাপা মদনের আখড়া ধর্ম নিয়ে বাঁধাও ঝগড়া।
লালন কয় ছেঁড়া ন্যাকড়া এক হাতে বাজে না তালি ॥

২৫৬.
কাল কাটালি কালের বশে।
এ যে যৌবনকাল কামে চিত্ত কাল কোনকালে আর হবে দিশে ॥

যৌবনকালের কালে কামে দিলি মন দিনে দিনে হারা হলি পিতৃধন।
গেলো নবীন জোর আঁখি হলো ঘোর কোনদিন ঘিরবে মহাকাল এসে ॥

যাদের সঙ্গে রঙ্গে মেতে র'লি চিরকাল কালার কালে তারাই হলো কাল।
তাও জানো না কার কী গুণপনা ধনীর ধন গেল সব রিপুর বশে ॥

বাদীভেদী বিবাদী সদাই সাধন সিদ্ধি করিতে না দেয়।
নাটের গুরু হয় লালস মহাশয় ডুবি দাওরে লালন লোভ লালসে ॥

২৫৭.
কাশী কি মক্কায় যাবি চলরে যাই।
দোটানাতে ঘুরলে পরে সন্ধ্যাবেলা উপায় নাই ॥

মক্কা যেয়ে ধাক্কা খেয়ে যেতে চাও কাশীধামে।
এমনি মতে কাল কাটালে ঠিক নামালে কোথা ভাই ॥

নৈবেদ্য পাকা কলা তাই দেখে মন ভোলে ভোলা।
শিরনি বিলায় দরগাতলা তাও দেখে মন খলবলায় ॥

চুল পেকে হলে হুড়ো পেলে না পথের মুড়ো।
লালন বলে সন্ধি ভুলে না পেলাম কূল নদীর ঠাঁই ॥

২৫৮.
কি করি কোন পথে যাই মনে কিছু ঠিক পড়ে না।
দোটানাতে ভাবছি বসে এই ভাবনা ॥

কেউ বলে মক্কায় গিয়ে হজ্ব করিলে যাবে গুনাহ্।
কেউ বলে মানুষ ভজে মানুষ হ না ॥

কেউ বলে পড়লে কালাম পায় সে আরাম বেহেস্তখানা।
কেউ বলে ভাই ঐ সুখের ঠাঁই কায়েম রয় না ॥

কেউ বলে মুর্শিদের ঠাঁই খুঁজলে পায় মূল ঠিকানা।
তাই না বুঝে লালন ভেড়ো হয় দোটানা ॥

২৫৯.
কী কালাম পাঠাইলেন আমার শাঁই দয়াময়।
এক এক দেশে এক এক বাণী কয় খোদায় পাঠায় ॥

একযুগে যা পাঠায় কালাম অন্যযুগে হয় কি হারাম।
এমনই মতে ভিন্ন তামাম ভিন্ন দেখা যায় ॥

যদি একই খোদার হয় রচনা তাতে ভিন্ন ভেদ থাকে না।
এ সকল মানুষের রচনা তাইতে ভিন্ন হয় ॥

এক এক দেশে এক এক বাণী পাঠান কি সাঁই গুণমণি।
মানুষের রচিত জানি লালন ফকির কয় ॥

২৬০.
কী সে শরার মুসলমানের জাতের বড়াই।
শরার রাহে না গেলে সে মুসলমানই নয় ॥

পঞ্চতত্ত্ব নামাজ শরায় কোথায় খোদা সেজদা কোথায়।
কারে দেখে ডানে বাঁয় সালাম ফিরায় ॥

আঁধার ঘরকে মক্কা বলে হাজি হয় সেখানে গেলে।
আল্লাহ্ কি আসিয়া মেলে হাজিদের সভায় ॥

ইব্রাহিম নবি হজের তরে পুত্রকে কোরবানি করে।
দেখাতে গেলেন ইসলাম যারে সেইরূপে হেথায় ॥

দেহমক্কা ঢুঁড়লে পরে মিলবেরে সেই পরওয়ারে।
তাই না বুঝে অবোধ লালন ধাইলরে সেই মক্কায় ॥

২৬১.
কুলের বউ ছিলাম বাড়ি হলাম ন্যাড়ি ন্যাড়ার সাথে।
কুলের আচার কুলের বিচার আর কি ভুলি ঐ ভোলেতে ॥

ভবের ন্যাড়ি ভবের ন্যাড়া কুল নাশিলাম জগত জোড়া।
করণ তার উল্টো দাঁড়া বিধির ফাঁড়া কাটবে যাতে ॥

হয়েছিলাম ন্যাড়ার ন্যাড়ি পরণে পরেছি ধড়ি।
দেবো না আচার কড়ি বেড়াবো চৈতন্যপথে ॥

আসতে ন্যাড়া যেতে ন্যাড়া দুদিন কেবল মোড়া জোড়া।
লালন কয় আগাগোড়া জেনে মাথা হয় মুড়াতে ॥

২৬২.
কে তোমার আর যাবে সাথে।
কোথায় রবে এই ভাইবন্ধু পড়বি যেদিন কালের হাতে ॥

নিকাশের দায় করে খাড়া মারবেরে আতশের কোড়া।
সোজা করবে বাঁকাত্যাড়া জোর জবর খাটবে না তাতে ॥

যে আশায় এইভবে আসা হলো না তার রতিমাসা।
ঘটলোরে কী দুর্দশা কুসঙ্গে কুরঙ্গে মেতে ॥

যাঁরে ধরে পাবি নিস্তার তাঁরে সদাই ভাবলিরে পর।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমার ছাড়ো ভবের কুটুম্বিতে ॥

২৬৩.
কোথায় রইলে হে দয়াল কাণ্ডারি।
এ ভবতরঙ্গে আমায় দাও এসে চরণতরী ॥

যতোই করি অপরাধ তথাপি তুমি নাথ।
মারিলে মরি নিতান্ত বাঁচালে বাঁচতে পারি ॥

পাপীকে করিতে তারণ নাম ধরেছো পতিতপাবন।
ঐ ভরসায় আছি যেমন চাতকে মেঘ নিহারি ॥

সকলেরে নিলে পারে আমারে না চাইলে ফিরে।
লালন বলে এ সংসারে আমি কী তোর এতোই ভারি ॥

২৬৪.
কোথায় হে দয়াল কাণ্ডারি।
এ ভবতরঙ্গে আমার কিনারায় লাগাও তরী ॥

তুমি হও করুণাসিন্ধু অধমজনার বন্ধু।
দাও হে আমায় পদারবিন্দু যাতে তুফান তরিতে পারি ॥

পাপী যদি না তরাবে পতিতপাবন নাম কে লবে।
জীবের দ্বারা ইহাই হবে নামের ভেরো যাবে তোমারই ॥

ডুবাও ভাসাও হাতটি তোমার এ ভবে আর কেউ নাই আমার
লালন বলে দোহাই তোমার চরণে ঠাঁই দাও ত্বরি ॥

২৬৫.
খোঁজো আবহায়াতের নদী কোনখানে।
আগে যাও জিন্দাপীরের খান্দানে দেখিয়ে দেবে সন্ধানে ॥

সেই সে নদীর পিছল ঘাটা কতো চাঁদ কোটালে খেলছে ভাটা।
দ্বীনদুনিয়ায় জোড়া একটা মীন আছে তার মাঝখানে ॥

মাওলার মহিমা এমনই সেই নদীতে হয় অমৃতপানি।
তাঁর একরতি পরশে অমনি অমর হবে সেইজনে ॥

আবহায়াতের মর্ম যেজন পায় উপাসনা তারই বটে হয়।
সিরাজ শাঁইয়ের যে আদেশ হয় অধীন লালন তাই ভনে ॥

২৬৬.
জাত গেলো জাত গেলো বলে এ কী আজব কারখানা।
সত্যপথে কেউ নয় রাজি সবই দেখি তা না না না ॥

আসবার কালে কি জাত ছিলে এসে তুমি কি জাত নিলে।
কি জাত হবা যাবার কালে সেইকথা ভেবে বলো না ॥

ব্রাহ্মণ চণ্ডাল চামার মুচি একজলে সকলেই শুচি।
দেখে শুনে হয় না রুচি যমে তো কাউকে ছাড়বে না ॥

গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায় তাতে ধর্মের কী ক্ষতি হয়।
লালন বলে জাত কারে কয় এই ভ্রম তো গেলো না ॥

২৬৭.
জাতের গৌরব কোথায় রবে।
যেদিন এসব ফেলে যেতে হবে ॥

ব্রাহ্মণ কায়স্থ কামার কলু ভিন্ন ভিন্ন ভাবছো সবে।
এসব ঘুঁচবে যেদিন তোমায় সেদিন রাজাধিরাজ তলব দেবে ॥

গঠেছে এক কারিগরে স্ত্রী পুরুষ ভঙ্গিভাবে।
তাদের চাহনি চলনে সবাই চিনে ঢাকলেও না ঢাকা রবে ॥

যতো সব বিষয়াশয় সাথে কিছু নাহি যাবে।
মুদলে নয়ন করবে শয়ন মাটির দেহ মাটিতে খাবে ॥

জাতকুল সবই বিফল জাত লয়ে কেউ কি পাব পাবে।
সিরাজ শাঁই বলেরে লালন ভাবো আখেরে কি বা হবে ॥

২৬৮.
দায়ে ঠেকে বলছোরে মন আল্লাহ্ গনি।
সুখের কালেতে তাঁরে ভোলোরে মণি ॥

আগা কেটে হলি মুসলমান মানুষে আনলিনে ইমান।
মানুষরূপে মরদুদ শয়তান ঘরে ঘরে জানি ॥

উবহায়জত মুসিবত এলে দরুদ কালাম পড়ো সকলে।
সে সকল উতরায়ে গেলে গাজীর গান গেয়ে বেড়াও শুনি ॥

দুষে বেড়াও জাত ভালো না আপন জাতের খবর করো না।
ফকির লালন বলে এমন দিনকানা আর তো দেখিনি ॥

২৬৯.

দেখ না মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারি।
পরিয়ে কোপনি ধ্বজা মজা উড়ালো ফকিরি ॥

যা করো তা করোরে মন পিছের কথা রেখো স্মরণ বরাবরই।
সাথে সাথে ফিরছ শমন কোনদিন হাতে দেবে বেড়ি ॥

দরদের ভাই বন্ধুজনা সঙ্গের সাথী কেউ হবে না মন তোমারই।
খালি হাতে একা পথে বিদায় করে দেবে তোরই ॥

বড়ো আশার বাসা এ ঘর পড়ে রবে কোথায় বা কার ঠিক নাই তারই।
দরবেশ সিরাজ শাঁই কয় শোন্‌রে লালন হোসনে কারো ইন্তেজারি ॥

২৭০.

ধড়ে কে তোর মালিক চিনলি না তাঁরে।
মন কি এমন জনম আর হবেরে ॥

দেবের দুর্লভ এবার মানবজনম তোমার।
এমন জনমের আচার করলি কীরে ॥

নিঃশ্বাসের নাইরে বিশ্বাস পলকে করিবে বিনাশ।
তখন মনে রবে মনের আশ বলবি কারে ॥

এখনো শ্বাস আছে বজায় যা করো তাই সিদ্ধি হয়।
সিরাজ শাঁই তাই কয় বারবার লালনেরে ॥

২৭১.

নানারূপ শুনে শুনে শূন্য হলামরে সাধুর খাতায়।
বুঝিতে বুঝিতে বোঝা চাপলোরে মাথায় ॥

যা শুনিতে হয় বাসনা শুনলে মনের আঁট বসে না।
তার বড় শুনে মনা দৌড়ায় সেথায় ॥

একবার বলে যাই কাশীতে আবার একজন বলে মক্কায় যেতে।
দিন গেলো মোর দোটানাতে যাই বা কোথায় ॥

এক জেনে যে এক ধরিল সেই সে পাড়ি সেরে গেলো।
লালন বারো তালে প'লো শেষ অবস্থায় ॥

২৭২.
নাপাকে পাক হয় কেমনে।
জন্মবীজ যার নাপাক বলে মৌলভিগণে ॥

কোরানে সাফ শোনা যায় নাপাক জলে জান পয়দা হয়।
ধুলে কি তা পাক করা যায় আসল নাপাক যেখানে ॥

মানুষের বীজে হয় না ঘোড়া ঘোড়ার বীজে হয় না ভেড়া।
যে বীজ সেই গাছ মুল্লুক জোড়া দেখতে পাই নয়নে ॥

ভিতরে লালসার থলি বাইরে জল ঢালাঢালি।
লালন বলে মনমুসল্লি তোর ঠিক পড়ে না মনে ॥

২৭৩.
নামাজ পড়বো কিরে মক্কাঘরে বাঁধলো গণ্ডগোল।
মক্কাঘরের চারিপাশে সব দেখি উলুর পাগল ॥

ছয়জনা মুসল্লি এসে সদাই বাঁধায় গণ্ডগোল যে।
কারো কথা কেউ না শোনে উলু দেয় আর বাজায় ঢোল ॥

মক্কাঘরের মধ্যে শুনি একজন দেয় শিঙ্গায় ধ্বনি।
কি নাম তাঁর নাহি জানি ক্ষণেক বলে হরিবোল ॥

মানুষমক্কায় পড়ো নামাজ তাতেই রাজি শাঁই বেনেয়াজ।
ভক্তিপ্রেম মিশিয়ে ভজে ভেবে লালন হয় উতল ॥

২৭৪.
না হলে মন সরলা কী ধন মেলে কোথায় ঢুঁড়ে।
হাতে হাতে বেড়াও মিছে তওবা পড়ে ॥

মুখে যে পড়ে কালাম তারই সুনাম হুজুরি বাড়ে।
মন খাঁটি নয় বাঁধলে কি হয় বনে কুঁড়ে ॥

মক্কা-মদিনায় যাবি ধাক্কা খাবি মন না মুড়ে
হাজি নাম কওলালি কেবল জগত জুড়ে ॥

মন যার হয়েছে খাঁটি মুখে যদি গলদ পড়ে
খোদা তাতে নারাজ নয়রে লালন ভেড়ে ॥

২৭৫.

পাপপূণ্যের কথা আমি কারে বা শুধাই
এইদেশে যা পাপগণ্য অন্যদেশে পুণ্য তাই ॥

তিব্বত আইন অনুসারে একনারী বহুপতি ধরে।
এইদেশে তা হলে পরে ব্যভিচারী দণ্ড হয় ॥

শূকর গরু দুইটি পশু খাইতে বলেছেন যিশু।
এখন কেন মুসলমান হিন্দু পিছেতে হটায় ॥

দেশ সমস্যা অনুসারে বিভিন্ন বিধান প্রচারে।
সূক্ষ্মজ্ঞানে বিচার করলে পাপপুণ্যের আর নাই বালাই ॥

পাপ করলে ভবে আসি পুণ্য হলে স্বর্গবাসী।
লালন বলে নাম উর্বশী নিত্য নিত্য প্রমাণ পাই ॥

২৭৬.

পার করো হে দয়াল চাঁদ আজ আমারে।
ক্ষমো হে অপরাধ আমার এ ভবকারাগারে ॥

পাপী অধম জীব হে তোমার তুমি যদি না করো পার দয়া প্রকাশ করে
পতিতপাবন পতিতনাশন কে বলবে আর তোমারে ॥

না হলে তোমার কৃপা সাধন সিদ্ধি কে বা কোথা করতে পারে।
আমি পাপী তাইতে ডাকি ভক্তি দাও মোর অন্তরে ॥

জলে স্থলে সর্ব জায়গায় তোমারই সব কীর্তিময় ত্রিবিধ সংসারে।
তাই না বুঝে অবোধ লালন প'লো বিষম ঘোরফেরে ॥

২৭৭.

বারো তাল উদয় হলো আমি নাচি কোন্ তাল।
ভবে এসে ভাবছি বসে হারা হয়ে বুদ্ধিবল ॥

কেউ বা বলে খ্রিস্টানি সেইধর্ম সত্য জানি।
ভজ গে যেয়ে ইসা নবি মুক্তি পাবি পরকাল ॥

কেউ বলে নামাজ পড়ো কেউ বা বলে মানুষ ভজো।
বাপদাদার চালচরিত্র চলরে ভেড়ো মেনে চল ॥

না করিলাম শরিয়ত না করিলাম মারেফত।
লালন বলে আখের যেতে হতে হবে দায়মাল ॥

২৭৮.
ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন শাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে তাঁর জাতের বিচার নাই ॥

ভক্ত কবির জাতে জোলা শুদ্ধভক্তি মাতোয়ালা।
ধরে সে ব্রজের কালা সর্বস্ব ধন দিয়ে তাই ॥

রামদাস মুচি ভবের পরে ভক্তির বল সদাই করে।
সেবায় স্বর্গে ঘণ্টা পড়ে সাধুর মুখে শুনতে পাই ॥

এক চাঁদে জগত আলো এক বীজে সব জন্ম হলো।
লালন বলে মিছে কলহ আমি এ ভবে দেখতে পাই ॥

২৭৯.
ভালো এক জলসেঁচা কল পেয়েছো মনা।
ডুবারু জন পায় সে রতন তোর কপালে ঠনঠনা ॥

ইন্দ্রিয় দ্বারে কপাট যে দেয় সেই বটে ডুবারু হয় নইলে হবে না।
আপা সেচা কাদা খচা কী এক ভূতের কারখানা ॥

মান সরোবর নামটি গো তাঁর লালমতি আছে অপার তাঁয় ডুবতে পারলে না।
ডুবতে যেয়ে খাবি খেয়ে সুখটা বোঝো তৎক্ষণা ॥

জল সেচে নদী শুকায় কার বা এমন সাধ্য হয় পায় পরশখানা।
লালন বলে সন্ধি পেলে যায় সমুদ্র লঙ্ঘনা ॥

২৮০.
মন আইনমাফিক নিরিখ দিতে ভাবো কি।
কালশমন এলে হবে কী ॥

ভাবিতে দিন আখের হলো ষোলআনা বাকি প'লো।
কী আলস্যে ঘিরে নিলো দেখলিনে খুলে আঁখি ॥

নিষ্কামী নির্বিকার হলে জ্যান্তে মরে যোগ সাধিলে।
তবে খাতায় উশুল হলে নইলে উপায় কই দেখি ॥

শুদ্ধমনে সকলই হয় তাও তো জোটে না এবার তোমায়।
লালন বলে করবি হায় হায় ছেড়ে গেলে প্রাণপাখি ॥

২৮১.
মন আমার কী ছার গৌরব করছো ভবে।
দেখ নারে মন হাওয়ার খেলা বন্ধ হতে দেরি কি হবে ॥

বন্ধ হলে এই হাওয়াটি মাটির দেহ হবে মাটি।
ভেবে বুঝে হও মন খাঁটি কে তোরে কতোই বোঝাবে ॥

হাওয়াতে হাওয়াখানা মাওলা বলে ডাক রসনা।
শিয়রে তোর কালশমনে কখন যেন কী ঘটাবে ॥

ভবে আসার আগেরে মন বলেছিলে করবো সাধন।
লালন বলে সেকথা মন ভুলেছো ভবের লোভে ॥

২৮২.
মন এখনো সাধ আছে আল ঠেলা বলে।
চুল পেকে হয়েছো হুড়ো চামড়া বুড়োর ঝুলমুলে ॥

গায়ে ভস্ম মেখে লোকেরে দেখাও মনে মনে মনকলাটি খাও।
তোমার নাই সবুরই চাম কুঠরি ছাড়বিরে আর কোনকালে ॥

হেঁটে যেতে হাঁটু নড়বড়ায় তবু যেতে সাধ মন বারোপাড়ায়।
চেংড়ার সুমার বুদ্ধি তোমার ভ্রু কুঁচকে জানালে ॥

কেউ বলে পাগলা বুড়ো পীর আমার মন রয় না স্থির।
মন কি মনাই নইলে কি ভাই লালন কয় ভূমি সেঁচাই অকালে ॥

২৮৩.
মন তোর আপন বলতে কে আছে।
কার কাঁদায় কাঁদো মিছে ॥

থাক সে ভবের ভাই বেরাদার প্রাণপাখি সে নয় আপনার।
পরের মায়ায় মজে এবার প্রাপ্ত ধন হারাই পিছে ॥

সারানিশি দেখো মনুরায় নানান পাখি একবৃক্ষে রয়।
যাবার বেলা কে কারে কয় দেহের প্রাণ তেমনই সে যে ॥

মিছে মায়ার মদ খেও না প্রাপ্তপথ সব ভুলে যেও না।
এবার গেলে আর হবে না পড়বিরে কয় যুগের প্যাঁচে ॥

আসতে একা এলি যেমন যেতে একা যাবি তেমন।
সিরাজ শাঁই বলেরে লালন কার দুঃখে কাঁদো মিছে ॥

২৮৪.
মন সহজে কি সই হবা চিরদিন ইচ্ছা মনে আইল ডিঙ্গায়ে ঘাস খাবা।
ডাবার পর মুগুর প'লে সেইদিনে গা টের পাবা ॥

বাহার তো গেছে চলে পথে যাও ঠেলা পেড়ে কোনদিনে পাতাল ধাবা।
তবু দেখি গেলো না তোর ত্যাড়া চলন বদলোভা ॥

সুখের আশ থাকলে মনে দুঃখের ভার নিদানে অবশ্যই মাথায় নিবা।
সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল শেষকালে তাই টের পাবা ॥

ইল্লতে স্বভাব হলে পানিতে কি যায়রে ধুলে খাসলতি কিসে ধোবা।
লালন বলে হিসাবকালে সকল ফিকির হারাবা ॥

২৮৫.
মনের এ মন হলো না একদিনে।
ছিলাম কোথায় এলাম হেথায় যাবো কার সনে ॥

আমার বাড়ি আমার এ ঘর মিছে কেবল ঝকমারি সার।
কোনদিন পলকে সব হবে সংহার হবে কোনদিনে ॥

পাকা দালানকোঠা দেবো মহাসুখে বাস করিব।
আমি ভাবলাম না কোনদিনে যাবো যাবো শ্মশানে ॥

কি করিতে কী বা করি পাপের বোঝাই হলো ভারি।
লালন কয় তরঙ্গ ভারি দেখি শমনে ॥

২৮৬.
মাওলা বলে ডাকো মনরসনা।
গেলো দিন ছাড়ো বিষয় বাসনা ॥

যেদিনে শাঁই হিসাব নেবে আগুনপানির তুফান হবে।
সেদিন এ বিষয় তোর কোথা রবে একবার ভেবে দেখলে না ॥

সোনার কুঠরিকোঠারে মন সোনার খাটপালঙ্কে শয়ন।
শেষে হবে সব অকারণ সার হবে মাটির বিছানা ॥

ইমান ধন আখরের পুঁজি সে ঘরে দিলে না কুঞ্জি।
লালন বলে হারলে বাজি শেষে আর কাঁদলে সারবে না ॥

২৮৭.
মানুষ অবিশ্বাসে পায় নারে সে মানুষনিধি।
এই মানুষে মিলতো মানুষ চিনতাম যদি ॥

অধর চাঁদের যতো খেলা সর্বোত্তম মানুষলীলা।
না বুঝে মন হলি ভোলা মানুষবিবাদী ॥

যে অঙ্গের অবয়ব মানুষ জানো নারে মন বেহুঁশ।
মানুষ ছাড়া নয় সে মানুষ অনাদির আদি ॥

দেখে মানুষ চিনলাম নারে চিরদিন মায়ার ঘোরে।
লালন বলে এদিন পরে কী হবে গতি ॥

২৮৮.
মিছে ভবে খেলতে এলি তাস।
ও মন তোর করলো সর্বনাশ ॥

রঙ থাকিতে খেললে রূপ তুমি মিছে ভবে পড়ে খালি করিতেছ তুরুপ।
ক্ষ্যাপা পাশায় ছেড়ে এলি ফিরে লোভী মন হাতের পাঁচের কি বা আশ ॥

টেক্কাতে রঙ তুরুপ করে মন তুই এমন বেওকুফ দশখান টিক্কা না মেরে।
ক্ষ্যাপা খেলছো খেলা ও মনভোলা কাবার দেও ইস্তক পঞ্চাশ ॥

যেদিন দিনকারি সাত দেখতে হবে মন তুমি হায় হাবুডুবু খাবে।
লালন বলে ভাগ্যের ঘাটেরে ক্ষ্যাপা তুই ডুবে ডুবে হবি নাশ ॥

২৮৯.
মুর্শিদকে মান্য করিলে খোদার মান্য হয়।
সন্দেহ যদি হয় কাহারো কোরান দেখলে মিটে যায় ॥

দেখো বেমুরিদই যতো শয়তানের অনুগত।
এবাদত বন্দেগি তার তো সই দেবে না দয়াময় ॥

মুর্শিদ যা ইশারা দেয় বন্দেগির তরিক সে হয়।
কোরানে তো সাফ লেখা রয় আবার অলি দরবেশ তাঁরাও কয় ॥

মুর্শিদের মেহের হলে খোদার মেহের তাঁরে বলে।
হেন মুর্শিদ না ভজিলে তার কী আর আছে উপায় ॥

মুর্শিদ হন পথের দাঁড়া যাবে কোথায় তাঁরে ছাড়া।
সিরাজ শাঁই কয় লালন গোড়া মুর্শিদ ভজলে জানা যায় ॥

২৯০.
যদি কেউ জট বাড়ায়ে হতোরে সন্ন্যাসী।
তালগাছে জট পড়েছে সেই গাছেরই সাবাসী ॥

ঘর ছেড়ে জঙ্গলে যায় তাইতে কি সে হরিকে পায়।
তবে বনের পশুকে ভাই কেন করি দোষী ॥

জলে গেলে হরি পায় কাছিম সে তো মন্দ নয়।
তবে কেন সাধতে হয় হয়ে চরণদাসী ॥

গুরুজি ভজনের মূল তাঁর চরণ করে ভুল।
লালন হয় নামাকুল ধায় গয়া-কাশী ॥

২৯১.
শিরনি খাওয়ার লোভ যার আছে।
সে কী চেনে মানুষরতন তার দরগাতলায় মন মজেছে ॥

সাধুর হাটে সে যদি যায় আঁট বসে না কোনো কথায়।
মন থাকে তার দরগাতলায় তার বুদ্ধি প্যাঁচোয় পেয়েছে ॥

ভাস্কর প্রতিমা গড়ে মূলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে।
আবার গুরু বলে তারে এমন পাগল কে দেখেছে ॥

মাটির পুতুল দেখায় নাচায় একবার মারে একবার বাঁচায়।
সে যেন স্বয়ং হতে চায় লালন কয় তার সকল মিছে ॥

২৯২.
শুনে পড়ে সারলি দফা করলি রফা গোলেমালে।
ভাবলিনে মন কোথা সে ধন ভাজলি বেগুন পরের তেলে ॥

করলি বহু পড়াশোনা কাজে কামে ঝলসে কানা।
কথায় তো চিড়ে ভেজে না জল কিংবা দুধ না দিলে ॥

আর কি হবে এমন জনম লুটবি মজা মনের মতন।
বাবার হোটেল ভাঙবে যখন খাবি তখন কার বাসালে ॥

হায়রে মজা তিলে খাজা খেয়ে দেখলিনে মন কেমন মজা।
লালন কয় বেজাতের রাজা হয়ে রইলি একই কালে ॥

২৯৩.
সকল দেবধর্ম আমার বোষ্টমি।
ইষ্ট ছাড়া কষ্ট নাই মোর ঐটে ছাড়া নষ্টামি ॥

কেমন সুখ ভাত রাঁধা জল আনা তা কেন কেউ করে দেখো না
দুটো মুখের কথার মিষ্টি দিয়ে ইষ্ট গোঁসাইর ফষ্টামি ॥

বোষ্টমি মোর শীতের কাঁথা তখন ইষ্ট গোঁসাই রয় কোথা।
কোন্‌কালে পরকাল হবে তাই তো ভজবো গোস্বামী ॥

বোষ্টমির গুণ বিষ্ণু জানে ভাই আর জানি আমি চিতোরাম গোঁসাই।
লালন বলে বোষ্টমিরতন হেঁসেল ঘরের শালগ্রামই ॥

২৯৪.
সকলই কপালে করে।
কপালের নাম গোপাল চন্দ্র কপালের নাম গুয়ে গোবরে ॥

যদি থাকে এই কপালে রত্ন এনে দেয় গোপালে।
কপালে বিমতি হলে দুর্বাবনে বাঘে মারে ॥

কেউ রাজা কেউ হয় ভিখারি কপালের ফ্যার হয় সবারই।
মনের ফ্যারে বুঝতে নারি খেটে মরি অনাচারে ॥

যার যেমন মনের করুণা তেমনই ফল পায় সেজনা।
ফকির লালন বলে ভাবলে হয় না বিধির কলম আর কি ফেরে ॥

২৯৫.
সবলোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয় জাতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে ॥

সুন্নত দিলে হয় মুসলমান নারীলোকের কী হয় বিধান
বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ বামনি চিনি কী করে ॥

কেউ মালা কেউ তসবিহ্‌ গলে তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে।
আসা কিংবা যাওয়ার কালে জাতের চিহ্ন রয় কারে ॥

জগত জুড়ে জাতের কথা লোকে গল্প করে যথাতথা।
ফকির লালন কয় জাতের ফাতা বিকিয়েছি সাধবাজারে ॥

২৯৬.
সবে বলে লালন ফকির কোন্‌ জাতের ছেলে।
কারে বা কী বলি আমি দিশে না মেলে ॥

একদণ্ড জরায়ু ধরে এক একেশ্বর সৃষ্টি করে।
আগমনিগম চরাচরে তাইতে জাত ভিন্ন বলে ॥

জাত বলিতে কি হয় বিধান হিন্দু বৌদ্ধ যবন খ্রিস্টান।
তাতে কি হয় জাতের প্রমাণ শাস্ত্র খুঁজিলে ॥

হয় কেমনে জাতের বিচার এক এক দেশে এক এক আচার।
লালন বলে জাত ব্যবহার গিয়াছি ভুলে ॥

২৯৭.

সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন।
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।

একই ঘাটে আসাযাওয়া একই পাটনি দিচ্ছে খেওয়া।
কেউ খায় না কারো ছোঁয়া ভিন্ন জল কে কোথা পান ॥

বেদ কোরানে করেছে জারি যবনের শাঁই হিন্দুর হরি।
তাও তো আমি বুঝতে নারি দুইরূপ সৃষ্টি করলেন কী প্রমাণ।

বিবিদের নাই মুসলমানি পৈতে নাই যার সেও তো বাম্‌নি।
বোঝেরে ভাই দিব্যজ্ঞানী লালন তেমনই জাত একখান ॥

২৯৮.

হক নাম বলো রসনা।
যে নাম স্মরণে যাবে জঠর যন্ত্রণা ॥

শিয়রে শমন বসে কখন যেন বাঁধবে কসে।
ভুলে রইলি বিষয় বিষে দিশে হলো না ॥

কয়বার যেন ঘুরে ফিরে মানবজনম পেয়েছোরে।
এবার যেন অলস করি সে নাম ভুলো না ॥

ভবের ভাই বন্ধুয়াদি কেউ হবে না সঙ্গের সাথী।
লালন বলে গুরুরতি করো সাধনা ॥

প্রবর্তদেশ

দেশভূমিকা

প্র + বর্ত = প্রবর্ত। 'প্র' অর্থ আরম্ভ বা শুরু করা এবং 'বর্ত' অর্থ পথ। প্রবর্তদেহ অর্থ সাধনপথের প্রারম্ভকালীন মনোদেহ। স্থূলদেহবন্ধন থেকে মনোদেহের মুক্তিলাভের জন্যে সম্যক গুরুর প্রভাবচক্র বা আদর্শিক বলয় (Megnetic field) এ আশ্রয়গ্রহণ এবং আত্মসমর্পণ দ্বারা আত্মতত্ত্বসাধনার ব্যবস্থাপত্র তথা বিধান বা প্রকৃত শরিয়ত লাভ হয় কারো কারো ভাগ্যে। গুরুর কাছে এক একজনের জন্যে এক এক ধরনের শরিয়ত বা ব্যবস্থা বা প্রবর্তনা। অবশ্য জ্ঞানপাত্র অনুসারে শরিয়ত বা ব্যবস্থাপত্র বিভিন্ন হতে বাধ্য। সবার জন্যে যান্ত্রিকভাবে একই শরিয়ত কখনো হতে পারে না। যে বিধান অনুসরণ দ্বারা প্রকৃতিমোহগ্রস্ত জীবাত্মা মায়াপাশের চিন্তাভাবনা ও কর্মের আসক্তিবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পাপপুণ্য, জন্মমৃত্যু বিনাশ করে এবং নিত্যজীবন্মুক্ত হবার সদ্‌জ্ঞান লাভ করে সে দেহকে 'সূক্ষ্ম তটস্থদেশ' বা প্রবর্তদেশ বলা হয়ে থাকে। তাই আপন সাধন গুরুকে মাতা, পিতা, বন্ধু, ভ্রাতার চাইতে 'অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত' পরমাত্মীয় অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা প্রবর্তদেহের প্রথম শর্ত। হাতেকলমে গুরুজির সালাত শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ, মনন, ধরন ও করণের গুরুত্বপূর্ণ এ পর্যায়ে সম্যক গুরু হলেন দেহবর্তের প্রবর্তক এবং ভক্ত হন প্রবর্তনা।

'সূক্ষ্ম' অর্থ চেতনব্রহ্ম এবং 'তটস্থ' অর্থ উৎপত্তি। ব্রহ্ম স্বরূপে অপ্রাকৃত অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে চিৎশক্তির অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা সম্যক গুরু অর্জিত অযোনিসম্ভবা উৎপত্তি চতুর্বিংশতি তত্ত্বোদ্ভব অর্থাৎ চব্বিশ চন্দ্রমূলক দেহকে সূক্ষ্ম তটস্থ বা প্রবর্তদেহ বলে।

প্রবর্তদেশের দেশ হলো অনিত্যদেহে নিত্যব্রহ্মবোধক দেহ। 'অনিত্য' অর্থ বারবার জন্মমৃত্যুময় স্থানকালসীমার অধীনতা। 'নিত্য' অর্থ যার উৎপত্তিবিলুপ্তি বা জন্মমৃত্যু নেই এবং যাতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। ব্রহ্মস্বরূপ সদ্‌গুরু নূর মোহাম্মদ অর্থাৎ চেতনগুরু, অনাদি, অনন্ত সত্তা, পরমেশ্বর ইত্যাদি। চিৎশক্তি দ্বারা সৃজিত জীবন্ত গুরুরূপে চেতনা যে স্থানে জাগ্রত হন বা যাতে চেতন গুরুর বাসস্থান দেহে সেই স্থানের নাম ব্রহ্মতালু।

প্রবর্তদেশের কাল অহং বা আমিত্বমুক্ত সত্তা, গুরুর অধীন দাস্যসেবক। 'কালের শেষ প্রবর্তের প্রথম' – এ সন্ধিকালীন যে সময়কালে মন্ত্রের অর্থ দ্বারা

গুরু স্বরূপে দর্শন দিয়ে অজ্ঞানী জীবকে চেতন করিয়ে আত্মনিত্যকর্ম সম্পন্ন করেন সেই কালকে সম্যক গুরুর দাসত্বকাল বলা হয়।

প্রবর্তের পাত্র জায়মান সম্যক গুরু। অনিত্যদেহে নিত্যকর্ম সম্পন্ন করিয়ে 'ক্লাস ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড' গুরু অনিত্যদেহ মানে জগতের মন সুন্দররূপে আকর্ষণ দ্বারা অসার সংসারাসক্তি বিনাশ করেন এবং আপন চেতনা সম্প্রদান দ্বারা অজ্ঞান জীবকে সুচেতন করান। পরিণামে 'আমি ও আমার'– ভ্রান্ত এ অহঙ্কার বিনাশের দ্বারা অনিত্যদেহকে নিত্যদেহে উত্তরণের ধারায় চেতনজ্ঞান জন্মিয়ে জগতময় চেতনাকে দেখান তেমন একজন কামেল মোর্শেদকে বলা হয় প্রবর্তের পাত্র।

প্রবর্তদেশের আশ্রয় সম্যক গুরুবাক্য। শাঁইজির বাক্যকে পদ বা চরণও বলা হয়। ফকিরি ঘরানায় গুরুসত্তা আর গুরুবাক্য বা গুরুপদ একই ভাব প্রকাশক। যিনি অজ্ঞান জীবকে মাতৃগর্ভের সপ্তম মাসে সেই পরমার্থতত্ত্ব জানিয়ে জীবন্মুক্ত করেন, তাঁর ভাব-ভাষার মর্মানুগ গুণমন্ত্র দ্বারা বহুবিধ ভক্তিবিধি জানিয়ে চেতন করান তাঁকেই আশ্রয় গুরুবাক্য বা শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় বলা হয়।

প্রবর্তদেশের আলম্বন হলো গুরুনাম স্মরণ করা তথা কীর্তন করা মানে গুরুকৃতির কীতিকর্ম আপন স্বভাবের উপর বিস্তারিত করা। গু + রু = গুরু। 'গু' অর্থ অন্ধকার। 'রু' অর্থ বিদীর্ণকারি। যিনি ভক্তমনের অজ্ঞান আকাশের কালোমেঘের আচ্ছাদন ভেদ করিয়ে জ্ঞানের সূর্যোদয় ঘটান তিনিই সম্যক গুরু। 'নাম' অর্থ গুরুগুণ যা শিষ্যের অন্তরে জাগিয়ে তোলাকে বলা হয় প্রবর্তদেশের আলম্বন।

প্রবর্তদেশের উদ্দীপন হলেন সম্প্রদায় গুরু। সম্প্রদায় অর্থ সমভাবে যা প্রদেয়। সম্প্রদায় গুরু অর্থ সম্যক জ্ঞানদাতা শাঁই বা জ্ঞানপন্থার প্রদর্শক গুরু বা তরিকার ইমাম যিনি আশ্রিত ভক্তের জ্ঞানপাত্র অনুসারে আত্মিক ক্রমোন্নতির সুউচ্চ পথ দেখিয়ে থাকেন। গুরুপাঠ দেখে শুনে বুঝে মনের যে ভাবোদয় দ্বারা সপ্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমূহজ্ঞান প্রত্যক্ষগোচর হয় বা দর্শন করা যায়, সেই সাথে নিগূঢ় রহস্যাবৃত নূরতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব ও রসুলতত্ত্বভিত্তিক অপ্রাকৃত পঞ্চতত্ত্বাদি এবং সাধকদেহে হেরাগুহাসাধনার প্রাথমিক অনুশীলন কৌশল আয়ত্ত করাকে উদ্দীপন সম্প্রদায় গুরু বলা হয়।

অতএব প্রবর্তদেশের কর্মকাণ্ড হলো মনোদেহকে নতুনভাবে সৎকর্ম, শুদ্ধজ্ঞান ও ধ্যানের ধারায় পরিশুদ্ধ করা, সম্প্রদায় গুরুর চরণাশ্রয়ে দেহকে নিত্যকর্ষণ দ্বারা নূরতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব ও রসুলতত্ত্বধারার ক্রমবিকাশসাধন। এর দ্বারা চেতনা সম্পাদনপূর্বক গুরুনাম স্মরণের মাধ্যমে হেরাগুহাসাধনার প্রথম ধাপ আয়ত্ত করা যায়।

২৯৯.
অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়।
সে তো শুধু মুখের কথা নয় ॥

বনের পশু হনুমান রাম বিনে তার নাইরে ধ্যান।
মুদিলেও তার দুই মোদা নয়ন অন্যরূপ ফিরে নাহি চায় ॥

তার স্বাক্ষী দেখো চাতকেরে কৈট সাধনে যায় মরে।
তবু অন্যবারি খায় নারে থাকে মেঘের জল আশায় ॥

রামদাস মুচির ভক্তিতে গঙ্গা এলো চামকেটোতে।
এমন সাধন করে কতো মহতে লালন কেবল কূলে কূলে বায় ॥

৩০০.
অন্তিমকালের কালে কী হয় না জানি।
মায়াঘোরে দিন কাটালাম কাল হারে দিনমনি ॥

এসেছিলাম বসে খেলাম উপার্জন কই কী করিলাম।
নিকাশের বেলা খাটবে না ভোলা আউলো বাণী ॥

জেনে শুনে সোনা ফেলে মন মজালে রাঙ পিতলে।
এ লাজের কথা বলবো কোথা আর এখনি ॥

ঠকে গেলাম কাজে কাজে ঘিরিল উনপঞ্চাশে।
লালন বলে মন কি হবে এখন বলো শুনি ॥

৩০১.
অবোধ মন তোর আর হলো না দিশে।
এবার মানুষের করণ হবে কিসে ॥

যেদিন আসবে যমের চেলা ভেঙ্গে যাবে ভবের খেলা।
সেদিন হিসাব দিতে বিষম জ্বালা ঘটবে শেষে ॥

উজানভেটেন দুটি পথ ভক্তিমুক্তির করণ সে তো।
তাতে যায় না জরামৃত যমের ঘরে সে ॥

যে পরশে পরশ হবি সে করণ আর কবে করবি।
সিরাজ শাঁই কয় লালন র'লি ফাঁকে বসে ॥

৩০২.
অবোধ মন তোরে আর কী বলি।
পেয়ে ধন হারালি ॥

মহাজনের পুঁজি এনে ছিটালি উলুবনে।
কী হবে নিকাশের দিনে সে ভাবনা কই ভাবলি ॥

সই করিয়ে পুঁজি তখন আনলিরে তিন রতি এক মন।
ব্যাপার করা যেমন তেমন আসলে খাদ মিশালি ॥

করলি ভালো বেচকেনা চিনলে না মন রাঙ কি সোনা।
লালন বলে মনরসনা কেন সাধুর হাটে এলি ॥

৩০৩.
অসারকে ভেবে সার দিন গেলো আমার সার বস্তুধন এবার হলামরে হারা।
হাওয়া বন্ধ হলেই সব যাবে বিফলে দেখে শুনে লালস গেলো না মারা ॥

গুরু যার সহায় আছে এ সংসারে লোভে সাঙ্গ দিয়ে সেই যাবে সেরে।
অঘাটায় মরণ হইলো আমারে জানলাম না গুরুর করণ কী ধারা ॥

মহতে কয় থাকলে পূর্বসুকৃতি দেখিয়া শুনিয়া হয় গুরুপদে মতি।
সে সুকৃতি আমার থাকিত যদি তবে কি আর আমি হতাম পামরা ॥

সময় ছাড়িয়া জানিলাম এখন গুরুর কৃপা বিনে বৃথা এ জীবন।
বিনয় করে কয় ফকির লালন আমি আর কি পাবো অধরা ॥

৩০৪.
আইন সত্য মানুষবর্ত করো এইবেলা।
ক্রমে ক্রমে হৃৎকমলে খেলবে নূরের খেলা ॥

যে নাম ধরে চলেছো ভবে সেই নামেতে যেতে হবে।
একে শূন্য দশ হইবে নয় দশে নব্বই মিলা ॥

নয়ে চার শূন্য দিলে নব্বই হাজার কয় দলিলে।
সেসব শূন্য মুছে ফেলিলে শুধুইরে নয়ের খেলা ॥

নয় হতে আট বাদ দিলে এক থাকে তার শেষকালে।
লালন বলে বোঝো সকলে সেইটি স্বরূপ রূপের ভেলা ॥

৩০৫.
আগে গুরুরতি করো সাধনা।
ভববন্ধন কেটে যাবে আসায়াওয়া রবে না ॥

প্রবর্তের গুরু চেনো পঞ্চতত্ত্বের খবর জানো
নামে রুচি হলে কেন জীবের দয়া হবে না।

প্রবর্তের কাজ না সারিতে চাও যদি মন সাধু হতে
ঠেকবি যেয়ে মেয়ের হাতে লম্পতে আর সারবে না ॥

প্রবর্তের কাজ আগে সারো মেয়ে হয়ে মেয়ে ধরো
সাধনদেশে নিশান গাড়ো রবে ষোলোআনা।
রেখো শ্রীগুরুতে নিষ্ঠারতি ভজন পথে রেখো রতি
আঁধার ঘরে জ্বলবে বাতি অন্ধকার আর থাকবে না ॥

মেয়ে হয়ে মেয়ের বেশে ভক্তি সাধন করো বসে
আদিচন্দ্র রাখো কসে কখনো তাঁরে ছেড়ো না।
ডোবো গিয়ে প্রেমানন্দে সুধা পাবে দণ্ডে দণ্ডে
লালন কয় জীবের পাপখণ্ডে আমার মুক্তি হলো না ॥

৩০৬.

আগে জানো নারে মন বাজি হারাইলে পতন
লজ্জায় মরণ শেষে কাঁদলে কী আর হয়।
খেলা খেলে মন খেলাড়ু ভাবিয়ে শ্রীগুরু অধোপথে যেন না মারা যায় ॥

এইদেশেতে যতো জুয়োচোরের খেলা
টোটকায় দিয়ে ফটকায় ফেলে ওরে মনভোলা
তাই বলি মন তোমারে খেলা খেলো হুঁশিয়ারে নয়নে নয়ন বাঁধিয়ে সদাই ॥

চোরের সঙ্গে খাটে না কোনো ধর্মদাঁড়া
হাতের অস্ত্র কভু করো না হাতছাড়া
তাই অনুরাগের অস্ত্র ধরে দুষ্ট দমন করে স্বদেশে গমন করোরে ত্বরায় ॥

চুয়ানি বাঁধিয়ে খেলে যেজনা
সাধ্য কার আছে তার অঙ্গে দেয় হানা
লালন বলে আমি তিনতেরো না জানি বাজি সেরে যাওয়া ভার হলোরে আমায় ॥

৩০৭.

আগে পাত্র যোগ্য না করে যেজন সাধন করে।
সেতো প্রেমী নয় তারে কামী কয় যেমন চকমকি পাথরে সদা অগ্নি ঝরে ॥

হেতু ইচ্ছায় করে পিরিত পায় না হিত ঘটে বিপরীত
যেমন গাভীর ভাণ্ডে গোরোচোনা গাভী তার মর্ম জানে না
শুক্রবস্তু মিশে সদা বিন্দু ঝরে ॥

জলন্ত অনলে যদি ঘৃত রাখে নিরবধি তবে জানি সাধকের গতি
যেমন দুগ্ধেতে কলস ভরি লয়ে রাখে গঙ্গাবারি সে ক্ষুদ্র অপরাধী
তাই পড়ে প্রমাদে সুরাস্পর্শে অপবিত্র করে ॥

না হতে প্রবর্তের দিশা আগে করে সিদ্ধির আশা পুরায় না তার মনের আশা
যেমন অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে হলো সেই দশা ভাবুকজনা না শুনিলে মানা
ফকির লালন বলে সে মাথা দিয়ে উল্টে পড়ে ॥

৩০৮.
আছে ভাবের তালা যে ঘরে।
সেই ঘরে শাঁই বাস করে ॥

ভাব দিয়ে খোলো ভাবের তালা দেখবি সেই অটলের খেলা।
ঘুঁচে যাবে মনের ঘোলা থাকলে সে রূপ নিহারে ॥

ভাবের ঘরে কী মুরতি ভাবের লণ্ঠন ভাবের বাতি।
ভাবের বিভাব হলে একরতি অমনি সে রূপ যায় সরে ॥

ভাব নইলে ভক্তিতে কী হয় ভেবে বুঝে দেখো মনুরায়।
যার যে ভাব সে তাই জানিতে পায় লালন কয় বিনয় করে ॥

৩০৯.
আছে মায়ের ওতে জগত পিতা ভেবে দেখো না।
হেলা করো না বেলা মেরো না ॥

কোরানে শাঁই ইশারা দেয় আলিফ যেমন লামে লুকায়।
আকার সাকার চাপা রয় সে ভেদ মুরশিদ ধরলে যায় জানা ॥

নিষ্কাম নির্বিকার হয়ে দাঁড়াও মায়ের শরণ লয়ে।
বর্তমানে দেখো চেয়ে আছে স্বরূপে রূপ নিশানা ॥

কেমন পিতা কেমন মা সে চিরদিন সাগরে ভাসে।
ফকির লালন বলে করো দিশে আছে ঘরের মধ্যে ঘরখানা ॥

৩১০.
আত্মতত্ত্ব না জানিলে।
ভজন হবে না পড়বি গোলে ॥

আগে জান গা কালুল্লা আইনাল হক সে বলে আল্লাহ্ যারে মানুষ বলে।
পড়ে ভূত এবার হোসনে মন আমার একবার দেখ না প্রেমনয়ন খুলে ॥

আপনি শাঁই ফকির আপনি ফিকির ও সে লীলার ছলে।
আপনার আপনি ভুলে সে রব্বানি আপনি ভাসে আপন প্রেমজলে ॥

লা ইলাহা তন ইল্লাল্লাহ জীবন আছে প্রেম যুগলে।
লালন ফকির কয় যাবি মন কোথায় আপনার আপনি ভুলে ॥

৩১১.
আপন খবর না যদি হয়।
যাঁর অন্ত নাই তাঁর খবর কে পায় ॥

আত্মারূপে কে বা ভাণ্ডে করে সেবা।
দেখো দেখো যে বা হও মহাশয় ॥

কে বা চালায় হারে কে বা চলে ফেরে।
কে বা জাগে ধড়ে কে বা ঘুমায় ॥

অন্য আনমনা ছাড়ো মনরে আত্মতত্ত্ব ঢোঁড়ো।
লালন বলে তীর্থ-ব্রতের কার্য নয় ॥

৩১২.
আপন মনে যার গরল মাখা থাকে।
যেখানে যায় সুধার আশায় তথায় গরলই দেখে ॥

কীতিকর্মার কীর্তি অথৈ যে যা ভাবে তাই দেখতে পায়।
গরল বলে কারে দোষাই ঠিক পড়ে না ঠিকে ॥

মনের গরল যাবে যখন সুধাময় সব দেখবে তখন।
পরশিলে এড়াবি শমন নইলে পড়বি পাকে ॥

রামদাস মুচির মন সরলে চামকাটোয়ায় গঙ্গা মেলে।
সিরাজ শাঁই লালনকে বলে আর কী বলবো তোকে ॥

৩১৩.
আপনার আপনিরে মন না জানো ঠিকানা।
পরের অন্তর কোটি সুমুদ্দুর কিসে য়ায়রে জানা ॥

আত্মা ও পরমেশ্বর গুরুরূপে অটল বিহার দ্বিদলে বারামখানা।
শতদল সহস্রদলে অনন্ত শাঁইয়ের করুণা ॥

কেশের আড়েতে যৈছে পাহাড় লুকায়ে আছে দরশন হলো না।
হেঁট নয়ন যাঁর নিকটে তাঁর সিদ্ধি হয় কামনা ॥

সিরাজ শাঁই বলেরে লালন গুরুপদে ডুবেরে মন আত্মার ভেদ জানলে না।
জীবাত্মা পরমাত্মা ভিন্ন ভেদ জেনো না ॥

৩১৪.
আমার মনবিবাগী ঘোড়া বাগ মানে না দিবারেতে।
মুর্শিদ আমার বুটের দানা খায় না ঘোড়ায় কোনোমতে ॥

বিসমিল্লায় দিয়ে লাগাম একশ ত্রিশ তাহার পালান।
কোরানমতে কসনি কসে চড়লাম ঘোড়ায় সওয়ার হতে ॥

বিছমিল্লাহ্‌র গম্বু ভারি নামাজ রোজা তাহার সিড়ি।
খায় রাতেদিনে পাঁচ আড়ি ছিঁড়লো দড়া আচম্বিতে ॥

লালন কয় রয়ে সয়ে কতো সওয়ারি যাচ্ছে বেয়ে।
পারে যাবো কী ধন লয়ে আছি আমি কোড়া হাতে ॥

৩১৫.
আমার সাধ মেটে না লাঙ্গল চষে।
জমি করবো আবাদ ঘটে বিবাদ দুপুরে ডাকিনি পুষে ॥

পালে ছিলো ছয়টা এঁড়ে দুটো কানা দুটো খোঁড়া আর দুটো হয় আলসে
তাদের ধাক্কা দিলে হুঁক্কা ছাড়ে কুখন যেন সর্বনাশে ॥

জমি করি পদ্মবিলে মানমাতঙ্গ কাম সলিলে জমি গেলো কসে।
জমির বাঁধ বুনিয়াদ ভেসে গেলো কাঁদি জমির আলে বসে ॥

সুইলিশ লোহার অস্ত্রখানি ধার ওঠে না দিনরজনী টান দিলে যায় খসে।
ফকির লালন বলে পাকাল না দিলে সে অস্ত্র কি আসে বশে ॥

৩১৬.
আমার শুনিতে বাসনা দেলে।
গুরু সেই কথাটি বলো খুলে ॥

যখন তোমার জন্ম হলো বাবা তখন কোথায় ছিলো।
কার সঙ্গে মা যুগল হলো কে তোমারে জন্ম দিলে ॥

শুনি মায়ের পালিত ছেলে দুটি গর্ভে জন্ম হলে।
কার গর্ভে কয়দিন ছিলে তোমার হায়াতমউত কে লিখিলে ॥

মায়ের বাম অঙ্গে কে বা বাবা দায়ে ঠেকায় সেবা।
লালন ভনে তাপিত প্রাণে জ্ঞাননয়নে দেবেন বলে ॥

৩১৭.
আমার হয় নারে সেই মনের মতো মন।
কবে জানবো সেই রাগের করণ ॥

পড়ে রিপু ইন্দ্রিয় ভোলে মন বেড়ায়রে ডালে ডালে।
দুই মনে এক মন হলে এড়ায় শমন ॥

রসিক ভক্ত যাঁরা মনে মন মিশালো তাঁরা।
শাসন করে তিনটি ধারা পেলো রতন ॥

কবে হবে নাগিনী বশ সাধবো আমি অমৃতরস।
সিরাজ শাঁই কয় বিষেতে বিনাশ হলি লালন ॥

৩১৮.
আমারে কি রাখবেন গুরু চরণদাসী।
ইতরপনা কার্য আমার ঘটে অহর্নিশি ॥

জঠর যন্ত্রণা পেয়ে এসেছিলাম করার দিয়ে।
সে সকল গিয়েছি ভুলে এ ভবে আসি ॥

চিনলাম না মন গুরু কী ধন করলাম না তাঁর সেবাসাধন।
ঘুরতে বুঝি হলোরে মন ভুবন চৌরাশি ॥

গুরু যার আছে সদয় শমন বলে তার কিসের ভয়।
লালন বলে মন তুই আমায় করলিরে দোষী ॥

৩১৯.
আমি আর কতো না জানি অবলা পরানি এ জ্বলনে জ্বলবো ওহে দয়াশ্বর।
চিরদিন দুঃখের অনলে প্রাণ জ্বলছে আমার ॥

দাসী ম'লে ক্ষতি নাই যাই হে মরে যাই
দয়াল নামের দোষ রবে হে গোঁসাই তোমার।
দাও হে দুঃখ যদি তবু তোমায় সাধি
তোমা বিনে দোহাই আর দেবো বা কার ॥

ও মেঘ হইল উদয় লুকাইল কোথায়
পিপাসায় প্রাণ গেলো পিপাসীর।
কোন দোষের ফলে এ দশা ঘটালে
একবার ফিরে চাও হে নাথ ফিরে চাও হে একবার ॥

আমি উড়ি হাওয়ার সাথ ডুরি তোমার হাত
তুমি না তরালে কে তরাবে হে নাথ।
ক্ষমো ক্ষমো অপরাধ দাও হে শীতল পদ
লালন বলে প্রাণে সহে না তো আর ॥

৩২০.
আমি ভবনদীতে স্নান করি ভাবনদীতে ডুব দিলাম না।
কূলে বসে ঐরূপ হেরি নদীর কূলে কূলে বেড়াই ঘুরি
পাই না ঘাটের ঠিকানা ॥

পানির নিচে স্থলপদ্ম তাহার নিচে কত মধু গো।
কালো ভ্রমর জানে মধুর মর্ম অন্য কেউ আর জানে না ॥

নতুন গাঙ্গে জোয়ার আসে সঙ্গে একটা কুমীর ভাসে।
লালন বলে সেই কুমীরে গ্রাসে তাতে মরণভয়, নামিস না ॥

৩২১.
আশা পূর্ণ হলো না আমার মনের বাসনা।
সাধন ভজন করবো আমি বাদী ছয়জনা ॥

দাসী হবো যুগল পদে সাধ মিটাবো ঐ পদ সেধে।
বিধি বৈমুখ হলো তাতে দিলো সংসার যাতনা ॥

বিধাতা সংসারের রাজা আমায় করে রাখলেন প্রজা।
কর না দিলে দেয় গো সাজা কারো দোহাই মানে না ॥

পড়ে গেলাম বিধির বামে ভুল হলো মোর মূলসাধনে।
লালন বলে এই নিদানে মুর্শিদ ফেলে যেও না ॥

৩২২.
আল্লাহ্ সে আল্লাহ্ বলে ডাকছে সদাই করে ফকিরি।
জানলে তাঁর ফিকিরফাকার তাঁরই এবার হয় ফকিরি ॥

আত্মারূপের পরিচয় নাই যার পড়লে কি যায় মনের অন্ধকার।
আবার আত্মরূপে কর্তা হয়ে হও বিচারী ॥

কোরানে কালুল্লায় কুল্লে সাই মোহিত লেখা যায়।
আল জবানের খবর জেনে হও হুঁশিয়ারী ॥

বেদ পড়ে ভেদ পেতো যদি সবে গুরুগৌরব থাকতো না ভবে।
লালন ভনে তাই না জেনে গোলমাল করি ॥

৩২৩.
আয় কে যাবি ওপারে।
দয়াল চাঁদ মোর দিচ্ছে খেওয়া অপারসাগরে ॥

পার করে জগতবেড়ি লয় না সে পারের কড়ি।
সেরে সুরে মনের দেড়ি ভাব দে নারে ॥

যে দেবে ঐ নামের দোহাই তারে দয়া করবেন গোসাঁই।
এমন দয়াল আর কেহই নাই এ ভব মাঝারে ॥

দিয়ে ঐ চরণে ভার কতো পাপী হলো পার।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমার মনের বিকার যায় নারে ॥

৩২৪.
আয়ু হারালি আমাবতী না মেনে।
তোর হয় না সবুর একদিনে ॥

একেতে আমাবতীর বার মাটি রসে সরোবর।
সাধু গুরু বৈষ্ণব তিনে উদয় হয় রসের সনে ॥

তুই তো মদনা চাষাভাই ও তোর জ্ঞান কিছুই নাই।
আমাবতীর প্রতিপদে হাল বয়ে কাল হও কেনে ॥

যেজনা রসিক চাষী হয় জমি কসে হাল বয়।
লালন ফকির পায় না ফিকির হাপুরহুপুর ভূঁই বোনে ॥

৩২৫.
উপরোধের কাজ দেখোরে ভাই ঢেঁকি গেলার মতো।
যায় না গেলা তলা গলা ফেড়ে হয় হত ॥

মনটা যাতে রাজি হয় প্রাণটা তাতে আপনি যায়
পাথর দেখে ভাসে শোলার মতো।
বেগার ঠেলা ঢেঁকি গেলা টাকশালে সই নয় তো ॥

মুচির চাম কেটোয়ায় গঙ্গা মা কোন গুণে যায় দেখো না
তারে ফুল দিয়ে পায় না তো।
মন যাতে নাই পূজলে কি হয় ও ফুল দিয়ে শত শত ॥

যার মনে যা লাগেরে ভাই সে করুক করুকরে তাই
গোল কেন আর এতো।
ফকির লালন কয় লাথিয়ে পাকায় সে ফল হয় তেতো ॥

৩২৬.
এই সুখে কি দিন যাবে।
একদিন হুজুরে হিসাব দিতে যে হবে ॥

হুজুরে মন তোর আছে কবুলতি মনে কি পড়ে না সেটি।
বাকির দায়ে কখন এসে শমন তিলেকে তরঙ্গ তুফান ঘটাবে ॥

আইনমাফিক নিরিখ দিতে মন কেন এতো আড়িগুড়ি তোর এখন।
পত্তন যে সময় হইলে জমায় নিরিখ ভারি কি পাতলা দেখো নাই ভেবে ॥

ছাড়ো ছাড়ো ও মন ছাড়োরে বিকার সরল হয়ে যোগাও রাজকর।
এবার হলে বাকি উপায় না দেখি লালন বলে দায়মাল হবি মন তবে ॥

৩২৭.
এক অজানমানুষ ফিরছে দেশে তাঁরে চিনতে হয়।
তাঁরে মানতে হয় ॥

শরিয়তের বেনা যাতে জানে না তা শরিয়তে।
জানা যাবে মারেফতে যদি মনের বিকার যায় ॥

মূলছাড়া এক আজগুবি ফুল ফুটেছে ভাবনদীর কূল।
চিরদিন এক রসিক বুলবুল সেই ফুলে মধু খায় ॥

শুনেছি সেই মানুষের খবর আলিফের জের মিমের জবর।
লালন বলে হোস্‌নে পামর মুর্শিদ ভজলে জানা যায় ॥

৩২৮.
একদিনও পারের ভাবনা ভাবলি নারে।
পার হবি হীরের সাঁকো কেমন করে ॥

বিনা কড়ির সওদা কেনা মুখে আল্লাহ্‌র নামজপনা।
তাতেও যদি অলসপনা দেখি তোরে ॥

এক দমের ভরসা নাই কখন কি করেন গোসাঁই।
তখন কার দিবি দোহাই কারাগারে ॥

ভাসাও অনুরাগের তরী মুর্শিদকে করো কাণ্ডারি।
লালন বলে যার যার পাড়ি যাও না সেরে ॥

৩২৯.
একবার আল্লাহ বলো মনরে পাখি।
ভবে কেউ কারো নয় দুখের দুখি ॥

ভুলো নারে ভবের ভ্রান্ত কাজে আখেরে সব কাণ্ড মিছে।
ভবে আসতেও একা যেতেও একা এ ভবপিরিতের ফল আছে কী ॥

হাওয়া বন্ধ হলে সম্বন্ধ কিছু নাই ঘরের বাহির করেন গো সবাই।
সেদিন কে বা আপন পর কে তখন দেখে শুনে খেদে ঝরে আঁখি ॥

গোরের কিনারায় যখন লয়ে যায় কাঁদিয়া সবাই প্রাণ ত্যাজিতে চায়।
ফকির লালন বলে কারো গোরে কেউ না যায় থাকতে হয় সবার একাকী ॥

৩৩০.

একবার চাঁদবদনে বলো ওগো শাঁই।
বান্দার একদমের ভরসা নাই ॥

হিন্দু কি যবনের বালা পথের পথিক চিনে ধরো এইবেলা।
পিছে কালশমন আছে সর্বক্ষণ কোনদিন বিপদ ঘটাবে ভাই ॥

আমার বিষয় আমার বাড়িঘর এইরবে দিন গেলোরে আমার।
বিষয় বিষ খাবে সে ধন হারবে শেষে কাঁদলে কী আর সারবে তাই ॥

নিকটে থাকিতে সে ধন বিষয় চঞ্চলাতে খুঁজলি নারে মন।
অধীন লালন কয় সে ধন কোথা রয় আখেরে খালি হাতে যাই সবাই ॥

৩৩১.

এ জনম গেলোরে অসার ভেবে।
পেয়েছো মানবজনম হেন দুর্লভ জনম আর কি হবে ॥

জননীর জঠরে যখন অধোমুণ্ডে ছিলেরে মন।
বলেছিলে করবো সাধন এখন কি তা মনে হয় না ভবে ॥

কারে বলো আমার আমার তুমি কার আজ কে বা তোমার।
যাইবে সকল গুমার যেদিন শমন রায় আসিবে ॥

এদিনে সেদিন ভা'লে না কী ভেবে কী করো মনা।
লালন বলে যাবে জানা হারলে বাজি কাঁদলে কী আর হবে ॥

৩৩২.

এইবেলা তোর ঘরের খবর নেরে মন।
কে বা জাগে কে বা ঘুমায় কে তোরে দেখায় স্বপন ॥

শব্দের ঘরে কে বারাম দেয় নিঃশব্দে কে আছে সদাই।
যেদিন হবে মহাপ্রলয় কে কারে করে দমন ॥

দেহের গুরু আছে কে বা শিষ্য হয়ে কে দেয় সেবা।
যেদিনেতে জানতে পাবা কোলের ঘোর যাবে তখন ॥

যে ঘরামি ঘর বেঁধেছে কোনখানে সে বসে আছে।
সিরাজ শাঁই কয় তাই না খুঁজে দিন তো বয়ে যায় লালন

৩৩৩.
এসব দেখি কানার হাটবাজার।
বেদবিধির পর শাস্ত্র কানা আর এক কানা মন আমার ॥

পণ্ডিত কানা অহঙ্কারে মাতবর কানা চোগলখোরে।
আন্দাজি এক খুঁটি গাড়ে জানে না সীমানা কার ॥

এক কানা কয় আর এক কানারে চলো যাই ভবপারে।
নিজে কানা পথ চেনে না পরকে ডাকে বারংবার ॥

কানায় কানায় ওলামেলা বোবাতে খায় রসগোল্লা।
লালন তেমনই মদনা কানা ঘুমের ঘোরে দেয় বাহার ॥

৩৩৪.
এসেছোরে মন যেপথে।
যেতে হবে সেইপথে ॥

মোহমায়ায় ভুলে র'লি আজকাল বলে দিন ফুরালি।
করো ঐ নামে কৃতাঞ্জলি যদি সময় হয় তাতে ॥

সেইপথের নাম ত্রিবেণীর ঘাট বাঘে সর্পে ধরেছে বাট।
রসিকজনা সেই ঘাটের তট মনা যাচ্ছে তাঁর সাথে ॥

সেইপথেতে তিনটি মরা পেলে মানুষ খাচ্ছে তারা।
লালন বলে মরায় মরা খেলছে খেলা তাঁর সাথে ॥

৩৩৫.
ঐরূপ তিলে তিলে জপো মনসূতে।
ভুলো না বৈদিক ভোলেতে ॥

গুরুরূপ যার ধ্যানে রয় কী করবে তার শমন রায়।
নেচে গেয়ে ভবপারে যায় গুরুচরণতরীতে ॥

উপর বাড়ি সদরওয়ালা স্বরূপ রূপে করছে খেলা।
স্বরূপ গুরু স্বরূপ চেলা আর কে আছে জগতে ॥

শমনে তরঙ্গ ভারি গুরু বিনে নাই কাণ্ডারি।
লালন বলে ভাসাও তরী যা করেন শাঁই কৃপাতে ॥

৩৩৬.
ও তোর ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন।
কিসে চিনবিরে মানুষরতন ॥

আপন খবর নাই আপনারে বেড়াও পরের খবর করে।
আপনারে চিনলে পরে পরকে চেনা যায় তখন ॥

ছিলি কোথায় এলি হেথা স্মরণ কিছু হলো না তা।
না বুঝে মুড়ালি মাথা পথের নাই অন্বেষণ ॥

যাঁর সঙ্গে এই ভবে এলি তাঁরে আজ কোথায় হারালি।
সিরাজ শাঁই কয় পেটশাখালি তাই নিয়ে পাগল লালন ॥

৩৩৭.
ও যার আপন খবর আপনার হয় না।
একবার আপনারে চিনতে পারলে যাবে অচেনারে চেনা ॥

ও শাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না।
ঘুরে এলাম সারা জগতরে তবু কোলের ঘোর তো যায় না ॥

আত্মারূপে কর্তা হরি
সাধন করলে মিলবে তাঁরই ঠিকানা।
তুই বেদ বেদান্ত পড়বি যতোরে তোর বেড়ে যাবে লখনা ॥

অমৃতসাগরের সুধা
পান করিলে ক্ষুধাতৃষ্ণা রয় না।
লালন ম'লো জল পিপাসায়রে কাছে থাকতে নদী দেখ না ॥

৩৩৮.
কতোজন ঘুরছে আশাতে খুঁজে পেলাম না এই জগতে।
অর্থ করো বোঝো ভাইরে বর্ত আছে অজুদে ॥

কুড়ি চক্ষু চৌদ্দ হস্ত তাই শুনে হলাম ব্যস্ত।
শোনার কারণ করি ন্যস্ত শুনবো আমি তোমার মুখেতে ॥

শুনে এলাম আরেক কথা এক ফেরেস্তার দুইটি মাথা।
কও তো তার মোকাম কোথা এও শুনবো তোমার কাছেতে ॥

মুর্শিদের মুখে শুনি খায় না কোনো দানাপানি।
লালন বলে কিঞ্চিৎ ধ্যানী সবুজ রঙ তাঁর গায়েতে ॥

৩৩৯.
কতোদিন আর রইবি রঙ্গে।
ধরো এইবেলা যদি বাঁচতে চাও তরঙ্গে ॥

নিকটে বিকটে বেশেতে গমন দাঁড়াইয়া আছে হরিতে জীবন।
মানিবে না কারে কেশে ধরে তোরে লয়ে যাবে সেজন আপন সঙ্গে ॥

দারাসূতাদি যতো প্রিয়জনে বক্ষ মাঝে যাদের রাখো সর্বক্ষণে।
আমার আমার বলো বারে বার তখন হেরিবে না কেহ অপাঙ্গে ॥

অতএব শোনো থাকিতে জীবন করো অন্বেষণ পতিতপাবন।
সিরাজ শাঁই কয় লালন অধমতারণ বাঁচো এখন পাপাতঙ্কে ॥

৩৪০.
করোরে পেয়ালা কবুল শুদ্ধ ইমানে।
মিশবি যদি জাত সেফাতে এ তনু আখেরের দিনে ॥

সাধিলে নূরের পেয়ালা খুলে যাবে রাগের তালা।
অচিন মানুষের খেলা দেখবি দুই নয়নে ॥

সত্তরি জব্বরি নূরি চেনোরে সেই নূর জহুরি।
এ চার পেয়ালা ভারি আছে অতিগোপনে ॥

ফানা ফিশ্ শেখ ফানা ফির রসুল ফানা ফিল্লাহ্ ফানা বাকা স্থূল।
এ চার মোকামে লালন ভজো মুর্শিদ নির্জনে ॥

৩৪১.
কয় দমে বাজে ঘড়ি করোরে ঠিকানা।
কয় দমে দিনরজনী ঘুরছে বলো না ॥

দেহের খবর যেজন করে আলকবাজি দেখতে পারে।
আলকে দম হাওয়ার ঘরে এ কী আজব কারখানা ॥

ছয় মহলে ঘড়ি ঘোরে শব্দ হয় নিঃশব্দের ঘরে।
কলকাঠি রয় মনের দ্বারে দমেতে আসল বেনা ॥

দমের সাথে করো সম্মিলন অজান খবর জানবিরে মন।
বিনয় করে বলছে লালন ঠিকের ঘর ভুলো না ॥

৩৪২.
কাছের মানুষ ডাকছো কেন শোর করে।
তুই যেখানে সেও সেখানে খুঁজে বেড়াস কারেরে ॥

বিজলী চটকের ন্যায় থেকে থেকে ঝলক দেয় রঙমহল ঘরে।
অহর্নিশি পাশাপাশি থাকতে দিশে হয় নারে ॥

হাতের কাছে যাঁরে পাও ঢাকা দিল্লি খুঁজতে যাও কোন অনুসারে।
এমনও কী বুদ্ধিনাশা তুই হলি সংসারে ॥

ঘরের মাঝে ঘরখানা খোঁজোরে মন সেইখানে কে বিরাজ করে।
সিরাজ শাঁই কয় দেখরে লালন সে কী রূপ আর তুই কী রূপরে ॥

৩৪৩.
কাঁদলে কী হবেরে মন ভাবলে কি হবে।
কীর্তিকর্মার লেখাজোখা আর কি ফিরিবে ॥

তুষে যদি পাড় কেহ দেয় তাতে কি আর চাল বাহির হয়।
মন যদি হয় তুষেরই ন্যায় বস্তুহীন ভবে ॥

হাওয়ায় কর্পূর উড়ে যেমন গোল মরিচ মিশায় তার কারণ।
মন যদি গোল মরিচ হতো কর্পূর কেন উড়ে যাবে ॥

হাওয়ার চিড়ে কথার দধি ফলছে ফলার নিরবধি।
লালন বলে যার যেমন প্রাপ্তি কেন না পাবে ॥

৩৪৪.
কালঘুমেতে গেলোরে তোর চিরদিন।
দিন গেলো মিছে কাজে মন রাত্র গেলো পরাধীন ॥

কী বলিয়ে ভবে এলি সেই কর্ম কি বা করলি।
ওরে মোহমায়ায় ভুলে র'লি গুরুকর্ম করলি না একদিন ॥

গুরুবস্তু অমূল্য ধন ঘুমের ঘোরে চিনলি না মন
ঐ ঘুমেতে হবে মরণ যেতে হবে শমনের অধীন ॥

সিরাজ শাঁই বলেরে লালন ক্ষীণ হলোরে সোনার তন।
আরো বাদী রিপু ছয়জন বাধ্য করলে না কোনোদিন ॥

৩৪৫.
কিসে আর বুঝাই মন তোরে।
দেলমক্কার ভেদ না জানিলে হজ হয় কিসেরে ॥

দেলগঠন সে কুদরতি কাম খোদ খোদা তাতে দেয় বারাম।
তাইতে হলো দেলমক্কা নাম সর্বসংসারে ॥

এক দেল যাঁর জেয়ারত হয় হাজার হজ তাঁর তুল্য নয়।
কোরানেতে সাফ লেখা রয় তাইতে বলিরে ॥

মানুষে হয় মক্কার সৃজন মানুষে করে মানুষের ভজন।
লালন বলে মক্কা কেমন চিনবি কবেরে ॥

৩৪৬.
কী হবে আমার গতি।
কতো জেনে কতোই শুনে ঠিক পড়ে না কোনো ব্রতই ॥

যাত্রাভঙ্গ যে নাম শুনে বনের পশু হনুমানে।
নিষ্ঠা যার রামচরণে সাধুর খাতায় তার সুখ্যাতি ॥

কলার ডেগো সর্প হলো চাম কেটোয়ায় গঙ্গা এলো।
এ সকল ভক্তির বল আমার নাই কোনো বলশক্তি ॥

মেঘপানে চাতকের ধ্যান অন্যবারি করে না পান।
লালন বলে জগত প্রমাণ ভক্তির শ্রেষ্ঠ সেহি ভক্তি ॥

৩৪৭.
কুদরতির সীমা কে জানে।
আপনি আপন জিকির বসিয়ে আল জবানে ॥

আল জবানে খবর হলে তারই কিছু নজির মেলে।
নইলে ফাঁকড়া কথা বলে উড়িয়ে দেবে সবজনে ॥

খোদকে চিনে খোদা চিনি খোদ খোদা বলেছে আপনি।
মান আরাফা নাফসাহু বাণী বোঝো তাঁর কি হয় মানে ॥

কে বলেরে আমি আমি সেই আমি কি আমিই আমি।
লালন বলে কে বা আমি আমারে আমি চিনিনে ॥

৩৪৮.
কুলের বউ হয়ে মনা আর কতোদিন থাকবি ঘরে।
ঘোমটা ফেলে আয় না চলে যাই সাধবাজারে ॥

কুলের ভয়ে মান হারাবি কুল কি নিবি সঙ্গে করে।
পস্তাবি শ্মশানে যেদিন ফেলবে তোরে ॥

নিসনে আর আঁচি কড়ি ন্যাড়ার ন্যাড়ি হও যেইরে।
থাকবি ভালো সর্বকালে যাবে দূরে ॥

কুলের গৌরব যার হয় গুরু হয় না তারে সদয়।
লালন বেড়ায় ফাতরার বেড়ায় ফুচকি মেরে ॥

৩৪৯.
কে বুঝিতে পারে মাওলার কুদরতি।
আপনি ঘুমায় আপনি জাগে আপনি লুটে সম্পত্তি ॥

গগনের চাঁদ গগনেতে রয় ঘটেপটে তাঁর জ্যোতির্ময়।
এমনই খোদা খোদরূপে রয় অনন্ত রূপ আকৃতি ॥

নিরাকার বটে সে খোদা অনেকে তা ভাবে সদা।
আহ্‌মদের কদে কে বা হলো উৎপত্তি ॥

আদমের কলবের মাঝে আত্মারূপে কে বিরাজে।
লালন বলে তাই না বুঝে আজাজিলের দুর্গতি ॥

৩৫০.
কে বোঝে মাওলার আলকবাজি।
করছেরে কোরানের মানে যা আসে যার মনে বুঝি ॥

একই কোরান পড়াশোনা কেউ মৌলভি কেউ মাওলানা।
দাহেরা হয় কতোজনা সে মানে না শরার কাজি ॥

রোজ কেয়ামত বলে সবাই কেউ করে নাই তারিখ নির্ণয়।
হবে কি হচ্ছে সদাই কোন কথায় মন করি রাজি ॥

ম'লে জান ইল্লিন সিজ্জিনে রয় যতোদিন রোজ হিসাব না হয়।
কেউ বলে জান ফিরে জন্মায় তবে ইল্লিন সিজ্জিন কোথায় খুঁজি ॥

আর এক খবর শুনিতে পাই এক গোর মানুষের মউতই নাই।
সে কোন আ মরি কোন ভজনরে ভাই বলছে লালন কারে পুঁছি ॥

৩৫১.
কেন ডুবলি না মন গুরুর চরণে।
এসে কাল শমন বাঁধবে কোনদিনে ॥

আমার পুত্র আমার দারা সঙ্গে কেউ যাবে না তারা যেতে শ্মশানে।
আসতে একা যেতে একা তা কি ভাবিসনে ॥

নিদ্রাবশে নিশি গেলো বৃথা কাজে দিন ফুরালো চেয়ে দেখলিনে।
এবার গেলে আর হবে না পড়বি কুক্ষণে ॥

এখনও তো আছে সময় সাধলে কিছু ফল পাওয়া যায় যদি লয় মনে।
সিরাজ শাঁই বলেরে লালন ভ্রমে ভুলিসনে ॥

৩৫২.

কেনরে মনমাঝি ভবনদীতে মাছ ধরতে এলি।
তোর মাছ ধরার ঠনঠনা শুধু কাদাজল মাখালি ॥

লোহা খসা ঘাইছেঁড়া জালে কেমন করে ধরবি মাছ আনাড়ি বাইলে।
ভক্তির জোরে জাল না দিলে টান দিলে জাল উঠে খালি ॥

লালন বলে ও মনমাঝি ভাই মাছধরার কায়দা কৌশল শিক্ষা করো নাই।
এবার শিক্ষা লও গা গরুর ঠাঁই মাছে ভরবে দেহডালি ॥

৩৫৩.

কেবল বুলি ধরেছো মারেফতি।
তোমার বুদ্ধি নাইকো অর্ধরতি ॥

মুখে মারেফত প্রকাশ করো শুধালে হা করে পড়ো।
খবর কিছু বলতে পারো কেবল কও সিনায় বসতি ॥

চোরে যেমন চুরি করে ধরে ফেললে দোষে পড়ে।
মারফতি সেই প্রকারে চোরামালের মহারতি ॥

অনুমানে বুঝলাম এখন সেইজন্যে তা করো গোপন।
লালন বলে এসব যেমন মেয়েলোকের উপপতি ॥

৩৫৪.

কেন মরলি মন ঝাঁপ দিয়ে তোর বাবার পুকুরে।
দেখি কামে চিত্ত পাগল প্রায় তোরে ॥

কেনরে মন এমন হলি যাতে জন্ম তাতেই ম'লি।
ঘুরতে হবে লক্ষ গলি হাতে পায় বেড়ি সার করে ॥

দীপের আলো দেখে যেমন উড়ে পড়ে পতঙ্গগণ।
অবশেষে হারায় জীবন আমার মন তাই করলি হারে ॥

দরবেশ সিরাজ শাঁই কয় শক্তিরূপে ত্রিজগতময়।
কেন লালন ঘুরছো বৃথাই আত্মতত্ত্ব না সেরে ॥

৩৫৫.

কেন সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না।
জল শুকাবে মীন পালাবে পস্তাবিরে ভাই মনা ॥

ত্রিবিনের তীরধারে মীনরূপে শাঁই বিরাজ করে।
উপর উপর বেড়াই ঘুরে গভীরেতে ডুবলে না ॥

মাসান্তে মহাযোগ হয় নিরস হতে রস ভেসে যায়।
করে সেই যোগের নির্ণয় মীনরূপে খেল দেখলে না ॥

জগত জোড়া মীন অবতার সন্ধির মর্ম সন্ধির উপর।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমার সন্ধানীকে চিনলে না ॥

৩৫৬.

কোথা আছেরে সেই দ্বীন দরদী শাঁই।
চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর করো ভাই ॥

চক্ষু আঁধার দেলের ধোঁকায় কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়।
কী রঙ্গ শাঁই দেখছে সদাই বসে নিগম ঠাঁই ॥

এখানে না দেখলাম যাঁরে চিনবো তাঁরে কেমন করে।
ভাগ্যগতি আখেরতরে যদি দেখা পাই ॥

সমঝে ভজনসাধন করো নিকটে ধন পেতে পারো।
লালন কয় নিজ মোকাম ঢোঁড়ো বহুদূরে নাই ॥

৩৫৭.

কোন কুলেতে যাবি মনুরায়।
গুরুকুলে যেতে হলে লোককুল সব ছাড়তে হয় ॥

নদীর দুকুল ঠিক রয় না গাঙ্গে এককুল গড়ে আর এককুল ভাঙ্গে
তেমনই যেন সাধুর সঙ্গে বেদবিধিকুল দূরে রয় ॥

রোজা পূজা বেদের আচার মন যদি চায় করো এবার।
বেজাতের কাজ বেদ বেদান্তর মায়াবাদীর কার্য নয় ॥

ভেবে বুঝে এককুল ধরো দোটানায় কেন ঘুরে মরো।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোর ফুঁ ফুরাবে কোন সময় ॥

৩৫৮.
কোন্ কোন্ হরফে ফকিরি।
কিসে আসল হয় সে হরফ জানতে হয় তার ফিকিরি ॥

কয়টি হরফ লেখে বরজোখ কি কি নাম বলি তারই।
না জেনে তার নিরিখ নেহাত পড়ে শুনে কী করি ॥

এক হরফে নিজ নাম আছে শুনি তাই বরাবরই।
কোন্ হরফ সে করো না দিশে দিন হলো আখেরি ॥

ত্রিশ হরফের চার হরফে কালুল্লাহ্ গণ্য করি।
লালন বলে আর কয় হরফ তাঁর কলব করে জারি ॥

৩৫৯.
কোন চরণ এই দীনহীনকে দেবে।
দুটি চরণ বৈ নয় আছে শতভক্তের হৃদয় দয়াময় আমার ভাগ্যে কী হবে ॥

শুনেছি সেই ত্রেতাযুগে রাম অবতার ভক্তের লেগে
মহাতীর্থস্থানযোগে যুদ্ধজয় কলরবে।
তুমি গয়াসুরকে চরণ দিয়ে বন্ধু হয়েছো ভক্তিভাবে ॥

প্রহ্লাদ নারদাদি চরণ সাথে নিরবধি
আমার বঞ্চিত বিধি এ নিধনের ভার কে লবে।
চরণ পাবার আশায় ত্রিপুরারই বেড়ায় শ্মশানে পাগলভাবে ॥

পাষাণী মানব হলো চরণধূলায় চরণমালা হনুর গলায়
হৃদয় মাঝে চরণ দোলায় নূপুর বাজে সুরবে।
লালন বলে চরণ বিক্রেতা জনমের মতো ফিরে কি কেহ আর পাবে ॥

৩৬০.
কোন দেশে যাবি মনা চল দেখি যাই কোথা পীর হও তুমিরে।
তীর্থে যাবি কী ফল পাবি সেখানে কি পাপী নাইরে ॥

বিবাদী তোর দেহে সকল অহর্নিশি করছেরে গোল।
যথায় যাবি তথায় পাগল করবে তোরে ॥

নারী ছেড়ে কেউ জঙ্গলেতে যায় স্বপ্নদোষ কি হয় না সেথায়।
মনের বাঘে যারে খায় তখন কে ঠেকায় তারে ॥

ভ্রমে বারো বসে তেরো তাও তো সদাই শুনে ফেরো।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোর বুদ্ধি নাইরে ॥

৩৬১.
কোনরূপে করো দয়া এই ভুবনে।
অনন্ত অপার মহিমা তোমার কে জানে ॥

তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ মন্ত্রদাতা পরম ইষ্টমন্ত্র দাও কানে।
মন্ত্র দিতে সপে দিলে সাধুগুরু বৈষ্ণব গোঁসাইর চরণে ॥

তীর্থ মক্কা গয়া কাশী বারাকুঞ্জ বানারসী মথুরা বৃন্দাবনে।
তীর্থে যদি গৌর পেতো ভজনসাধন করে জীব কী কারণে ॥

গুরুমুখের পদ্মবাক্য সাধকেরা করে ঐক্য আমি জানিনে।
সিরাজ শাঁই কয় অবোধ লালন শক্তিসান্ত হবে কোনদিনে ॥

৩৬২.
খালি ভাঁড় থাকবেরে পড়ে।
দিনে দিন কর্পূর তোর যাবেরে উড়ে ॥

মন যদি গোলমরিচ হতো তবে কি আর কর্পূর যেতো।
তিলকাদি না থাকিত সুসঙ্গ ছেড়ে ॥

অমূল্য কর্পূর যাহা ঢাকা দেওয়া আছে তাহা।
কেমনে প্রবেশে হাওয়া কর্পূরের ভাঁড়ে ॥

সে ধন রাখিবার কারণ নিলে না গুরুর শরণ।
লালন বলে বেড়াই এখন আগাড়ভাগাড়ে ॥

৩৬৩.
খুলবে কেন সে ধন মালের গাহক বিনে।
কতো মুক্তামণি রেখেছে ধনী বোঝাই করে সেই দোকানে ॥

সাধু সওদাগর যাঁরা মালের মূল্য জানে তাঁরা।
তাঁরা মূল্য দিয়ে লন অমূল্যরতন সে ধন জেনে চিনে তাঁরাই কেনে ॥

মাকাল ফলের বরণ দেখে যেমন ডালে বসে নাচে কাকে।
তেমনই মন আমার চটকে বিভোর সার পদার্থ নাহি চেনে ॥

মন তোমার গুণ জানা গেলো পিতল কিনে সোনা বলো।
সিরাজ শাঁইয়ের বচন মিথ্যা নয় লালন মূল হারালি তুই দিনে দিনে ॥

৩৬৪.
খেয়েছি বেজাতে কচু না বুঝে।
এখন তেঁতুল কোথা পাই খুঁজে ॥

কচু এমন মান গোঁসাই তারে কেউ চিনলি নারে ভাই।
খেয়ে হলাম পাগলপ্রায় চুবনি ঘরা চুলকাইছে ॥

ভবে নিমবৃক্ষ তার তাতে দিলে চিনির চার।
কখনো সে হয় না মিঠা এমনই কচুর বংশ সে যে ॥

যতো সব ভেড়ুয়া বাঙ্গালে কচুকে মানগোঁসাই বলে।
লালন ভেড়ো দেখলো চেখে এতে কি মন মজে ॥

৩৬৫.
খোদা বিনে কেউ নাই সংসারে।
এ মহাপাপের দায় কে উদ্ধার করে ॥

এ জগত মাঝে যতোজন আছে।
তারা সবে দোষী হবে নিজ পাপভরে ॥

পিতামাতা আশা যতো ভালবাসা।
তারা আমার পাপের ভার নাহি নিতে পারে ॥

ওরে আমার মন করো তাঁহার অন্বেষণ।
লালন বলে যিনি তোমার ভার নেয় শিরোপরে ॥

৩৬৬.
খোদা রয় আদমে মিশে।
কার জন্যে মন হলি হত সেই খোদা আদমে আছে ॥

নাম দিয়ে শাঁই কোথায় লুকালে মুর্শিদ ধরে সাধন করলে নিকটে মেলে।
আত্মারূপে কর্তা হয়ে করো তাঁর দিশে ॥

আল্লাহ্ নবি আদম এই তিনে নাই কোনো ভেদ আছে এক আত্মায় মিশে।
দেখবি যদি হযরত নবিকে এশকেতে আছে ॥

যাঁর হয়েছে মুর্শিদের জ্ঞান উজালা সেই দেখিবে নূর তাজাল্লা।
লালন বলে জ্ঞানী যাঁরা দেখবে অনা'সে ॥

৩৬৭.
গরল ছাড়া মানুষ আছে কেরে।
সেই মানুষ জগতের গোড়া আলা কুল্লে সাই জাহির আছেরে ॥

তিন আলিফে দিয়ে জবর হবে সেই মানুষের খবর।
করণ চৌদ্দ ভুবনের উপর সে কথা ব্যক্ত আছে যেরে ॥

লা মোকামে আছে বারি জবরুতে হয় তাঁর ফুকারি।
জাহের নয় সে রয় গভীরই জিহ্বাতে কে সে নাম করে ॥

সেই মানুষকে করো সাথী কাদির মাওলাকে চিনবে যদি।
লালন খোঁজে জন্মাবধি মানুষ লুকায় পলকেরে ॥

৩৬৮.
গুরু ধরো করো ভজনা।
তবে হবে তোর সাধনা ॥

তোমার বাড়ি হয় কাচারি হাকিম হলো খোদা বারি।
বেলায়েত হয় জজ কোর্ট ফৌজদারি উকিল ব্যারিস্টার এই ছয়জনা ॥

বিসমিল্লাহর 'পর হবে আপিল ইল্লাহল্লাহুতে জামিন দাখিল।
এই মামলায় করো না গাফেল খালাস করবে গুরুজনা ॥

পিছে আছে ছয়জন আমলা তারাই শুধু বাঁধায় মামলা।
খেয়েছো কি রস লেবু কমলা এই মামলায় খালাস পাবা না ॥

লালন বলে দৌড়াদৌড়ি বন্ধ আছে মায়াবেড়ি।
কার জন্যে বা এ ঘরবাড়ি বলতে আমার বাক সরে না ॥

৩৬৯.
গুরুবস্তু চিনে নে না।
অপারের কাণ্ডারি গুরু তা বিনে কেউ কূল পাবে না ॥

হেলায় হেলায় দিন ফুরালো মহাকালে ঘিরে এলো।
আর কতোকাল বাঁচবে বলো রঙমহলে প'লে হানা ॥

কি বলে এই ভবে এলি কী না কর্ম করে গেলি।
মিছে মায়ায় ভুলে র'লি সে কথা তোর মনে হয় না ॥

এখনও চলছে পবন হতে পারে কিছু সাধন।
সিরাজ শাঁই কয় অবোধ লালন এবার গেলে আর হবে না ॥

৩৭০.
গুরু বিনে কি ধন আছে।
কি ধন খুঁজিস ক্ষ্যাপা কার কাছে ॥

বিষয়ধনের ভরসা নাই ধন বলিতে গুরু গোঁসাই।
যে ধনের দিয়ে দোহাই ভব তুফান যাবে বেঁচে ॥

পুত্র পরিবার বড়ো ধন ভুলেছো এই ভবের ভুবন।
মায়ায় ভুলে অবোধ মন গুরুধনকে ভাবলি মিছে ॥

কী ধনের কী গুণপনা অন্তিমকালে যাবে জানা।
গুরুধন এখন চিনলে না নিদানে পস্তাবি পিছে ॥

গুরুধন অমূল্য ধনরে কুমনে বুঝলি না হারে।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোরে নিতান্ত প্যাঁচোয় পেয়েছে ॥

৩৭১.
গুরুপদে ডুবে থাকরে আমার মন।
গুরুপদে না ডুবিলে হবে না ভজন সাধন ॥

গুরুশিষ্য এমনই ধারা চাঁদের কোলে থাকে তাঁরা।
আয়নাতে লাগিয়ে পারা দেখে তাঁরা ত্রিভুবন ॥

শিষ্য যদি হয় কায়েমি কর্ণে পায় তার মন্ত্রদানি।
নিজগুণে পায় চক্ষুদানি নইলে অন্ধ দু নয়ন ॥

ঐ দেখা যায় আন্‌কা নহর অচিন মানুষ অচিন শহর।
সিরাজ শাঁই কয় লালনরে তোর জনম গেলো অকারণ ॥

৩৭২.
গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে।
যাবেরে তার সব অসুসার অমূল্য ধন হাতে সেহি পাবে ॥

গুরু যার হয় কাণ্ডারি চালায় তার অচল তরী।
তুফান বলে ভয় কী তারই সে নেচে গেয়ে ভবপারে যাবে ॥

আগমে নিগমে তাই কয় গুরুরূপে দ্বীন দয়াময়।
সময়ে সখা সে হয় অধীন হয়ে যে তাঁরে ভজিবে ॥

গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান যার অধোপথে গতি হয় তার।
লালন বলে তাই আজ আমার ঘটলো বুঝি মনের কুস্বভাবে ॥

৩৭৩.
গুরুকে ভজনা করো মন ভ্রান্ত হয়ো না।
সদাই থেকো সচেতনে অচেতনে ঘুমাইও না ॥

ব্যাধে যখন পাখি ধরতে যায় নয়ন তার উর্ধ্বপানে রয়
এক নিরিখে চেয়ে থাকে পলক ফিরায় না।
আঁখি নড়লে পাখি যাবে নয়নে পলক মেরো না ॥

ছিদ্র কুম্ভে জল আনতে যায় তাতে জল কী মতে রয়
আসাযাওয়ায় দেরি হলে পিপাসায় যায় প্রাণ।
মন তোর আসাযাওয়ায় দিন ফুরালো গুরুমতি ঠিক হলো না ॥

নারকেলে জলের সঞ্চার তার কী আচার কী ব্যবহার
রসে পরিপূর্ণ দেখতে চমৎকার গোপনে যার গোপিকা ভজনা।
সেই জানে জলের মর্ম লালন কয় আপনদেহের খবর নিলে না ॥

৩৭৪.
গুরু গো মনের ভ্রান্তি যায় না সংসারে।
ভ্রান্ত মন করো শান্ত শান্ত হয়ে রই ঘরে ॥

একটি কথা আনকা শুনি পিতাপুত্রে এক রমণী।
কোনখানে রেখেছে ধনী বলো দেহের মাঝারে ॥

আহার নাই সে উপবাসী নিত্য করে একাদশী।
প্রভাতে হয় পূর্ণশশী পূর্ণিমার চাঁদ অন্ধকারে ॥

ছেষট্টি দিনে এক ছেলে হলো সেই ছেলে বাজারে গেলো।
লালন মহাগোলে প'লো ফিরছেরে জীবের দ্বারে ॥

৩৭৫.
গুরুর চরণ অমূল্যধন বাঁধো ভক্তিরসে।
মানবজনম সফল হবে গুরুর উপদেশে ॥

হিংসা নিন্দা তমঃ ছাড়ো মরার আগেতে মরো।
তবে যাবে ভবপার ঘুঁচবে মনের বেদিশে ॥

ষোলোকলা পূর্ণরতি হতে হবে ভাবপ্রকৃতি।
গুরু দেবেন পূর্ণরতি হৃৎকমলে বসে ॥

পারাপারের খবর জানো জেনে মহৎ গুরুকে মানো।
লালন কয় ভাবছো কেন পড়ে মায়ার ফাঁসে ॥

৩৭৬.
গুরুর ভজনে হয় তো সতী।
জ্যোতিঃরূপ নগরে যাবি ফুলবতী ॥

না হলেরে সতী হবে না ভজনে মতি।
এক কৃষ্ণ জগতের পতি আর সব প্রকৃতি ॥

প্রকৃতি হয়ে করো প্রকৃতি ভজন তবেই হবে গোপিনীর শরণ।
না হলে গোপীর ভাবাশ্রয়করণ হবে না গুরুর ভজনে মতি ॥

গুরুতে করো নাগরীপ্রীতি হইবে দশ ইন্দ্রিয় রিপুর মতি।
ফকির লালন বলে প্রেম পিরিতি তৃতীয় ভজনের এই রীতি ॥

৩৭৭.
গড় মুসল্লি বলছো কারে।
ঠিক মুসুল্লি বলছো কারে মুসল্লি এই সংসারে ॥

শুনবো শাঁইয়ের নিগূঢ়কথা আশা তসবির জন্ম কোথা।
কোথায় পেলে গলার খিলকা তাজ মাথায় পরালো কেরে ॥

একটি মরার পাঁচটি কাল্লা কাল্লায় কাল্লায় বলছে আল্লাহ্।
কোন্ কাল্লায় হয় রসুলাল্লাহ্ সর্বদা নাম জপিলরে ॥

তহ্‌বন পরে হলে খাঁটি উপরে কোপনি নিচে নেংটি।
লালন বলে এসব ফষ্টি খাটবে নারে সাধুর দ্বারে ॥

৩৭৮.
গেড়ো গাঙ্গেরে ক্ষ্যাপা হাপুরহুপুর ডুব পাড়িলে।
এবার মজা যাবে বোঝা কার্তিকের উলানের কালে ॥

কুঁতবি যখন কফের জ্বালায় তাগা তাবিজ বাঁধবি গলায়।
তাতে কী রোগ হবে ভালাই মস্তকের জল শুষ্ক হলে ॥

বাইচালা দেয় ঘড়ি ঘড়ি ডুব পাড়িস কেন তাড়াতাড়ি।
প্রবল হবে কফের নাড়ি যাতে হানি জীবনমূলে ॥

ক্ষান্ত দেরে ঝাঁপুই খেলা শান্ত হওরে ও মনভোলা।
লালন কয় আছে বেলা দেখলি নারে চক্ষু মেলে ॥

৩৭৯.
গোয়ালভরা পুষণে ছেলে বাবা বলে ডাকে না।
মনের দুঃখ মনই জানে সে অন্যে তা জানে না ॥

মন আর তুমি মানুষ দুইজন এই দুজনাতেই প্রেমালাপন।
কখন সুধার হয় বরিষণ কখন গরল খেয়ে যন্ত্রণা ॥

মন আর তুমি একজন হলে অনায়াসে অমূল্য ধন মেলে।
একজনাতে আর একজন এলে হয় মুর্শিদরূপ প্রকাশনা ॥

পাবার আশে অমূল্য ধন জীবন যৌবন সব সমর্পণ।
আশাসিন্ধুর কূলে লালন আপন কিছু রাখলো না ॥

৩৮০.

ঘরে বাস করে সে ঘরের খবর নাই।
চারযুগে ঘর চাবি আঁটা ছোড়ান পরের ঠাঁই ॥

কলকাঠি যার পরের হাতে তার ক্ষমতা কি এ জগতে।
লেনাদেনা দিবারাতে পরে পরের ভাই ॥

এ কী বেহাত আপন ঘরে থাকতে রতন হই দরিদ্ররে।
দেয় সে রতন হাতে ধরে তাঁরে কোথা পাই ॥

ঘর থুয়ে ধন বাইরে খোঁজা বয় সে যেমন চিনির বোঝা
পায় নারে সে চিনির মজা বলদ য্যাছাই ॥

পর দিয়ে পর ধরাধরি সে পর কই চিনতে পারি।
লালন বলে হায় কী করি না দেখি উপায় ॥

৩৮১.

চরণ পাই যেন অন্তিমকালে।
ফেলো না অতুর অধম বলে ॥

সাধনে পাবো তোমায় সে ক্ষমতা নাইগো আমায়।
দয়াল নাম শুনিয়ে আশায় আছি অধীন কাঙালে ॥

জগাই মাধাই পাপী ছিলো কাঁধা ফেলে গায় মারিল।
তাহে প্রভুর দয়া হলো আমায় দয়া করো সেই হালে ॥

ভারতপুরাণে শুনি পতিতপাবন নামের ধ্বনি।
লালন বলে সত্য জানি আমারে চরণ দিলে ॥

৩৮২.

চল্ দেখি মন কোনদেশে যাবি।
অবিশ্বাস হলে কোথায় কী পাবি ॥

এদেশেতে ভূতপ্রেত বলে গয়ায় পিণ্ড দিলে।
গয়ার ভূত কোনদেশে গেলে মুক্তি কিসে পায় ভাবি ॥

মন বোঝে না তীর্থ করা মিছেমিছি খেটে মরা।
পেঁড়োর কাজ পিঁড়েয় সারা নিষ্ঠা মন যার হবে ॥

বারো ভাটি বাংলা জুড়ে একই মাটি আছে পড়ে।
সিরাজ শাঁই কয় লালন ভেড়ে ঠিক দাও নিজ নসিবই ॥

৩৮৩.
চলো যাই আনন্দের বাজারে।
চিত্তমন্দ তমঃ অন্ধ নিরানন্দ রবে নারে ॥

সুজনায় সুজনাতে সহজ প্রেম হয় সাধিতে
যাবি নিত্যধামেতে প্রেমপদ্মের বাসনাতে।
প্রেমের গতি বিপরীতে সকলে জানে না
কৃষ্ণপ্রেমের বেচাকেনা অন্য বেচাকেনা নাইরে ॥

সহস্রারের বাঁকা কারণ শ্যামরায় করলেন ধারণ
হইলেন গৌরবরণ রাধার প্রেমসাধনা।
আনন্দে সানন্দে মিশে যোগ করে যেজনা
লালন বলে নিহেতু প্রেম অধর ধরা যেতে পারে ॥

৩৮৪.
চাষার কর্ম হালেরে ভাই লাঙ্গল বইতে মানা।
জমির চাষ না দিলে ঘাস মরে না ফলে কাশবেনা ॥

অনুরাগের চাষা হয়ে প্রেমের করো চাষ তাইতে শুকাইবে ঘাস।
জমিতে নীর পড়িবে কৃষি হবে ফলে যাবে সোনা ॥

সাগু কাঠের লাঙ্গল বান্ধ ক্ষ্যান্ত কাঠের ইশ্।
তাতে থাকবে না কোনো বিষ লালন বলে ওরে চাষা চাষের কাম ছেড়ো না ॥

৩৮৫.
জগত মুক্তিতে ভোলালেন শাঁই।
ভক্তি দাও হে যাতে চরণ পাই ॥

ভক্তিপদ বঞ্চিত করে মুক্তিপদ দিচ্ছো সবারে।
যাতে জীব ব্রহ্মাণ্ডে ঘোরে কাণ্ড তোমার দেখি তাই ॥

রাঙ্গাচরণ পাবো বলে বাঞ্ছা সদাই হৃৎকমলে।
তোমার নামের মিঠায় মন মজালে রূপ কেমন তাই দেখতে চাই ॥

চরণের যোগ্য মন নয় তথাপি মন ঐ চরণ চায়।
ফকির লালন বলে হে দয়াময় দয়া করো আজ আমায় ॥

৩৮৬.
জান গা বরজোখ বেলায়েত ভেদ পড়ে।
অচিনকে চিনবি ঐ বরজোখ ধরে ॥

নবুয়তে সব অদেখা তপ্‌জপ্।
বেলায়েতে দীপ্তকার দেখো নজরে ॥

বরজোখে যার নাই নিহার আখেরে রূপ চিনবি কী তাঁর।
নবি সরওয়ার বলছেন বারংবার প্রমাণ আছে তাঁর হাদিস মাঝারে ॥

সেই প্রমাণ এখানে মানি অদেখারে দেখে কেমনে চিনি।
যদি চেনা যায় তার বিধি হয় আলকজনকে সত্য বিশ্বাস করে ॥

নবুয়ত বেলায়েত কারে বলা যায় যে ভজে মুর্শিদ সেই জানতে পায়।
লালন ফকির কয় আরেক ধাঁধা হয় বস্তু বিনে নামে পেট কই ভরে ॥

৩৮৭.
জান গা যা গুরুর দ্বারে জ্ঞান উপাসনা।
কোন মানুষের কেমন কৃতি যাবেরে জানা ॥

পুরুষ পরশমণি কালাকাল তাঁর কিসে জানি।
জল দিয়ে সব চাতকিনী করে সান্ত্বনা ॥

যাঁর আশায় জগত বেহাল তাঁর কি আছে সকালবৈকাল।
তিলক মন্ত্রে না দিলে জল ব্রহ্মাণ্ড রয় না ॥

বেদবিধির অগোচর সদাই কৃষ্ণপদ্ম নিত্য উদয়।
লালন বলে মনের দ্বিধায় কেউ দেখেও দেখে না ॥

৩৮৮.
জ্বালঘরে চটিলে হয় সে জাতনাশা।
তার কী ছার আশার আশা ॥

হাঁড়ি চটে কেউ রয় মনে দেখে ধোঁকা হয়।
বুঝি পূর্বেকার ফ্যারেফোরে পড়ে সেরে তলাফাঁসা ॥

ও সে পোড়াচাড়া চার যুগে মিশে না থাকে।
গুরুত্যাগী মনবিবাগী তার তো ঘটে সেই দশা ॥

কেউ কুমারকে দোষায় কেউ মাটি খারাপ কয়।
লালন বলে পাগলা ছেলে বোঝা কঠিন সাধুভাষা ॥

৩৮৯.
জিজ্ঞাসিলে খোদার কথা দেখায় আসমানে।
আছেন কোথায় স্বর্গপুরে কেউ নাহি তাঁর ভেদ জানে ॥

পৃথিবী গোলাকার শুনি অহর্নিশি ঘোরে জানি
তাইতে হয় দিনরজনী জ্ঞানীগুণী তাই মানে ॥

একদিকেতে নিশি হলে অন্যদিকে দিবা বলে
আকাশ তো দেখে সকলে খোদা দেখে কয়জনে ॥

আপন ঘরে কে কথা কয় না জেনে আসমানে তাকায়
লালন বলে কে বা কোথায় বুঝিবে দিব্যজ্ঞানে ॥

৩৯০.
জিন্দা পীর আগে ধরোরে।
দেখে শমন যাক ফিরে ॥

আয়ু থাকতে আগে মরা সাধক যে তার এমনই ধারা
প্রেমোন্মাদে মাতোয়ারা সে কি বিধির ভয় করে ॥

মরে যদি ভেসে ওঠে সে তো বেড়ায় ঘাটে ঘাটে
মরে ডোবো শ্রীপাটে বিধির অধিকার ত্যাগেরে ॥

হায়াতের আগে যে মরে বাঁচে সে মউতের জোরে
দেখোরে মন হিসাব করে ফকির লালন কয় ডেকেরে ॥

৩৯১.
জেনে নামাজ পড়ো হে মোমিনগণ।
না জেনে পড়লে নামাজ আখেরে তার হয় মরণ ॥

এক মোমিন মক্কায় যেতে লোক ছিলো না সাথে
সে ভাবে মনে মনে আল্লাহ্ কী করি এখনে
নামাজ কাজা হলে হবে আখেরে মরণ ॥

তাঁর সঙ্গে ছিলো চৌষট্টি জন তাই গুণ করে তখন
তার গড় লায়েক ছাব্বিশ জন সঙ্গে নিলো লায়েক তিরিশ জন
অজু বানাইয়া নামাজ আদায় করে তখন ॥

নামাজে যখন সেজদা দিলো সাতাশ জন
বিমুখ হয়ে তখন বসে রইলো তিনজন
লালন বলে ঐ তিনজনাই ঘুরায় ত্রিভুবন ॥

৩৯২.
ডাকোরে মন আমার হক নাম আল্লাহ্ বলে।
মনে ভেবে বুঝে দেখো সকলই না হক হক না হক নাম সঙ্গে চলে ॥

ভবের ভাই বন্ধু যারা
বিপদ দেখে তারা ছেড়ে পালাবে।
সেদিন কোঠাবালাঘর কোথা রবে কার
হক নাম হক তাই কেবল সঙ্গে চলে ॥

ভরসা নাই এ জিন্দেগানি
যেমন পদ্মপাতার পানি পড়িবে টলে।
তেমনই কায় প্রাণেতে ভাই আখের সুবাদ নাই
ক্ষণেক পক্ষি যেমন থাকে বৃক্ষডালে ॥

অকাজে দিন হলোরে সাম
কবে নেবো সেই আল্লাহ্র নাম ভবের বাজার ভাঙ্গিলে।
এবার পেয়েছোরে মন দুর্লভ মানবজনম
লালন বলে মানবজনম যায় বিফলে ॥

৩৯৩.
ঢোঁড় আজাজিল রেখেছে সেজদা বাকি কোনখানে।
করোরে মন করো সেজদা সেই জায়গা চিনে ॥

জগত জুড়ে করিল সেজদা তবু ঘটলো দুরবস্থা।
ইমান না হইল পোস্তা থোড়াই জমিনে ॥

এমন মহাত্ম্য সে জায়গায় সেজদা দিলে মকবুল হয়।
আজাজিলের বিশ্বাস নয় লানত সেই কারণে ॥

আজাজিলের সেজদার উপর সেজদা দিলে কী ফল হয় তার।
লালন বলে এহি বিচার ত্বরায় লও জেনে ॥

৩৯৪.
তরিকতে দাখেল না হলে।
শরিয়ত হবে না সিদ্ধ পড়বি গোলমালে ॥

শরার নামাজের বীজ আরকান আহ্কাম তেরো চিজ।
তরিকতের আহ্কাম আরকান কয় চিজে বলে ॥

সালেকি মজ্জুবি হয় হকিকতে হয় পরিচয়।
মারেফত সেই সিদ্ধির মোকাম দেখ নারে খুলে ॥

আত্মতত্ত্ব জানে যে সব খবরে জবর সে।
লালন ফকির ফাঁকে প'লো নিগূঢ়পথ ভুলে ॥

৩৯৫.
তাঁরে চিনবে কেরে এই মানুষে।
ম্যারে শাঁই ফেরে কী রূপে সে ॥

মায়ের গুরু পুত্রের শিষ্য দেখে জীবের জ্ঞান নৈরাশ্য।
কী তাঁহার মনের উদ্দেশ্য ভেবে বোঝা যায় কিসে ॥

গোলোকে অটল হরি ব্রজপুরে বংশীধারী।
হলেন নদীয়াতে অবতারী ভক্তরূপে প্রকাশে ॥

আমি ভাবি নিরাকার সে ফেরে স্বরূপ আকার।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমার কই হলোরে সে দিশে ॥

৩৯৬.
তুমি কার আজ কে বা তোমার এই সংসারে।
মিছে মায়ায় মজিয়ে মন কী করোরে ॥

এতো পিরিত দন্ত জিহ্বায় কায়দা পেলে সেও সাজা দেয়।
স্বল্পেতে সব জানিতে হয় ভাবনগরে ॥

সময়ে সকলই সখা অসময় কেউ দেয় না দেখা।
যার পাপে সে ভোগে একা চার যুগেরে ॥

আপনি যখন নও আপনার কারে বলো আমার আমার।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমার জ্ঞান নাহিরে ॥

৩৯৭.
তোর ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন।
কিসে চিনবিরে মানুষরতন ॥

আপন খবর নাই আপনারে বেড়াও পরের খবর করে।
আপনারে চিনলে পরে পরকে চেনা যায় তখন ॥

ছিলি কোথা এলি কোথা স্মরণ কিছু হয় না তা।
কী বুঝে মুড়ালি মাথা পথের নাই অন্বেষণ ॥

যাঁর সাথে এইদেশে এলি তাঁরে আজ কোথায় হারালি।
সিরাজ শাঁই কয় পেটশাখালী তাই লয়ে পাগল লালন ॥

৩৯৮.
থাকো না মন একান্ত হয়ে।
গুরু গোঁসাইর বাক লয়ে ॥

মেঘপানে চাতক তাকায় চাতকের প্রাণও যদি যায়
তবু কি অন্যজল খায় উর্ধ্বমুখে থাকে সদাই।
নবঘন জলপানে তেমনই মতোন হলে সাধন সিদ্ধি হবে এইদেহে ॥

এক নিরিখ দেখো ধনী সূর্যগত কমলিনী
দিনে বিকশিত তেমনই নিশীথে মুদিত রহে।
এমনই জেনো ভক্তের লক্ষণ একরূপে বাঁধে হিয়ে ॥

বহু বেদ পড়াশোনা শুনিতে পাইরে মনা
সদাশিব যোগী সে না কিঞ্চিত ধ্যান করিয়ে।
শ্মশানে মশানে থাকে কিঞ্চিতের লাগিয়ে ॥

গুরু ছেড়ে গৌর ভজি তাতে নরকে মজি
দেখো না মন পুঁথিপাজি সত্য কি মিথ্যা কহে।
মন তোরে বুঝাবো কতো লালন কয় দিন যায় বয়ে ॥

৩৯৯.
দয়াল অপরাধ মার্জনা করো এবার।
আমি দিয়েছি সব তোমার চরণে ভার ॥

নিজগুণে দিয়ে চরণ যেমন ইচ্ছে করো হে তারণ।
পতিতকে উদ্ধারের কারণ পতিতপাবন নামটি তোমার ॥

ত্রিজগতের একনাম তুমি অপরাধ ক্ষমা করো হে স্বামী।
তোমার নামটি শুনে দোহাই দিই আমি দাসেরে করো নিস্তার ॥

ও দয়াল আমি অতিমূর্খমতি না জানি কোনো ভক্তি স্তুতি।
লালন বলে করি মিনতি তুমি বিনে আর কেউ নাই আমার ॥

৪০০.
দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরি।
আমি ছিলাম কোথা এলাম হেথা আবার কোথা যাবো ভেবে মরি ॥

বাল্যকাল খেলাতে গেলো যৌবনে কলঙ্ক হলো।
বৃদ্ধকাল সামনে এলো মহাকাল হলো অধিকারী ॥

বসত করি দিবারাতে ষোলোজন বম্বেটের সাথে।
আমায় যেতে দেয় না সরল পথে কাজে কামে করে দাগাদারি ॥

যে আশায় এই ভবে আসা আশায় প'লো ভগ্নদশা।
লালন বলে হায় কী দশা আমার উজান যেতে ভেটেন প'লো তরী

৪০১.
দেখবি যদি স্বরূপ নিহারা।
তবে মনের মানুষ পড়বে ধরা ॥

মরার আগে মরতে হবে তবে মনের মানুষ সন্ধান পাবে।
যজ্ঞেযোগে অনুরাগে আয়নাতে মিশাও গে পারা ॥

তারে তার মিশালে দেখবি সাধের মানুষলীলে।
বসে আছে একজন ছেলে শূন্যের উপর আসন করা ॥

লালন বলে দেখবি ভালো চাররঙে করেছে আলো।
আর একরঙ গোপনে রইলো তার চতুর্দিকে লাল জহুরা ॥

৪০২.
দেখ নারে দিনরজনী কোথা হতে হয়।
কোন পাকে দিন আসে ঘুরে কোন পাকে রজনী যায় ॥

রাত্রদিনের খবর নাই যার কিসের ভজন সাধনা তার।
নাম গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ ফকিরি তার তেমনই প্রায় ॥

কয় দমে দিন চালাচ্ছে বারি কয় দমে রজনী আখেরি।
আপন ঘরের নিকাশ করে যে জানে সে মহাশয় ॥

সামান্যে কি যাবে জানা কারিগরের কী গুণপনা।
লালন বলে তিনটি তারে অনন্তরূপ কল খাটায় ॥

৪০৩.
দেলদরিয়ায় ডুবলে সে দরিয়ার খবর পায়।
নইলে পুঁথি পড়ে পণ্ডিত হলে কী ফল হয় ॥

স্বয়ম্‌রূপ দর্পণ নিহারে মানবরূপ সৃষ্টি করে
দিব্যজ্ঞানী যাঁরা ভাবে বোঝে তাঁরা
মানুষ ভজে সিদ্ধি করে যায় ॥

একেতে হয় তিনটি আকার অযোনি সহজ সংস্কার
যদি ভাব তরঙ্গে তরো মানুষ চিনে ধরো
দিনমণি গেলে কী হবে উপায় ॥

মূল হতে হয় বৃক্ষের সৃজন ডাল ধরলে হায় মূল অন্বেষণ
এমনই রূপ হইবে স্বরূপ তাঁরে ভেবে বিরূপ
অবোধ লালন সদাই নিরূপ ধরতে চায় ॥

৪০৪.
দ্বীনের ভাব যেদিন উদয় হবে।
সেদিন মন তোর ঘোর অন্ধকার ঘুঁচে যাবে ॥

মণিহারা ফণি যেমন এমনই ভাবরাগের করণ।
অরুণ বসন ধারণ বিভূতিভূষণ লবে ॥

ভাবশূন্য হৃদয় মাঝার মুখে পড়ো কালাম আল্লাহর।
তাইতে কি মন তুই পাবি নিস্তার ভেবেছো এবে ॥

অঙ্গে ধরণ করো বেহাল হৃদে জ্বালো প্রেমের মশাল।
দুই নয়ন হবে উজ্জ্বল মুর্শিদবস্তু দেখতে পাবে।

কোরানে লিখেছে প্রমাণ আপনার আপনি এলহাম।
কোথা থেকে কে কহিছে জবান কীরূপে ॥

করোরে মন সেসব দিশে তরিকার মঞ্জিলে বসে।
তিনেতে তিন আছে মিশে ভাবুক হলে জানতে পাবে ॥

একের জুতে তিনের লক্ষণ তিনের ঘরে আছে সে ধন।
তিনের মর্ম খুঁজিলে স্বরূপ দর্শন তার হবে ॥

সিরাজ শাঁইয়ের হকের বচন ভেবে কয় ফকির লালন।
কথায় কি আর হয় আচরণ খাঁটি হও মন দ্বীনের ভাবে ॥

৪০৫.
ধর্মবাজার মিলাইছে নিরঞ্জনে।
কানা চোরে চুরি করে ঘর থুয়ে সিঁদ দেয় পাগাড়ে
হস্ত নাই সে ওজন করে বোবায় গান করে কানায় বসে শোনে ॥

কানায় করে দোকানদারি বোবায় বসে মার নিচ্ছে তারই।
সেই হাটে এক বেঁজো নারী ছেলে কোলে হাসছে রাত্রদিনে ॥

ভাঙ্গবে বাজার উঠবে ধনী মানুষ নাই তাঁর শব্দ শুনি।
তালাশ নাই তার মধ্যে প্রাণী লালন বসে ভাবছে মনে মনে ॥

৪০৬.

ধড়ে কে মুরিদ হয় কে মুরিদ করে।
শুনে জ্ঞান হয় তাইতে শুধাই যে জানো সে বলো মোরে ॥

হাওয়া রুহু লতিফারা হুজুরে কারবারি তারা।
বেমুরিদা হলে এরা হুজুরে কি থাকতে পারে ॥

মুর্শিদ-বালকা এই দুজনার কোন মোকামে বসতি কার।
জানলে মনের যেতো আঁধার দেখতাম কুদরত আপন ঘরে ॥

নতুন সৃষ্টি হলে তখন মুর্শিদ লাগে শিক্ষার কারণ।
লালন বলে সব পুরাতন নতুন সৃষ্টি হচ্ছে কীরে ॥

৪০৭.

নজর একদিক দাওরে।
যদি চিনতে বাঞ্ছা হয় তাঁরে ॥

লামে আলিফ রয় যেমন মানুষে শাঁই আছে তেমন।
নীরে ক্ষীরে তেমনই মিলন বলতে নয়ন ঝরে ॥

কে ছোট কে গাছ-বীজে কে আগে কে হলো পিছে।
দাসী হলে গুরুর কাছে দেখায় দুইচোখ ধরে ॥

না বুঝে যায় সে কাজে বলবো কী কথা মরি লাজে।
লালন বলে দুই নৌকায় পা দিলে অমনি পাছা যায় চিরে ॥

৪০৮.

নাই সফিনায় নাই সিনায় দেখো খোদা বর্তমান।
রূপ না দেখে সেজদা দিলে কোরানে হারাম ফরমান।

বরজোখ ব্যতীত সেজদা কবুল করে না খোদা
সকলই হবে বেফায়দা বেজার হবেন সোবাহান।
রূপ না দেখে বসে কূপে কারে ডাকো মোমিন চাঁন ॥

আলহামদু কুল হু আল্লাহ এইদেহেতে আছে মিলা
আত্তাহিয়াতু আত্মায় আল্লাহ তিনে দেহ বর্তমান।
মানবদেহে বিরাজ করে খোদ খোদা স্বরূপরতন ॥

লাহুত নাসুত মালকুত জবরুত তার উপরে আছে হাহুত
কোরানে রয়েছে সাবুদ পড়ে করো গুরুধ্যান।
নয় দরজা মেরে তালা বরজোখে করো ছোড়ান ॥

স্বরূপ রূপ যাকে বলে মুর্শিদের মেহের হলে
জবরুতের পর্দা খুলে দেখায় তারে স্বরূপ বর্তমান।
সিরাজ শাঁই বলেরে লালন আর কবে তোর হবে সাধনজ্ঞান

৪০৯.
না ঘুঁচিলে মনের ময়লা।
সেই সত্যপথে না যায় চলা ॥

মন পরিষ্কার করো আগে অন্তরবাহির হবে খোলা।
তবে যত্ন হলে রত্ন পাবে এড়াবে সংসারজ্বালা ॥

স্নানাদি বস্ত্র পরিষ্কার অঙ্গে ছাপা জপমালা।
দেখো এ সকলই ভ্রান্ত কেবল লোকদেখানো ছেলেখেলা ॥

ভবনদী তরবি যদি কড়ি যোগাড় করো এইবেলা।
সিরাজের প্রেমে মগ্ন হলে লালন তোর ঘুঁচবে মনের ঘোলা ॥

৪১০.
না জানি ভাব কেমন ধারা।
না জেনে পাড়ি ধরে মাঝদরিয়ায় ডুবলো ভারা ॥

সেই নদীর ত্রিধারা কোন ধারে তার কপাট মারা।
কোন ধারে তার সহজ মানুষ সদাই করে চলাফেরা ॥

হরনাল করনাল মৃণালে শকনালে সুধারায় চলে।
বিনা সাধনে এসে রণে পুঁজিপাট্টা হলাম হারা ॥

অবোধ লালন বিনয় করে একথা আর বলবো কারে।
রূপদর্শন দর্পণের ঘরে হলাম আমি পারাহারা ॥

৪১১.
না জেনে করণকারণ কথায় কি হবে।
কথায় যদি ফলে কৃষি তবে কেন বীজ রোপে ॥

গুড় বললে কি মুখ মিঠে হয় দীপ না জ্বাললে আঁধার কি যায়
তেমনই মতো হরি বলায় হরি কি পাবে ॥

রাজায় পৌরুষ করে জমির কর সে বাছে নারে।
তেমনই শাঁইয়ের একরারি কার্য সে কি পৌরুষে ছাড়বে ॥

গুরু ধরে খোদাকে জানো শাঁইর আইন আমলে আনো।
লালন বলে তবে মন শাঁই তোরে নেবে ॥

৪১২.
না দেখলে লেহাজ করে মুখে পড়লে কি হয়।
মনের ঘোরে কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় ॥

আহ্‌মদ নামে দেখি মিম হরফটি দেখায় নফি।
মিম গেলে সে হয় কি দেখো পড়ে সবাই ॥

আহাদ আহ্‌মদে এক লায়েক সে মর্ম পায়।
আকার ছেড়ে নিরাকারে সেজদা কে দেয় ॥

জানাতে ভজনকথা তাইতে খোদা অলিরূপ হয়।
লালন গেলো পড়ে ধূলায় দাহিরিয়ার ন্যায় ॥

৪১৩.
না পড়িলে দায়েমি নামাজ সে কি রাজি হয়।
কোথায় খোদা কোথায় সেজদা করছো সদাই ॥

বলেছেন তাঁর কালাম কিছু আন্তা আবুদু ফান্তা রাহু।
বুঝিতে হয় বোঝো কেহ দিন তো বয়ে যায় ॥

এক আয়াতে কয় তাফাক্কারুন বোঝো তাহার মানে কেমন।
কলুর বলদের মতন ঘোরার কার্য নয় ॥

আঁধার ঘরে সর্প ধরা সাপ নাই প্রত্যয় করা।
লালন তেমনই বুদ্ধিহারা পাগলের প্রায় ॥

৪১৪.
না বুঝে মজো না পিরিতে।
বুঝে সুঝে করো পিরিত শেষ ভালো দাঁড়ায় যাতে ॥

ভবের পিরিত ভূতের কীর্তন ক্ষণেক বিচ্ছেদ ক্ষণেক মিলন
অবশেষে হয় তার মরণ তেমাথা পথে ॥

যদি পিরিতের হয় বাসনা সাধুর কাছে জান গে বেনা।
লোহা যেমন স্পর্শে সোনা হবে সেইমতে ॥

এক পিরিতে দ্বিভাগ চলন কেউ স্বর্গে কেউ নরকে গমন।
বিনয় করে বলছে লালন এই জগতে ॥

৪১৫.
নামসাধন বিফল বরজোখ বিনে।
এখানে সেখানে বরজোখ মূল ঠিকানা তাই দেখো মনে মনে ॥

বরজোখ ঠিক না হয় যদি ভোলায় তারে শয়তান গৃধী।
ধরিয়ে রূপ নানান বিধি তারে চিনবি কীরূপ প্রমাণে ॥
চার ভেঙ্গে দুই হলো পাকা এই দুই বরজোখ লেখাজোখা।

তাতে প'লো আরেক ধোঁকা দুইদিক ঠিক কিসে হয় ধেয়ানে ॥

যেমন নৌকা ঠিক নাই বিনা পারায় নিরাকারে মন কি দাঁড়ায়।
লালন মিছে ঘুরে বেড়ায় অধর ধরতে চায় বরজোখ না চিনে ॥

৪১৬.
পড় গা নামাজ জেনে শুনে।
নিয়ত বাঁধ গা মানুষ মক্কাপানে ॥

শতদল কমলে কালা আসন শূন্য সিংহাসনে।
খেলছে খেলা বিনোদকালা এই মানুষের তনভুবনে ॥

মানুষে মনস্কামনা সিদ্ধ করো বর্তমানে।
চৌদ্দ ভুবন ফিরায় নিশান ঝলক দিচ্ছে নয়নকোণে ॥

মুর্শিদের মেহেরে মোহর যাঁর খুলেছে সেই তো জানে।
সিরাজ শাঁই কয় অবোধ লালন খুঁজিস কী তুই বনে বনে ॥

৪১৭.
পড় গা নামাজ ভেদ বুঝে।
বড়জোখ নিরিখ না হলে ঠিক নামাজ পড়া হয় মিছে ॥

আপনি কেন আপন পানে তাকাও নামাজে বসে।
আত্তাহিয়াতু রুকু সালাম দেখো তার প্রমাণ আছে ॥

সুন্নত নফল ফরজ সব রাকাত গোনা নামাজ।
থাকলে এসব হিসাবনিকাশ বরজোখ ঠিক রয় কিসে ॥

শুনে ভজনের হুকুম সাবেদ করেছে।
লালন বলে আন্ধেলা ইমাম এক্তেদা নাই তার পিছে ॥

৪১৮.

পড়ে ভূত আর হোসনে মনুরায়।
কোন হরফে কী ভেদ আছে লেহাজ করে জানতে হয় ॥

আলিফ হে আর মিম দালেতে আহ্‌মদ নাম লেখা যায়।
মিম হরফ তাঁর নফি করে দেখ না খোদা কারে কয় ॥

আকার ছেড়ে নিরাকারে ভজলিরে আন্ধেলার প্রায়।
আহাদে আহ্‌মদ হলো করলিনে তাঁর পরিচয় ॥

জাতে সেফাত সেফাত জাত দরবেশে তাই জানিতে পায়।
লালন বলে কাঠমোল্লাজি ভেদ না জেনে গোল বাঁধায় ॥

৪১৯.

পড়োরে দায়েমি নামাজ এইদিন হলো আখেরি।
মাশুকরূপ হৃৎকমলে দেখো আশেক বাতি জ্বেলে
কি বা সকাল কি বৈকালে দায়েমির নাই অবধারী ॥

সালেকের বাহ্যপনা মজ্জুবি আশেক দিওয়ানা
আশেক দেলে করে ফানা মাশুক বৈ অন্য জানে না
আশার ঝুলি লয়ে সে না মাশুকের চরণ ভিখারী ॥

কেফায়া আইন সিনই এহি ফরজ জাত নিশানি
দায়েমি ফরজ আদায় যে করে তার নাই জাতের ভয়
জাত এলাহির ভাবে সদাই মিশেছে সেই জাতি নূরি ॥

আইনির অদেখা তরিক দায়েমি বরজোখ নিরিখ
সিরাজ শাঁইর হক বচন ভেবে কয় ফকির লালন
দায়েমি সালাতি যেজন শমন তার আজ্ঞাকারি ॥

৪২০.

পাবিরে মন স্বরূপের দ্বারে।
খুঁজে দেখ নারে মন বরজোখ 'পরে নিহার করে ॥

দেখ না মন ব্রহ্মাণ্ড 'পরে সদাই সে বিরাজ করে।
অখণ্ড রূপ নিহারে থাক গে বসে নিরিখ ধরে ॥

লেখা আছে কুদরত কালাম জানাই তাঁরে হাজার সালাম।
লেখা নাই ভেদ সফিনায় আ ়ক শাঁই রয় আলের 'পরে ॥

ছাড়োরে মন ছল চাতুরি তাকাব্বরি গুণ জাহিরি।
লালন কয় আহা মরি ডুব দিয়ে দেখ গভীর নীরে ॥

৪২১.
পাবে সামান্যে কি তাঁর দেখা।
বেদে নাই যাঁর রূপরেখা ॥

সবে বলে পরম ইষ্ট কারো না হইল দৃষ্ট।
বরাতে করিল সৃষ্ট তাই লয়ে লেখাজোখা ॥

নিরাকার ব্রহ্ম হয় সে সদাই ফিরছে অচিন দেশে।
দোসর তাঁর নাইকো পাশে ফেরে সে একা একা ॥

কিঞ্চিৎ ধ্যানে মহাদেব সে তুলনা কী আর দেবো।
লালন কয় গুরু ভাবো যাবেরে মনের ধোঁকা ॥

৪২২.
পুল সেরাতের কথা কিছু ভাবিও মনে।
একদিন পার হতে অবশ্য হবে সেখানে ॥

সেইপথ ত্রিভঙ্গ বাঁকা তাতে হীরের ধার চোখা।
ইমান তার হলে পাকা তরাবে সেইদিনে ॥

বলবো কি সেই পারের দুষ্কর চক্ষু হবে ঘোর অন্ধকার।
কেউ দেখবে না কারো আকার কে যাবে কেমনে ॥

ফাতেমা নবির করণ তাঁর দাওন ভরসা এখন।
এখন মেয়ে দোষো লালন দেখলে সামনে ॥

৪২৩.
পেঁড়োর ভূত হয় যেজনা শোনরে মনা কোন দেশে সে মুরিদ হয়।
ফাতেহায় ভূত সেরে যায় পেঁড়োর দরগায় ॥

মক্কায় শুনি শয়তান থাকে ভূত হয় নাকি পেঁড়োর মাঝে।
সে কথা পাগলেও বোঝে এই দুনিয়ায় ॥

মুর্দার নামে ফাতেহা দিলে মুর্দা কি তা পায় সেখানে গেলে।
তবে কেন পিতাপুত্রে দোজখে যায় ॥

মরার আগে ম'লে পরে আপন ফাতেহা হতে পারে।
তবে আখের হতে পারে অধীন লালন কয় ॥

৪২৪.
প্রেম জানো না প্রেমের হাটে বোলবলা।
কথায় করো ব্রহ্মালাপ মনে মনে খাও মনকলা ॥

বেশ করে বৈষ্ণবগিরি রস নাহি তার যশটি ভারি।
হরি নামে ঢু ঢু তারই তিনগাছি জপের মালা ॥

ধাঁদাবাদা ভূত চালানি সেই যে বটে গণ্য জানি।
সাধুর হাটে ঘুষঘুষানি কি বলিতে কী বলা ॥

মন মাতোয়াল মদনরসে সদাই থাকে সেই আবেশে।
লালন বলে সকল মিছে লবলবানি প্রেম উতলা ॥

৪২৫.
প্রেমনহরে ভেসেছে যারা।
বেদবিধি শাস্ত্র অগণ্য মানে না আইন তারা ॥

চার বেদ চৌদ্দ শাস্ত্রের কাজ কিরে তার সে সব খবর।
জানে কেবল নুকতার খবর নুক্তা হয় না হারা ॥

প্রেমের রসিক হয় যেজনে মন থাকে তার রূপের পানে
অন্যরূপ সে নাহি জানে আশেকি পাগলপারা ॥

বলে গেছেন আপে বারি রূপের কাছে আজ্ঞাকারি।
লালন তাই কয় ফুকারি সিরাজ শাঁইয়ের ধারা ॥

৪২৬.
প্রেম পরমরতন।
লভিবারে হেন ধন করো হে যতন ॥

প্রেমে রত যতোজন নাহি কোনো কুবচন।
হিংসা দ্বেষ কদাচন নাহি লয় মন ॥

প্রেম সহিষ্ণু করে পরহিতে সদা ফেরে।
শত্রুমিত্রে মঙ্গল করে সবারে সমান ॥

প্রেমে লোভ ক্রোধ হরে অহঙ্কার বিনাশ করে।
দয়ামায়াগুণ ধরে সুখ প্রস্রবন ॥

সিরাজ শাঁই বলেরে লালন প্রেমধন করো বিতরণ।
তবে পাবে তাঁর শ্রীচরণ সপে প্রাণমন ॥

৪২৭.
প্রেম পিরিতের উপাসনা।
না জানলে সে রসিক হয় না ॥

প্রেমপ্রকৃতি স্বরূপশক্তি কামগুরু হয় নিজপতি।
মনরসনা অনুরাগী না হলে ভজনসাধন হবে না ॥

যোগী ঋষি মুনিগণে বসে আছে প্রেমসাধনে।
শুদ্ধ অনুরাগী বলে পেয়েছে কেলেসোনা ॥

প্রেমের বাণে মধু চেনে সাধুজন শুদ্ধ অনুরাগী যারা উর্দ্ধদেশে করে গমন।
লালন বলে জ্ঞানী না হলে নিগূঢ়তত্ত্ব জানবে না ॥

৪২৮.
প্রেমরসিকা হবো কেমনে।
করি মানা কাম ছাড়ে না মদনে ॥

এইদেহেতে মদন রাজা করে কাচারি
কর আদায় কড়ি লয়ে যায় হুজুরি
মদন তো দুষ্ট ভারি তারে দাও তহশিলদারি
করে সে মুন্সিগিরি গোপনে ॥

চোর দিয়ে চোর ধরাধরি এ কী কারখানা
আমি তাই জিজ্ঞাসিলে তুমি বলো না
চোরেরা চুরি করে সাধু দেখে পালায় ডরে
চোরে সব লয়ে গেলো কোন্‌খানে ॥

অধীন লালন বিনয় করে সিরাজ শাঁইয়ের পায়
স্বামী মারিলে লাথি নালিশ করিব কোথায়
তুমি মোর প্রাণপতি কী দিয়ে রাখবো রতি
কেমনে হব সতী চরণে ॥

৪২৯.
ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোন রাগে।
হিন্দু মুসলমান রয় দুইভাগে ॥

বেহেস্তের আশায় মোমিনগণ হিন্দুদের স্বর্গেতে মন।
টল কি সে অটল মোকাম লেহাজ করে জান আগে ॥

ফকিরি সাধন করে খোলাসা রয় হুজুরে।
বেহেস্তসুখ ফাটক সমান শরায় ভালো তাই লাগে ॥

অটল প্রাপ্তি কিসে হয় মুর্শিদের ঠাঁই জানা যায়।
সিরাজ শাঁই কয় লালন ভেড়ো ভুগিসনে ভবের ভোগে ॥

৪৩০.
ফ্যার প'লো তোর ফকিরিতে।
যে ঘাট মারা ফিকিরফাকার মন ডুবে ম'লি সেই ঘাটেতে ॥

ফকিরি সেই এক নাচাড়ি অধর ধরে দিতাম বেড়ি।
পাস্তানি খোলা দোয়াড়ি তাই দেখে রেখেছো পেতে ॥

না জেনে ফিকির আঁটা শিরেতে পাড়ালাম জটা।
সার হলো ভাঙ্ ধুতরা ঘোঁটা ভজনসাধন সব চুলাতে ॥

ফকিরি ফিকিরি করা হতে হবে জ্যান্তে মরা।
লালন ফকির নেংটি এড়া আঁইট বসে না কোনো মতে ॥

৪৩১.
ফেরেব ছেড়ে করো ফকিরি।
দিন তোমার হেলায় হেলায় হলো আখেরি ॥

ফেরেবে ফকির দাঁড়া দরগা নিশান ঝাণ্ডা গাড়া।
গলায় বেঁধে হড়া মড়া শিরনি খাওয়ার ফিকিরি ॥

আসল ফকিরি মতে বাহ্য আলাপ নাইকো তাতে।
চলে শুদ্ধ সহজ পথে গোবোধের চটক ভারি ॥

নাম গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ তোমার দেখি তেমনই লক্ষণ।
সিরাজ শাঁই কয় অবোধ লালন সাধুর হাটে জুয়াচুরি ॥

৪৩২.
বল কারে খুঁজিস ক্ষ্যাপা দেশবিদেশে।
আপন ঘর খুঁজিলে রতন পায় অনা'সে ॥

দৌড়াদৌড়ি দিল্লি লাহোর আপনার কোলে রয় ঘোর।
নিরূপণ আলক শাঁই মোর আত্মা রূপে সে ॥

যে লীলে ব্রহ্মাণ্ডের পর সেই লীলে ভাণ্ড মাঝার।
ঢাকা যেমন চন্দ্র আকার মেঘের পাশে ॥

আপনাকে আপনি চেনা সেই বটে মূল উপাসনা।
লালন কয় আলক বেনা হয় তাঁর দিশে ॥

৪৩৩.
বাপবেটা করে ঘটা একঘাটেতে নাও ডুবালে।
হেঁট নয়নে দেখ না চেয়ে কি করিতে কী করিলে ॥

তারণমরণ যে পথে ভুল হলো তাই জানিতে।
ভুলে রইলি ঐ ভুলেতে ঘুরতে হবে বেড়ি গলে ॥

যে জলে লবণ জন্মায় সেই জলেতে লবণ গলে যায়।
আমার মন তেমনি প্রায় শক্তি উপাসনা ভুলে ॥

শক্তি উপাসক যাঁরা সে মানুষ চেনে তাঁরা।
লালন ফকির পাগলপারা শিমুল ফুলের রঙ দেখিলে ॥

৪৩৪.
বলি সব আমার আমার কে আমি তাই চিনলাম না।
কার কাছে যাই কারে শুধাই সেই উপাসনা ॥

আমারে আমি চিনিনে কীরূপে আছি কোনখানে।
পরেরে আজ কোন সন্ধানে যাবে চেনা ॥

ধলা কি কালা বরণ আমি আছি এই ভুবন।
কোনোদিনে এ নয়নে দেখলাম না ॥

বারো ভাটি বাংলায় আমি আমি রব সদাই।
লালন বলে কে জানে আমি'র বেনা ॥

৪৩৫.
বিনা কার্যে ধন উপার্জন কে করিতে পারে।
গুরুগত প্রেমের প্রেমিক না হলে সে ধন পায় নারে ॥

একই স্কুলে পড়ে দশজনে সে বাসনা গুরুমনে।
সব করে সমান সমানে কেউ পরে এসে আগে গেলো পরীক্ষা পাশ করে।

বাংলা পুঁথি কতোজন পড়ে আরবি-ফারসি-নাগরি বুলি কে বুঝিতে পারে
শিখবি যদি নাগরী বুলি আগে বাংলাশিক্ষা লও গা করে ॥

বিশ্বম্ভর বিষপান করে তাড়কায় বিছা হজম করে কাকে কি তাই পারে
ফকির লালন বলে রসিক হলে বিষ খেয়ে বিষ হজম করে ॥

৪৩৬.
বিনা পাকালে গড়িয়ে কাঁচি করছো নাচানাচি।
ভেবেছো কামার বেটারে ফাঁকিতে ফেলেছি ॥

জানা যাবে এবার নাচন কাঁচিতে কাটবে না যখন কারে করবি দোষী।
বোঁচা অস্ত্র টেনে কেবল মরছো মিছেমিছি ॥

পাগলের গোবধ আনন্দ মন তোমার আজ সেহি ছন্দ দেখে ধন্দ আছি।
নিজ ভালো পাগলেও বোঝে তাও নাই তোমার বুঝি ॥

কেনরে মন এমন হ'লি যথায় জন্ম তথায় ম'লি
আপন পাকে আপনি প'লি হয়ে মহাখুশি।
সিরাজ শাঁই কয় লালনরে তোর জ্ঞান হলো নৈরাশী ॥

৪৩৭.
বিদেশির সঙ্গে কেউ প্রেম করো না।
ভাব জেনে প্রেম করলে পরে ঘুঁচবে মনের বেদনা ॥

ভাব দিলে বিদেশির ভাবে ভাবের ভাব কভু না মিলবে।
পথের মাঝে গোল বাঁধিবে কারো সাথে কেউ যাবে না ॥

স্বদেশের দেশি যদি সে হয় মনে করে তারে পাওয়া যায়।
বিদেশি ঐ জংলা টিয়ে কখনো পোষ মানে না ॥

নলিনী আর সূর্যের প্রেম যেমন সেই প্রেমভাব লও রসিক সুজন।
লালন বলে আগে ঠকলে কেঁদে শেষে সারবে না ॥

৪৩৮.
বিষয় বিষে চঞ্চলা মন দিবারজনী।
মনকে বোঝালে বুঝ মানে না ধর্মকাহিনি ॥

বিষয় ছাড়িয়ে কবে মন আমার শান্ত হবে।
আমি কবে সে চরণ লইব শরণ শীতল হবে তাপিত পরানি ॥

কোনদিন শ্মশানবাসী হবো কী ধন সঙ্গে লয়ে যাবো।
কী করি কী কই ভূতের বোঝা বই একদিনও ভাবলাম না গুরুর বাণী ॥

অনিত্য দেহেতে বাসা তাইতে এতো আসার আসা।
অধীন লালন বলে দেহ নিত্য হলে আর কতো কী করতাম না জানি ॥

৪৩৯.

বোঝালে বোঝে না মনুরায়।
আইনমত নিরিখ দিতে বেজার হয় ॥

যা বলে ভবে আসা হলো না তার রতিমাসা।
কুসঙ্গে তোর উঠাবসা তাইতে মনের মূল হারায় ॥

নিষ্কামী নির্বিকার হয়ে যে থাকবে সেই চরণ চেয়ে।
শ্রীরূপ এসে তারে লয়ে যাবে রূপের দরজায় ॥

না হলে শ্রীরূপের গত না জানলে রসরতির তত্ত্ব।
লালন বলে আইনমতো তবে নিরিখ কিসে হয় ॥

৪৪০.

বেদে কি তাঁর মর্ম জানে।
যেরূপে শাঁইয়ের লীলাখেলা এই দেহভুবনে ॥

পঞ্চতত্ত্ব বেদের বিচার পণ্ডিতেরা করে প্রচার।
মানুষতত্ত্ব ভজনের সার বেদ ছাড়া বৈরাগ্যর সনে ॥

গোলে হরি বললে কী হয় নিগূঢ়তত্ত্ব নিরালা পায়।
নীরে ক্ষীরে যুগলে রয় শাঁইয়ের বারামখানা সেইখানে ॥

পড়িলে কী পায় পদার্থ আত্মতত্ত্ব যার ভ্রান্ত।
লালন বলে সাধু মোহান্ত সিদ্ধ হয় আপনারে চিনে ॥

৪৪১.

ভজনের নিগূঢ়কথা যাতে আছে।
ব্রহ্মার বেদছাড়া ভেদ বিধান সে যে ॥

চারবেদে দিক নিরূপণ অষ্টবেদ বস্তুর কারণ।
রসিক হইলে জানে সেজন আর ঠাঁই মিছে ॥

অপরূপ সেই বেদ দেখি পাঠক তার অষ্টসখী।
ষড়তত্ত্ব অনুরাগী সেই জেনেছে ॥

ভক্তিরাগ নাস্তি করো মুক্তিপদ শিরে ধরো।
শক্তিসারতন্ত্র পড়ো ঘোর যাক ঘুঁচে ॥

শাঁইয়ের ভজন হেতুশূন্য ঐবেদ করি গণ্য।
লালন কয় ধন ধন্য যে তাই খোঁজে ॥

৪৪২.
ভক্তি না হলে মাওলার দিদার কি মেলে।
মানুষরূপে দ্বীন দয়াময় চেনো তাঁরে খেয়ালে ॥

ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ ছিলো মাওলা তাঁর মন বুঝিল।
আপন পুত্র কোরবানি দিলো মাওলাকে পাবার আশে ॥

মাওলাকে জানিবে যেমন ফকিরকেও জানিবে তেমন।
আলেমে পায় দরশন ফকির হালসে বেহালে ॥

হরদম যে করে জিকির তাঁহারে জানিও ফকির।
খোদ খোদা তাঁর কলবে হাজির ফকির লালন তাই বলে ॥

৪৪৩.
ভজা উচিত বটে ছড়ার হাঁড়ি।
যাতে শুদ্ধ করে ঠাকুরবাড়ি ॥

চণ্ডীমণ্ডপ আর হেঁসেল ঘর দুয়ার।
কেবল শুদ্ধ করে ছড়ার নুড়ি ॥

ছড়ার হাঁড়ির জল ক্ষণেক পরশে ফল।
ক্ষণেক ছুঁসনে বলে করো আড়ি ॥

ছড়ার হাঁড়ির মতো আছে আরও একতত্ত্ব।
লালন বলে জাগাও আগে বুদ্ধির নাড়ি ॥

৪৪৪.
ভবপারে যাবি কিরে গুরুর চরণ স্মরণ কর আগে।
পিতৃধন তোর গেলো চোরে পারে যাবি কোন রাগে ॥

আছে ঘাটে যার রাজা সেই তো তাঁর প্রজা
সাব্যস্ত করে আগে ডিঙ্গা সাজা
নইলে পড়বে ধোঁকা সারবে দফা মৃণালের দুইভাগে ॥

আগে মৃণালের কোণে ভেবে দেখো নয়নে
ধনীর ভারা যাচ্ছে মারা পড়ে সেই ভাগে
কতো নায়ের মাঝি হারায় পুঁজি কলকলে নদীর ঘুরপাকে ॥

সিরাজ শাঁই বলেরে লালন স্বরূপ রূপে দিলে নয়ন
পার হয়ে যাবি তখন ভেগে পলাবে শমন
পারবিনে সাধন বিনে সেই ত্রিবিনে ভুগবি মনে ভবের ভোগে ॥

৪৪৫.
ভবে এসে রঙ্গরসে বিফলেতে জনম গেলো।
কবে করবো ভজন ধর্মযাজন দিনে দিনে দিন ফুরালো ॥

থাকবে চাপা কদাচ করেছো যে সকল কাজ।
তোমার নিজমুখে তার সম্মুখে ব্যক্ত হবে মন্দভালো ॥

পুণ্যধর্ম হিতকর্ম চেনে তার নিগূঢ়মর্ম।
যাতে হবে মন্দ তাই পছন্দ করেছো আজন্মকাল ॥

আপন পাপ স্বীকার করি সিরাজ শাঁইয়ের চরণ ধরি।
লালন বলে পুণ্য পাবো স্বর্গে যাবো এর চেয়ে আর কী ভাবো ॥

৪৪৬.
ভবে এসে হয়েছি এক মায়ার ঢেঁকি।
পরের ধান ভানতে ভানতে নিজের ঘরে নাই খোরাকি ॥

দিনে দিনে কামশক্তি বেড়ে যায় কামিনী কাঞ্চন লুটে পিতৃধন খোয়াই।
কাঞ্চন কুলায় ঝেড়ে পাছড়ে চাল নেই শুধু তুষ দেখি ॥

ছিলাম ঢেঁকি পনেরো পোয়া কর্মদোষে হই চৌদ্দ পোয়া।
যদি হতাম পনের পোয়া শমনকে দিতাম ফাঁকি ॥

ঢেঁকি যদি স্বর্গেও যায় তিনবেলা ভানা কুটা লাথি না এড়ায়।
লালন বলে নিদানকালে খাই যেন সদ্‌গুরুর লাথি ॥

৪৪৭.
ভবে নামাজি হও যেজনা
নুক্তা চিনে করো ঠিকানা ॥

নুক্তার জন্ম হয় কিসে একথা মানুষের কাছে
জের জবর তসদিদ দিয়ে ভেঙেছেন কোরানখানা।
নবিজি তার করেছেন মানে মোল্লারা তা জানে না ॥

যার নুক্তা নিরূপণ দিয়ে প্রেমে দুইনয়ন
ঘড়ি ঘড়ি হচ্ছে নামাজ ঠিক আছে মন।
নুক্তা নিরিখ হইল ঠিক ওয়াক্ত নফল লাগবে না ॥

আল্লাহ বলে হাম নবি তোমারই এসব কাম
দশ হরফ বাতুন রেখে ভেজিলে কোরান রব্বান্না।
দশ হরফের মানে না জানিলে লালন কয় সে ফকির না ॥

৪৪৮.

ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার।
সর্বসাধন সিদ্ধি হয় তার ॥

নদী কিংবা বিল বাওড় খাল সর্বস্থলে একই একজল।
একা মেরে শাঁই ফেরে সর্বঠাঁই মানুষে মিশিয়ে হয় বেদান্তর ॥

নিরাকারে জ্যোতির্ময় যে আকার সাকার হইল সে।
যেজন দিব্যজ্ঞানী হয় সে জানতে কলিযুগে হয় মানুষ অবতার ॥

বহুতর্কে দিন বয়ে যায় বিশ্বাসে ধন নিকটে রয়।
সিরাজ শাঁই ডেকে বলে লালনকে কুতর্কের দোকান করিসনে আর ॥

৪৪৯.

মধুর দেলদরিয়ায় ডুবিয়ে কররো ফকিরি।
করো ফকিরি ছাড়ো ফিকিরি দিন হলো আখেরি ॥

খোদার তখত বান্দার দেল যথা বলেছে কোরানে খোদে খোদ কর্তা।
আজাজিলের পর হলো খাতাদার মন না ডুবিলি গভীরি ॥

জানতে হয় সে দেলের চৌদ্দ ঘর মোকাম চারেতে প্রচার।
লা মোকামে তাহার উপর মাওলার নিজ আসন সেই পুরী ॥

দেলদরিয়ার ডুবারু যেজন হয় আলখানার ভেদ সেহি জানতে পায়।
আলে আজব কাল দ্বিদলে বারাম লালন খোঁজে বাহিরই ॥

৪৫০.

মন আমার আজ প'লি ফ্যারে।
দিনে দিনে পিতৃধন গেলো চোরে ॥

মায়ামদ খেয়ে মনা দিবানিশি ঝোঁক ছোটে না।
পাছবাড়ির উল হলো না কে কী করে ॥

ঘরের চোরে ঘর মারে মন হয় না খোঁজ জানবি কখন।
একবারও দিলে না নয়ন আপন ঘরে ॥

ব্যাপার করতে এসেছিলি আসলে বিনাশ হলি।
লালন কয় হুজুরে গেলে বলবি কীরে ॥

৪৫১.
মন আমার তুই করলি এ কী ইতরপনা।
দুগ্ধেতে যেমন রে তোর মিশিলো চোনা ॥

শুদ্ধরাগে থাকতে যদি হাতে পেতে অটলনিধি।
বলি মন তাই নিরবধি বাগ মানে না ॥

কী বৈদিকে ঘিরলো হৃদয় হলো না সুরাগের উদয়।
নয়ন থাকিতে সদাই হলি কানা ॥

বাপের ধন তোর খেলো সর্পে জ্ঞানচক্ষু নাই দেখবি কবে।
লালন বলে হিসাবকালে যাবে জানা ॥

৪৫২.
মন জানে না মনের ভেদ এ কী কারখানা।
এইমনে ঐমন করছে ওজন কোথা সে মনের থানা ॥

মন দিয়ে মন ওজন করায় দুইমনে একমন লেখে খাতায়।
তারে ধরে যোগ সাধনে ধর গে আসল নিশানা ॥

মন এসে মনহরণ করে লোকে ঘুম বলে তারে।
কতো আনকা শহর আনকা নহর ভ্রমিয়ে দেখায় তৎক্ষণা ॥

সদাই সে মন বাইরে বেড়ায় বদ্ধ সে তো রয় না আড়ায়।
ফকির লালন বলে সন্ধি জেনে কর গে মনের ঠিকানা ॥

৪৫৩.
মন তুই ভেড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞানছাড়া।
সদরের সাজ করছো ভালো পাছবাড়ি তোর নাই বেড়া ॥

কোথায় বস্তু কোথারে মন চৌকি পাহারা দাও হামেশক্ষণ।
তোমার কাজ দেখি পাগলের মতন কথায় যেমন কাঠফাঁড়া ॥

কোন কোণায় কী হচ্ছে ঘরে একদিনও তা দেখলি নারে।
পিতৃধন তোর গেলো চোরে হলিরে তুই ফোকতাড়া ॥

পাছবাড়ি আঁটলা করো মনচোরারে চিনে ধরো।
লালন বলে নইলে তোরও থাকবে না মূল এক কড়া ॥

৪৫৪.

মন তুমি গুরুর চরণ ভুলো না।
গুরু বিনে এ ভুবনে পারে যাওয়া যাবে না ॥

পারে লয়ে যাবে যাহা ঠিক রাখো ষোলোআনা।
পারের সম্বল না থাকিলে পাটনি পার করবে না ॥

হকের উপরে থাকবে যখন লাহুত মোকাম চিনবে তখন।
এই সত্য জেনে ও মন মানুষ তুমি ধরলে না ॥

পারের সম্বল লাগবে না এমন পাগল আর দেখি না।
ফকির লালন বলে মনরসনা করো গুরুর বন্দনা ॥

৪৫৫.

মন তোর বাকির কাগজ গেলো হুজুরে।
কখন জানি আসবে শমন সাধের অন্তঃপুরে ॥

যখন ভিটেয় হয় বসতি দিয়েছিলে খোশ কবুলতি।
হরদমে নাম রাখবো স্থিতি এখন ভুলেছো তাঁরে ॥

আইনমাফিক নিরিখ দেনা তাতে কেন ইতরপনা।
যাবেরে মন যাবে জানা জানা যাবে আখেরে ॥

সুখ পেলে হও সুখভোলা দুখ পেলে হও দুখ উতলা।
লালন কয় সাধনের খেলা কিসে জুত ধরে ॥

৪৫৬.

মন তোমার হলো না দিশে।
এবার মানুষের করণ হবে কিসে ॥

যখন আসবে যমের চেলা ভেঙ্গে যাবে ভবের খেলা।
সেদিন হিসাব দিতে বিষম জ্বালা ঘটবে শেষে ॥

উজানভেটেন দুটি পথ ভক্তিমুক্তির করণ সে তো।
তাতে যায় না জরামৃত যমের ঘরে সে ॥

যে পরশে পরশ হবি সে করণ আর কবে করবি।
সিরাজ শাঁই কয় লালন র'লি ফাঁকে বসে ॥

৪৫৭.
মনবিবাগী বাগ মানে নারে।
যাতে অপমৃত্যু হবে সদাই তাই করে ॥

কিসে হবে আমার ভজনসাধন মন হলো না মনের মতন।
দেখে শিমুল ফুল সদাই ব্যাকুল দুইকুল হারালাম মনের ফেরে ॥

মনের গুণে কেহ মহাজন হয় ঠাকুর হয়ে কেহ নিত্য পূজা পায়।
আমার এই মনে তো আমায় করলো হত বুঝাইতে নারি এ জনমভরে ॥

মন কি মনাই হাতে পেলাম না কি রূপে তার করি সাধনা।
লালন বলে আমি হলাম পাতালগামী কি করতে এসে গেলাম কী করে ॥

৪৫৮.
মন বুঝি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে।
জানে না কাঞ্চির খবর রঙমহলের খবর নিচ্ছে ॥

ঠিক পড়ে না কুড়োকাঠা ধূল ধরে সতেরো গণ্ডা।
অকারণ খাটিয়ে মনটা পাগলামি প্রকাশ করছে ॥

যে জমির নাই আড়া দিঘা লতা কী রূপ কালি করো সেথা।
শুনে চৌদ্দ পোয়ার কথা কুড়োকাঠা আন্দাজে বানাচ্ছে ॥

কৃষ্ণদাস পণ্ডিত ভালো কৃষ্ণলীলার সীমা দিলো।
তার পণ্ডিতী চূর্ণ হলো টুনটুনি এক পাখির কাছে ॥

বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যায় অমনি আমার মন মনুরায়।
লালন বলে কবে কোথায় এমন পাগল কে দেখেছে ॥

৪৫৯.
মন র'লো সেই রিপুর বশে রাত্রদিনে।
মনের গেলো না স্বভাব কিসে মেলে ভাব সাধুর সনে ॥

বলি সেই শ্রীচরণ মনে যদি হয় কখন।
অমনই রিপু হয় দুষ্ট সে সময় ধরে সেদিক টানে ॥

নিজগুণে যা করেন সাঁই তা বিনে আর ভরসা নাই।
জানা গেলো মোর মনের ভক্তিজোর যেরূপ মনে ॥

দিনে দিনে দিন ফুরালো রঙমহল অন্ধকার হলো।
লালন বলে হায় কী হবে উপায় উপায় তো দেখিনে ॥

৪৬০.
মনরে যেপথে শাঁইয়ের আসাযাওয়া।
তাতে নাই মাটি আর হাওয়া ॥

আলীপুর করে কাচারী তার উপরে নিঃশব্দপুরী।
জীবের সাধ্য কিরে তাঁর উল পাওয়া ॥

নিগূঢ় ঠাঁই সতত থাকে যথা যে যা করো সব সে দেখে।
দেখতে নারে চর্মচোখে কেউ দেখে না তাঁর কায়া ॥

মন যদি যায় মনের উপরে তবে অধর শাঁইকে ধরতে পারে।
অধীন লালন কয় বিনয় করে কে জানে তাহা ॥

৪৬১.
মনের কথা বলবো কারে কে আছে এ সংসারে।
আমি ভাবি তাই আর না দেখি উপায় কার মায়ায় বেড়াই ঘুরে ॥

মন আমার ভুলে তত্ত্ব হলি মত্ত সার পদার্থ চিনলি নারে।
হলো না গুরুর করণ তাইতে মরণ কোনদিনে মন যাবা গোরে ॥

ছেড়ে মূল ভক্তিদাঁড়া লক্ষীছাড়া কপালপোড়া দেখি তোরে।
লেগে এই ভবের নেশা তাইতে দশা সর্বনাশা বেড়াই ঘুরে ॥

মন আমার আপনবশে মদনরসে আপনি মিশে বেড়াই হারে।
লালন সেই বাক্য ছেড়ে গলা নেড়ে গড়িয়ে প'লো পাতালপুরে ॥

৪৬২.
মনের নেংটি এঁটে করোরে ফকিরি।
আমানতের ঘরে যেন হয় নারে চুরি ॥

এইদেশেতে দেখিরে ভাই ডাকিনী যোগিনীর ভয়।
দিনেতে মানুষ ধরে খায় থেকো হুঁশিয়ারি ॥

বারে বারে বলিরে মন করোরে আত্মসাধন।
আকর্ষণে দুষ্ট দমন মারো ধরি ধরি ॥

কাজে দেখি ধড়ফড়ে নেংটি তোমার নড়বড়ে।
খাটবে নারে লালন ভেড়ে টাকশালে চাতুরি ॥

৪৬৩.
মনের মানুষ চিনলাম নারে।
পেতাম যদি মনের মানুষ সাধিতাম তাঁর চরণ ধরে ॥

সাধুর হাটে কাচারি হয় অধোমুণ্ডে ঘুরে বেড়ায়।
ছয়জনা মিশতে না দেয় মনের মানুষ ধরি কী করে ॥

আরজ আমার সাধুর হাটে মানুষ হয়ে মানুষ কাটে।
তাঁহার বাস কাহার নিকটে সৃষ্টি করলে কী প্রকারে ॥

লালন বলে ভেবে দেখি কেবল তোমার ফাঁকাফাঁকি।
চাতুরি জুড়েছো নাকি আছি তোমার আশা করে ॥

৪৬৪.
মনের হলো মতিমন্দ।
তাইতে হয়ে রইলাম জন্মান্ধ ॥

ভবরঙ্গে রইলাম মজে ভাব দাঁড়ায় না হৃদয় মাঝে।
গুরুর দয়া হবে কিসে ভক্তিবিহীন পশুর ছন্দ ॥

ত্যাজিয়ে সুধারতন গরল খেয়ে ঘটাই মরণ।
মানিনে সাধু গুরুর বচন তাইতে মূল হারিয়ে হইরে ধন্দ ॥

বালকবৃদ্ধ সকলে কয় সাধুচিত্ত আনন্দময়।
লালন বলে সদাই যায় না আমার নিরানন্দ ॥

৪৬৫.
মনেরে আর বোঝাই কিসে।
ভবযাতনা আমার জ্ঞানচক্ষু আঁধার যেমন ঘিরলোরে রাহুতে এসে ॥

যেমন বনে আগুন লাগে
দেখে সর্বলোকে
মনআগুন কে দেখে মনকোঠা ফেঁসে ॥

এ সংসারে বিধি বড়ো বল ধরে
কর্মফাঁসে বেঁধে মারিলে আমারে
কারে শুধাই এসব কথা কে ঘোচবে ব্যথা মনআগুনে মন দগ্ধ হতেছে ॥

ভবে আসা আমার মিথ্যে আসা হলো
অসার ভেবে সকলই ফুরালো
পূর্বে যে সুকৃতি ছিলো পেলাম তার ফল আবার যেন আমার কী হবে শেষে ॥

গুণে আনি দেওয়া হয়ে যায়রে কুয়ো
তেমনই আমার সকল কার্য ভূয়ো
লালন ফকির সদাই দিচ্ছে গুরুর দোহাই আর যেন না আসি এমন দেশে ॥

৪৬৬.
মরার আগে ম'লে শমনজ্বালা ঘুঁচে যায়।
জান গে কেমন মরা কী রূপ জানাজা তার দেয় ॥

জ্যান্তে মরে সুজন লয়ে খেলকা তাজ তহবন ভেক সাজায়।
রূহ্ ছাপাই হয় কিসে তাহার কবর কোথায় ॥

মরার শৃঙ্গার ধরে উচিত জানাজা করে যে যথায়।
সেই মরা আবার মরিলে জানাজার কী হয় ॥

কথায় হয় না সে মরা তাঁদের করণ বেদছাড়া।
ফকির লালন বলে সমঝে পরো মরার হাল গলায় ॥

৪৬৭.
ম'লে ঈশ্বরপ্রাপ্তি হবে কেন বলে।
সেই কথার পাইনে বিচার কারো কাছে শুধালে ॥

ম'লে যদি হয় ঈশ্বরপ্রাপ্ত সাধুঅসাধু এ সমস্ত।
তবে কেন তপজপ এতো কররে জলে স্থলে ॥

যে পঞ্চে পঞ্চভূত হয় ম'লে যদি তাতে মিশায়।
ঈশ্বর অংশ ঈশ্বরে যায় স্বর্গনরক কোথায় মেলে ॥

জীবের এই শরীরে ঈশ্বর অংশ বলি কারে।
লালন বলে চিনলে তাঁরে মরার ফল তাজায় ফলে ॥

৪৬৮.
ম'লে গুরুপ্রাপ্তি হবে সে তো কথার কথা।
জীবন থাকিতে যাঁরে না দেখলাম হেথা ॥

সেবা মূলকরণ তাঁরই না পেলে কার সেবা করি।
আন্দাজি হাতড়ে ফিরি কথার লতাপাতা ॥

সাধন জোরে এইভবে যাঁর স্বরূপ চক্ষে হবে নিহারণ
তাঁরই বটে আকারসাকার মেলে যথাতথা ॥

ভজে পাই কি পেয়ে ভজি কোন ভজনে সে হয় রাজি।
সিরাজ শাঁই কয় কী আন্দাজি লালন মুড়ায় মাথা ॥

৪৬৯.
মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে।
সে কি অন্যতত্ত্ব মানে ॥

মাটির ঢিবি কাঠের ছবি ভুলভাবের সব দেবদেবী।
ভোলে না সে এসব রূপই মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে ॥

জড়োইসড়োই নুলাঝোলা প্যাঁচাপ্যাঁচী আলাভোলা।
তাতে নয় সে ভোলনেওয়ালা যে মানুষরতন চেনে ॥

ফায়াফেপী ফ্যাকসা যারা ভাকাভোকায় ভোলে তারা।
লালন তেমনই চটামারা ঠিক দাঁড়ায় না একখানে ॥

৪৭০.
মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি ॥

দ্বিদলে মৃণালে সোনার মানুষ উজ্বলে।
মানুষ গুরু কৃপা হলে জানতে পাবি ॥

মানুষে মানুষ গাঁথা দেখ না যেমন আলকলতা।
জেনে শুনে মুড়াও মাথা জাতে উঠবি ॥

মানুষ ছাড়া মন আমার দেখবিরে সব শূন্যকার।
লালন বলে মানুষ আকার ভজলে তরবি ॥

৪৭১.
মায়ার বশে কাঁদবি বসে আর কতোকাল।
মন তোর শিয়রেতে এলো মহাকাল ॥

একদিনান্তে মনভ্রান্তে ভজলি না মন গুরুর চরণযুগল।
যেদিন এসে ঘিরবে তোরে সেদিন পড়ে রবে মায়জাল ॥

গুরু বলে ডাকলিনে মিছে মায়ায় হরিসত্ত্ব হারালি জ্ঞানতত্ত্ব
গুরুবস্তু কী পদার্থ চেনো না কুপথ ছেড়ে সুপথে কেন চলো না
তাই বলিরে ও পাগলমন হও না কেন মনের মতন
যার জন্য তুই করিস রোদন তার দেখিনে চোখে জল ॥

চক্ষু কর্ণ নাসিকা মুখ এক জা'গায় বসত কেউ দেখে না কারো মুখ
যেমন লেংড়ার ইচ্ছায় বেড়ায় হেঁটে বোবার ইচ্ছায় কথা ফোটে
অন্ধের ইচ্ছায় বিদ্যা ঘটে সবাই টলে ঘটেপটে
লালন বলে যার যেমন কাজ তার তেমনই ফল ॥

৪৭২.

মুর্শিদের মহৎগুণ নে না বুঝে।
যাঁর কদম বিনে ধরমকরম মিছে ॥

যতোসব কলেমা কালাম ঢুঁড়িলে মেলে তামাম কোরান বিচে
তবে কেন পড়া ফাজেল মুর্শিদ ভজে ॥

মুর্শিদ যার আছে নিহার ধরতে পারে অধর সেই অনা'সে।
মুর্শিদ খোদা ভাবলে জুদা পড়বি প্যাঁচে ॥

আলাদা বস্তু কি ভেদ কি বা সে ভেদ মুর্শিদ জগত মাঝে।
সিরাজ শাঁই কয় দেখরে লালন আক্কেল খুঁজে ॥

৪৭৩.

মূলের ঠিক না পেলে সাধন হয় কিসে।
কেউ বলেরে শ্রীকৃষ্ণ মূল কেউ বলে মূলব্রহ্ম সে ॥

ব্রহ্ম ঈশ্বরে দ্বৈত লেখা যায় শাস্ত্রমতো।
উচাঁনিচা কি তাঁর এতো করিতে হয় সেই দিশে ॥

কোথা যাই কি বা করি বলে বেড়াই গোলে হরি।
লালন কয় এক জানতে নারি তাইতে বেড়ায় মন ভেসে ॥

৪৭৪.

ম্যারে শাঁইর আজব কুদরতি কে বুঝতে পারে।
আপনি রাজা আপনি প্রজা ভবের পরে ॥

আহাদ রূপে লুকায় হাদি রূপটি ধরে আহমদি।
এ মর্ম না জেনে বান্দা পড়বি ফ্যারে ॥

বাজিকরে পুতুল নাচায় আপনি তারে কথা কওয়ায়।
জীবদেহ শাঁই চালায় ফেরায় সেই প্রকারে ॥

আপনারে চিনবে যেজন ভেদের ঘরে পাবে সে ধন।
সিরাজ শাঁই কয় লালন কী আর বেড়াও ঢুঁড়ে ॥

৪৭৫.

ম্যারে শাঁইর ভাবুক যারা।
তাদের ভাবের ভূষণ যায় ধরা ॥

সাদা ভাব তাঁর সাদা করণ নাইরে কালামালা ধারণ।
সে পঞ্চক্রিয়া সাঙ্গ করে ঘরে রাত্রদিন নিহারা ॥

পঞ্চতত্ত্বরস তার উপর একের কলস।
তাতে জ্বলছে বাতি দিবারাতি তাহে দৃষ্ট রয় বিভাবরা ॥

আলক রূপ হেরেছে যে সে কী দেবদেবী পূজে।
এবার আউল চলন চলে লালন পেয়ে রত্ন হইল হারা ॥

৪৭৬.
যার নয়নে নয়ন চিনেছে তার প্রভেদ কি বা রয়েছে।
বললে পাপী হবে বা কি এবার বুঝি ভুল হয়েছে ॥

শব্দ শুনি তুমিআমি আসল কাজে কে আসামী।
জগত কর্তা হলে তুমি বলো দেখি কার কাছে ॥

মূল আসামী তুমি হলে আমায় ফেলো গোলমালে।
এখন তুমি ভক্ত বলে দেখো আপনার কাছে ॥

তোমার লীলা তোমার বোল তোমার ভিয়ান তোমার মহল।
লালন বলে ওহে দয়াল এখন বুঝি প্যাঁচ পড়েছে ॥

৪৭৭.
যাতে যায় শমনযন্ত্রণা ভ্রমে ভুলো না।
গুরুর শীতল চরণ ছেড়ো না ॥

বৈদিকের ভোলে ভুলি গুরু ছেড়ে গোবিন্দ বলি।
মনের ভ্রম এ সকলই শেষে যাবে জানা ॥

চৈতন্য আজব সুরে নিকট থেকে দেখায় দূরে।
গুরুরূপ আশ্রিত করে করো ঐরূপ ঠিকানা ॥

জগত জীবের দ্বারাই নিজরূপে সম্ভব তো নয়।
লালন বলে তাইতে গোসাঁই দেখায় গুরুরূপের রূপ নিশানা ॥

৪৭৮.
যদি ফানার ফিকির জানা যায়।
কোন্‌রূপে ফানা করে খোদ খোদা খুশি হয় ॥

খোদার রূপ খোদই করে ধারণ অকৈতব সে করণকারণ।
আয়ু থাকিতে হয়রে মরণ ফানার করণ তারই হয় ॥

একে একে জেনে বেনা করতে হয় চার রূপ ফানা।
একরূপে করে ভাবনা এড়াবে সে শমন দায় ॥

না জানিলে ফানার করণী করণ হয় তার মিথ্যা জানি।
সিরাজ শাঁই কয় অর্থ বাণী দেখরে লালন মুর্শিদের ঠাঁই ॥

৪৭৯.
যদি শরায় কার্যসিদ্ধি হয়।
তবে মারফতে কেন মরতে যায় ॥

শরিয়ত আর মারেফত যেমন দুগ্ধেতে মিশানো মাখন।
মাখন তুললে দুগ্ধ তখন ঘোল বলে তা তো জানো সবাই ॥

মারেফত মূলবস্তু জানি শরিয়ত তার সরপোষ মানি।
ঘুঁচাইলে সরপোষখানি বস্তু রয় কি সরপোষ ধরে রয় ॥

আউয়ালআখের দরিয়া দেখ না মন তাতে ডুবিয়া।
মুর্শিদ ভজন যে লাগিয়া লালন ডুবেও ডোবে না তায় ॥

৪৮০.
যাঁরে ভাবলে পাপীর পাপ হরে।
দিবানিশি ডাকো তাঁরে ॥

গুরুর নাম সুধাসিন্ধু পান করো তাঁহার বিন্দু।
সখা হবে দীনবন্ধু ক্ষুধাতৃষ্ণা রবে নারে ॥

যে নাম প্রহ্লাদ হৃদয়ে ধরে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে।
কৃষ্ণ নৃসিংহ রূপধারণ করে হিরণ্যকশিপু মারে ॥

ভাবলি না শেষের ভাবনা মহাজনের ধন ষোলো আনা।
লালন বলে মনরসনা একদিনও তা ভাবলি নারে ॥

৪৮১.
যেজন শিষ্য হয় গুরুর মনের খবর লয়।
একহাতে যদি বাজতো তালি তবে কেন দুইহাত লাগায় ॥

গুরুশিষ্য এমনই ধারা যেমন চাঁদের কোলে থাকে তারা।
কাঁচা বাঁশে ঘুণে জরা গুরু না চিনলে ঘটবে তায় ॥

গুরু লোভী শিষ্য কামী প্রেম করা তার ছেঁচা পানি।
উলুখড়ে জ্বলছে অগ্নি জ্বলতে জ্বলতে নিভে যায় ॥

গুরুশিষ্য প্রেম করা মুঠোর মধ্যে ছায়া ধরা।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তেরা এমনই প্রেম করা চাই ॥

৪৮২.
যে যাই ভাবে সেইরূপ সে হয়।
রাম রহিম করিম কালা একই আল্লাহ্ জগতময় ॥

কুল্লে সাইয়ুন মোহিত খোদা আল কোরানে কয় সেকথা
বিচার নাইরে যার একথা পড়ে গোল বাঁধায় ॥

আকারসাকার নাই নিরাকারে।
নির্জন ঘরে রূপ নিহারে এক বিনে কি দেখা যায় ॥

এক নিহারে দাও মন এবার ছেড়ে পূজা দুন আল্লাহ্‌র।
লালন বলে একরূপ খেলে ঘটেপটে সব জায়গায় ॥

৪৮৩.
যেরূপে শাঁই আছে মানুষে।
দ্বীনের অধীন না হলে খুঁজে কি পাবে তাঁর দিশে ॥

বেদী ভাই বেদ পড়ে সদাই আসলে গোলমাল বাঁধায়।
রসিক ভেয়ে ডুবে সদয় রতন পায় সে রসে ॥

তালারও উপরে তালা তাহার ভিতরে কালা।
ঝলক দেয় সে দিনের বেলা শুধু রসেতে ভেসে ॥

লা মোকামে আছে নূরি সেকথা অকৈতব ভারি।
লালন কয় দ্বারের দ্বারী আদ্যমাতা সে ॥

৪৮৪.
যে সাধন জোরে কেটে যায় কর্মফাঁসি।
যদি জানবি সে সাধনের কথা হও গুরুর দাসী ॥

স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আর নপুংশককে শাসন কর।
যে লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের উপর তাই প্রকাশি ॥

মারে মৎস্য না ছোঁয় পানি রসিকের করণ তেমনই।
আকর্ষণে আনে টানি শারদ শশী ॥

কারণসমুদ্রের পারে গেলে পায় অধর চাঁদেরে।
অধীন লালন বলে নইলে ঘুরে মরবি চৌরাশি ॥

৪৮৫.
রাত পোহালে পাখি বলে দেরে খাই।
আমি গুরুকার্য মাথায় লয়ে কী করি কোন পথে যাই ॥

এমন পাখি কে বা পোষে খেতে চায় সাগর শুষে আমি কী দিয়ে যোগাই।
পাখি পেট ভরিলে হয় না রত খাবো খাবো রব সদাই ॥

আমি বলি আত্মারাম পাখি লওরে আল্লাহ্‌র নাম যাতে মুক্তি পাই।
পাখি সে নামে তো হয় না রত কী করবে গুরু গোঁসাই ॥

আমি লালন লালপড়া পাখি আমার সেই আড়া তার সবুর কিছুই নাই।
বুদ্ধিসুদ্ধি সব হারায়ে সার হলোরে পেটুক বাই ॥

৪৮৬.
রসিকের ভঙ্গিতে যায় চেনা।
তার শান্তচিত্ত ঊর্ধ্বরতি বরণ কাঁচা সোনা ॥

সহজ হয়ে সহজ মানুষ সেধেছে সেইজনা।
তার কামসাগরে চর পড়েছে প্রেমসাগরে জল আঁটে না ॥

চণ্ডীদাস আর রজকিনী।
তাঁরাই প্রেমে ধন্য শুনি এমন প্রেমিক কয়জনা ॥

তারা একপ্রেমে দুইজন মরে।
কেউ কাউকে ছাড়ে না ॥

সিরাজ শাঁই দরবেশে বলে শোনরে লালন বলি খুলে।
রসিকের প্রেম চমৎকারা তাদের সে প্রেম ছোটে না ॥

৪৮৭.
রোগ বাড়ালি শুধু কুপথ্য করে।
ঔষধ খেয়ে অপযশটি করলি কবিরাজেরে ॥

মানিলে কবিরাজের বাক্য তবে রোগ হতো আরোগ্য।
মধ্যে মধ্যে নিজে বিজ্ঞ হয়ে রোগ বাড়ালিরে ॥

অমৃত ঔষধ খেলি তাতে মুক্তি নাহি পেলি।
লোভ লালসে ভুলে র'লি ধিক তোর লালসেরে ॥

লোভে পাপ পাপে মরণ তা কি জানো নারে মন।
সিরাজ শাঁই কয় লালন এখন মর গে ঘোর বিকারে ॥

৪৮৮.
লাগলো ধুম প্রেমের থানাতে।
মনচোরা পড়েছে ধরা রসিকের হাতে ॥

বৃন্দাবনে রসের খেলা জানে তা ব্রজবালা।
তার সন্ধান কি পাবি তোরা চাঁদ ধরিতে ॥

ভক্তিরাম জমাদারের হাতে দুদিনকার চাঁদ জিম্মা আছে।
তিনদিনের দিন চালান করে চলে আট কৌশলেতে ॥

চোর আছে অটলের ঘরে তার সন্ধান কে চিনে ধরে।
লালন কয় সাধনে জোরে পাবি অধর চাঁদ হাতে ॥

৪৮৯.
সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন।
সত্য সুপথ না চিনিলে পাবিনে মানুষের দরশন ॥

খরিদদার দোকানদার মহাজন বাটখারাতে কম তাদের কসুর করবে যে যম।
গদিয়াল মহাজন যেজন বসে কেনে প্রেমরতন ॥

পরের দ্রব্য পরের নারী হরণ করো না পারে যেতে পারবে না।
যতোবার করিবে হরণ ততোবার হবে জনম ॥

লালন ফকির আসলে মিথ্যে ঘুরে বেড়ায় তীর্থে তীর্থে।
সই হলো না একমন দিতে আসলে তার প'লো কম ॥

৪৯০.
সবে কি হবে ভবে ধর্মপরায়ণ।
যার যে ধর্ম সে তাই করে তোমার বলা অকারণ ॥

ময়ূর চিত্র কেউ করে না কাঁটার মুখ কেউ চাঁছে না।
এমনই মতো সব ঘটনা যার যাতে আছে সৃজন ॥

শশকপুরুষ সত্যবাদী মৃগপুরুষ ঊর্ধ্বভেদী।
অশ্ব বৃষ বেহুঁশ নিরবধি তাদের কুকর্মেতে সদাই মন ॥

চিন্তামণি পদ্মিনী নারী এরাই পতিসেবার অধিকারী।
হস্তিনী শঙ্খিনী নারী তারা কর্কশ ভাষায় কয় বচন ॥

ধর্মকর্ম সব আপনার মন করে ধর্ম সব মোমিনগণ।
লালন বলে ধর্মের করণ প্রাপ্তি হবে নিরঞ্জন ॥

৪৯১.
সরল হয়ে করবি কবে ফকিরি।
দেখ মনুরায় হেলায় হেলায় দিন হলো আখেরি ॥

ভজবিরে লা শরিকালা ঘুরিস কেন কল্কেতলা।
খাবিরে নৈবেদ্য কলা সেটা কি আসল ফকিরি ॥

চাও অধীন ফকিরী নিতে ঠিক হয়ে কই ডুবলি তাতে।
কেবল দেখি দিবারাতে পেট পূজার ঢোল ভারি ॥

গৃহে ছিলি ভালোই ছিলি আঁচলা ঝোলা কেনো নিলি।
সিরাজ শাঁই কয় নাহি গেলো লালপড়া লালন তোরই ॥

৪৯২.
সরল হয়ে ভজ দেখি তাঁরে।
তোরে যে পাঠায়েছে এ ভবসংসারে ॥

ঠিক ভুলো না মন রসনারে এলে করার করে।
সেই রকম কর যোগাও এবার অমূল্য ধন দিয়েরে ॥

দমে নয়ন দিয়েরে মন সদাই থাকো হুঁশিয়ারে।
তোমার দ্বিদলে জপো থাকবে না পাপ আসান পাবি হুজুরে ॥

দেল দিয়ে তাঁর হও তলবদার মুর্শিদের বাক্ ধরে।
কোথায় সে ধন মিলবে লালন শুদ্ধভক্তির জোরে ॥

৪৯৩.
সহজমানুষ ভজে দেখ নারে মন দিব্যজ্ঞানে।
পাবিরে অমূল্যনিধি বর্তমানে ॥

ভজো মানুষের চরণ দুটি নিত্যবস্তু পাবে খাঁটি।
মরিলে শোধ হবে মাটি ত্বরা এইভেদ লও জেনে ॥

শুনে ম'লে পাবা বেহেস্তখানা তাই শুনে তো মন মানে না।
বাকির লোভে নগদ পাওনা কে ছাড়ে এই ভুবনে ॥

আস্‌সালাতুল মেরাজুল মোমেনিনা জানতে হয় সেই নামাজের বেনা
বিশ্বাসীদের দেখাশোনা লালন কয় এই জীবনে ॥

৪৯৪.
সামান্যজ্ঞানে কি মন তাই পারবিরে।
বিষ জুদা করিয়ে সুধা রসিকজনা পান করে ॥

কতোজনা সুধার আশায় ফণির মুখে হাত দিতে চায়।
বিষের আতশ লেগে তার গায় মরণদশা ঘটেরে ॥

দেখাদেখি মন কি ভাবো সুধা খেয়ে অমর হবো।
পারো যদি ভালোই ভালো নইলে ল্যাঠা বাঁধবেরে ॥

অহিমুণ্ডে উভয় যদি হিংসা ছেড়ে হয় পিরিতি।
লালন কয় সুধানিধি সেধে অমর হয় সেরে ॥

৪৯৫.
সামান্যে কি সেই অধর চাঁদকে পাবে।
যাঁর লেগে হলো যোগী দেবের দেব মহাদেবে ॥

ভাব জেনে ভাব না দিলে তখন বৃথা যাবে সেই ভক্তি ভজন
বাঞ্ছা যদি হয় সে চরণ ভাব দে না সেইভাবে ॥

যেভাবে সব গোপিনীরা হয়েছিলো পাগলপারা।
চরণ চিনে তেমনই ধারা ভাব দিয়ে তায় হবে ॥

নিহেতু ভজন গোপিকার তাতে সদাই বাঁধা নটবর।
লালন বলে মনরে তোমার মরণ ভবলোভে ॥

৪৯৬.
সামান্যে কি সে ধন পাবে।
দ্বীনের অধীন হয়ে চরণ সাধিতে হবে ॥

গুরুপদে কী না হলো কতো বাদশার বাদশাহি গেলো।
কুলবতীর কুল গেলো কালারে ভেবে ॥

গুরুপদে কতোজনা বিনামূল্যে হয়ে কেনা।
করে গুরুর দাস্যপনা সে ধনের লোভে ॥

কতো কতো মুনি ঋষি যুগ যুগান্তর বনবাসী।
পাবো বলে কালো শশী বসেছে স্তবে ॥

গুরুপদে যার আশা অন্যধনে নাই লালসা।
লালন ভেড়ো বুদ্ধিনাশা দোআশা ভেবে ॥

৪৯৭.
সেই প্রেম গুরু জানাও আমায়।
মনের কৈতবাদি যাতে ঘুঁচে যায় ॥

দাসীর প্রতি নিদয় হইও না দাও হে কিঞ্চিৎ প্রেম উপাসনা।
ব্রজের জলদ কালো গৌরাঙ্গ হলো কোন প্রেমে সেধে রাই বাঁকা শ্যামরায় ॥

পুরুষ কোনদিন সহজ ঘটে শুনলে মনের সন্দ' যায় মিটে।
তবে যে জানি প্রেমের করনি সহজে সহজে লেনাদেনা হয় ॥

কোন প্রেমে বশ গোপীর দ্বারে কোন প্রেমে শ্যাম রাধার পায়ে ধরে।
বলো বলো তাই হে গুরু গোঁসাই অধীন লালন বিনয় করে কয় ॥

৪৯৮.
সেই প্রেমময়ের প্রেমটি অতিচমৎকার।
প্রেমে অধম পাপী হয় উদ্ধার ॥

দুনিয়াতে প্রেমের তরী বানিয়ে দিলেন পাঠায়ে পাপীর লাগি।
মানুষ চাপিয়ে তাতে অনায়াসেতে স্বর্গেতে পায় অধিকার ॥

সত্যপ্রেমের কথা নয়কো বৃথা তাই খলতা নয় চাই প্রেমের সরলতা।
নির্মল প্রেমে ক্রমে ক্রমে মনের ময়লা রয় না আর ॥

সেই প্রেমের ভাব বোঝা ভার মধুর আলাপে বসে আছি অনিবার।
প্রেমে মগ্ন হলে হৃদয় গলে লালন বলে দূরে যায় পাপ-অন্ধকার ॥

৪৯৯.
সেই প্রেম সামন্যে কি জানা যায়
যে প্রেম সেধে গৌর হলো শ্যামরাই ॥

দেবের দেব পঞ্চাননে জেনেছিলো সে একজনে।
শক্তির আসন বক্ষস্থলে বক্ষস্থলে দেয় ॥

প্রেমিক ছিলো চণ্ডীদাসে বিকালো রজকীর পাশে।
মরে আবার জীবনে সে জীবনদান পায় ॥

মরে যেজন বাঁচতে পারে প্রেম গুরু জানায় তারে।
সিরাজ শাঁই কয় লালনেরে তোর সে কার্য নয় ॥

৫০০.
সে তো রোগীর মতো পাঁচন গেলা নয়।
যারে সাধন ভক্তি বলা যায় ॥

অরুচিতে আহার করা জানতে পায় সেসব ধারা।
পেট ফুলে হয় গো সারা উচ্ছিষ্ট সেবা সেহি প্রায়।

উপরোধের কাজ ঢেঁকির মতো গেলা কঠিন হয় কতো।
সাধনে যার নাই একান্ত তারই এমনই হয় ॥

এমনই মতো বারে বারে কতোই আর বুঝাবো হারে।
লালন বলে ভক্তির জোরে শাঁইকে বাঁধে সর্বদাই ॥

৫০১.

সে ধন কি চাইলে মিলে
হরি ভক্তের অধীন কালে কালে ॥

ভক্তের বড়ো পণ্ডিত নয় প্রমাণ তার প্রহ্লাদকে কয়।
যারে আপনি কৃষ্ণ গোঁসাই অগ্নিকুণ্ডে বাঁচাইলে ॥

বনের একটা পশু বৈ নয় ভক্ত হনুমান তারে কয়।
কৃষ্ণরূপ সে রামরূপ ধরায় কেবল শুদ্ধভক্তিবলে ॥

অভক্তে সে দেয় না দেখা কেবল শুদ্ধভক্তের সখা।
লালন ভেড়োর স্বভাব বাঁকা অধর চাঁদকে রইলো ভুলে ॥

৫০২.

সোনার মান গেলোরে ভাই ব্যাঙ্গা এক পিতলের কাছে।
শাল পটকের কপালের ফের কুষ্টার বোনায় দেশ জুড়েছে ॥

বাজিল কলির আরতি প্যাঁচ প'লো সব মানীর প্রতি।
ময়ূরের নৃত্য দেখে প্যাঁচায় পেখম ধরতে বসে ॥

শালগ্রামকে করে নোড়া ভূতের ঘরে ঘণ্টা নাড়া।
কলির তো এমনই দাঁড়া স্থূলকাজে সব ভুল পড়েছে ॥

সবাই কিনে পিতলদানা জহরের উল হলো না।
লালন কয় গেলো জানা চটকে জগত মেতেছে ॥

৫০৩.

হরিনাম যত্ন করে হৃদয় মাঝে রাখবে মন।
ও নাম গলদ করলে হারিয়ে যাবে হরি বলা হবে অকারণ ॥

নিজ হরিনাম করে খাঁটি হিংসা নিন্দা দেও গে মাটি।
হবা নির্বিকার পরিপাটি পাবা হরির দরশন ॥

হরির সঙ্গে করো যদি ভাব দিও না কথার জবাব।
থাকবে না আর পারের অভাব গোলোকপুরে হবে গমন ॥

লোক দেখিয়ে হরি বলা ভজন সাধন হবে ঘোলা।
লালন বলে রঙ মাখানো মালাঝোলা গলায় রাখো কী কারণ ॥

৫০৪.
হাতের কাছে মামলা থুয়ে কেনে ঘুরে বেড়াও ভেয়ে।
ঢাকা শহর দিল্লি লাহোর খুঁজলে মেলে এই ঠাঁয়ে ॥

মনের ধোঁকায় মক্কায় যাবি ধাক্কা খেয়ে হেথায় ফিরবি।
এমনই ভাবে ঘুরতে হবে দেহের খবর না পেয়ে ॥

গয়া কাশী মক্কা মদিনা বাইরে খুঁজে ফাঁকড়ায় পড়ো না।
দেহরতি খুঁজলে পাবি সকল তীর্থের ফল তায়ে ॥

দেখ দেখিরে অবোধ মন আমার অবিশ্বাসে কোথায় প্রাপ্তি কার।
বিশ্বাসে মন নিকটে পায় ধন লালন ফকির যায় কয়ে ॥

৫০৫.
হুজুরে কার হবেরে নিকাশ দেনা।
পঞ্চজন আছে ধড়ে বেরাদার তাঁর ষোলোজনা ॥

মৌলোভী মুন্সিজির কাছে জনমভরে শুধাই এসে ঘোর গেলো না
পরে নেয় পরের খবর আপন খবর আপনার না ॥

ক্ষিতি জল বায়ু হুতাশনে যার যার বস্তু সে সেখানে মিশবে তাই
আকাশে মিশবে আকাশজানা গেলো পঞ্চবেনা ॥

ঘরের আত্মা কর্তা কারে বলি
কোন মোকাম হয় কোথায় গলি করে আওনাযাওনা।
সেই মোকামে লালন কোনজন তাও লালনের ঠিক হলো না ॥

৫০৬.
হুজুরের নামাজের এমনই ধারা।
ইবলিসের সেজদার ঠাঁই ছেড়ে চাই সেজদা করা ॥

সে তো করেছে সেজদা স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জোড়া
কোনখানে বাদ রাখলো এবার দেখ না তোরা ॥

জায়গার মাহাত্ম্য বুঝে সেজদা দিতে পারে যারা
আগমে কয় তাদের হবে নামাজ সারা ॥

কিসে হবে আসল নামাজ করো সেই কাজ ভাই সকলরা
লালন বলে আখের যেতে যেন না যায় মারা ॥

সাধকদেশ

দেশভূমিকা

প্রবর্তদেশে সিদ্ধি অর্জনের মধ্য দিয়ে সাধকদেশে উত্তরণ হয় সাধনার। সাধকের দেহ বা সাধকদেশ হলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার একাত্মতাপূর্ণ অখণ্ডসত্তা তথা তৌহিদ অবস্থা।

সাধকদেশ বা সাধকদেহ চুরাশি ক্রোশ মানে চুরাশি আঙ্গুল ব্যাপ্ত এবং দৈর্ঘ্যপ্রস্থে সমান। তাতে সৃষ্টি ও স্রষ্টা একাকার হয়ে ওঠেন। চুরাশি আঙ্গুল বা সাড়ে তিন হাত সাধকদেহকে কোরানে রূপক নামে বলা হয়েছে হেরাগুহা। সাধকদেহ সৃষ্টির আবরণ ভেদ করে স্বয়ং মূলসত্তায় স্রষ্টার জাগ্রত হাল লাভ করে।

সাধকদেশের কাল মানে গুরুবাক্য সমস্ত চিন্তা ও তৎপরতায় পরিচর্যার ধারায় মনোদেহে সমন্বয়সাধনার কাল। সম্যক গুরু আত্মদর্শনকালে সাধকভক্তকে স্বরূপ রূপে দেখা দিয়ে যখন সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণপূর্বক চব্বিশ চন্দ্রভেদতত্ত্ব জানিয়ে প্রাকৃত দেহকে অপ্রাকৃত করার মাধ্যমে উজ্জ্বল রসসাধন করান সেই সময়কালকে গুরুবাক্য চিন্তা ও চর্যায় মনোদেহের সমন্বয়সাধনকাল বলা হয়।

সাধকদেহের পাত্র হলেন গুরুরসের রসিক। গুরুরস আস্বাদনের দ্বারা গুপ্ত রহস্যজগত নিহার ও বিহারের মাধ্যমে জগতের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সকল বিষয়ের উপর সূক্ষ্ম জ্ঞানবান হাল সাধকদেশের পাত্র।

সাধকদেশের আশ্রয় প্রকৃতিস্বরূপ। সাধক প্রকৃতিস্বরূপের সান্নিধ্য লাভ করে রিপু ইন্দ্রিয়ের অবসান ঘটিয়ে জিতেন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়জিৎ বীর হয়ে ওঠেন।

সাধকদেহের আলম্বন হলো গুরুভাবে ভাবী। গুরুরূপী মহাজ্ঞানরাজ্য তথা প্রেমরাজ্যের ভাবাশ্রয়ে নিবেদিত থেকে তাঁর আদেশানুযায়ী মনোদৈহিক সৎকর্ম করাকে আলম্বন গুরুভাবে ভাবী বলা হয়। তাতে অতীন্দ্রিয় দর্শন ও শ্রবণাদির দ্বারা মূলসত্তায় যে অণুদর্শন সূচিত হয়ে দর্শনসাধনাদি দিন দিন বিকশিত হয়।

সাধকদেহের উদ্দীপন হলো মান্য আদিধারা, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মিলনমুখর প্রেমময় সার্বক্ষণিক বিকাশপ্রবাহ।

অতএব সাধকদেশের কর্মকাণ্ড হলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার একাত্মতাপূর্ণ তৌহিদ পর্যায়ে উত্তরণের মাধ্যমে গুরুরসের রসিক হওয়া। গুরুরসময় প্রকৃতিস্বরূপ শক্তি আত্তীকরণের দ্বারা গুপ্ত রহস্যজগত বিহার করে জীবন জগতের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সকল বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞানবান তথা আত্মজ্ঞানী হয়ে ওঠা। পর্যায়ক্রমে আদিধরনে প্রত্যাবর্তনের জন্যে চিত্ত ও চেতনার সমন্বয়সাধনা করা এদেশের কাজ।

৫০৭.
অকূল পাথার দেখে মোদের লাগেরে ভয়।
মাঝি ব্যাটা বড়ো ঠ্যাঁটা হাল ছেড়ে বগল বাজায় ॥

উজানভেটেন দুটি নালে দমদমাদম বেদমকলে।
পবন গুরু সর্বময় ॥

প্রেমানন্দে সাঁতার খেলে তাইতে সুধানিধি মেলে।
তার ঘটেপটে একসত্য হয় ॥

সামনে অপার নদী পার হয়ে যায় ছয়জন বাদী শ্রীরূপলীলাময়।
লালন বলে ভাব জানিয়ে ডুব দিয়ে সে রত্ন উঠায় ॥

৫০৮.
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচর।
গুরু তুমি পতিতপাবন পরম ঈশ্বর ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে তিনে ভজে তোমায় নিশিদিনে।
তোমা বৈ জানি না অন্যে তুমি গুরু পরাৎপর ॥

ভজে যদি না পাই তোমার এ দোষ আমি দেবো বা কার।
নয়ন দুটি তোমার উপর যা করো তুমি এবার ॥

আমি লালন একই শিরে ভাই বন্ধু নাই আমার জোড়ে।
ভুগেছিলাম পক্কজ্বরে মলম শাহ্ করেন উদ্ধার ॥

৫০৯.
অজুদের ভেদ কিছু বলি শোনরে মন।
জেনে শুনে আপনার আপনি হও চেতন ॥

আব আতশ খাক বাতে গঠেছে শাঁই আদমতন।
আপনার নূর তাতে করেছে সে পত্তন ॥

নূরেতে মোকাম ঘেরা তার ভিতরে সাত সিতারা।
তার উপরে যুগল তারা আলো করে ত্রিভুবন ॥

আঠারো চিজে অজুদ খাড়া বাইশ মোকাম আছে মোড়া।
তিনতারেতে খবর করা তোরা আগে লেহাজ করে জান ॥

তিনশো ষাট রগের জোড়া জুড়েছে এক পবনঘোড়া।
জগত জুড়ে একজন ন্যাড়া উল্টোদাঁড়ায় তাঁর ভ্রমণ ॥

পাঁচ কাবা পাঁচ ইমাম পাঁচ নবি পড়ে কালাম।
পাঁচ পাঁচে পঁচিশের ধাম পাঁচ ইমাম হন প্রধান ॥

তীরধারা ত্রিবিনে ধরায় ত্রিগুণে।
মুর্শিদ বিনে দিশে পাবিনে কোথায় মূলবস্তুধন ॥

ছয় মহলে ঘড়ি ঘোরে দিনরাতে দমে আসল বেনা তাতে।
সিরাজ শাঁই কয় জ্ঞান উপাসনাতে মন দেরে অবোধ লালন ॥

৫১০.
অধরাকে ধরতে পারি কই গো তারে তার।
আত্মারূপে চলে ফিরে মানুষ মারা কলের উপর ॥

প্রেমগঞ্জের রসিক যারা কামগঞ্জে ভুল
কামে থেকে ধরতে পারে তরঙ্গের কুল
এ পারেতে বসে দেখি ঐ পারেতে মূল
মানুষ মারি মানুষ ধরি মানুষ খবরদার ॥

শূন্যের উপরে ধনুক ধরা বেজায় বিষম ফল
ছলকে পলকে হেলে পড়ে অ্যায়সা মজার কল
ক্ষণেক ধরা ক্ষণেক অধর পথ ছাড়া অপথে চল
ক্ষণেই নিরাকার মানুষ ক্ষণেই আকার ॥

ও সে আবার ভাঙা যন্ত্র বাজে ঠসঠস
পাকে পাকে তার ছিঁড়ে যায় করে খসখস
সিরাজ শাঁই কয় বাজে না ভাঙ্গা বশ
লালনরে তোর কেবল দৌড়াদৌড়ি সার ॥

৫১১.
অনুরাগের ঘরে মার গা চাবি।
যদি রূপনগরে যাবি ॥

শোন মন তোরে বলি তুই আমারে ডুবাইলি।
পরের ধনে লোভ করিলি সে ধন আর কয়দিন খাবি ॥

নিরঞ্জনের নাম নিরাকার নাইকো তাঁর আকার সাকার।
বিনা বীজে উৎপত্তি তাঁর দেখলে মানুষ পাগল হবি ॥

সিরাজ শাঁই দরবেশে বলে গাছ রয়েছে অগাধ জলে।
ঢেউ খেলিছে ফুলে ফলে লালন বাঞ্ছা করলে দেখতে পাবি ॥

৫১২.
অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখিতে পায়।
অমাবস্যা নাই সে চাঁদে দ্বিদলে তাঁর কিরণ উদয় ॥

বিন্দু মাঝে সিন্ধুবারি মাঝখানে তার স্বর্ণগিরি।
অধর চাঁদের স্বর্গপুরি সেহি তো তিল পরিমাণ জা'গায় ॥

যথারে সেই চন্দ্রভুবন দিবারাতের নাই আলাপন।
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ বিজলী চঞ্চরে সদাই।

দরশনে দুঃখ হরে পরশনে পরশ করে।
এমনই সে চাঁদের মহিমা লালন ডুবে ডোবে না তায় ॥

৫১৩.
অন্তরে যার সদাই সহজরূপ জাগে।
সে নাম বলুক বা না বলুক মুখে ॥

যাঁহার কর্তৃক এই সংসার নামের অন্ত নাই কিছু তাঁর।
বলুক যে নাম ইচ্ছা হয় যার নাম বলে যদি রূপ দেখে ॥

যে নয় গুরুরূপের আশ্রি কুজনে যেয়ে ভোলায় তারি।
ধন্য যাঁরা রূপ নিহারি রূপ দেখে রয় ঠিক বাগে ॥

নামেতেই রূপ নিহারা সর্বজয়ী সিদ্ধ তাঁরা।
সিরাজ শাঁই কয় লালন গোঁড়া এলিগেলি কিসের লেগে ॥

৫১৪.
অমাবস্যার দিনে চন্দ্র থাকে না থাকে কোন শহরে।
প্রতিপদে হয় সে উদয় দৃষ্ট হয় না কেন তাঁরে ॥

মাসে মাসে চাঁদের উদয় অমাবস্যা মাসান্তে হয়।
সূর্যের অমাবস্যা নির্ণয় জানতে হয় লেহাজ করে ॥

ষোলোকলা হলে শশী তবে তো হয় পূর্ণমাসী।
পনেরোয় পূর্ণিমা হয় কিসি পণ্ডিতেরা কয় সংসারে ॥

যে জানতে পারে দেহচন্দ্রের স্বর্গচন্দ্রের পায় সে খবর।
সিরাজ শাঁই কয় লালনরে তোর মূল হাঁরালি কোলের ঘোরে ॥

৫১৫.
অমৃত সে বারি অনুরাগ নইলে কি যাবে ধরা।
সে বারির পরশ হলে হবে ভবের করণ সারা ॥

বারি নামে বার এলাহি নাইরে তাঁর তুলনা নাহি।
সহস্রদল পদ্মে সেহি মৃণাল গতি বহে ধারা ॥

ছায়াহীন এক মহামুনি বলবো কিরে তাঁর করণী।
প্রকৃতি হয়ে জিনি হলেন বারি সেধে অমর গোরা ॥

আসমানে বরিষণ হলে দাঁড়ায় জল মৃত্তিকাস্থলে।
লালন ফকির ভেবে বলে সে মাটি চিনবে ভাবুক যারা ॥

৫১৬.
আকার কি নিরাকার শাঁই রব্বানা।
আহাদ আর আহ্‌মদের বিচার হলে যায় জানা ॥

আহ্‌মদ নামে দেখি মিম হরফ লেখে নফি।
মিম গেলে আহাদ বাকি আহ্‌মদ নাম থাকে না ॥

খুদিতে বান্দার দেহে খোদা সে আছে লুকায়ে।
আহাদে মিম বসায়ে আহ্‌মদ নাম হলো সে না ॥

এইপদের অর্থ ঢুঁড়ে কারো বা জান বসেছে ধড়ে।
কেউ বলে লালন ভেড়ে ফাকড়ানো সই বোঝে না ॥

৫১৭.
আকারে ভজন সাকারে সাধন তাই।
আকার সাকার অভেদ রূপ জানতে হয়।

ভজনের মূল নিরাকার গুরুশিষ্য হয় প্রচার।
সাকার রূপেতে আকারে নির্ণয় আকার ছাড়া সাকার নাহি রয় ॥

পুরুষপ্রকৃতি আকার যুগল ভজন প্রচার।
নায়কনায়িকার যোগ মাহাত্ম্য যোগের সাধন জানতে হয় ॥

অযোনি সহজ সংস্কার স্বরূপে দুইরূপ হয় নিহার।
স্বরূপে রূপের স্বরূপ হয় অবোধ লালন তাই জানায় ॥

৫১৮.
আগে কপাট মারো কামের ঘরে।
মানুষ ঝলক দেবে রূপ নিহারে ॥

হাওয়া ধরো অগ্নি স্থির করো যাতে মরিলে বাঁচিতে পারো।
মরণের আগে মরো দেখে শমন যাক ফিরে ॥

বারে বারে করিরে মানা লীলাবাসে আর যেও না।
রেখো তেজের ঘর তেজিয়ানা সাধোরে মন সচেতন করে ॥

জানো নারে মন পারাহীন দর্পণ যাতে হয় না শ্রীরূপদর্শন।
অতিবিনয় করে বলছে লালন থাকো হুঁশিয়ারে ॥

৫১৯.
আগে জানলে তোর ভাঙা নায়ে চড়তাম না।
ওরে দূরদেশে পাড়ি ধরতাম না ॥

ছিলো সোনার দাঁড় একখানা পবনের বৈঠা ময়ূরপঙ্খি নায়ে।
গলুইতে ছিলো ফুল তোলা গহনা চন্দ্র সূর্য তারা জোছনা ॥

ছমছম কলকল দরিয়াতে ওঠে ঢেউ ঐ মাতঙ্গ তুফান দেখে কেউ।
দিও না পাড়ি কারণদরিয়ায় নাও ডুবিলে উপায় কি জানো না ॥

ছিদ্র ছিলো বুঝি নায়ের মাঝখানে উঠলো পানিভরে নায়ে তুফানে তুফানে
যদি যেতো জানা নায়ের ছিদ্র আছে গোপনে
লালন বলে তাহলে নায়ে চড়তাম না ॥

৫২০.
আগে তুই না জেনে মন দিসনে নয়ন করি হে মানা।
নয়ন দিলে যাবা জন্মের মতো আর ফিরে আসবে না ॥

নেবার বেলায় কতো সন্ধি নিয়ে করে কপাট বন্দি ফিরে দেখায় না।
তোর মতো ভোলানি সন্ধি জগতে কেউ জানে না ॥

দেখেছি তাঁর রাঙাচরণ না দেখেই ভুলেছিলো মন করে বন্দনা।
লালন বলে ঐ রাঙাচরণ আমার ভাগ্যে হইলো না ॥

৫২১.
আগে মন সাজো প্রকৃতি।
প্রকৃতির স্বভাব ধরো সাধন করো উর্ধ্ব হবে দেহের রতি ॥

যে আছে ষড়দলে সাধো তাঁরে উল্টোকলে।
যদি সে সাধনবলে যায় দ্বিদলে উঠবে জ্বলে জ্যোতি ॥

অনাত্ম নিবৃত্তি হলে নিষ্ঠারতিবলে।
কামব্রহ্মাণ্ড সাকারমূলে উদয় হবে গুরুমূর্তি ॥

বৈদিক এক সাধন আছে তারে রাখো আগে পিছে।
সেই সাধন করতে গেলে গুরু হয় নিজপতি ॥

তারপরে এক সাধন আছে সে সাধন বড়োই বেজাতে।
অধীন লালন বলে মনরে আমার হবে কোন গতি ॥

৫২২.
আগে শরিয়ত জানো বুদ্ধি শান্ত করে।
রোজা আর নামাজ শরিয়তের কাজ আসল শরিয়ত বলছো কারে ॥

কলেমা নামাজ রোজা হজ জাকাত
তাই করিলে কি হয় শরিয়ত বলো শরা কবুল করোরে।
ভাবে বোঝা যায় কলেমা শরিয়ত নয় শরিয়তের অর্থ থাকতে পারে ॥

বেইমান বেলিল্লাজনা শরিয়তের আঁক বোঝে না শুধু মুখে তোড় ধরে।
চিনতো যদি আঁক করতো না অদেখা নিয়ত
থাকতো না কভু বরজোখ ছেড়ে ॥

শরিয়তের গন্তু ভারি
যে যা করে সেই ফল তারই হয় আখেরে।
লালন বলে মোর বুদ্ধিহীন অন্তর মারি মূলে লাগে ডালের 'পরে ॥

৫২৩.
আছে ভাবের গোলা আসমানে তাঁর মহাজন কোথা।
কে জানে কারে শুধাই সেইকথা ॥

জমিনেতে মেওয়া ফলে আসমানে বরিষণ হলে।
কমে না আর কোনোকালে শুধাই কোথা ॥

রবি শশী সৃষ্টির কারণ সেই গোলা করে ধারণ।
আছেরে দুইজন যে যথা ॥

ধন্য ধনীর ধন্য কারবার দেখলাম না তাঁর বাড়িঘর।
লালন বলে জন্ম আমার গেলো বৃথা ॥

৫২৪.
আছে মায়ের ওতে জগতপিতা ভেবে দেখো না।
হেলা করো না বেলা মেরো না ॥

নিষ্কাম নির্বিকার হয়ে দাঁড়াও মায়ের শরণ লয়ে।
বর্তমানে দেখো চেয়ে আছে স্বরূপে রূপনিশানা ॥

কেমন মাতা কেমন পিতা সে চিরদিন সাগরে ভাসে।
লালন বলে করো দিশে ঘরের মধ্যে ঘরখানা ॥

৫২৫.

আছে যার মনের মানুষ মনে তোলা সে কি জপে মালা
অতিনির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা ॥

কাছে রয় ডাকে তারে কোন পাগলা উচ্চস্বরে।
যে যা বোঝে সেই তা বোঝে থাকরে ভোলা ॥

যেথা যার ব্যথা নেহাত সেইখানে হাত ডলামলা।
তেমনই জেনো মনের মানুষ মনে তোলা ॥

যেজন দেখে সে রূপ করিয়ে চুপ থাক নিরালা।
লালন ভেড়োর লোকজানানো মুখে হরি হরি বলা ॥

৫২৬.

আজ আমার দেহের খবর বলি শোনরে মন।
দেহের উত্তর দিকে আছে বেশী দক্ষিণেতে কম ॥

দেহের খবর না জানিলে আত্মতত্ত্ব কীসে মেলে।
লাল জরদ সিয়া সফেদ বাহান্ন বাজার এই চারকোণ ॥

আগে খুঁজে ধরো তাঁরে নাসিকাতে চলে ফেরে।
নাভিপদ্মের মূল দুয়ারে বসে আছে সর্বক্ষণ ॥

আঠারো মোকামে মানুষ যে না জানে সেই তো বেহুঁশ।
লালন বলে থাকলে হুঁশ আদ্য মোকাম তার আসন ॥

৫২৭.

আজ বাতাস বুঝে ভাসাওরে তরী।
তেঘাটা ত্রিবিনে বড়ো তোড়তুফান ভারি ॥

একে অসার কাষ্ঠের নাও তাতে বিষম বদহাওয়াও।
কুপ্যাচে কুপাকে প'লে জীবনে মরি ॥

মহাজনের ধন এনে ডুবালি সেই ত্রিবিনে।
মাড়ুয়া বাদীর মতন যাবি ধরা পড়ি ॥

কতশত মহাশয় সেই নদীতে মারা যায়।
লালন বলে বুঝবো এবার মন তোর মাঝাগিরি ॥

৫২৮.
আজব আয়নামহল মণি গভীরে।
সেথা সতত বিরাজে শাঁইজি মেরে ॥

পূর্বদিকে রত্নবেদি তার উপরে খেলছে জ্যোতি।
যে দেখেছে ভাগ্যগতি সে সচেতন সব খবরে ॥

জলের ভিতর শুক্‌না জমি আঠারো মোকামে তাই কায়েমি।
নিঃশব্দে শব্দের উদ্‌গামী যা যা সেই মোকামের খবর জান গা যারে ॥

মণিপুরের হাটে মনোহারি কল তেহাটা ত্রিবেণী তাহে বাঁকা নল।
মাকড়ার আঁশে বন্দি সে জল লালন বলে সন্ধি বুঝবে কেরে ॥

৫২৯.
আজো করছে শাঁই ব্রহ্মাণ্ডে অপার লীলে।
নৈরাকারে ভেসেছিলো যেরূপ হালে ॥

নৈরাকারের গম্ভু ভারি আমি কি তাই বুঝতে পারি।
কিঞ্চিৎ প্রমাণ তাঁরই শুনি সমকূলে ॥

অবিম্বু উথলিয়ে নীর হয়েছিলো নিরাকার।
ডিম্বরূপ হয়গো তার সৃষ্টির ছলে ॥

আত্মতত্ত্ব আপনি ফানা মিছে করি পড়াশোনা।
লালন বলে যাবে জানা আপনার আপনি চিনিলে ॥

৫৩০.
আত্মতত্ত্বসাধন করে জ্ঞানীজনা বসে রয়।
আগেরে মন সেই সাধন সেরে আয় ॥

ভাবের আসন করে শ্রীপাটে শুভযোগে লাগেরে জাহাজ রূপচাঁদের ঘাটে।
তারের খবর ইশ্‌কে প'লে সহজ হলে হয় উদয় ॥

করে এ কী রসের কল শুভযোগে ডেকে বলে উজান বাঁকে চল।
ছলছল কল হলো বিকল সহজে যেতে ধাক্কা খায় ॥

নিহার যদি তীরে ছুটে যেতেরে মন পিছল ঘাটে তরঙ্গ উঠে।
লালন বলে মোহর এঁটে ঠিক রাখো রাগের তালায় ॥

৫৩১.
আপন আপন চিনেছে যেজন।
দেখতে পাবে সেই রূপেরই কিরণ ॥

সেই আপন আপন রূপ সে বা কোন স্বরূপ।
স্বরূপেরই সেই রূপ জানিও করণ ॥

সেই আপনা মোকাম জেনে প্রধান যে জানে সেই মোকামের সন্ধান।
করে মোকামেরই সাধন উজালা তার দেহভুবন ॥

সেইঘরের অন্বেষণ জানে যেজন ঘরের মধ্যে আছে লতিফা ছয়জন।
ঘরে আছে পাক পাঞ্জাতন ওরে পঞ্চজন আত্মায় আত্মার করে ভজন ॥

সেই রসিকের মন রসেতে মগন সেই রূপরসেতে যেজন দিয়েছে নয়ন।
ফকির লালন কয় আমি আমাতে হারাই আমি বিনে আমার সকল অকারণ ॥

৫৩২.
আপন ঘরের খবর নে না।
অনা'সে দেখতে পাবি কোন্‌খানে শাঁইর বারামখানা ॥

কমলকোঠা কারে বলি কোন মোকাম তার কোথা গলি।
কোন্ সময় পড়ে ফুলি মধু খায় সে অলিজনা ॥

সূক্ষ্মজ্ঞান যার ঐক্য মুখ্য সাধকের উপলক্ষ।
অপরূপ তাঁর বৃক্ষ দেখলে চোখের পাপ থাকে না ॥

শুক্রনদীর সুখ সরোবর তিলে তিলে হয় গো সাঁতার।
লালন কয় কীর্তিকর্মার কীর্তিকর্মার কী কারখানা ॥

৫৩৩.
আপন দোষে আপনি মরবি দোষী করবি কার।
সেখানে বলে এলি কী কার্য তুই করলি তাঁর ॥

যখন ছিলি মায়ের উদরে বলেছিলি ভজবো গুরু গিয়ে সংসারে
এখন বিষয় পেয়ে মত্ত হয়ে গেলিরে মন ছারখার ॥

মহাজনের অমূল্যরতন দিয়েছিলো তোর হাতে করিতে যতন।
এখন বুঝি হারিয়ে সে পুঁজি বদনামি করবি কার ॥

অমাবস্যা পূর্ণিমার তিথি এদিনে হলে যুগল মিলন পুরুষের ক্ষতি।
তুমি চেনো না মন অমাবস্যায় নদীর জল ওঠে ডাঙ্গায়
সিরাজ শাঁই কয় এবার তুমি থাকো হুশিয়ার ॥

গাঁটের মাল সব জুয়োচোরে নেবে যে এবার।
ফকির লালন ভনে এই না জেনে শুধু আসা যাওয়া হবে সার ॥

৫৩৪.
আপন মনের গুণে সকলই হয়।
পিঁড়েয় পায় পেঁড়োর খবর কেউ দূরে যায় ॥

মুসলমানের মক্কাতে মন হিন্দু করে কাশী ভ্রমণ।
মনের মধ্যে অমূল্য ধন কে ঘুরে বেড়ায়।

রামদাস রামদাস বলে জাতে সে মুচির ছেলে।
গঙ্গা মাকে হেরে নিলে চাম কেটোয়ায় ॥

জাতে সে জোলা কবীর উড়িষ্যায় তাঁহার জাহির।
বারো জাত তাঁরই হাঁড়ির তুড়ানি খায় ॥

কতোজন ঘর ছেড়ে জঙ্গলে বাঁধে কুঁড়ে।
লালন কয় রিপু ছেড়ে সে যাবে কোথায় ॥

৫৩৫.
আপন মনের বাঘে যারে খায়।
কোনখানে পালালে বলো বাঁচা যায় ॥

বন্ধছন্দ করিরে এঁটে ফস করে যায় অমনি কেটে।
আমার মনের বাঘ গর্জে উঠে সুখপাখিরে হানা দেয় ॥

মরণের আগে যে মরে ঐ বাঘে কী করতে পারে।
মরা কী সে আবার মরে মরেও সে জিন্দা রয় ॥

মরার আগে জ্যান্তে মরা গুরুপদে মন নোঙ্গর করা।
লালন তেমনই পতঙ্গের ধারা অগ্নিমুখে ধেয়ে যায় ॥

৫৩৬.
আপন সুরতে আদম গঠলেন দয়াময়।
নইলে কি ফেরেস্তারে সেজদা দিতে কয় ॥

আল্লাহ্ আদম না হলে পাপ হতো সেজদা দিলে।
শেরেকি পাপ যারে বলে এ দ্বীন দুনিয়ায় ॥

দুষে সেই আদম সফি আজাজিল হলো পাপী।
মন তোমার লাফালাফি তেমন দেখা যায় ॥

আদমি সে চেনে আদম পশু কি তাঁর জানে মরম।
লালন কয় আদ্যধরম আদম চিনলে হয় ॥

৫৩৭.
আপনার আপনি চিনিনে।
দ্বীনজনের উপর যাঁর নাম অধর তাঁরে চিনবো কেমনে ॥

আপনারে চিনতাম যদি মিলতো অটল চরণনিধি।
মানুষের করণ হতো সিদ্ধি শুনি আগম পুরাণে ॥

কর্তারূপে রূপের নাই অন্বেষণ নইলে কি হয় রূপ নিরুপণ।
আপ্তবাক্যে পায় সে আদিধরণ সহজ সাধক জনে ॥

দিব্যজ্ঞানী যেজন হলো নিজতত্ত্বে নিরঞ্জন পেলো।
সিরাজ শাঁই কয় লালন র'লো জন্মান্ধ মনগুণে ॥

৫৩৮.
আপনার আপনি ফানা হলে সকলই জানা যাবে।
কোন নামে ডাকিলে তাঁরে হৃদাকাশে উদয় হবে ॥

আরবি ভাষায় বলে আল্লাহ ফারসিতে হয় খোদাতালা।
গড বলেছে যিশুর চেলা ভিন্নদেশে ভিন্নভাবে ॥

মনের ভাব প্রকাশিতে ভাষার উদয় ত্রিজগতে।
ভাব দিতে হয় অধর চিতে ভাষা বাক্যে নাহি পাবে ॥

আল্লাহ হরি ভজন পূজন এ সকল মানুষের সৃজন।
অনামক অচেনার বচন বাগেন্দ্রিয়ে না সম্ভবে ॥

আপনাতে আপনি ফানা হলে তাঁরে যাবে চেনা।
সিরাজ শাঁই কয় লালন কানা সংক্ষেপেতে রূপ দেখিবে ॥

৫৩৯.
আপনার আপনি যদি চেনা যায়।
তবে তাঁরে চিনতে পারি সেই দয়াময় ॥

উপরওয়ালা সদর বারি আত্মারূপে অবতারী।
মনের ঘোরে চিনতে নারি কিসে কী হয় ॥

যে অঙ্গ সেই অংশকলা কায় বিশেষে ভিন্ন বলা।
যার ঘুঁচেছে মনের ঘোলা সে কী তা কয় ॥

সেই আমি কি এই আমি তাই জানিলে যায় দুর্নামি।
লালন কয় তবে কি ভ্রমি এ ভবকূপায় ॥

৫৪০.
আমার আপন খবর নাহিরে কেবল বাউল নাম ধরি।
বেদ-বেদান্তে নাই যার উল কেবল শুদ্ধনামে মশগুল জগতভরি ॥

খবরদার কারে বলা যায় কিসে হয় খবরদারি।
আপনার আপনি যে জেনেছে বাউলের উল সে পেয়েছে সেই হুঁশিয়ারই ॥

কতো মুনি ঋষি যোগী সন্ন্যাসী খবর পায় না তাঁরই।
আউলবাউলের আত্মতত্ত্ব ভজন আমি লালন পশুর চলন কেমনে ধরি ॥

৫৪১.
আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
জনমভরে একদিনও তাঁরে দেখলাম নারে ॥

নড়েচড়ে ঈশানকোণে দেখতে পাইনে এই নয়নে।
হাতের কাছে যাঁর ভবের হাট বাজার ধরতে গেলে হাতে পাইনে তাঁরে ॥

সবে বলে প্রাণপাখি শুনে চুপে চেপে থাকি।
জল কি হুতাশন মাটি কি পবন কেউ বলে না আমায় নির্ণয় করে ॥

আপন ঘরের খবর হয় না বাঞ্ছা করি পরকে চেনা।
লালন বলে পর বলিতে পরমেশ্বর সে কী রূপ আমি কী রূপরে ॥

৫৪২.
আমার দিন কি যাবে এই হালে আমি পড়ে আছি অকূলে।
কতো অধম পাপী তাপী অবহেলে তরালে ॥

জগাই মাধাই দুটি ভাই
কাদা ফেলে মারিল গায় তাহে তো নিলে
আমি তোমার কেউ নই দয়াল তাই কি মনে ভাবিলে ॥

অহল্যা পাষাণী ছিলো
সেও তো মানব হলো প্রভুর চরণ ধূলে
আমি পাপী ডাকছি সদাই দয়া হবে কোন কালে ॥

তোমার নাম লয়ে যদি মরি
দোহাই দিই তবু তোমারই আর আমি যাবো কোন্ কূলে
তুমি বৈ আর কেউ নাই আমার মূঢ় লালন কেঁদে বলে ॥

৫৪৩.
আমার দেখে শুনে জ্ঞান হলো না।
আমি কী করিতে কী করিলাম আমার দুগ্ধেতে মিশিলো চোনা ॥

মদনরাজার ডঙ্কা ভারি হলাম না তার আজ্ঞাকারি।
যাঁর মাটিতে বসত করি চিরদিন তাঁরে চিনলাম না ॥

রাগের আশ্রয় নিলে তখন কী করিতে পারে মদন।
আমার হলো কামলোভী মন মদন রাজার গাঁঠরি টানা ॥

উপর হাকিম একদিনে কৃপা করলে নিজগুণে।
দ্বীনের অধীন লালন ভনে যেতো মনের দোটানা ॥

৫৪৪.
আমার হয় নারে সেই মনের মতো মন।
কিসে চিনবো সেই মানুষরতন ॥

পড়ে রিপু ইন্দ্রিয় ভোলে মন বেড়ায়রে ডালে ডালে।
দুইমনে একমন হলে এড়ায় শমন ॥

রসিক ভক্ত যাঁরা মনে মন মিশালো তাঁরা।
শাসন করে তিনটি ধারা পেলো রতন ॥

কিসে হবে নাগিনী বশ সাধবো কবে অমৃতরস।
সিরাজ শাঁই কয় বিষেতে নাশ হ'লি লালন ॥

৫৪৫.
আমারে জল সেচায় জল মানে না এই ভাঙ্গা নায়।
একমালা জলসেচতে গেলে তিনমালা যোগায় চালায় ॥

আগা নায়ে মন মনুরায় বসে বসে চুকুম খেলায়।
আমার দশা তলাফাঁসা জলসেঁচি আর গুদরী গড়াই ॥

ছুতোর ব্যাটার কারসাজিতে মানবতরীর ছাদ আঁটা নাই।
নৌকার আশেপাশে তক্তা ভালো মেজেল কাঠ গড়েছে তলায় ॥

মহাজনের অমূল্যধন মারা গেলো ডাকিনী জোলায়।
লালন কয় কী জানি হয় শেষকালে নিকাশের বেলায় ॥

৫৪৬.
আমায় চরণছাড়া করো না হে দয়াল হরি ॥
পাপ করি পামরা বটে দোহাই দিই তোমারই ॥

চরণের যোগ্য মন নয় তথাপি মন ঐ রাঙাচরণ চায়।
দয়াল চাঁদের দয়া হলে যেতো অসুসারই ॥

অনিত্যসুখেতে সর্বঠাঁই তাই দিয়ে জীব ভোলাও গোঁসাই।
চরণ দিতে তবে কেন করো হে চাতুরি ॥

ক্ষমো অধীন দাসের অপরাধ শীতল চরণ দাও হে দীননাথ।
লালন বলে ঘুরাইও না হে মায়াকারি ॥

৫৪৭.
আমি ঐ চরণে দাসের যোগ্য নই।
নইলে মোর দশা কি এমন হয় ॥

নিজগুণে পদারবিন্দু দেন যদি শাঁই দীনবন্ধু।
তবে তরি ভবসিন্ধু নইলে না দেখি উপায় ॥

ভাব জানিনে প্রেম জানিনে কেবল দাসী হতে চাই চরণে।
ভাব জেনে ভাব নিলে মনে সেই সে রাঙাচরণ পায় ॥

অহল্যা পাষাণী ছিলো প্রভুর চরণ ধূলায় মানব হলো।
লালন পথে পড়ে রইলো যা করেন শাঁই দয়াময় ॥

৫৪৮.
আমি কি তাই জানলে সাধনসিদ্ধি হয়।
আমি কথার অর্থ ভারি আমাতে আর আমি নই ॥

অনন্ত শহর বাজারে আমি আমি শব্দ করে।
আমার আমি না চিনিয়ে বেদ পড়ি পাগলের প্রায় ॥

মনসুর হাল্লাজ ফকির সে তো বলেছিলে আমি সত্য।
সই প'লো শাঁইর আইনমতো শরায় কী তাঁর মর্ম পায় ॥

কুমবে এজনি কুমবে এজনিল্লা শাঁই হুকুম আমি হিল্লা।
লালন বলে এ ভেদ খোলা মুর্শিদেরই ঠাঁই ॥

৫৪৯.
আমি কী দোষ দেবো কারে।
আপন মনের দোষে প'লাম ফেরে ॥

সুবুদ্ধি সুস্বভাব গেলো কাকের স্বভাব মনে হলো।
ত্যাজিয়ে অমৃত ফল মাকাল ফলে মন মজিলরে ॥

যে'আশায় এ ভবে আসা ভাঙ্গিল সেই আশার বাসা।
ঘটিলরে কী দুর্দশা ঠাকুর গড়তে বানর হলোরে ॥

গুরুবস্তু চিনলিনে মন অসময় কী করবি তখন।
বিনয় করে বলছে লালন যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায় খেলোরে ॥

৫৫০.
আমি কী সাধনে পাই গো তাঁরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ধ্যানে পায় না যাঁরে ॥

স্বর্ণশিখর যাঁর নির্জন গুহা স্বরূপে সেহি চাঁদের আভা।
আভা ধরতে চাই হাতে নাহি পাই কী রূপে সে রূপ যায় গো সরে ॥

পড়ে শাস্ত্রাভাষ কেহ কেহ কয় পঞ্চতত্ত্ব হলে সেই তাঁরে পায়।
পঞ্চতত্ত্বের ঘর সেও তো অন্ধকার নিরপেক্ষ রয় দেখো বিচারে ॥

গুরুপদে যদি হইত মরণ তবে সফল হইত জনম।
অধীন লালন বলে ওরে মন আমার ভাগ্যে তাও ঘটলো নারে ॥

৫৫১.
আমি কোথায় ছিলাম আবার কোথায় এলাম ভাবি তাই।
একবার এসে এই ফল আমার জানি আব্বার ফিরে কোথা যাই ॥

বেদ-পুরাণে শুনি সদাই কীর্ত্তিকর্ম্মা আছে একজন জগতময়।
আমি না জানি তাঁর বাড়ি কোথায় আমি কী সাধনে তাঁরে পাই ॥

যাদের সঙ্গে করি কারবার তারাই সব বিবাগী আবার হলোরে আমার।
লুটলোরে এই ধনীর ভাণ্ডার আমায় ঘিরে উনপঞ্চাশ বায় ॥

কে বা আমার আমি বা কার মিছে ধন্ধবাজি এ ভবসংসার।
অধীন লালন বলে হইলাম অপার আমার সাথের সাথী কেহ নয় ॥

৫৫২.

আমি কোন সাধনে তাঁরে পাই।
আমার জীবনের জীবন শাঁই ॥

শাক্ত শৈব বৈরাগ্যের ভাব তাতে যদি হয় চরণ লাভ।
দয়াময় কেন সর্বদাই বেদীভক্তি বলে দুষিলেন তাই ॥

সাধলে সিদ্ধির ঘরে শুনিলাম সেও পায় না তাঁরে।
সাধক যে ব্যক্তি পেলো সে মুক্তি ঠকে যাবে অমনি শুনিরে ভাই ॥

গেলো নারে মনের ভ্রান্ত পেলাম না সে ভাবের অন্ত।
বলে তাই মূঢ় লালন ভবে এসে মন কি করিতে কী করে যাই ॥

৫৫৩.

আমি তো নইরে আমার সকলই পর আমি আমার না।
কার কাছে কইরে আমি আমি বলতে আমার না ॥

আমি যদি আমার হতাম কুপথে নাহি যেতাম।
সরল পথে থেকে মন দেখতাম আপন কল কারখানা ॥

আমি এলাম পরে পরে পরেরে নিয়ে বসত করে।
আজ আমার কেউ নাইরে পরের সঙ্গে দেখাশোনা ॥

পরে পরে কুটুম্বিলি পরের সঙ্গে দিন কাটালি।
ভেবে কয় ফকির লালন না ভাবলাম পারের ভাবনা ॥

৫৫৪.

আমি বাঁধি কোন মোহনা।
আমার দেহনদীর বেগ গেলো না ॥

নদীতে নামার আশা করি মাঝখানে সাপের হাড়ি কুমিরেরই থানা।
ছয় কুমিরেই যুক্তি করে ঐ নদীতে দিচ্ছে হানা ॥

কালিদার পূর্ব ঘাটে তিননালে এক ফুল ফোটে সে ফুল তুলতে যেও না
সে ফুল তোলার আশায় ছয়জনার গোল গেলো না ॥

বেযোগেতে স্নান করিতে যায়
সে তো মানুষ মরা খায় সে ঘাটের সন্ধি জানে না।
লালন কয় সে ঘাটে ইন্দ্রিয় রিপু আমি তারে চিনি না ॥

৫৫৫.
আর কি পাশা খেলবোরে আমার জুড়ি কে আছে।
খেলার পাশা যাওয়াআসা আমার খেলার দিন গিয়েছে ॥

অষ্টগুটি রইলো কাঁচা কী দিয়ে আর খেলবো পাশা।
আমি ভবকূপে পাই যে সাজা সাজা আখেরে হতেছে ॥

পরের সঙ্গে জন্মাবধি পাশাখেলায় রইলাম বন্দি।
ভবকূপে দিবারাত্রি কতোই ঢেউ মোর উঠতেছে ॥

সিরাজ শাঁই কয় ভাঙরে খেলা অবহেলায় গেলো বেলা।
লালন হলি কামে ভোলা পাশা ফেলে যাও দেশে ॥

৫৫৬.
আর কি বসবো এমন সাধুর সাধবাজারে।
না জানি কোন সময় কোন দশা ঘটে আমারে ॥

সাধুর বাজার কী আনন্দময় অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্রোদয়।
আছে ভক্তির নয়ন যাঁর সে চাঁদদৃষ্টি তাঁর ভববন্ধনজ্বালা তাঁর যায় গো দূরে ॥

দেবের দুর্লভ পদ সে সাধু নামটি তাঁর শাস্ত্রে ভাসে।
গঙ্গা মা জননী পতিতপাবনী সেও তো সাধুর চরণ বাঞ্ছা করে ॥

দাসের দাস তার দাসযোগ্য নই কোন ভাগ্যে এলাম সাধু সাধসভায়।
ফকির লালন কয় মোর ভক্তিহীন অন্তর এবার বুঝি প'লাম কদাচারে ॥

৫৫৭.
আর কি হবে এমন জনম বসবো সাধু মিলে।
হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায় ঘিরে নিলো কালে ॥

কতো কতো লক্ষযোনি ভ্রমণ করেছো শুনি।
মানবকুলে মনরে তুমি এসে কী করিলে ॥

মানবকুলেতে আশায় কতো দেব দেবতা বাঞ্ছিত হয়।
হেন জনম দ্বীন দয়াময় দিয়েছে কোন্ ফলে ॥

ভুলো নারে মন রসনা সমঝে করো বেচাকেনা।
লালন বলে কুল পাবে না এবার ঠকে গেলে ॥

৫৫৮.
আর কেনরে মন ঘোরো বাইরে চলো না আপন অন্তরে।
বাইরে যাঁর তত্ত্ব করো অবিরত সে তো আজ্ঞাচক্রে বিহারে ॥

বামে ইড়া নাড়ি দক্ষিণে পিঙ্গলা শ্বেত রজঃগুণে করিতেছে খেলা।
মধ্যে শতগুণ সুষুম্না বিমলা ধরো ধরো তাঁরে সাদরে ॥

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বায়ু বিকারে অচৈতন্য হয়ে আছে মূলাধারে।
গুরুদত্ত তত্ত্ব সাধনেরই জোরে চেতন করো তাহারে ॥

মূলাধার অবধি পঞ্চচক্রভেদী লালন বলে আজ্ঞাচক্রে বয় নিরবধি।
হেরিলে সে নিধি যাবে ভবব্যাধি ভাসবি আনন্দসাগরে ॥

৫৫৯.
আলক শাঁই আল্লাহ্জি মিশে।
ফানা ফিল্লাহ্ মোরাকাবায় নাহি পায় দিশে ॥

যার ধড়ে বসত করি নিরাকার কি ডিম্বধারি।
আমি ঐ তল্লাশে ঘুরে মরি আছেন তিনি কোন্ ঘরে বসে ॥

মক্কা মোয়াজ্জেমা যারে বলে সে কি আহাদে আহ্মদ মেলে।
মোশাহেদায় কপাট প'লে থাকে গুরুর আড়ার পাশে ॥

যেমন লোহাতে চমক ঠেকালে চার রঙ যায় অমনি গলে।
শিক্ষাগুরুর দয়া হলে দেখা দেয় সে অনা'সে ॥

লালেতে হয় মতির জন্ম পানিতে হয় মাটির ধর্ম।
লালন বলে ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম করলে না তার উদ্দিশে ॥

৫৬০.
আল্লাহ্ নাম সার করে যেজন বসে রয়।
তাঁর আবার কিসের কালের ভয় ॥

মুখে আল্লাহর নাম বলো সময় যে বয়ে গেলো
মালেকুল মউত এসে বলিবে : চলো
যার বিষয় সে নিয়ে যাবে সে কি রাখবে ভয় ॥

আল্লাহর নামের নাইকো তুলনা
সাদেক দেলে সাধলে সাধনা বিপদ থাকে না
সে যে খুলবে তালা জ্বলবে আলা দেখতে পাবে জ্যোতির্ময় ॥

ফকির লালন ভেবে কয়
তাঁর নামের তুলনা দিতে নাই
আল্লাহ হয়ে আল্লাহ্ ডাকে জীবে কি তাঁর মর্ম পায় ॥

৫৬১.
আশেক উন্মত্ত যাঁরা।
তাঁদের মনের বিয়োগ জানে তাঁরা ॥

কোথায় বা শরার টাটি আশেকে বেভুল সেটি।
মাশুকের চরণ দুটি নয়নে আছে নিহারা ॥

মাশুক রূপ হৃদয়ে রেখে থাকে সে পরম সুখে।
শত শত স্বর্গ থেকে মাশুকের চরণের ধারা ॥

না মানে সে ধর্মাধর্ম না করে সে কর্মাকর্ম।
যার হয়েছে বিকার সাম্য লালন কয় তাঁর করণ সারা ॥

৫৬২.
উব্দ মানুষ জগতের মূলগোড়া হয়।
করণ তাঁর বেদছাড়া ধরা সহজ নয় ॥

ডানে বেদ বামে কোরান মাঝখানে ফকিরের বয়ান।
যার হবে সেই দিব্যজ্ঞান সেহি দেখতে পায় ॥

জাহের নাই বেদকোরানে আছে সে অজুদভজনে।
ঐক্য হলে মনে প্রাণে নাম যাঁর নবি কয় ॥

ইরফানি কোরান খুঁজে দেখতে পাবে তনের মাঝে।
ছয় লতিফা কী রূপ সাজে জিকিরে উঠছে সদাই ॥

নফির জোরে পাবি দেখা বেদে নাই যার চিহ্নরেখা।
সিরাজ শাঁই কয় লালন বোকা এসব ধোঁকাতে হারায় ॥

৫৬৩.
এইদেশেতে এইসুখ হলো আবার কোথায় যাই না জানি
পেয়েছি এক ভাঙা তরী জনম গেলো সেচতে পানি ॥

আর কিরে এই পাপীর ভাগ্যে দয়াল চাঁদের দয়া হবে।
আমার দিন এই হালে যাবে বইয়ে পাপের তরণী ॥

আমি বা কার কে বা আমার প্রাপ্তবস্তু ঠিক নাহি তার।
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার উদয় হয় না দিনমণি ॥

কার দোষ দেবো এই ভুবনে হীন হয়েছি ভজন বিনে।
লালন বলে কতোদিনে পাবো শাঁইয়ের চরণ দুখানি ॥

৫৬৪.

এইবেলা তোর মনের মানুষ চিনে সাধন কর।
মানুষ পালাইবে দেহ ছেড়ে পড়ে রবে শূন্যঘর ॥

ঘরের মধ্যে তোর তিন তেরো আর কোন দরজা করেছো সার।
ঘরের মধ্যে বাস্তুখুঁটি সেইটা কর গে মূলাধার ॥

ডুবে থাক গে রূপসাগরে বসত কর গে যুতের ঘরে।
লালন বলে মনের মানুষ চেনা হলো ভার ॥

৫৬৫.

এই মানুষে সেই মানুষ আছে।
কতো মুনি ঋষি যোগী তপস্বী তাঁরে খুঁজে বেড়াচ্ছে ॥

জলে যেমন চাঁদ দেখা যায় ধরতে গেলে হাতে কে পায়।
আলক মানুষ অমনই সদাই আছে আলকে বসে ॥

অচিন দলে বসতি যাঁর দ্বিদলপদ্মে বারাম তাঁর।
দল নিরূপণ হবে যাহার সে রূপ দেখবে অনা'সে ॥

আমার হলো বিভ্রান্ত মন বাইরে খুঁজি ঘরের ধন।
সিরাজ শাঁই কয় ঘুরবি লালন আত্মতত্ত্ব না বুঝে ॥

৫৬৬.

এ কী অনন্ত লীলা তাঁর দেখো এবার।
আলক পুরুষ থাকে বারি ক্ষণেক ক্ষণেক হয় নিরাকার ॥

আছে শাঁই নিরাকারে ছিলো কুদরতের জোরে।
সংসার সৃজনের তরে ধরিলো প্রকৃতি আকার ॥

শুনি শাঁই করিম কায় তাঁর কার অংশে তিন আকার।
কারে ভজে কারে পাবো দিশে পাইনে তাঁর ॥

ভেবে পাইনে তাঁর অন্বেষণ মনে কি বা পাবো তখন।
বিনয় করে বলছে লালন ঘুঁচাও মনের ঘোর অন্ধকার ॥

৫৬৭.

এ কী আজগুবি এক ফুল
তাঁর কোথায় বৃক্ষ কোথায় আছে মূল ॥

ফুটেছে ফুল মানসরোবরে স্বর্ণ গুফায় ভ্রমরা তাঁর।
কখন মিলন হয়রে দোহার রসিক হলে জানা যায়রে স্থূল ॥

শম্ভু বিম্বু নাই সে ফুলে মধুকর কেমনে খেলে।
পড়ো সহজ প্রেম স্কুলে জ্ঞানের উদয় হলে যাবে ভুল ॥

শোণিত শুক্র এরা দুজন সেই ফুলে হইল সৃজন।
সিরাজ শাঁই বলেরে লালন ফুলের ভ্রমর কে তা কর গে উল ॥

৫৬৮.

এ কী আসমানি চোর ভাবের শহর লুটছে সদাই।
তার আসাযাওয়া কেমন রাহা কে দেখেছো বলো আমায় ॥

শহর বেড়ে অগাধ দোরে মাঝখানে ভাবের মন্দিরে সেই নিগম জায়গায়।
তার পবন দ্বারে চৌকি ফেরে এমন ঘরে চোর আসে যায় ॥

এক শহরে চব্বিশ জেলা দাগছেরে কামান দু'বেলা বলিয়ে জয় জয়।
ধন্য চোরে এ ঘর মারে করে না সে কাহারো ভয় ॥

মনবুদ্ধির অগোচর চোরা বললে কী বুঝবি তোরা আজ আমার কথায়।
লালন বলে ভাবুক হলে ধাক্কা লাগে তাইরি গায় ॥

৫৬৯.

এনে মহাজনের ধন বিনাশ করলি ক্ষ্যাপা।
শুদ্ধ বাকির দায় যাবি যমালয় হবেরে কপালে দায়মাল ছাপা ॥

কীর্তিকর্মা সেহি ধনী অমূল্য মানিকমণি তোরে করলেন কৃপা।
সে ধন এখন হারালিরে মন এমনই তোর কপাল বেওফা ॥

আনন্দবাজারে এলে ব্যাপারে লাভ করবে বলে এখন সারলে সে দফা।
কুসঙ্গেরই সঙ্গে মজে কুরঙ্গে হাতের তীর হারায়ে হলিরে ক্ষ্যাপা ॥

দেখলিনে মন বস্তু টুঁড়ে কাঠের মালা নেড়েচেড়ে মিছে নাম জপা।
লালন ফকির কয় কী হবে উপায় বৈদিকে র'ল জ্ঞানচক্ষু ঝাপা ॥

৫৭০.

এমন মানবজনম আর কি হবে।
দয়া করো গুরু এবার এইভবে ॥

অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন শাঁই মানবরূপের উত্তম কিছু নাই।
দেব দেবতাগণ করে আরাধন জন্ম নিতে মানবে ॥

কতো ভাগ্যের ফলে না জানি পেয়েছো এই মানবতরণী।
বেয়ে যাও ত্বরায় তরী সুধারায় যেন ভারা না ডোবে ॥

এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন তাইতে মানবরূপ গঠলেন নিরঞ্জন।
এবার ঠকলে আর না দেখি কিনার অধীন লালন কয় কাতরভাবে ॥

৫৭১.
এমন সৌভাগ্য আমার কবে হবে।
দয়াল চাঁদ আসিয়ে আমায় পার করিবে ॥

সাধনের বল কিছুই নাই কেমনে সে পারে যাই।
কূলে বসে দিচ্ছি দোহাই অপার ভেবে ॥

পতিতপাবন নামটি তোমার তাই শুনে বল হয়গো আমার।
আবার ভাবি এ পাপীর ভার সে কি নেবে ॥

গুরুপদে ভক্তিহীন হয়ে রইলাম চিরদিন।
লালন বলে কী করিতে এলাম ভবে ॥

৫৭২.
এসে পার করো দয়াল আমায় ভবের ঘাটে।
ভবনদীর তুফান দেখে আতঙ্কে প্রাণ কেঁপে ওঠে ॥

পাপপুণ্যি যতোই করি ভরসা কেবল তোমারই।
তুমি যার হও কাণ্ডারি ভবভয় তার যায় ছুটে ॥

সাধনার বল যাদের ছিলো তারাই কুল কিনারা পেলো।
আমার দিন অকাজেই গেলো কী জানি হয় ললাটে ॥

পুরাণে শুনেছি খবর পতিতপাবন নামটিরে তোর।
লালন বলে আমি পামর তাই তো দোহাই দিই বটে ॥

৫৭৩.
ও দেলমোমিনা চলো আবহায়াত নদীর পারে।
শ্রীগুরু কাণ্ডারীযার রয়েছে হাল ধরে ॥

সে ঘাটে জন্মে সোনা কামী লোভী যেতে মানা।
সে ঘাটে জোর খাটে না চলো ধীরে ধীরে ॥

যার ছেলে কুমিরে খায় তার দেলে লেগেছে ভয়।
ঢেঁকি দেখে পালায় আবার বুঝি আমারে ধরে ॥

শুদ্ধদেল হয়েছে যাঁরা তাদের ধরনকরণ খাড়া।
ভবের ভাবী নহে তাঁরা তাঁদের খায় না কুমীরে ॥

না পেয়ে ঘাটের খুবি কতোজনা খাচ্ছে খাবি।
পা পিছলে অমনি গড়াগড়ি চুবানি খেয়ে মরে ॥

রূপাধারে গিয়েছিলাম কতো রঙবেরঙ দেখিলাম।
নদীর উজানভেটেন ধারা কুমীর আছে গভীর ধারে ॥

গুরুরচরণ হৃদপদ্মেতে ঝাঁপ দিলাম দরিয়াতে।
লালন কয় মুক্তামণি মিলে গুরুর বচন ধরে ॥

৫৭৪.
ওরে মন আর কি যাবি আবহায়াত নদীর পারে।
যার ছেলে কুমিরে খায় ঢেঁকি দেখে সে ভয় পায় আবার বুঝি আমায় ধরে ॥

কামীরূপে জন্মে সোনা সাধুজনার জোর খাটে না।
প্রেমডুবারু ভাই শক্তির বর তাই চলে সে ধীরে ধীরে ॥

প্রেমিক ডুবারু হলে অথৈ জলে ডুবলে সোনার মূল সেই নেয় তুলে।
শ্রীগুরু আছে যার কাণ্ডারির ভার বসে রয় সে হাল ধরে ॥

যার আছে কামনা বাসনা সে সহজ প্রেম জানে না।
ফকির লালন বলে রসিক প্রেমিক হলে যেতে পারে হায়াত নদীর ধারে ॥

৫৭৫.
ওরে মন পারে আর যাবি কী ধরে।
যেতে হুজুরে তরঙ্গ ভারি সেই পথেরে ॥

ইস্রাফিলের শিঙ্গা রবে আসমান জমিন উড়ে যাবে।
হবে নৈরাকারময় কে ভাসবে কোথায় সেই তুফানেরে ॥

চুলের সাঁকো তাতে হীরের ধার পার হতে হবে তুফানের উপর।
নজর আসবে না কোথায় দিবি পা সেই হীরের ধারে ॥

স্বরূপে যার আছেরে নয়ন তার ভবপারের ভয় কিরে মন।
ভেবে বলে ফকির লালন সিরাজ শাঁই যা করে ॥

৫৭৬.
কই হলো মোর মাছ ধরা।
চিরদিন ধাপ ঠেলিয়ে হলাম আমি বলহারা।
যোগ বুঝিনে ঝিম চিনিনে আন্দাজি হয় চাপ মারা ॥

একে যাই খেপো বিলই তাতে বাই ঠেলা জালই ওঠে শামুকের ভারা।
শুভযোগ না পেলে সে মাছ এলে হয় না কভু ক্ষারছাড়া ॥

কেউ বলা কওয়া করে ধরে মাছ প্রেমসাগরে যে নদীর তীরধারা।
আমি এলাম মরতে সেই নদীতে খাটলো না খেপলা ধরা ॥

যেজন ডুবারু ভালো মাছের ক্ষার খ্যাড় চিনিল সিদ্ধি হলো যাত্রা।
ধাপঠেলা মন আমি লালন সার হলো মোর লালাপড়া ॥

৫৭৭.
কবে সাধুর চরণধূলি মোর লাগবে গায়।
আমি বসে আছি আশা সিন্ধুকূলে সদাই ॥

চাতক যেমন মেঘের জল বিনে অহর্নিশি চেয়ে থাকে মেঘ ধেয়ানে।
তৃষ্ণায় মৃত্যু গতি জীবনে হলো সেই দশা আমায় ॥

ভজন সাধন আমাতে নাই কেবল মহৎ নামের দিই গো দোহাই।
তোমার নামের মহিমা জানাও গো সাঁই পাপীর হও সদয় ॥

শুনেছি সাধুর করুণা সাধুর চরণ পরশিলে হয় গো সোনা।
আমার ভাগ্যে তাও হলো না ফকির লালন কেঁদে কয় ॥

৫৭৮.
করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেমসাধন।
প্রেম সাধিতে ফাঁপরে ওঠে কামনদীর তুফান ॥

প্রেমরত্নধন পাবার আশে ত্রিবেণীর ঘাট বাঁধলাম কসে।
কামনদীর এক ধাক্কা এসে ছুটে যায় বাঁধনছাদন ॥

বলবো কী সেই প্রেমের কথা কাম হইল প্রেমের লতা।
কাম ছাড়া প্রেম যথাতথা হয়রে আগমন ॥

পরম গুরু প্রেমপ্রকৃতি কামগুরু হয় নিজপতি।
কামছাড়া প্রেম পায় কী গতি ভেবে কয় লালন ॥

৫৭৯.
করো সাধনা মায়ায় ভুলো না।
নইলে আর সাধন হবে না ॥

সিংহের দুগ্ধ স্বর্ণপাত্রের রয়
মেটেপাত্রে দিলে কেমন দেখায়

মনপাত্র হলে মেটে কী করবি আর কেঁদেকেটে
আগে করো সেই পাত্রের ঠিকানা ॥

অঙ্কশিক্ষার আগে নাও সদগুরুর দীক্ষা
চেতনগুরুর সঙ্গে করো ভগ্নাংশ শিক্ষা
বীজগণিতে পূর্ণমান তাতে পাবি রক্ষা
মানসাঙ্ক কষতে যেন ভুল করো না ॥

বাংলাশিক্ষা করো মন আগে
ইংরেজিতে মন তোমার রাখো বিভাগে
বাংলা না শিখে ইংরেজিতে মন দিয়ে
লালন করছে পাশের ভাবনা ॥

৫৮০.

কামের ঘরে কপাট মেরে উজানমুখে চালাও রস।
দমের ঘর বন্ধ রেখে যম রাজারে করো বশ ॥

সেই রসে হয় শতধারা জানে সুজন রসিক যাঁরা।
প্রাণ থাকিতে জ্যান্তে মরা জঙ্গলে সে করে বাস ॥

অরুণ বরুণ বায়ু ক্ষিতি এ চাররসে নিষ্ঠারতি
ত্রিসন্ধ্যা বারোমাস ॥

ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়ে রেখো চেতন হয়ে ঠাওরে দেখো।
মন তুমি হুঁশিয়ার থেকো সঙ্গে ইন্দ্রিয় জনা দশ ॥

সিরাজ শাঁই বলে ঘুমকে রাখো শিকেয় তুলে।
লালন তুই ভাবিস কেনে গলে লাগাও প্রেমের ফাঁস ॥

৫৮১.

কারণ নদীর জলে একটা যুগল মীন খেলিছে নীরে।
ঢেউয়ের উপর ফুল ফুটেছে তার উপরে চাঁদ ঝলক মারে ॥

চাঁদচকোর খেলে যখন একটা যুগল মীন মিলন হয় তখন।
তার উপরে শাঁইয়ের দরশন সুধা ভাসে মৃণাল তীরে ॥

শুকনো জমিন জলে ভাসে আজব ধন্য লীলা গঙ্গা আসে।
সে নিরন্তর মীনরূপে ভাসে কুম্ভ ভাসে তীর্থতীরে ॥

সুধাগরল এক সহিত ঝাপা যেমন গুড়ের সঙ্গে মিঠামাখা।
আমি কী ফিকিরে করবো চাখা লালন বলে আমার শিক্ষার তরে ॥

৫৮২.

কারে আজ শুধাবো সে কথা।
কী সাধনে পাবো তারে সে যে আমার জীবনদাতা ॥

শুনতে পাই পাপী-ধার্মিক সবে ইল্লিন সিজ্জিনে যাবে।
তথায় জান সব কয়েদ রবে তবে অটলপ্রাপ্তির কোন ক্ষমতা ॥

ইল্লিন সিজ্জিন দুখসুখের ঠাঁই কোনখানে রেখেছেন শাঁই।
হেথায় কেন সুখদুঃখ পাই কোথাকার ভোগ ভুগি হেথা ॥

যথাকার পাপ তথায় ভুগি শিশু তবে কেন হয় গো রোগী।
লালন বলে বোঝো দেখি কখন হয় শিশুর গুনাহ্ খাতা ॥

৫৮৩.

কারে দেবো দোষ নাহি পরের দোষ মনের দোষে আমি প'লামরে ফ্যারে।
মন যদি বুঝিত লোভের দেশ ছাড়িত লয়ে যেতো আমায় বিরজাপারে ॥

একদিনও ভাবলে না অবোধ মনুরায় ভেবেছো দিন এমনই বুঝি যায়।
অন্তিমকালের কালে কিনা জানি হয় জানা যাবে যেদিন শমনে ধরে ॥

মনের গুণে কেউ হলো মহাজন ব্যাপার করে পেলো অমূল্যরতন।
আমারে ডুবালে ওরে অবোধ মন পারের সম্বল কিছুই না গেলাম করে ॥

কামে চিত্ত হত মনরে আমার সুধা ত্যজে গরল খাই বেশুমার।
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার ভগ্নদশা বুঝি ঘটলো আখেরে ॥

৫৮৪.

কারে বলছো মাগী মাগী।
সে বিনে এড়াতে পারে কোন বা মহৎযোগী ॥

মাগীর দায়ে নন্দের বেটা হয়ে গেলো নটাবটা।
মাগীর দায়ে মুড়িয়ে মাথা হালসে বেহাল যোগী ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু আর নারায়ণে ম'লো মাগীর বোঝা টেনে।
তাই না বুঝে আনলোকেরা বাধাইল ঠকঠকি ॥

ভোলা মহেশ্বর মাগীর দাসী মাগীর দায়ে শিব শ্মশানবাসী।
লালন কয় সে লালন কিসি তোর এতো পদবী ॥

৫৮৫.
কারে বলবো আমার মনের বেদনা।
এমন ব্যথার ব্যথী তো মেলে না ॥

যে দুঃখে আমার মন আছে সদা উচাটন বললে সারে না।
গুরু বিনে আর না দেখি কিনার তাঁরে আমি ভজলাম না ॥

অনাথের নাথ যেজনরে আমার
সে আছে কোন অচিন শহর তাঁরে চিনলাম না।
কী করি কী হয় দিনে দিন যায় কবে পুরাবে মনের বাসনা ॥

অন্যধনের নইরে দুঃখী মন বলে আজ হৃদয়ে রাখি শ্রীরূপখানা।
লালন বলে মোর পাপের নাহি ওড় তাইতে আশা পূর্ণ হলো না ॥

৫৮৬.
কারো রবে না এ ধন জীবন যৌবন তবেরে কেন মন এতো বাসনা।
একবার সবুরের দেশে বয় দেখি দম কসে উঠিস নারে ভেসে পেয়ে যন্ত্রণা

যে করে কালার চরণের আশা জানো নারো মন তার কী দুর্দশা।
ভক্তবলী রাজা ছিলো তারে সবংশে নাশিল
বামনরূপে প্রভু করে ছলনা ॥

কর্ণরাজা ভবে বড় ভক্ত ছিলো অতিথিরূপে পুত্রকে নাশিল।
দেখো কর্ণ অনুরাগী না হইল দুখী
অতিথির মন করে সান্ত্বনা ॥

প্রহলাদ চরিত্র দেখো দৈত্যধামে কতো কষ্ট পেলো এ হরির নামে।
তারে জলে ডুবাইল অগ্নিতে পোড়াইল
তবু না ছাড়িল শ্রীরূপ সাধনা ॥

রামের ভক্ত লক্ষণ ছিলো সর্বকালে শক্তিবান হানিল তাহার বক্ষস্থলে।
শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি লক্ষণ না ভুলিল ভক্তি
ফকির লালন বলে করো এ বিবেচনা ॥

৫৮৭.
কিসে পাবি ত্রাণ সংকটে ঐ নদীর তটে।
গুরুচরণ তারণতরী ধরোরে অকপটে ॥

নদীর মাঝে মাঝে আসে বাণ প্রাণে রাখো ভক্তির
যেন হইও নারে অজ্ঞান রবি বসিলো পাটে ॥

রিপু ছয়টি করো বশ ছাড়ো বৃথা রঙ্গরস।
কাজেতে হইলে অলস পড়ে রবি পারঘাটে ॥

দেহব্যাধির সিদ্ধির পদ্মপত্রে যথা নীর।
জীবন তথা হয় অস্থির কোন সময় কি বা ঘটে ॥

সিরাজ শাঁই বলেরে লালন বৈদিকে ভুলো না মন।
একনিষ্ঠা মন করো সাধন বিকার তোমার যাবে ছুটে ॥

৫৮৮.
কী আজব কলে রসিক বানিয়েছে কোঠা।
শূন্যভরে পোস্তা করে তার উপরে ছাদ আঁটা ॥

অনন্ত কুঠরি স্তরে স্তর চারিদিকে আয়নামহল তার।
হাওয়ার বারাম নাই রূপ দেখা যায় মণিমানিক্যের ছটা ॥

যেদিন রসিক চাঁদ যাবে সরে হাওয়া প্রবেশ হবে না সেই ঘরে
নিভে যাবে রসের বাতি ভেঙে যাবে সবঘটা ॥

দেখিতে বাসনা যার হয় দেলদরিয়ায় ডুবলে দেখা যায়।
লালন বলে সত্যাসত্য কারে আর দেখবি কেঠা ॥

৫৮৯.
কী এক অচিন পাখি পুষলাম খাঁচায়।
হলো না জনমভরে তাঁর পরিচয় ॥

আঁখির কোণে পাখির বাসা দেখতে নারে কী তামাশা।
আমার এ আঁন্ধেলা দশা কে আর ঘুঁচায় ॥

পাখি রাম রহিম বুলি বলে ধরে সে অনন্ত লীলে।
বলো তাঁরে কে চিনিলে বলো গো নিশ্চয় ॥

যারে সাথে সাথ লয়ে ফিরি তারে বা কই চিনিতে পারি।
লালন কয় অধর ধরি কী রূপধ্বজায় ॥

৫৯০.
কী করি ভেবে মরি মনমাঝি ঠাহর দেখিনে।
ব্রহ্মাদি খাচ্ছে খাবি ঐ নদীর পার যাই কেমনে ॥

মাড়ুয়া বাঁদীর এমনই ধারা মাঝদরিয়ায় ডুবিয়ে ভারা।
দেশে যাইতে পড়ি ধরা ঐ নদীর ভাব না জেনে ॥

শক্তিপদে ভক্তিহারা কপটভাবের ভাবুক তারা।
মন আমার তেমনই ধারা ফাঁকে ফেরে রাত্রিদিনে ॥

মাকাল ফলটি রাঙ্গা চোঙ্গা তাই দেখে মন হলি ঘোঙ্গা।
লালন কয় তোলোয়া ডোঙ্গা কখন ঘড়ি ডোবায় তুফানে ॥

৫৯১.
কী মহিমা করলেন শাঁই বোঝা গেলো না।
আমার মনভোলা চাঁদ ছলা করে বাদি আছে ছয়জনা ॥

যতোশত মনে করি ভাবদেলেতে ঘুরে মরি।
কোথায় রইলে দয়াল বারি ফিরে কেন চাইলে না ॥

করে তোর চরণের আশা ঘটালো আমার এ দুর্দশা।
সার হলো কেবল যাওয়াআসা কিনার তো আর পেলাম না ॥

জনম গেলো দেশে দেশে ভজনসাধন হবে কিসে।
লালন তাই ভাবছে বসে ভবে হলো যাতনা ॥

৫৯২.
কী রূপসাধনের বলে অধর মানুষ ধরা যায়।
নিগূঢ়সন্ধান জেনে শুনে সাধন করতে হয় ॥

পঞ্চতত্ত্বসাধন করে পেতো যদি সে চাঁদেরে।
তবে বৈরাগীরা কেনে আঁচলা গুদরী টানে
কুলের বাহির হয় তারা চরণবাঞ্ছায় ॥

বৈষ্ণবের সাধন ভালো তাতে বুঝি ভক্তি ছিলো।
ব্রহ্মজ্ঞানী যাঁরা সদাই ভাবে তাঁরা
শাক্ত বৈষ্ণবের নাই স্বয়ং পরিচয় ॥

শুনে ব্রহ্মজ্ঞানীর বাক্য দরবেশে করে ঐক্য।
বস্তুজ্ঞান যার নাই নামব্রহ্ম কী পায়
লালন বলে দরবেশ এ কী কথা কয় ॥

৫৯৩.
কী শোভা দ্বিদল 'পরে।
রস মণিমাণিক্যের রূপ ঝলক মারে ॥

অবিম্বু গন্মুতে অনিত্য গোলোক বিরাজ করে তাহে পূর্ণব্রহ্মলোক।
হলে দ্বিদল নির্ণয় সব জানা যায় অসাধ্য থাকে না সাধনদ্বারে ॥

শতদল সহস্রদল রসরতি রূপে করে চলাচল।
দ্বিদলে স্থিতি বিদ্যুত আকৃতি ষোড়দলে বারাম যোগান্তরে ॥

ষোড়দলে সে তো ষড়তত্ত্ব হয় দশমদলের মৃণালগতি গঙ্গাময়।
ত্রিধারা তার ত্রিগুণ বিচার লালন বলে গুরু অনুসারে ॥

৫৯৪.
কী সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।
আধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে ॥

যেতে পথে কামনদীতে পাড়ি দিতে ত্রিবিনে।
কতো ধনীর ভারা যাচ্ছে মারা পড়ে নদীর তোড়তুফানে ॥

রসিক যাঁরা চতুর তাঁরা তাঁরাই নদীর ধারা চেনে।
উজান তরী যাচ্ছে বেয়ে তাঁরাই স্বরূপসাধন জানে ॥

শতদল কমলের উপরে মূল রয়েছে গোপনে।
মনের মানুষ স্থলে রেখে দেখতে পাইনে দুই নয়নে ॥

লালন বলে ম'লাম জ্বলে জলে স্থলে নিশিদিনে।
মণিহারা ফণির মতন হারা হলাম পিতৃধনে ॥

৫৯৫.
কী সাধনে আমি পাই গো তাঁরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ধ্যানে পায় না যারে ॥

শূন্য শিখর যার নির্জন গুহা স্বরূপে সেই তো চন্দ্রের আভা।
সে আভা ধরতে চাই হাতে নাহি পাই কেমনে সে রূপ যায় গো সরে

জানে শাস্ত্র ভাল কেহ কেহ পঞ্চতাত্ত্বিক হলে জানতে পায় সেহ।
পঞ্চতত্ত্বের ঘর সেও তো অন্ধকার নিরপেক্ষ সে হয় বিচারে ॥

গুরুপদে আজ হইত মরণ তবে বুঝি সফল হইত জীবন।
ভেবে বলে অধীন লালন আমার ভাগ্যে তা ঘটলো নারে ॥

৫৯৬.
কুলের বউ ছিলাম বাড়ি বাহির হলাম ন্যাড়ি ন্যাড়ার সাথে।
কুলের আচার কুলের বিচার আর কি ভুলি সেই ভোলাতে ॥

ভাবের ন্যাড়ি ভাবের ন্যাড়া কুল নাশালাম জগত জোড়া।
করণ তার উল্টো দাঁড়া বিধির ফাঁড়া কাটবে যাতে ॥

ভাবের ন্যাড়া ভাবের ন্যাড়ি পরনে পরেছি ধরি।
দেবো না আর আচার কড়ি বেড়াবো চৈতন্যপথে ॥

আসতে ন্যাড়া যেতে ন্যাড়া দুদিন কেবল মোড়া জোড়া।
লালন কয় আগাগোড়া জেনে মাথা হয় মুড়াতে ॥

৫৯৭.
কে আমায় পাঠালে এহি ভাবনগরে।
মনের আঁধার হরা চাঁদ সেই দয়াল চাঁদ আর কতোদিনে দেখবো তাঁরে ॥

কে দেবেরে উপাসনা করিরে আজ কী সাধনা।
কাশীতে যাই কী মক্কা থাকি আমি কোথা গেলে পাবো সে চাঁদেরে ॥

ঘর ছেড়ে বনে খোঁজা যে পথে তাঁর আসাযাওয়া।
সে পথের হয় কোন ঠিকানা কে জানাবে আজ আমারে ॥

মনফুলে পূজিব কী নামব্রহ্ম রসনায় জপি।
কিসে দয়া তাঁর হবে পাপীর উপর অধীন লালন বলে তাইতে প'লাম ফেরে ॥

৫৯৮.
কে কথা কয়রে দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে খুঁজলে জনম ভর মেলে না ॥

খুঁজি যারে আসমানজমি আমারে চিনিনে আমি।
এ বিষম ভ্রমে ভ্রমি আমি কোনজন সে কোনজনা ॥

রাম রহিম বলেছে যে জন ক্ষিতি জল কি বায়ু হুতাশন।
শুধালে তার অন্বেষণ মূর্খ বলে কেউ বলে না ॥

হাতের কাছে হয় না খবর কী দেখতে যাও দিল্লি লাহোর।
সিরাজ সাঁই কয় লালনরে তোর সদাই মনের ঘোর গেলো না ॥

৫৯৯.
কে গো জানবে তাঁরে সামান্যেরে।
আজব মীনরূপে সাঁই খেলছে নীরে ॥

জগত জোড়া মীন অবতার কারণ্য বারির মাঝার।
মনে বুঝে কালাকাল বাঁধিলে বাঁধাল অনায়াসে সে মীন ধরতে পারে ॥

আজব লীলা মানুষগঙ্গায় আলোর উপর জলময়।
যেদিন শুকাবে জল হবে সব বিফল সে মীন পালাবে অমনি শূন্যভরে ॥

মানুষগঙ্গা গভীর অথৈ থৈ দিলে তায় রসিক ভাই।
সিরাজ শাঁইর চরণ কহিছে লালন চুবনি খেলাম নেমে সেই কিনারে ॥

৬০০.
কে তোমারে এ বেশভূষণ পরাইল বলো শুনি।
জিন্দাদেহে মূর্দার বসন খিরকা তাজ আর ডোর কোপিনী ॥

জ্যান্তে মরার পোশাক পরা আপন সুরত আপনি সারা।
ভবলোভকে ধ্বংস করা এহি তো অসম্ভব করণই ॥

মরণের যে আগে মরে শমনে ছোঁবে না তাঁরে।
শুনেছি তাই সাধুর দ্বারে তাই বুঝি করেছো ধনী ॥

সেজেছো সাজ ভালোই তোরো মরে যদি বাঁচতে পারো।
লালন বলে যদি ফেরো দুকূল হবে অপমানী ॥

৬০১.
কে তোর মালেক চিনলি নারে।
মন কি এমন জনম আর হবেরে ॥

দেবের দুর্লভ এবার মানবজনম তোমার।
এমন জনমের আচার করলি কিরে ॥

নিঃশ্বাসের নাইরে বিশ্বাস পলকেতে করে নিরাশ।
তখন মনে রবে মনের আশ বলবি কারে ॥

এখনও শ্বাস আছে বজায় যা করোরে ভাই সিদ্ধি হয়।
সিরাজ শাঁই তাই বারে বার কয় লালনরে ॥

৬০২.
কে পারে মকরউল্লার মকর বুঝিতে।
আহাদে আহ্‌মদ নাম হয় জগতে ॥

আহ্‌মদ নামে খোদায় মিম হরফ নফি কেন কয়।
মিম উঠায়ে দেখো সবাই কী হয় তাতে ॥

আকারে হয়ে জুদা খোদে সে বলে খোদা।
দিব্যজ্ঞানী নইলে কি তা পায় জানিতে ॥

এখলাস সুরাতে তাঁর ইশারায় আছে বিচার।
লালন বলে দেখ না এবার দিন থাকিতে ॥

৬০৩.
কে বানালো এমন রঙমহলখানা।
হাওয়া দমে দেখো তারে আসল বেনা ॥

বিনা তেলে জ্বলে বাতি দেখতে যেমন মুক্তামতি।
ঝলক দেয় তার চুতুর্ভিতি মধ্যে খানা ॥

তিল পরিমাণ জায়গা সে যে হদ্দরূপ তাহার মাঝে।
কালায় শোনে আন্ধেলায় দেখে নেংড়ার নাচনা ॥

যে গঠিল এ রঙমহল না জানি তাঁর রূপটি কেমন।
সিরাজ সাঁই কয় নাইরে লালন তাঁর তুলনা ॥

৬০৪.
কে বুঝিতে পারে শাঁইয়ের কুদরতি।
অগাধ জলের মাঝে জ্বলছে বাতি ॥

বিনা কাষ্ঠে অনল জ্বলে জল রয়েছে বিনা স্থলে।
আখের হবে জলানলে প্রলয় অতি ॥

অনলে জল উষ্ণ হয় না জলে সে অনল নেভে না।
এমনই সে কুদরত কারখানা দিবারাতি ॥

যেদিন জলে ছাড়বে হুংকার নিভে যাবে আগুনের ঘর।
লালন বলে সেইদিন বান্দার কী হবে গতি ॥

৬০৫.
কে বোঝে তোমার অপারলীলে।
আপনি আল্লাহ্ ডাকো আল্লাহ্ বলে ॥

নিরাকারের তরে তুমি নূরী ছিলে ডিম্ব অবতারী।
সাকারে সৃজন গঠলে ত্রিভুবন আকারে চমৎকার ভাব দেখালে ॥

নিরাকারে নিগম ধ্বনি সেও সত্য সবাই জানি।
তুমি আগমের ফুল নিগমে রসুল আদমের ধড়ে জান হইলে ॥

আত্মতত্ত্ব জানে যাঁরা শাঁইর নিগূঢ় লীলা দেখছে তাঁরা।
তুমি নীরে নিরঞ্জন অকৈতব ধন লালন খুঁজে বেড়ায় বনজঙ্গলে ॥

৬০৬.

কে বোঝে শাঁইয়ের লীলাখেলা।
সে আপনি গুরু আপনি চেলা॥

সপ্ততলার উপরে সে নিঃরূপে রয় অচিন দেশে।
প্রকাশ্য রূপলীলারস চেনা যায় না বেদের ঘোলা॥

অঙ্গের অবয়বে সবে সৃষ্টি করলেন পরম ইষ্টি।
তবে কেন আকার নাস্তি বলি না জেনে সে ভেদ নিরালা॥

যদি কেউ হয় চক্ষুদান সেই দেখে সে রূপ বর্তমান।
লালন বলে তাঁর ধ্যানজ্ঞান হবে দেখিয়ে সব পুঁথিপালা॥

৬০৭.

কে ভাসায় ফুল প্রেমের ঘাটে।
অপার মহিমা তাঁর সে ফুলের বটে॥

যাতে জগতের গঠন সে ফুলের হয় না যতন।
বারে বারে তাইতে ভ্রমণ ভবের হাটে॥

মাসান্তে ফোটে সে ফুল কোথা বৃক্ষ কোথায়রে মূল।
জানিলে তাহারই উল ঘোর যায় ছুটে॥

গুরুকৃপা যার হইল ফুলের মূল সেই চিনিল।
লালন আজ ফ্যারে প'লো ভক্তি চটে॥

৬০৮.

কেন খুঁজিস মনের মানুষ বনে সদাই।
এবার নিজ আত্ম রূপ যে আছে দেখো সেই রূপ দীন দয়াময়

কারে বলি জীবাত্মা কারে বলি স্বয়ং কর্তা।
আবার দেখি ছটা চোখে ভেল্কি লেগে মানুষ হারায়॥

বলবো কী তাঁর আজব খেলা আপনি গুরু আপনি চেলা।
পড়ে ভূত ভুবনের পণ্ডিত যে জন আত্মতত্ত্বের প্রবর্ত নয়॥

পরমাত্মাকে রূপ ধরে জীবাত্মাকে হরণ করে।
লোকে বলে যায়রে নিদ্রে সে যে অভেদব্রহ্ম ভেবে লালন কয়

৬০৯.

কেন ভ্রান্ত হওরে আমার মন।
ত্রিবেণী নদীর করো অন্বেষণ॥

নদীতে বিনা মেঘে বাণ বরিষণ হয়
বিনা বায়ে হামাল উঠে মৌজা ভেসে যায়
নদীর হিল্লোলে মরি হায় না জানি গতি কেমন ॥

নদীর ক্ষণে ক্ষণে হয়রে উৎপত্তি
কালিন্দে গঙ্গা নদী প্রবল বেগবতী
কেউ হেলায় পার হয়ে যায় কারো শুকনা ডাঙ্গায় হয়রে মরণ ॥

নদীতে মাঝে মাঝে উঠছেরে ফেপি
তাতে পড়লে কুটো হয়রে দুটো এতোই বেগবতী
অধীন লালন বলে ও অবোধ মন নদীর কূলে গিয়ে লও স্মরণ ॥

৬১০.
কোথায় আনিলে আমায় পথ ভুলালে।
দুরন্ত তরঙ্গে তরীখানি ডুবালে ॥

তরী নাহি দেখি আর চারিদিকে শূন্যকার।
প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘূর্ণিপাকের জলে ॥

কোথায় রইলে মাতাপিতা কে করে স্নেহ মমতা।
আমার মুর্শিদ রইলো কোথা দয়া করো বন্ধু সকলে ॥

অধীন লালন কয় কাতরে পড়ে ম'লাম তীরধারে।
কে দেবে আমায় সন্ধান করে সুপথগামী রাস্তা খুলে ॥

৬১১.
কোন কলে নানা ছবি নাচ করে সদাই।
কোন কলে হয় নানাবিধ আওয়াজ উদয় ॥

কলমা পড়ি কল চিনিনে যে কলে ঐ কলমা চলে।
উপর উপর বেড়াও ঘুরে গভীরে ডুবল না হৃদয় ॥

কলের পাখি কলের চুয়া কলের মোহর গিরে দেওয়া।
কল ছুটিলে যাবে হাওয়া পড়ে রবে কে কোথায় ॥

আপনদেহের কল না টুঁড়ে বিভোর হলে কলমা পড়ে।
লালন বলে মুর্শিদ ছেড়ে কে পেয়েছে খোদায় ॥

৬১২.
কোন সুখে শাঁই করে খেলা এই ভবে।
আপনি বাজায় আপনি বাজেন আপনি মজেন সেই রবে ॥

নামটি তাঁর লা শরিকালা সবার শরিক সেই একেলা।
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা আপনি খাবি খায় ডুবে ॥

ত্রিজগতে যে রাই রাঙা তাঁর দেখি ঘরখানি ভাঙ্গা।
হায় কী মজা আজব রঙ্গা দেখায় ধনী কোনভাবে ॥

আপনি চোর সে আপনি বাড়ি আপনি পরে আপন বেড়ি।
লালন বলে এই নাচারি কইনে থাকি চুপচাপে ॥

৬১৩.
কোনদিন সূর্যের অমাবস্যে।
দেখি চাঁদের অমাবস্যে হয় মাসে মাসে ॥

আকাশে পাতালে শুনবো না দেহরতির চাই উপাসনা।
কোন পথে কখন করে আগমন চাঁদচকোর খেলে কখন এসে ॥

বারোমাসে ফোটে চব্বিশ ফুল জানতে হবে কোন্ ফুলে কার মূল।
আন্দাজি সাধন করো নারে মন মূল ভুললে ফল পাবি কীসে ॥

যে করে সেই আসমানি কারবার না জানি তাঁর কোথায় বাড়িঘর।
যদি চেতনমানুষ পাই তাঁহারে শুধাই লালন বলে মিলবে মনের দিশে ॥

৬১৪.
কোন রসে কোন রতির খেলা।
জানতে হয় এই বেলা ॥

সাড়ে তিন রতি বটে লেখা যায় শাস্ত্র পাটে
সাধকের মূল তিনরস ঘটে তিনশো ষাট রসের বালা।
জানিলে সেই রসের মর্ম রসিক তারে যায় বলা ॥

তিন রস সাড়ে তিনরতি বিভাগে করে স্থিতি
গুরু ঠাঁই জেনে পতি সাধন করে নিরালা।
তার মানবজনম সফল হবে এড়াবে শমনজ্বালা ॥

রসরতির নাই বিচক্ষণ আন্দাজি করি সাধন
কিসে হয় প্রাপ্তি সে ধন ঘোচে না মনের ঘোলা।
আমি উজানে কি ভেটেনে পড়ি ত্রিবেণীর ত্রিনালা ॥

শুদ্ধ প্রেমরসিক হলে সেই রতি উজানে চলে
ভিয়ানে সিদ্ধি ফলে অমৃত মিছরি উলা।
লালন বলে আমার কেবল শুধুই জল তোলাফেলা ॥

৬১৫.
কোন রাগে কোন মানুষ আছে মহারসের ধনী।
পদ্মে মধু চন্দ্রে সুধা যোগায় রাত্রদিনই ॥

সিদ্ধি সাধক প্রবর্তগুণ তিনরাগ ধরে আছে তিনজন।
এই তিন ছাড়া রাগ নিরূপণ জানলে হয় ভাবিনী ॥

মৃণালগতি রসের খেলা নবঘাট নবঘাটেলা।
দশমযোগে বারিগোলা যোগেশ্বর অযোনি ॥

সিরাজ শাঁইর আদেশে লালন বলছে বাণী শোনরে এখন।
ঘুরতে হবে নাগরদোলন না জেনে মূলবাণী ॥

৬১৬.
কোন সাধনে তাঁরে পাই।
আমার জীবনেরই জীবন শাঁই ॥

শাক্ত শৈব বৈরাগ্য ভাব তাতে যদি হয় চরণ লাভ।
তবে কেন দয়াময় সদা সর্বদাই বৈধিভক্তি বলে দুষিলেন তাই ॥

সাধিলে সিদ্ধির ঘরে আবার শুনি পায় না তাঁরে।
সাযুজ্যের মুক্তি পেলেও সে ব্যক্তি আবার শুনি ঠকে যাবে ভাই ॥

গেলো না মোর মনের ভ্রান্ত পেলাম না তার ভাবের অন্ত।
বলে মূঢ় লালন ভবে এসে মন কী করিতে যেন কী করে যাই ॥

৬১৭.
কোন সাধনে পাই গো তাঁরে।
মন অহর্নিশি চায় গো যাঁরে ॥

দান যজ্ঞ স্তব ব্রত তাতে গুরু হয় না রত।
সাধুশাস্ত্রে কয় সদা তো কোনটি জানি সত্য করে ॥

পঞ্চ প্রকার মুক্তিবিধি অষ্টাদশ প্রকারে সিদ্ধি;
এই সকল হেতুভক্তি তাতে বশ নয় শাঁইজি মোরে ॥

ঠিক পড়ে না প্রবর্তের ঘর সাধন সিদ্ধি হয় কী প্রকার।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমার নজর হয় না কোলের ঘোরে ॥

৬১৮.
কোন সাধনে শমনজ্বালা যায়।
ধর্মাধর্ম বেদের মর্ম শমনের অধিকার রয় ॥

দান যজ্ঞ স্তব ব্রত করে পূণ্যফল সে পেতে পারে।
সে ফল ফুরায়ে গেলে আবার ঘুরতে ফিরতে হয় ॥

নির্বাণ মুক্তি সেধে সে তো লয় হবে পশুর মতো।
সাধন করে এমন তত্ত্ব মুখে কেবা সাধতে চায় ॥

পথের গোলমালে পড়ে মূল হারালাম নদীর জলে।
লালন বলে কেশে ধরে লাগাও গুরু কিনারায় ॥

৬১৯.
খাকি আদমের ভেদ সে ভেদ পশু কী বোঝে।
আদমের কলবে খোদা খোদ বিরাজে ॥

আদম শরীর আমার ভাষায় বলেছেন অধর শাঁই নিজে।
নইলে কী আদমকে সেজদা ফেরেস্তায় সাজে ॥

শুনি আজাজিল খাস তন খাকে আদমতন গঠন গঠেছে।
সেই আজাজিল শয়তান হলো আদম না ভজে ॥

আব আতস খাক বাত ঘর গঠলেন জান মালেক মোক্তার কোন চিজে
লালন বলে এ ভেদ জানলে সব জানে সে যে ॥

৬২০.
খাকে গঠিল পিঞ্জরে এ সুখপাখি আমার কিসে গঠেছেরে।
পাখি পুষলাম চিরকাল নীল কিংবা লাল
একদিনও দেখলাম না সে রূপ সামনে ধরে ॥

আবে খাকে পিঞ্জরায় বর্ত আতশে হইল পোক্ত পবন আড়া সেই ঘরে।
আছে সুখপাখি সেথায় প্রেমের শিকল পায়
আজব খেল খেলছে গুরু গোঁসাই মেরে ॥

কেমনরে পিঞ্জিরার ধ্বজা নিচে উপর নয় দরজা কুঠরিকোঠা থরে থরে।
পঞ্চকুঠুরি তার আছে মূলাধার মূলাধারের মূল শূন্যভরে ॥

করে আজব কারিগরি বসে আছে ভাবমিস্ত্রি সেই পিঞ্জিরার বাইরে।
পাখির আসাযাওয়ার দ্বার আছে সন্ধির উপর
ফকির লালন বলে কেউ কেউ জানতে পারে ॥

৬২১.
খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসেযায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায় ॥

আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা।
তার উপরে সদর কোঠা আয়না মহল তায় ॥

কপালের ফের নইলে কি আর পাখিটির এমন ব্যবহার।
খাঁচা ছেড়ে পাখি আমার কোনখানে পালায় ॥

মন তুই রইলি খাঁচার আশে খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশে।
কোনদিন খাঁচা পড়ব ধসে লালন ফকির কেঁদে কয় ॥

৬২২.
খুঁজে ধন পাই কী মতে পরের হাতে ঘরের কলকাঠি।
আবার শতেক তালা আটা ঘরের মালকুঠি ॥

শব্দের ঘর নিঃশব্দের কুড়ে সদাই তারা আছে জুড়ে।
দিয়ে জীবের নজরে ঘোর টাঁটি ॥

আপন ঘরে পরের কারবার দেখলাম নারে তাঁর বাড়িঘর।
আমি বেহুঁশ মুটে বা কার মোট খাটি ॥

থাকতে রতন আপন ঘরে এ কী বেহাত আজ আমারে।
লালন বলে মিছে মনরে এ ঘরবাটি ॥

৬২৩.
খেলছে মানুষ নীরে ক্ষীরে।
আপন আপন ঘর খোঁজো মন আমার কেন হাতড়ে বেড়াও কোলের ঘোরে ॥

নীরনদীর গভীরে ডোবা কঠিন হয় ডুবলে পরে কতো আজব দেখা যায়।
সেই নীরভাণ্ড পুরা ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড বলতে আমার নয়ন ঝরে ॥

শূন্যদেশে মেঘের উদয় নিরোদ বিন্দু বারি বরিষণ হয়।
তাতে ফলছে ফল রঙ বেরঙের হল আজব কুদরতি কল ভাবের ঘরে ॥

ইন্দ্রিয়ডঙ্কা নাই সে রাজ্যে সহজ মানুষ ফেরে সহজে।
সিরাজ শাঁইয়ের বচন মিথ্যে নয় লালন ডুব দিয়ে দেখ স্বরূপ দ্বারে ॥

৬২৪.
গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার লও গো সুপথে
তোমার দয়া বিনে চরণ সাধিব কী মতে।

তুমি যারে হও গো সদয় সে তোমারে সাধনে পায়।
দেহের বিবাদীগণ সব বশে রয় তোমার কৃপাতে ॥

যন্তরে যন্তরি যেমন যে বোল বাজাও বাজে তেমন।
তেমনই যন্তর হও আমার মন বোল তোমার হাতে ॥

জগাই মাধাই দস্যু ছিলো তারে প্রভুর দয়া হলো।
লালন পথে পড়ে রইলো ঐ আশাতে ॥

৬২৫.
গুরুপদে মতি আমার কই হলো।
আজ হবে কাল হবে বলে কথায় কথায় দিন গেলো ॥

ইন্দ্রিয়াদি সব বিবাদী সদাই বাঁধায় কলহ।
তারা কেউ শোনে না কারো কথা উপায় কী করি বলো ॥

যে রূপ দেখি তাইতে আঁখি হয়ে যায় মন বেভুলো।
দীপের আলো দেখে যেমন পতঙ্গ পুড়ে ম'লো ॥

কী করিতে এলাম ভবে কী করে জনম গেলো।
লালন বলে যজ্ঞের ঘৃত সকলই কুত্তায় খেলো ॥

৬২৬.
গুরু বিনে সন্ধান কে জানে।
সে ভেদ জাহের নয় তা বার্তেনে ॥

সুধার কথা লোকে বলছে সুধা আছে গুরুর কাছে জান গে উদ্দিশে।
সুধানিধি দেখতে পাবি ভক্তি দাও ঐ চরণে ॥

বারো মাসে তেরো তিথি সে সে চাঁদে নাই অমাবস্যে ভজনে স্থিত সে।
মাসে মাসে জোয়ার আসে চন্দ্র উদয় সেইখানে ॥

রোহিনীর চাঁদ কপালেতে রয় নীলপদ্মে কৃষ্ণের আসন হয় বসে সেবা নেয়।
লালন ভনে ভরা গাঙ্গে আত্মতত্ত্ব নাই মনে ॥

৬২৭.
গুরুর দয়া যারে হয় সে ই জানে।
যে রূপে শাঁই বিরাজ করে দেহভুবনে ॥

শহরে সহস্র পাড়া তিন গলি তার এক মহড়া।
আলক সওয়ার পবনঘোড়া ফিরছে সেইখানে ॥

জলের বিম্ব আলের উপর অখণ্ড বলয়ের মাঝার।
যাঁর বিন্দুতে হয় সিন্ধু তাঁহার ধারা বয় ত্রিগুণে ॥

হাতের কাছে আলক শহর রঙবেরঙের উঠছে লহর।
সিরাজ শাঁই কয় লালনরে তোর সদাই ঘোর মনে ॥

৬২৮.
গুরু রূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে।
কিসের একটা ভজনসাধন লোক জানাতে করে ॥

বকের ধরনকরণ তার তো নয় দিকছাড়া রূপনিরিখ সদাই।
পলকভরে ভবপারে যায় সেই নিরিখ ধরে ॥

জ্যান্তে গুরু না পেলে হেথা ম'লে পাবো সে কথার কথা।
সাধকজনে বর্তমানে দেখে ভজে তাঁরে ॥

গুরুভক্তির তুলনা দেবো কী যে ভক্তিতে শাঁই থাকে রাজি।
লালন বলে গুরুরূপে নিরূপমানুষ ফেরে ॥

৬২৯.
গুরুশিষ্য হয় যদি একতার।
শমন বলে ভয় কীরে আর ॥

গঙ্গার জল গেঁড়োয় থাকলে সে জল কি ফুরায় সেচলে।
অমনি তারে তার মিশালে হয় অমর ॥

শুনি সুজল ধরে মেশার লক্ষণ কল্পিতে হয় তাঁর অন্বেষণ।
মনরে ভুলো না সাধন এবার ॥

মেশার সন্ধান জেনে মেশো গে ত্বরায় বরখাস্ত হোক শমন রায়
অধীন লালন বলে তা কি হায় ঘটবে আমার ॥

৬৩০.
গুরু সুভাব দাও আমার মনে।
তোমার চরণ যেন ভুলিনে ॥

তুমি নিদয় যার প্রতি সদাই তার ঘটে কুমতি।
তুমি মনোরথের সারথি যথা লও যাই সেখানে ॥

গুরু তুমি মনের মন্ত্রী গুরু তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী।
গুরু তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী না বাজাও বাজবে কেনে ॥

জন্মান্ধ আমার নয়ন তুমি বৈদ্য সচেতন।
অতিবিনয় করে বলে লালন জ্ঞানাঞ্জন দাও মোর মোর নয়নে ॥

৬৩১.

গোপনে রয়েছে খোদা তারে চিনোনি।
কাম গোপন প্রেম গোপন লীলা গোপন নিত্য গোপন
দেহেতে তোর মক্কা গোপন তাও হইল জানাজানি ॥

আহাদে আহ্‌মদ গোপন মিমে দেখো নূর গোপন।
নামাজে হয় মারফত গোপন তাও আবার জানো নি ॥

আছে আরশ কুরসি লহু কালাম গোপন তাই বলে ফকির লালন।
উপরে আল্লাহ্ গোপন পীরের নিশানি ॥

৬৩২.

গোসাঁইয়ের ভাব যেহি ধারা আছে সাধুশাস্ত্রে তাঁর প্রমাণধারা
শুনলেরে জীবন অমনি হয় সারা।
যে মরার সঙ্গে ভাবে মরে রূপসাগরে ডুবতে পারে সুভাবুক তাঁরা ॥

দুগ্ধে ননীতে মিশালো সর্বদা মৈথুনদণ্ডে করে আলাদা।
মনরে তেমনই ভাবের ভাবে সুধানিধি পাবে
মুখের কথায় নয়রে সে ভাব করা ॥

অগ্নি যৈছে ঢাকা ভস্মের ভিতরে, সুধা তেমনই আছে গরলে হল করে।
কেউ সুধার লোভে যেয়ে মরে গরল খেয়ে
মন্থনের সুতাক না জানে তারা ॥

যে স্তনেতে দুগ্ধ খায়রে শিশুছেলে জোঁকের মুখে তথায় রক্ত এসে মেলে।
অধীন লালন ফকির বলে বিচার করিলে
কুরসে সুরস মেলে সে ধারা ॥

৬৩৩.

ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিব সে ধন দেখবো চোখেতে ॥

আপন ঘরে বোঝাই সোনা পরে করে লেনাদেনা।
আমি হলাম জন্মকানা না পাই দেখিতে ॥

রাজি হলে দারোয়ানি দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি।
তাঁরে বা কই চিনি জানি বেড়াই কুপথে ॥

এই মানুষে আছেরে মন যাঁরে বলে মানুষরতন।
লালন বলে পেয়ে সে ধন না পাই চিনিতে ॥

৬৩৪.
ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছেন মনমোহিনী মনোহরা।
ঘরের আট কুঠুরি নয় দরজা আঠারো মোকাম চৌদ্দ পোয়া
দুই খুঁটিতে পাড়া সুসারা ॥

ঘরের বায়ান্ন বাজার তেপান্ন গলি কোন মোকামের কোথা চলি
ঐ বাজারে বেচাকেনা করে মনোচোরা ॥

ঘরের মটকাতে আছে নামটি তার অধরা।
ফকির লালন বলে ঐ রূপ নিহারি অনুরাগী যারা ॥

৬৩৫.
চাতক বাঁচে কেমনে।
শুদ্ধ মেঘের বরিষণ বিনে ॥

কোথায় হে নবজলধর চাতকিনী ম'লো এবার।
ও নামে কলঙ্ক তোমার বুঝি হলো ভুবনে ॥

তুমি দাতা শিরোমণি আমি চাতক অভাগিনী।
তোমা বৈ অন্য না জানি রেখো স্মরণে ॥

চাতক ম'লে যাবে জানা ও নামের গৌরব রবে না।
জল দিয়ে করো সান্ত্বনা আবোধ লালনে ॥

৬৩৬.
চাতক স্বভাব না হলে।
অমৃত মেঘেরই বারি শুধু কথায় কি মেলে ॥

মেঘে কতো দেয়রে ফাঁকি তবু চাতক মেঘের ভোগী।
অমনি নিরিখ রাখলে আঁখি তাঁরে সাধক বলে ॥

চাতক পাখির এমনই ধারা তৃষ্ণাতে প্রাণ যায়রে মারা।
অন্যবারি খায় না তারা মেঘের জল না হলে ॥

মন হয়েছে পবনগতি উড়ে বেড়ায় দিবারাতি।
লালন বলে গুরুর প্রতি মন রয় না সুহালে ॥

৬৩৭.
চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা।
কেমন করে সে চাঁদ দেখবি গো তোরা ॥

লক্ষ লক্ষ চাঁদে করিছে শোভা
তার মাঝে অধর চাঁদের আভা ॥

রূপের গাছে চাঁদফল ধরেছে তাই
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায় ॥

সে চাঁদের বাজার দেখে
চাঁদ ঘুরানি লেগে দেখিস্ যেন হোস্ নে জ্ঞানহারা ॥

একবার দৃষ্টি করে দেখি
ঠিক থাকে না আঁখি রূপের কিরণে চমক পারা ॥

আলক নামে শহর আজব কুদরতি
রাতে উদয় ভানু দিবসে বাতি
যেজন আলের খবর জানে দৃষ্ট হয় নয়নে
লালন বলে সে চাঁদ দেখেছে তাঁরা ॥

৬৩৮.

চাঁদধরা ফাঁদ জানো নারে মন।
লেহাজ নাই তোমার নাচানাচি সার একবারে লাফ দিয়ে ধরতে চাও গগন ॥

সামান্যে রূপের মর্ম পাবে কে কেবল প্রেমরসের রসিক সে।
সে প্রেম কেমন করো নিরূপণ প্রেমের সন্ধি জেনে থাকো চেতন ॥

ভক্তিপাত্র আগে করোরে নির্ণয় মুক্তিদাতা এসে তাতে বারাম দেয়।
নইলে হবে না প্রেম উপাসনা মিছে জল সেচিয়ে হবে মরণ ॥

মুক্তিদাতা আছে নয়নের অজান ভক্তিপাত্র সিঁড়ি দেখো বর্তমান।
মুখে গুরু গুরু বলো সিঁড়ি ধরে চলো সিঁড়ি ছাড়লে ফাঁকে পড়বি লালন ॥

৬৩৯.

চাঁদে চাঁদে চন্দ্রগ্রহণ হয়।
সে চাঁদের উদ্দেশ পায় না রসিক মহাশয় ॥

চাঁদের রাহু চাঁদেরই গ্রহণ সে বড়ো করণকারণ।
বেদ পড়ে তার ভেদ অন্বেষণ পাবে কোথায় ॥

রবি শশী বিমুখ থাকে মাসান্তে সুদৃষ্টি দেখে।
মহাযোগ সেই গ্রহণযোগে আমার বলতে লাগে ভয় ॥

কখনো রাহুরূপ ধরে কোন চাঁদে কোন চন্দ্র ঘেরে।
ফকির লালন কয় সেই স্বরূপ দ্বারে দেখলে দেখা যায় ॥

৬৪০.
চারটি চন্দ্র ভাবের ভুবনে।
তার দুটি চন্দ্র প্রকাশ্য হয় তাই জানে অনেক জনে ॥

যে জানে সে চাঁদের ভেদকথা বলবো কী তাঁর ভক্তির ক্ষমতা।
চাঁদ ধরে পায় অন্বেষণ সে চাঁদ না পায় গুণে ॥

এক চন্দ্রে চারচন্দ্র মিশে রয় ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন রূপ হয়।
মণিকোঠার খবর জানলে সকল খবর সেই জানে ॥

ধরতে চায় মূলচন্দ্র কোনজন গরলচন্দ্রের করো নিরূপণ।
সিরাজ শাঁই কয় দেখরে লালন বিষামৃত মিলনে ॥

৬৪১.
চিনবে তাঁরে এমন আছে কোন ধনী।
নয় সে আকার নয় নিরাকার নয় ঘরখানি ॥

বেদ আগমে জানা গেলো ব্রহ্মা যারে ঢুঁড়ে হদ্দ হলো।
জীবের কী সাধ্য বলো তাঁরে চিনি ॥

কতো কতো মুনিজনা করেরে যোগসাধনা।
লীলার অন্ত কেউ পেলো না লীলা এমনই ॥

সবে বলে কিঞ্চিৎ ধ্যানী গণ্য সে হন শূলপাণি।
লালন বলে কবে আমি হবো তেমনই ॥

৬৪২.
চিনি হওয়া মজা কী খাওয়া মজা।
দেখ দেখি মন কোনটি মজা ॥

সাষ্টি সারূপ্য সামীপ্য শান্তি সালোক্য সাযুজ্য মুক্তি আদি
বলছে যারা এসব মুক্তি।
যদি এবার পাই মুক্তি কী সে যোগ কী সে যুক্তি তারা হয়ে রয় যমের প্রজা ॥

নির্বান মুক্তি সেধে সে তো জানা যায় সে চিনিমতো মুক্তি কি চিনি খাওয়া।
চিনিতে চিনি খায় তাতে কী জানা যায় সুখদুঃখ বোঝা ॥

সমঝে ভবে করো সাধন যাতে মেলে গুরুর চরণ অটলধ্বজা।
সিরাজ শাঁই কয় কারণ শোনরে অবোধ লালন ছাড়ো জলসেচা ॥

৬৪৩.
চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি।
ভেদ পরিচয় দেয় না আমায় ঐ খেদে ঝরে আঁখি ॥

পাখি বুলি বলে শুনতে পাই রূপ কেমন দেখিনে ভাই এও বিষম ঘোর দেখি।
চিনাল পেলে চিনে নিতাম যেতো মনের ধুক্‌ধুকি ॥

পোষা পাখি চিনলাম না এ লজ্জা তো যাবে না উপায় কী করি।
পাখি কখন যেন যায় উড়ে ধুলো দিয়ে দুইচোখই ॥

আছে নয় দরজা খাঁচাতে যায়আসে পাখি কোনপথে চোখে দিয়েরে ভেল্কি।
সিরাজ শাঁই কয় বয় লালন বয় ফাঁদ পেতে ঐ সিঁদমুখে ॥

৬৪৪.
চেতন ভুবনে সাধ্য কে জানে।
তলে আসে তলে বসে এমন কে তাঁরে চেনে ॥

চেতনঘরে হলে চুরি সে চোর কি আর ধরতে পারি।
লাম আলিফ যাঁর নাম করি দ্বিদলে সে রয় নির্জনে ॥

আউয়ালে যে হয় সে জানতে পায় নইলে তার ভজন কাটা যায়।
হামিমে যাঁর গোসল নাই তাঁর সাক্ষী তিনজনে ॥

আউয়ালে মোর আল্লাহ্ গনি দুয়মে আহ্‌মদ শুনি।
লালন বস্তু ভিখারি তাঁরে পাবে কোন্‌গুণে ॥

৬৪৫.
চেয়ে দেখ নারে মন দিব্যনজরে।
চার চাঁদে দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে ॥

হলে সেই চাঁদের সাধন অধর চাঁদ হয় দরশন হয়রে।
সে চাঁদেতে চাঁদের আসন রয়েছে ঘিরে ॥

চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া চাঁদে দেয় চাঁদের খেওয়া দেয়রে।
জমিনেতে ফলছে মেওয়া ঐ চাঁদের সুধা ঝরে ॥

নয়নচাঁদ প্রসন্ন যাঁর সকল চাঁদ দৃষ্ট হয় তাঁর।
লালন বলে বিপদ আমার গুরুচাঁদ ভুলেরে ॥

৬৪৬.
জগতের মূল কোথা হতে হয়।
আমি একদিনও চিনলাম না তাই ॥

কোথায় আল্লাহর বসতি কোথায় রসুলের স্থিতি।
পবনপানির কোথায় গতি কিসে তা জানা যায় ॥

কোন্ আসনে আল্লাহ আছে কোন্ আসনে রসুল বসে।
কোন্ হিল্লোলে মীন মিশে কোন্ রঙে রঙ ধরায় ॥

দালে মিম বসালে যা হয় সেই কি জগতের মূল কয়।
কোথায় আরশ কোথায় বা মিম একথা কারে শুধাই ॥

আল্লাহ নবি যাঁরে বলে দেখতে পায় মন এক হলে।
লালন বলে কাতর হালে আমার কী হবে উপায় ॥

৬৪৭.
জমির জরিপ একদিনেতে সারা।
আগারপাগার আগে তেগার ঠিকেতে ঠিক করা ॥

এইদেহে আঠারো কলি সেকথা এখন বলি।
পণ্ডিতে খুঁজে না পায় গলি বুঝবে সাধক যাঁরা ॥

একেতে তিন ভাগ করিয়ে বারোগুণ আকার দিয়ে।
অতীতপতিত রয় বাহিরে ভিতরে আছে বালুচরা ॥

দুই পয়ারে এক চরে পাখি জগতে নাই তাকিয়ে দেখি।
একে বারো তার ফাঁকিফুঁকি সে কী বুঝবি তোরা ॥

চিকন ধারে নলটি ধরে রাখ না জমিন জরিপ করে।
মস্তকছেদন করা দেখে অধীন লালন দিশেহারা ॥

৬৪৮.
জলে স্থলে ফুল বাগিচা ভাই।
এমন ফুল আর দেখি নাই ॥

ফুলের নামটি নীল লাল জবা ফুলে মধু ফলে সুধা তাঁর ভঙ্গি বাঁকা।
সে ফুল তুলতে গেলে মদনসাপা সে যে সদাই ছাড়ে হাঁই ॥

ফুলের রসিক যাঁরা মর্ম জেনে ডুব দিলো সেই জীবনফুলে
ঐ ফুলে আছে মধু রাখা।
তার মনের কী ভয় আর রয় দেবে শ্রীগুরুর দোহাই ॥

এবার ব্রহ্মা মাকে করে বাধ্য মদনরাজার সঙ্গে যুদ্ধ কার কী সাধ্য দেখা।
ফকির লালন বলে ওটা মরলে যেতো আমারই বালাই ॥

৬৪৯.
জান গা পদ্ম নিরূপণ।
কোনপদ্মে জীবের স্থিতি কোনপদ্মে গুরুর আসন ॥

অধোপদ্ম ঊর্ধ্বপদ্ম লীলানৃত্যের এ সরহদ্দ।
যে পদ্মে সাধকের বর্ত সে পদ্ম কেমন বরণ ॥

অধোপদ্মের কুঁড়ি ধরে ভৃঙ্গরতি চলেফেরে।
সে পদ্ম কোন দলের উপরে বিকশিত হয় কখন ॥

গুরুমুখে পদ্মবাক্য হৃদয়ে যার হয়েছে ঐক্য।
জানে সে সকল পক্ষ কহে দীনহীন লালন ॥

৬৫০.
জান গা মানুষের কারণ কিসে হয়।
ভুলো না মন বৈদিক ভোলে রাগের ঘরে বয় ॥

ভাটি স্রোত যার ফেরে উজান তাইতে কি হয় মানুষের করণ।
পরশনে না হইলে মন দরশনে কী না ॥

টলাটল করণ যাঁহার পরশগুণ কই মেলে তাঁর।
গুরুশিষ্য জন্ম জন্মান্তর ফাঁকে ফাঁকে রয় ॥

লোহা সোনা পরশ পরশে মানুষের কারণ তেমনই সে।
লালন বলে হলে দিশে জঠরজ্বালা যায় ॥

৬৫১.
জানতে হয় আদম সফির আদ্যকথা।
না দেখে আজাজিল সে রূপ কী রূপ আদম গঠলেন সেথা ॥

এনে জেদ্দার মাটি গঠলেন বোরখা পরিপাটি।
মিথ্যা নয় সে কথা খাঁটি কোন চিজে তাঁর গড়ে আত্মা ॥

সেই যে আদমের ধড়ে অনন্ত কুঠরি করে।
মাঝখানে হাতনে কল জুড়ে কীর্তিকর্মা বসালেন সেথা ॥

আদমি হলে আদম চেনে ঠিক নামায় সে দেলকোরানে।
লালন কয় সিরাজ শাঁইয়ে গুণে আদম অধর ধরার সূতা ॥

৬৫২.
জানা চাই অমাবস্যায় চাঁদ থাকে কোথায়।
গগনে চাঁদ উদয় হলে দেখা যায় আছে যথায় ॥

অমাবস্যার মর্ম না জেনে বেড়াই তিথি নক্ষত্র গুণে।
প্রতিমাসে নবীন চাঁদ সে মরি এ কী ধরে কায় ॥

অমাবস্যায় পূর্ণমাসী কী মর্ম হয় কারে জিজ্ঞাসি।
যে জানো সে বলো মোরে মন মুড়াই আজ সেথায় ॥

স্বাতী নক্ষত্র হয় গগনে স্বাতী নক্ষত্রযোগ হয় কখনে।
না জেনে অধীন লালন সাধক নাম ধরে বৃথাই ॥

৬৫৩.
জাল ফেলে মাছ ধরবে যখন।
কাতলাপোনা চুনোচানা কেউ বাকি থাকবে না তখন ॥

হাড়ুমহুড়ুম দাড়ুমদুড়ুম লাফালাফি করছো এখন।
আসছে শমন জেলে খেপলা ফেলে করবে তুলে খালুই পূরণ ॥

অগাধ জলে হেসে ভেসে উল্লাসে কাল করছো যাপন।
রাজার হুকুম হলে আর কী চলে শুনবে না সে কারো বারণ ॥

সংসারজলে নানাবিধ হইয়াছে মীনের গঠন।
ও তাই ভাবছি আমি জগত স্বামী একটা কেউ নহে বিস্মরণ ॥

অধীন লালনের এই নিবেদন ধরি সিরাজ শাঁইয়ের চরণ।
শমনভয় এড়াবে শান্তি পাবে পাপের পথে না করবে গমন ॥

৬৫৪.
জীব মরে জীব যায় কোন সংসারে।
জীবের গতিমুক্তি কে করে ॥

রাম নারায়ণ গৌর হরি ঈশ্বর বলে গণ্য যদি করি
তাঁরাও জীবের গর্ভধারী জীবের ভার নেয় কেমন করে ॥

যারে তারে ঈশ্বর বলা বুদ্ধি নাই তার অর্ধতোলা.
ঈশ্বরের কেন যমজ্বালা তাই ভাবি আজ মনের দ্বারে ॥

ত্রিজগতের মূলাধার শাঁই জরামৃত তাঁর কিছু নাই।
লালন বলে বোঝে সবাই বুঝেও ঘোর ধাঁধায় ঘোরে ॥

৬৫৫.
ঠাহর নাই আমার মনকাণ্ডারি।
ঐ বুঝি তীরধারায় ডুবলো তরী ॥

একটি নদীর তিন বইছে ধারা সেই নদীর নেই কূল কিনারা।
বেগে তুফান ধায় দেখে লাগে ভয় তরী বাঁচাবার উপায় কী করি ॥

যেমন মাঝি দিশেহারা তেমনই দাঁড়ী মাল্লা তারা।
কে কোনদিকে ধায় কেহ কারো বশ নয় পারে যাওয়া কঠিন ভারি ॥

কোথায় হে দয়াল হরি একবার এসে হও কাণ্ডারি।
তোমার স্মরণ না লয়ে তরী ভাসায়ে লালন বলে এখন বিপাকে মরি ॥

৬৫৬.
ডুবে দেখ দেখি মন ভবকূপে।
আর কয়দিন রাখবে চেপে ॥

খেললি খেলা খেলাঘরে এসে দুদিনের তরে।
সঙ্গের হিল্লায় মিশে মনরে এখন পড়েছো বিষম ধূপে ॥

ধূলোর পাশা ফুলের গুটি তাই নিয়ে মন আঁটাআঁটি।
যখন চার ইয়ারে বাঁধবে কটি কাঁদবেরে ভাই মা বাপে ॥

সিরাজ শাঁইয়ের সখের বাজারে ডাকাত এসে সকল নেয় হরে।
হত বর্বর লালন বলে আমার প্রাণ ওঠে কেঁপে ॥

৬৫৭.
তা কি পারবি তোরা জ্যান্তে মরা সে প্রেমসাধনে।
যে প্রেমে কিশোরকিশোরী মজেছে দুজনে ॥

কামে থেকে যে নিষ্কামী হয় কামরূপে প্রেমশক্তির আশ্রয়।
তার সন্ধি জানা বিষম সে না কঠিন জীবের প্রাণে ॥

পেয়ে অরুণকিরণ কমলিনী প্রফুল্লবদন।
তেমনই রতি সাধনে গতি আকর্ষণে টেনে ॥

সামর্থ্য আর শম্ভুরসের মান উভয়ের মান সমানসমান।
লালন ফকির ফাঁকে ফেরে কঠিন দেখে শুনে ॥

৬৫৮.
তা কি মুখের কথায় হয়।
চেতন হয়ে সাধন করে রসিক মহাশয় ॥

বেহাতে পাখি ধরেরে এমনই মতো ধরতে হয়রে।
অনুরাগের আঠা দিয়ে লাগাও গুরুর রাঙাপায় ॥

কানাবগী থাকে যেমন থাকতে হয়রে তেমন।
সে চিলের মতো ছোঁ মেরে আপন বাসায় লয়ে যায় ॥

ফকির লালন বলে মুখের কথায় নাহি মেলে।
দুইদেহ একদেহ হলে তবেই সে ধন পায় ॥

৬৫৯.
তা কি সবাই জানতে পায়।
রূপেতে রূপ আছে ঘেরা কে করে নির্ণয় ॥

তীর্থ গোদাবরীর তীরে রামানন্দ দেখলেন তাঁরে।
রসরাজ মহাভাবে মিশে একরূপ সে হয় ॥

লক্ষ পরে পক্ষ হানা তাঁরে কি পায় যে সে জনা।
রসিক ছাড়া কেউ জানে না বেদে কি তাই পায় ॥

হেরিয়ে তাঁকে মাতোয়ারা কমলপদ্মে ভ্রমর পুরা।
না দেখে লালন হলো সারা কেবল কমলপদ ধেয়ায় ॥

৬৬০.
তিনদিনের তিনমর্ম জেনে।
রসিক সেধে লয় একদিনে ॥

অকৈতব সে ভেদের কথা কইতে মর্মে লাগে ব্যথা।
না কইলে জীবের নাইকো নিস্তার কই সেইজন্যে ॥

তিনশ ষাট রসের মাঝার তিনরস গণ্য হয় রসিকার।
সাধিলে সেই করণ এড়াবে শমন এই ভুবনে ॥

অমাবস্যা প্রতিপদ দ্বিতীয়ার প্রথম সে তো।
অধীন লালন বলে তাই আগমন সেই যোগের সনে ॥

৬৬১.
তিন পোড়াতে খাঁটি হলে না।
না জানি কপালে তোমার আর কী আছে বলো না ॥

লোহা জব্দ কামারশালে যে পর্যন্ত থাকে জ্বালে।
স্বভাব যায় না তা মারিলে তেমনই মন তুই একজনা ॥

অনুমানে জানা গেলো চৌরাশির ফ্যার পড়িল।
আর কবে কী করবে বলো রঙমহলে প'লে হানা ॥

দেব দেবতার বাসনা যে মানবজনমের লেগে।
লালন কয় মানুষ হয়ে মানুষের কর্ম কেন করলে না ॥

৬৬২.
তিল পরিমাণ জায়গাতে কী কুদরতিময়।
জগত জোড়া একজন নাড়া সেইখানেতে বারাম দেয় ॥

বলবো কী সে নাড়ার গুণবিচার চারযুগে রূপ নবকিশোর।
অমাবস্যা নাই সেইদেশে দীপ্তাকারে সদাই রয় ॥

ভাবের ন্যাড়া ভাব দিয়ে বেড়ায় যে যা ভাবে তাই হয়ে দাঁড়ায়
রসিক যাঁরা বসে তাঁরা পেঁড়োর খবর পিড়েই পায় ॥

শতদল সহস্রদলের দল ঐ ন্যাড়া বসে ঘুরায় কল।
লালন বলে তিনটি তারে অনন্ত রূপ কল খাটায় ॥

৬৬৩.
ত্রিধারা বয়রে নদীর তীরধারা বয়।
কোনধারাতে কী ধনপ্রাপ্তি হয়।

তীরধারায় যোগানন্দ কার সঙ্গে কার কী সম্বন্ধ
শুনলে ঘোঁচে মনের সন্দেহ প্রেমানন্দ বাড়ে হৃদয়
শক্তিতত্ত্ব পরমতত্ত্ব সত্য সত্য যাহার হয় ॥

তারুণ্যে কারুণ্যে এসে লাবণ্যেতে কখন মেশে
যার আছে এসব দিশে সচেতন তারে বলা যায়
আমার হলো মতিমন্দ সেপথে ডোবে না মনুরায় ॥

কখন হয় শুকনো নদী কখন হয় বর্ষা অতি
কোনখানে তার কলের স্থিতি সাধকেরা করে নির্ণয়
অবোধ লালন না বুঝে ডুবে কিনারায় ॥

৬৬৪.
তুমি তো গুরু স্বরূপের অধীন।
আমি ছিলাম সুখে উর্ধ্বদেশে অধে এনে আমায় করলে হীন ॥

তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি হও জ্ঞানদাতা।
তুমি চক্ষুদান করিয়ে দেখাও আমায় শুভদিন ॥

করবো আমি গুরুর ভজন তাতে বাদি হলো ছয়জন।
দশে ছয়ে ষোলোজনা করলো পরাধীন ॥

ভক্তি নইলে কি মন গুরুচরণ হয় শরণ।
ভেবে কয় অধীন লালন কেমনে শুধিব গুরুঋণ ॥

৬৬৫.
তোরা কেউ যাসনে ও পাগলের কাছে।
তিন পাগলে হলো মেলা নদেয় এসে ॥

একটা পাগলামি করে জাত দেয় সে অজাতেরে দৌড়ে যেয়ে
আবার হরি বলে পড়ছে ঢলে ধূলার মাঝে ॥

একটা নারকেলের মালা তাতে জল তোলাফেলা করঙ্গ সে।
পাগলের সঙ্গে যাবি পাগল হবি বুঝবি শেষে ॥

পাগলের নামটি এমন বলিতে অধীন লালন হয় তরাসে।
ও সে চৈতে নিতে অদ্বৈ পাগল নাম ধরে সে ॥

৬৬৬.
দম কসে তুই বয়রে ক্ষ্যাপা প্রেমের নদীতে।
ধরবি যদি মীনমক্করা কাম রেখে আয় তফাতে ॥

গহিন জলে বাস করে মীন গুরু বলে ছাড়তেছে ঝিম।
যে চিনেছে সেই জলের ঝিম মীন ধরা দেয় তার হাতে ॥

কাম ক্রোধ লোভ মায়া মোহ এই কয়জন দেহের অবাধ্য।
প্রেমাগুনে হয়ে দগ্ধ জব্দ রবি তার সাথে ॥

লালনের বুদ্ধিকাণ্ড জল করেছে লণ্ডভণ্ড।
মাছ ধরিস নে মনপাষণ্ড মদনগঞ্জের মনমতে ॥

৬৬৭.
দয়াল তোমার নামে নিয়ে তরী ভাসালাম যমুনায়।
তুমি খোদার নাবিক পারের মালিক সে আশায় চড়েছি নায় ॥

চিরদিন কাণ্ডারি হয়ে কতো তরী বেড়াণ্ড বয়ে।
আমার জীর্ণতরী রেখো যতনে যদি তোমার মনে লয় ॥

দাঁড়ি মাঝির কুমন্ত্রণায় পড়েছি কতোবার ঘোরায়।
এবার সুযোগ পেয়ে তাই সব সঁপিলাম তোমার পায় ॥

ভাবের হাটে লাভের আশে থাকবো না আর পাঁরে বসে।
মন গিয়াছে ঊর্দ্ধদেশে লালন বলে তাই আছি সে আশায় ॥

৬৬৮.
দিন থাকতে মুর্শিদরতন চিনে নে না।
এমন সাধের জনম বয়ে গেলে আর হবে না ॥

কোরানে সাফ শুনিতে পাই অলিয়েম মোর্শেদা শাঁই।
ভেবে বুঝে দেখো মনরায় মুর্শিদ সে কেমনজনা ॥

মুর্শিদ আমার দয়াল নিধি মুর্শিদ আমার বিষয়াদি।
পারে যেতে ভবনদী ভরসা ঐ চরণখানা ॥

মুর্শিদবস্তু চিনলে পরে চেনা যায় মন আপনারে।
লালন কয় সে মূলাধারে নজর হবে তৎক্ষণা ॥

৬৬৯.
দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরি।
কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম যাবো কোথায় সদাই ভেবে মরি ॥

বসত করি দিবারাতে ষোলোজন বম্বেটের সাথে।
দেয় না যেতে সরল পথে পদে পদে দাগাদারী ॥

বাল্যকাল খেলায় গেলো যৌবনে কলঙ্ক হলো।
আবার বৃদ্ধকাল সামনে এলো মহাকাল হলো অধিকারি ॥

যে আশায় এভবে আসে তাতে হলো ভগ্নদশা।
লালন বলে এ কী দশা আমার উজাইতে ভেটেন প'লো তরী ॥

৬৭০.
দিব্যজ্ঞানে দেখরে মনুরায়।
ঝরার খালে বাঁধ বাঁধিলে রূপের পুলক ঝলক দেয় ॥

পূর্বদিকে রত্নবেদী তার উপরে পুষ্পজ্যোতি।
তাহে খেলছে রূপ আকৃতি বিজলী চটকের ন্যায় ॥

তথায় ক্ষীরোদ রসে অখণ্ড শিখর ভাসে।
রত্নবেদীর উর্দ্ধপাশে কিশোরকিশোরী রাই ॥

শ্রীরূপের আশ্রিত যাঁরা সব খবরের জবর তাঁরা।
লালন বলে অধর ধরা ফাঁদ পেতে ত্রিবেণীতে রয় ॥

৬৭১.
দেখ না এবার আপন ঘর ঠাউরিয়ে।
আঁখির কোণে পাখির বাসা আসেযায় হাতের কাছ দিয়ে ॥

সব ঘরে পাখি একটা সহস্র কুঠুরিকোঠা আছে আড়া পাতিয়ে।
নিগমে তাঁর মূল একটি ঘর অচিন হয় সেথা যেয়ে ॥

ঘরে আয়না আঁটা চৌপাশে মাঝখানে পাখি বসে আছে আনন্দিত হয়ে
দেখ নারে ভাই ধরার জো নাই সামান্যে হাত বাড়িয়ে ॥

দেখতে যদি সাধ করো সন্ধানীকে চিনে ধরো দেবে দেখিয়ে।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমায় বুঝাতে দিন যায় বয়ে ॥

৬৭২.

দেখ নারে ভাবনগরে ভাবের ঘরে ভাবের কীর্তি।
জলের ভিতরে জ্বলছেরে বাতি ॥

ভাবের মানুষ ভাবের খেলা ভাবে বসে দেখো নিরালা।
নীরে ক্ষীরেতে ভেলা বায় কী জ্যোতি ॥

রতিতে জ্যোতির উদয় সামান্যে কি তাই জানা যায়।
তাতে কতো রূপ দেখা যায় হীরে লাল মতি ॥

যখন নিঃশব্দ শব্দেরে খাবে তখন ভাবের খেলা সাঙ্গ হবে।
লালন কয় দেখবি তবে হয় কী গতি ॥

৬৭৩.

দেখ নারে মন পুনর্জনম কোথা হতে হয় ॥
মরে যদি ফিরে আসে স্বর্গনরক কেবা পায় ॥

পিতার বীজে পুত্রের সৃজন তাইতে পিতার পুনর্জনম।
পঞ্চভূতে দেহ গঠন আলকরূপে ফেরে শাঁই ॥

ঝিয়ের গর্ভে মায়ের জন্ম এ বড়ো নিগূঢ়মর্ম।
শোণিত-শুক্র হলে গম্ভু তবে সে ভেদ জানা যায় ॥

শোণিতে শুক্র হলে বিচার জানতে পারবি কে জীব কে ঈশ্বর।
সিরাজ শাঁই কয় লালন এবার ম'লি ঘুরে মনের ধোঁকায় ॥

৬৭৪.

দেখবি যদি সেই চাঁদেরে।
যা যা কারণ সমুদ্দুরের পারে ॥

যাস্ নে রে সামান্য নৌকায় সে নদীর বিষম তড়কায়।
প্রাণে হবি নাশ রবে অপযশ পার হবি যদি সাজাও প্রেমতরীরে ॥

তারুণ্য কারুণ্য আড়ি যেজন দিতে পারে পাড়ি।
সেই বটে সাধক এড়ায় ভবরোগ বসত হবে তাঁর অমরনগরে ॥

মায়ার গেরাপি কাটো ত্বরায় প্রেমতরীতে ওঠো।
সামনে কারণসমুদ্দুর পার হয়ে হুজুর যারে লালন সদগুরুর বাক ধরে ॥

৬৭৫.
দেখলাম এ সংসার ভোজবাজি প্রকার দেখিতে দেখিতে কে বা কোথা যায়।
মিছে এ ঘরবাড়ি মিছে ধন টাকাকড়ি মিছে দৌড়াদৌড়ি করছো কার আশায় ॥

কীর্তিকর্মার কীর্তি কে বুঝিতে পারে সে বা জীবকে কোথায় লয়ে যায় ধরে।
এ কথা আর শুধাবো কারে নিগূঢ়তত্ত্ব অর্থ কে বলবে আমায় ॥

যে করে এই লীলে তাঁরে চিনলাম না আমি আমি বলি আমি কোনজনা।
মরি কী আজব কারখানা শুণে পড়ে কিছু ঠাহর নাহি পাই ॥

ভয় ঘোঁচে না আমার দিবারজনী কার সাথে কোনদেশে যাবো না জানি।
সিরাজ শাঁই কয় বিষম কারগুণই পাগল হয়ে লালন তাই জানতে চায় ॥

৬৭৬.
দেখলাম সেই অধর চাঁদের অন্ত নাই।
নিকটে যাঁর বারামখানা হাতড়ে মুড়ো নাহি পাই ॥

জলে যেমন চাঁদ দেখি ধরতে গেলে হয় ফাঁকি।
তেমনই যেন অধর চাঁদের আভা নিকট দূরে ঠাঁই ॥

হলে গগনচন্দ্রে তার প্রমাণ সবাই দেখে বর্তমান।
যে যেখানে চাঁদ সেখানে ধরতে কারো সাধ্য নাই ॥

ঘাট অঘাটায় জানবে তেমনই সে চাঁদের আভা।
গুরু বিনে তাই কে চেনে লালন কয় গুরুপদ উপায় ॥

৬৭৭.
দেখো না আপন দেল ঢুঁড়ে।
দ্বীন দুনিয়ার মালিক সে যে আছে ধড়ে ॥

আপনি ঘর সে আপনি ঘরী আপনি করে চৌকিদারি।
আপনি সে করে চুরি আপন ঘরে ॥

আপনি ফানা আপনি ফকির আপনি করে আপনার জিকির।
বুঝবে কেরে আলেক ফিকির বেদভাষা পড়ে ॥

নানাছলে নানান মায়ায় আমি আমি শব্দ কে কয়।
লালন কয় সন্ধি যে পায় ঘোর যায় ছেড়ে ॥

৬৭৮.
দেলদরিয়ার মাঝে দেখলাম আজব কারখানা।
ডুবলে পরে রতন পাবে ভাসলে পরে পাবে না ॥

দেহের মাঝি বাড়ি আছে সেই বাড়িতে চোর লেগেছে।
ছয়জনাতে সিঁদ কাটিছে চুরি করে একজনা ॥

দেহের মাঝে নদী আছে সেই নদীতে নৌকা চলছে।
ছয়জনাতে গুণ টানিছে হাল ধরেছে একজনা ॥

দেহের মাঝে বাগান আছে তাতে নানারঙের ফুল ফুটেছে।
সৌরভে জগত মেতেছে লালনের প্রাণ মাতলো না ॥

৬৭৯.
দেলদরিয়ায় ডুবে দেখো না।
অতিঅজান খবর যায় জানা ॥

আলখানার শহর ভারি তাহে আজব কারিগিরি।
বোবায় কথা কয় কালায় শুনতে পায় আঁন্ধেলায় পরখ করে সোনা ॥

ত্রিবেণীর পিছল ঘাটে বিনে হাওয়ায় মৌজা ছোটে।
ডহরায় পানি নাই ভিটে ডুবে যায় ভাই শুনলে কী প্রভারই কারখানা ॥

কইবার যোগ্য নয় সে কথা সাগরে ভাসে জগতমাতা।
লালন বলে মায়ের উদরে পিতা জন্মে পত্নীর দুগ্ধ খেলো সে না ॥

৬৮০.
দেলদরিয়ায় ডুবিলে সে দূরের খবর পায়।
নইলে পুঁথি পড়ে পণ্ডিত হলে কী হয় ॥

স্বয়ংরূপ দর্পণে ধরে মানবরূপ সৃষ্টি করে।
দিব্যজ্ঞানী যাঁরা ভাবে বোঝে তাঁরা কার্য্যসিদ্ধি করে যায় ॥

একেতে হয় তিনটি আকার অযোনি সহজ সংস্কার।
যদি ভবতরঙ্গে তরো মানুষ চিনে ধরো দিনমণি গেলে কী হবে উপায়

মূল হতে হয় ডালের সৃজন ডাল ধরলে হয় মূলের অন্বেষণ।
তেমনই রূপ হইতে স্বরূপ তারে ভেবে বিরূপ.
অবোধ লালন সদাই নিরূপ ধরতে চায় ॥

৬৮১.

দেশ দেশান্তর দৌড়ে কেন মরছোরে হাঁফায়ে।
আদি মক্কা এই মানবদেহে দেখ নারে মন ভেয়ে ॥

করে অতিআজব বাক্কা গঠেছেন শাঁই মানুষ মক্কা কুদরতি নূর দিয়ে।
চার দ্বারে চার নূরী ইমাম মধ্যে শাঁই বসিয়ে ॥

মানুষমক্কা কুদরতি কাজ উঠছে আজগবি আওয়াজ সাততলা ভেদিয়ে
সিং দরজায় একজন দ্বারী আছে নিদ্রাত্যাগী হয়ে ॥

তিল পরিমাণ জায়গার উপর গঠেছেন শাঁই উর্ধ্বশহর মানুষমক্কা এ।
কতো লাখ লাখ হাজি করছেরে হজ সেই জায়গায় বসিয়ে ॥

দশদুয়ারি মানুষমক্কা মুর্শিদ পদে ডুবে থাক গা ধাক্কা সামলিয়ে।
লালন বলে গুপ্তমক্কায় আদি ইমাম ফকির মেয়ে ॥

৬৮২.

ধন্য আশেকিজনা এ দ্বীনদুনিয়ায়।
আশেক জোরে গগনের চাঁদ পাতালে নামায় ॥

সুঁইয়ের ছিদ্রে চালায় হাতি বিনা তেলে জ্বালায় বাতি।
সদাই থাকে নিষ্ঠারতি ঠাঁই অঠাঁইয়ে সেহি রয় ॥

কাম করে না নাম জপে না শুদ্ধ দেল আশেক দেওয়ানা।
তাইতে হয় শাঁই রব্বানা মদদ সদাই ॥

আশেকের মাশুকি নামাজ রাজি যাতে রয় বেনেয়াজ।
লালন করে শৃগালের কাজ দিয়ে সিংহের দোহাই ॥

৬৮৩.

ধন্য ধন্য বলি তাঁরে।
বেঁধেছে এমন ঘর শূন্যের উপর পোস্তা করে ॥

ঘরে মাত্র একটি খুঁটি খুঁটির গোড়ায় নাইকো মাটি।
কিসে ঘর রবে খাঁটি ঝড় তুফান এলে পরে ॥

ঘরের মূলাধার কুঠরি নয়টা তার উপরে চিলেকোঠা।
তাহে এক পাগলা ব্যাটা বসে একা একেশ্বরে ॥

ঘরের উপর নিচে সারি সারি সাড়ে নয় দরজা তারি।
লালন কয় যেতে পারি কোন দরজা খুলে ঘরে ॥

৬৮৪.

ধরাতে শাঁই সৃষ্টি করে আছে নিগমে বসে।
কী দেবো তুলনা তাঁরে তাঁর তুলনা সে ॥

স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ নপুংসক এ তিনভাবে না হবে ভাবুক।
ত্রিভুবন যাঁর লামকূপে তাঁর করো দিশে ॥

কিরূপে নিরাকার হলো ডিম্বরূপে কে ভাসিল।
সে অন্বেষণ জানে যেজন যায় সে দেশে ॥

বেদ পড়ে ভেদ পেতো যদি সবে গুরুর গৌরব থাকতো না ভবে।
সিরাজ সাঁই কয় লালন করোরে কিসে ॥

৬৮৫.

ধরো চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে।
সে কী সামান্য চোরা ধরবি কোণা কানচিতে ॥

পাতালে চোরের বহর দেখায় আসমানের উপর।
তিন তারে হচ্ছে খবর শুভাশুভ যোগমতে ॥

কোথা ঘর কি বাসনা কে করে ঠিক ঠিকানা।
হাওয়ায় তাঁর লেনাদেনা হাওয়ায় মূলাধার তাতে ॥

চোর ধরে রাখবি যদি হৃদ্‌গারদ কর গে খাঁটি।
লালন কয় খুঁটিনাটি থাকতে কি চোর দেয় ছুঁতে ॥

৬৮৬.

ধ্যানে যাঁরে পায় না মহামুনি।
আছে এক অচিন মানুষ মীনরূপে সে ধরে পানি ॥

জগত জোড়া মীন সেহিরে খেলছে মান সরোবরে।
দেখার সাধ হয় গো তাঁরে দেখো ধরে রসিক সন্ধানী ॥

নদীর গভীরে থাকে নির্জন করিতে হয় নীর অন্বেষণ।
যোগ পেলে ভাটি উজান ধায় আপনি ॥

যায় সে মহামীনকে ধরা বাঁধতে পারলে নদীর ধারা।
কঠিন সেই বাঁধাল করা লালন তাতে খায় চুবানি ॥

৬৮৭.

না জানি কেমন রূপ সে।
রূপের সৌরভে যাঁর ত্রিভুবন মোহিত করেছে ॥

রূপ দেখিতে হয় বাসনা কে দেবে তাঁর উপাসনা।
কোথায় বাড়ি কোথায় ঠিকানা আমি খুঁজে পাইনে কোনো দেশে ॥

আকার কি সাকার ভাবিব নিরাকার কি জ্যোতিঃরূপ।
এ কথা কারে শুধাবো সৃষ্টি করলে কোথায় বসে ॥

রূপের দেশে গোল যদি রয় কি করিতে কী বলা যায়।
গোলে হরি বললে কী হয় লালন ভেবে না পায় দিশে ॥

৬৮৮.
না জেনে ঘরের খবর তাকাও আসমানে।
চাঁদ রয়েছে চাঁদে ঘেরা ঘরের ঈশানকোণে ॥

প্রথমে চাঁদ উদয় দক্ষিণে কৃষ্ণপক্ষে অধো হয় বামে।
আবার দেখি শুক্লপক্ষে কেমনে যায় দক্ষিণে ॥

খুঁজিলে আপন ঘরখানা পাবে সে সকল ঠিকানা।
বার মাসে চব্বিশ পক্ষ অধর ধরা তাঁর সনে ॥

স্বর্গচন্দ্র মণিচন্দ্র হয় তাহাতে বিভিন্ন কিছু নয়।
এ চাঁদ সাধলে সে চাঁদ মেলে লালন কয় তাই নির্জনে ॥

৬৮৯.
নাম পাড়ালাম রসিক ভেয়ে।
না জেনে সেই রসের ভিয়ান মরতে হলো গরল খেয়ে ॥

গোঁসাই'র লীলা চমৎকারা বিষেতে অমৃত পোরা।
অসাধ্যকে সাধ্য করা ছুঁলে বিষ ওঠে ধেয়ে ॥

দুগ্ধে যেমন থাকে ননী ভিয়ানে বিভিন্ন জানি।
সুধামৃত রস তেমনই গরলে আছে ঢাকিয়ে ॥

দুগ্ধ জলে যদি মিশায় রাজহংস হলে সেই বেছে খায়।
লালন বলে আমি সদাই আমোদ করি জল হাতড়িয়ে ॥

৬৯০.
নিগম বিচারে সত্য গেলো যে জানা।
মায়েরে ভজিলে হয় তার বাপের ঠিকানা ॥

পুরুষ পরওয়ারদিগার অঙ্গে আছে প্রকৃতি তাঁর।
প্রকৃতিপ্রাকৃতি সংসার সৃষ্টি সবজনা ॥

নিগূঢ় খবর নাহি জেনে কেবা সেই মায়েরে চেনে।
যাহার ভার দ্বীন দোনে দিলেন রাব্বানা ॥

ডিম্বের মধ্যে কে বা ছিলো বাহির হয়ে কারে দেখিল।
লালন বলে ভেদ যে পেলো ঘুঁচলো দিনকানা ॥

৬৯১.

পাখি কখন যেন উড়ে যায়।
বদহাওয়া লেগে খাঁচায় ॥

খাঁচার আড়া প'লো ধসে পাখি আর দাঁড়াবে কিসে।
ঐ ভাবনা ভাবছি বসে চমক জ্বরা বইছে গায় ॥

ভেবে অন্ত নাহি দেখি কার বা খাঁচায় কে বা পাখি।
আমার এ আঙ্গিনায় থাকি আমারে মজাতে চায় ॥

আগে যদি যেতো জানা জংলা কভু পোষ মানে না।
তবে উহার সঙ্গে প্রেম করতাম না লালন ফকির কেঁদে কয়

৬৯২.

পানকাউর দয়াল পাখি।
রাতদিন তারে জলে দেখি ॥

মাছধরা তার যেমনতেমন বিলের শ্যাওলা ঠেলে সারাক্ষণ।
বিলের কাদাখোঁচা সার হলে সারা গায়ে কাদা মাখি ॥

কানাবগী মাছ ধরার লোভে বেড়ায় সেই গাঙের কূলে কূলে
ঠোক দিয়ে মাছ তুলে ডাঙ্গার উপরে তাকায় আড়চোখি ॥

মাছরাঙা নিহার করে পানির উপরে তাতে সে মাছ ধরে।
লালন বলে সেই জায়গায় জাল ঠেলা কারো সাধ্য কি ॥

৬৯৩.

পাপধর্ম যদি পূর্বে লেখা যায়।
কর্মের লিখিত কাজ করলে দোষগুণ তার কি হয় ॥

রাজার আজ্ঞায় দিলে ফাঁসি ফাঁসিদার কি হয় গো দোষি
জীবে পাপ করিয়ে কি শাঁই তার ফাটক দেয় ॥

শুনতে পাই সাধু সংস্কার পূর্বে থাকলে পরে হয় তাঁর।
পূর্বে না হলে এবার কী হবে উপায় ॥

কর্মের দোষ কাজকে দোষাই কোন্ কথাতে গিরে দিই ভাই
লালন বলে আমার বোধ নাই শুধাবো কোথায় ॥

৬৯৪.
পাপীর ভাগ্যে এমন দিন কি আর হবেরে।
দেখো দেখো মনুরায় হয়েছে উদয় কী আনন্দময় সাধুর সাধবাজারে ॥

যথারে সাধুর বাজার তথারে শাঁইর বারাম নিরন্তর।
হেন সাধসভায় তবে এনে মন আমায় আবার যেন ফ্যারে ফেলিস নারে ॥

সাধুগুরুর কী মহিমা বেদাদিতে নাইরে সীমা।
হেন পদে যার নিষ্ঠা না হয় তার না জানি কপালে কী আছেরে ॥

সাধুর বাতাসেরে মন বনের কাষ্ঠ হয়রে চন্দন।
লালন বলে মন খোঁজ কী আর ধন সাধুর সঙ্গে রঙ্গে অঙ্গ বশ করোরে ॥

৬৯৫.
পার করো দয়াল আমায় কেশে ধরে।
পড়েছি এবার আমি ঘোর সাগরে ॥

ছয়জনা মন্ত্রি সদাই অসৎ কুকাণ্ড বাঁধায়।
ডুবালো ঘাটঅঘাটায় আজ আমারে ॥

এ ভবকূপেতে আমি ডুবে হলাম পাতালগামী।
অপারের কাণ্ডারি তুমি লও না কিনারে ॥

আমি কার কে বা আমার বুঝেও বুঝলাম না এবার।
অসারকে ভাবিয়ে সার প'লাম ফেরে ॥

হারিয়ে সকল উপায় শেষে তোর দিলাম দোহাই।
লালন বলে দয়াল নাম শাঁই জানবো তোরে ॥

৬৯৬.
পারে লয়ে যাও আমায়।
আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময় ॥

আমি একা রইলাম ঘাটে ভানু সে বসিল পাটে।
তোমা বিনে ঘোর সংকটে না দেখি উপায় ॥

নাই আমার ভজনসাধন চিরদিন কুপথে গমন।
নাম শুনেছি পতিতপাবন তাই তো দিই দোহাই ॥

অগতির না দিলে গতি ঐ নামে রবে অখ্যাতি।
লালন কয় অকূলের পতি কে বলবে তোমায় ॥

৬৯৭.
পারো নিহেতুসাধন করিতে।
যাও নারে ছেড়ে জরামৃত্যু নাই যে দেশেতে ॥

নিহেতুসাধক যাঁরা তাঁদের করণ খাঁটি জবান খাড়া।
উপশক্য কাটিয়ে তাঁরা চলেছে পথে ॥

মুক্তিপদ ত্যাজিয়ে সদাই ভক্তিপদে রেখে হৃদয়।
শুদ্ধপ্রেমের হবে উদয় শাঁই রাজি যাতে ॥

সমঝে সাধন করো ভবে এবার গেলে আর কি হবে।
লালন বলে ঘুরতে হবে লক্ষ যোনিতে ॥

৬৯৮.
পিরিতি অমূল্যনিধি।
বিশ্বাসমতে কারো হয় যদি ॥

এক পিরিত শক্তিপদে মজেছিলো চণ্ডীচাঁদে।
জানলে সে ভাব মনকে বেঁধে ঘুঁচে যেতো পথের বিবাদী

এক পিরিত ভবানীর সনে করেছিলো পঞ্চাননে।
নাম রটিল ত্রিভুবনে কিঞ্চিৎ ধ্যানে মহাদেব সিদ্ধি ॥

এক পিরিত রাধা অঙ্গ পরশিয়ে শ্যাম গৌরাঙ্গ।
করো লালন এমনই সঙ্গ সিরাজ শাঁই কয় নিরবধি ॥

৬৯৯.
পূর্বের কথা ছাড়ান দাও ভাই।
সে লেখা তো থাকে না সাধনের দাঁড়ায় ॥

বাদশা গুরু গুরু বাদশা এসব কথা সাধুভাষা।
এ কথায় করে নিরাশা জীব পড়ে দুর্দশায় ॥

তাইতে বলি ওরে কানা সর্বজীব হয় গুরুজনা।
করো চৈতন্য গুরুর সাধনা তাতে কর্মভোগ যায় ॥

ধর্মাধর্ম সব নিজের কাছে জানা যায় সাধনের বিচে।
লালন কয় আমার ভুল হয়েছে ভেবে দেখি তাই ॥

৭০০.

পূর্ণচন্দ্র উদয় কখন করোরে মন বিবেচনা।
আগমে আছে প্রকাশি ষোলকলায় পূর্ণশশী
পনেরোয় পূর্ণিমা কিসি শুনে মনের ঘোর গেলো না ॥

সাতাশ নক্ষত্র সাঁইত্রিশ যোগেতে কোন সময় চলে সাঁইত্রিশেতে
যোগের এমনই লক্ষণ অমৃতফল হয়রে সৃজন
জানতো যদি দরিদ্র মন অসুসার কিছু রইতো না ॥

পূর্ণিমার যোগাযোগ হলে শুকনা নদী উজান চলে
ত্রিবেণীর পিছল ঘাটে মহাশব্দে বন্যা ছোটে
চাঁদচকোরের ভাটার চোটে বাঁধ ভেসে যায় তৎক্ষণা ॥

নিচের চাঁদ রাহুতে ঘেরা গগন চাঁদ কি পড়বে ধরা
যখন হয়রে অমাবস্যে তখন চন্দ্র রয় কোন্ দেশে
লালন ফকির শুনে পড়ে চোখ থাকতে হলো কানা ॥

৭০১.

প্রেমবাজারে কে যাবি তোরা আয় গো আয়।
প্রেমের গুরু কল্পতরু প্রেমরসে মেতে রয় ॥

প্রেমের রাজা মদনমোহন নিহেতুপ্রেম করে সাধন।
শ্যামরাধার যুগল চরণ প্রেমের সহচরী হয়ে গোপীগণ
গোপীর দ্বারে বাঁধা রয় ॥

অবিম্ব উথলিয়ে নীর পুরুষপ্রকৃতি হয়ে কার।
দোহার প্রেমশৃঙ্গারে উভয়ে মেতে
শেষে লেনাদেনা হয় ॥

নির্মলপ্রেম করে সাধন শঙ্করসে করে স্থিতি।
সামান্য রতি নিরূপণ সিরাজ শাঁই কয় শোনরে লালন
তাতে শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ হয় ॥

৭০২.

প্রেমযমুনায় ফেললবি বড়শি খবরদার।
লয়ে গুরুমন্ত্র ছেড়ে যন্ত্র ঠিক হয়ে বয় ঘাটের পর ॥

পাকিয়ে রাগের সূতা ছয়তারে করি একতা
ভাবের টোপ গেঁথে দাও সেথা
নিচে সাড়া পেলে পরে উঠবে ভেসে একান্তর ॥

সেই নদীপুরা জল সদা করছেরে কলকল
রাগের ছড়ি ছিপের বাড়ি খেলে যাবি রসাতল
কতো রসিক জেলে জাল ফেলে প্রাণ লয়ে দিচ্ছে সাঁতার ॥

যেয়ে দেখ নদীর কূল তুই হবিরে ব্যাকুল
ট্যাপায় নিবে আধার কেটে হবি নামাকুল
লালন বলে যেমন আমার ভ্যাদায় করছে রুই আহার ॥

৭০৩.
প্রেমেন্দ্রিয় বারি অনুরাগ নইলে কি যায় ধরা।
যে বারি পরশে জীবের যাবে ভবজ্বরা ॥

বারি মানে বার এলাহি নাহিরে তুলনা নাহি।
সহস্রদলেতে সেহি মৃণালগতি বহে ধারা ॥

ছায়াহীন এক মহামণি বলবো কিরে তাঁর করণী।
প্রকৃতি হন তিনি বারি সেধে অমর গোরা ॥

আসমানে বরিষণ হলে জল দাঁড়ায় মৃত্তিকাস্থলে।
লালন ফকির ভেবে বলে মাটি চিনবে ভাবুক যাঁরা ॥

৭০৪.
প্রেমের দাগরাগ বাঁধা যার মনে।
সে প্রেম ঐহিকে জানে না জানে রসিকজনে ॥

যার শতদল কমলে ত্রিবেণীতে তুফান খেলে।
ভাটায় যায় না সে চলে উজানকোণে ॥

সেই প্রেম করিতে আশা করো মনে আবার সাধ্য করো গোপীগণে।
লালন কয় লীলা নাই যেখানে সে চলে নিত্যভুবনে ॥

৭০৫.
প্রেমের ভাব জেনেছে যারা।
গুরুরূপে নয়ন দিয়ে হয়েছে আত্মহারা ॥

সখ্য শান্ত দাস্যরসে বাৎসল্য মধুরবশে।
পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চপ্রেমে বইছে সহস্রধারা ॥

পঞ্চানন খায় ধুতরা ঘটা হয় মতোয়ারা।
মুখে বলে রাম হরি নাম ঐ প্রেমের প্রেমিকারা ॥

খেলে তাঁর নামসুধা মিটে যায় ভবক্ষুধা।
কখনো গরলসুধা পান করে না তারা ॥

সদাই থাকে নিষ্ঠারতি হয়ে মরার আগে মরা।
কতো মণিমুক্তা রত্নহীরা মালখানায় দেয় পাহারা ॥

প্রেমশক্তি চতুর্দলে কুম্ভক উঠিয়ে ঠেলে।
প্রেমশক্তির বাহুবলে উজানে ভাসায় ভারা ॥

শতদল লঙ্ঘন করে সহস্তে কায়েম করা।
আসা যাওয়াই হলো সারা ॥

৭০৬.
প্রেমের সন্ধি আছে তিন।
ষড়রসিক বিনে জানা হয় কঠিন ॥

প্রেম প্রেম বললে কী হয় না জানে সে প্রেম পরিচয়।
আগে সন্ধি বোঝো প্রেমে মজো সন্ধিস্থলে সে মানুষ অচিন ॥

পঙ্কজ ফুল সন্ধিবিন্দু আদ্যমূল তার সুধার সিন্ধু।
সে সিন্ধু মাঝে আলক পাশে উদয় হচ্ছে সদা রাত্রদিন ॥

সরল প্রেমের প্রেমিক হলে চাঁদ ধরা যায় সন্ধি খুলে।
ভেবে লালন ফকির পায় না ফিকির হয়ে আছে সদা ভজনহীন

৭০৭.
বলিরে মানুষ মানুষ এই জগতে।
কী বস্তু কেমন আকার পাই না দেখিতে ॥

যে চারে হয় ঘর গঠন আগমে আছে রচন।
ঘরের মাঝে বসে কোনজন হয় তা চিনতে ॥

এই মানুষ না যায় চেনা কী বস্তু কেমনজনা।
নিরাকারে নিরঞ্জনা যায় না তাঁরে চিনতে ॥

মূলমানুষ এই মানুষে ছাড়াছাড়ি কতটুকু সে।
সিরাজ শাঁই কয় লালনেরে বোঝো তত্ত্ব অন্তে ॥

৭০৮.
বসতবাড়ির ঝগড়া কেজে আমার তো কই মিটলো না।
কার গোয়ালে কে দেয় ধূমা সব দেখি তা না না না ॥

ঘরের চোরে ঘর মারে যার বসতের সুখ হয় কিসে তার।
ভুতের কীর্তি যেমন প্রকার তেমনই তার বসতখানা ॥

দেখে শুনে আত্মকলহ বাড়ির কর্তাব্যক্তি হত হলো।
সাক্ষাতে ধন চুরি গেলো এ লজ্জা তো যাবে না ॥

সর্বদা হাকিমের তরে আর্জি করি বারে বারে।
লালন বলে আমার পানে একবার ফিরে চাইলে না ॥

৭০৯.
বড় নিগমেতে আছেন গোসাঁই।
যেখানে আছে মানুষ চন্দ্রসূর্যের বারাম নাই ॥

চন্দ্রসূর্য যে গড়েছে ডিম্বরূপে সেই ভেসেছে।
একদিনের হিল্লোলে এসে নিরঞ্জনের জন্ম হয় ॥

হাওয়াদ্বারী দেলকুঠরি মানুষ আছে স্বর্ণপুরী।
শূন্যকারে শূন্যপুরী মানুষ রয় মানুষের ঠাঁই ॥

আত্মতত্ত্ব পরমতত্ত্ব বৃন্দাবনে নিগূঢ় অর্থ।
লালন বলে নিগূঢ় পদার্থ সেই ধামেতে মানুষ নাই ॥

৭১০.
বারিযোগে বারিতলা খেলছে খেলা মনকমলে।
মনের খবর মন জানে না এ বড় আজব কারখানা
মত্তমদে জ্ঞান থাকে না হাত বাড়াই চাঁদ ধরবো বলে ॥

সর্বশাস্ত্রে আছে ঠেকা মন নিয়ে সব লেখাজোখা
কোথায় মনের ঘর দরজা কোথায় সে মনের রাজা
বয়ে বেড়াই পুঁথির বোঝা আপনারে আপনি ভুলে ॥

মনকমলে বাড়ে শশী জোয়ারভাটা দিবানিশি
অমাবস্যায় পূর্ণমাসী সুধা বর্ষে রাশি রাশি
মনের উপর সব কারসাজি মন জানে না সেই রূপলীলে ॥

বারি ভিয়ান যে করেছে গুরুকৃপা তাঁর হয়েছে
বহিছে কারণ্য বারি তাহেরে অটল বিহারী
লালন বলে মরি মরি মনেরে বুঝাই কোন ছলে ॥

৭১১.
বাড়ির কাছে আরশিনগর সেথায় এক পড়শি বসত করে।
আমি একদিনও না দেখিলাম তাঁরে ॥

গেরাম বেড়ে অগাধ পানি তাঁর নাই কিনারা নাই তরণী পারে।
বাঞ্ছা করি দেখবো তাঁরে কেমনে সেথায় যাইরে ॥

বলবো কী সেই পড়শির কথা তাঁর হস্তপদ স্কন্ধমাথা নাইরে।
ক্ষণেক ভাসে শূন্যের উপর ক্ষণেক ভাসে নীরে ॥

পড়শি যদি আমায় ছুঁতো যম যাতনা সকল যেতো দূরে।
সে আর লালন একখানে রয় লক্ষ যোজন ফাঁকরে ॥

৭১২.
বিষমরাগের করণ করা।
চন্দ্রকান্ত যোগ মাসান্ত জানে কেবল রসিক যাঁরা ॥

ফণীর মুখে রসিক ভেয়ে আছে সদাই নির্ভয় হয়ে।
হুতাশন শীতল করিয়ে অনলেতে দিয়ে পারা ॥

যোগমায়া রূপ যোগের স্থিতি দ্বিদলে হয় তাঁর বসতি।
জানে যদি কোনো ব্যক্তি হও তবে জ্যান্তে মরা ॥

সিরাজ শাঁই দরবেশে বলে লালন ডুবে থাক গা সিন্ধুজলে।
তাতে অঙ্গ শীতল হলে হবি চন্দ্রভেদী রসিক তোরা ॥

৭১৩.
বিষামৃত আছেরে মাখাজোখা।
কেউ জানে না কেউ শোনে না যায় না জীবের দেলের ধোঁকা ॥

হিংসা নিন্দা তম: গেলে আলো হয় তার হৃৎকমলে।
অধমে উত্তম লীলে গুরু যারে হয়রে সখা ॥

মায়ের স্তনে শিশু ছেলে দুগ্ধ খায় তার দুগ্ধ মেলে।
সেই ধারাতে জোঁক লাগিলে রক্তনদী যায় দেখা ॥

গাভীর ভাণ্ডে গোরোচনা গাভী তার মর্ম জানে না।
সিরাজ শাঁই কয় লালন কানা তেমনই একটা বোকা ॥

৭১৪.
ভাবের উদয় যেদিন হবে।
সেদ্দিন হৃৎকমলে রূপ ঝলক দেবে ॥

ভাবশূন্য হইলে হৃদয় বেদ পড়িলে কী ফল হয়।
ভাবের ভাবী থাকলে সদাই গুপ্তব্যক্ত সব জানা যাবে ॥

দ্বিদলে সহস্রদল একরূপে করেছে আলো।
সেইরূপে যে নয়ন দিলো মহাকাল শমনে কী করিবে ॥

অদৃশ্যসাধন করা যেমন আঁধার ঘরে সর্প ধরা।
লালন কয় সে ভাবুক যাঁরা জ্ঞানের বাতি জ্বেলে সে চরণ পাবে ॥

৭১৫.
ভুলবো না ভুলবো না বলি কাজের বেলায় ঠিক থাকে না।
আমি বলি ভুলবো নারে স্বভাবে ছাড়ে না মোরে
কটাক্ষে মন পাগল করে দিব্যজ্ঞানে দিয়ে হানা ॥

সঙ্গগুণে রঙ্গ ধরে জানলাম কার্য অনুসারে
কুসঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে সুমতি মোর গেলো ছেড়ে
খাবি খেলাম আপায় পড়ে এ লজ্জা মলেও যায় না ॥

যে চোরের দায় দেশান্তরী সে চোর হলো সঙ্গধারী
মদনরাজার ডঙ্কা ভারি কামজ্বালা দেয় অন্তপুরী
ভুলে যায় মোর মনকাণ্ডারি কী করবে গুরুজনা ॥

রঙ্গে মেতে সঙ সাজিয়ে বসি আছি মগ্ন হয়ে
সুসঙ্গের সঙ্গ করে জানতাম যদি সুসঙ্গেরে
লালন বলে তবে কিরে ছ্যাঁচড়ে মারে মালখানা ॥

৭১৬.
মকর উল্লার মকর কে বুঝতে পারে।
আপনি আল্লাহ্ আপনি নবি আপনি আদম নাম ধরে ॥

পরওয়ারদিগার মালিক সবার ভবের ঘাটে পারের কাণ্ডার।
তাতে করিম রহিম নাম তাঁর প্রকাশ সংসারে ॥

কোরান বলেছেন খাঁটি অলিয়েম মোর্শেদা নামটি।
আহাদে আহমদ সেটি মিলে কিঞ্চিৎ নজিরে ॥

আলিফ যেমন লামে লুকায় আদম রূপ তেমনই দেখায়।
লালন বলে ভাব জানতে হয় মুর্শিদের জবান ধরে ॥

৭১৭.
মধুর দেলদরিয়ায় যেজন ডুবেছে।
সে যে সব খবরের জবর হয়েছে ॥

অগ্নি যৈছে ভস্মে ঢাকা অমৃত গরলে মাখা সে রূপে স্বরূপ আছে।
রসিক সুজন ডুবায়ে মন তাঁর অন্বেষণ পেয়েছে ॥

যে স্তনের দুগ্ধ শিশুতে খায় জোঁকে মুখ লাগালে সেথায় রক্ত পায় গো সে।
অধমে উত্তম উত্তমে অধম যে যেমন দেখতেছে ॥

দুগ্ধে জল মিশালে যেমন রাজহংসে করে ভক্ষণ সেই দুগ্ধ বেছে।
সিরাজ শাঁই ফকির বলে সব ফিকির লালন বেড়াস না খুঁজে ॥

৭১৮.
মন আমার কুসর মাড়াই জাঠ হলোরে।
চিরদিন গুতায় পেড়ে আঁটলো নারে ॥

কতো রকম করি দমন কতোই করি বন্ধন ছন্ধন।
কটাক্ষে মাতঙ্গ মন কখন যেন যায়রে সরে ॥

কপালের ফ্যার নইলে আমার লোভের কুকুর হই কি এবার।
মনগুণে কী জানি হয় কখন যেন কী ঘটেরে ॥

মলয় পর্বতে কাষ্ঠের সবে সার হয় হয় না বাঁশের।
লালন বলে মনের দোষে আমার বুঝি তাই হলোরে ॥

৭১৯.
মন আমার গেলো জানা।
কারো রবে না এ ধন জীবন যৌবন তবেরে কেন মন এতো বাসনা।
একবার সবুরের দেশে বয় দেখি দম কসে উঠিস নারে ভেসে পেয়ে যন্ত্রণা ॥

যে করলো কালার চরণেরই আশা জানো নারে মন তার কী দুর্দশা।
ভক্তবলী রাজা ছিলো রাজত্ব তার নিলো বামনরূপে প্রভু করে ছলনা ॥

প্রহলাদ চরিত্র দেখো দৈত্যধামে কতো কষ্ট পেলো এক কৃষ্ণনামে।
তারে অগ্নিতে পোড়াইল জলে ডুবাইল তবু না ছাড়িল শ্রীনাম সাধনা ॥

কর্ণরাজা ভবে বড়দাতা ছিলো অতিথিরূপে তার সবংশ নাশিল।
আপন পুত্রকে অতিথি সেবায় দিলো তবু কর্ণ অনুরাগী না হইল শোকই
অতিথির মন সে করেন সান্ত্বনা ॥

রামের ভক্ত লক্ষণ ছিলো সর্বকালে শক্তিশেল হানিল তার বক্ষস্থলে।
তবু রামচন্দ্রের প্রতি না ছাড়িল ভক্তি লালন বলে করো এ বিবেচনা ॥

৭২০.

মন আমার চরকা ভাঙ্গা টেকো এড়ানে।
টিপে সোজা করবো কতো আর তো প্রাণে বাঁচিনে ॥

একটি আঁটি আর একটি খসে বেতো চরকা লয়ে যাবো কোনদেশে।
একটি কল তার বিকল হলে সারতে পারে কোনজনে ॥

ছুতোর ব্যাটার গুণ পরিপাটি ষোলোকলে ঘুরায় টেকোটি।
আর কতোকাল বইবো এ হাল এ বেতো চরকার গুণে ॥

সামান্য কাঠ পাটের চরকা হয় খসলে খুঁটো খেটে আঁটা যায়।
মানবদেহ চরকা সে হয় লালন কী তার ভেদ জানে ॥

৭২১.

মনচোরারে কোথা পাই।
কোথা যাই মনরে আজ কিসে বোঝাই ॥

নিষ্কলঙ্ক ছিলাম ঘরে কি বা রূপ নয়নে হেরে প্রাণে তো আর ধৈর্য নাই।
ও সে চাঁদ বটে কি মানুষ দেখে হলাম বেঁহুশ
থেকে থেকে ঐরূপ মনে পড়ে তাই ॥

রূপের কালে আমায় দংশিলে ঐ বিষ উঠিল ধেয়ে ব্রহ্মমূলে
কেমনে সেই বিষ নামাই।
ঐ বিষ গাঁঠরি করা না যায় হরা কী করিবে সে কবিরাজ গোঁসাই ॥

মন বুঝে ধন দিতে পারে কে আছে এই ভাবনগরে
কার কাছে এই প্রাণ জুড়াই।
যদি গুরু দয়াময় এই অনল নিভায় লালন বলে সেই তো উপায় ॥

৭২২.

মনচোরারে ধরবি যদি ফাঁদ পাতো আজ ত্রিবিনে।
অমাবস্যা পূর্ণিমাতে বারমখানা সেইখানে ॥

ত্রিবিনের ত্রিধারা বয় তার ধারা চিনে ধরতে পারলে হয়
কোন ধারায় তার সদাই বিহার হচ্ছে ভাবের ভুবনে ॥

সামান্যে কি যায় তাঁরে ধরা অষ্টপ্রহর দিতে হয় প্রহরা।
কখন সে ধারায় মেশে কখন রয় নির্জনে ॥

শুক্লপক্ষে ব্রহ্মাণ্ডে গমন কৃষ্ণপক্ষে যায় নিজ ভুবন।
লালন বলে সে রূপলীলে দিব্যজ্ঞানী সেই জানে ॥

৭২৩.
মন জানে না মনের ভেদ এ কী কারখানা।
এ মনে ও মন করছে ওজন কোথা সে মনের থানা ॥

মন দিয়ে মন ওজন করায় দুই মনে এক মন লেখে খাতায়।
তাঁরে ধরে যোগসাধনে কর গে মনের নিশানা ॥

মন এসে মন হরণ করে লোকে সদাই ঘুম বলে তারে।
কতো আনকা শহর আনকা নহর ভ্রমিয়ে দেখায় তৎক্ষণা ॥

সদাই যে মন বাইরে বেড়ায় বন্ধ সে তো রয় না আড়ায়।
লালন বলে সন্ধি জেনে কর গে মনের ঠিকানা ॥

৭২৪.
মনদুঃখে বাঁচি না সদাই।
সাড়ে তিন কাঠা জমি প্রমাণ তাই ॥

কোনদিকে হয় খুশির বাগান কতোখানি হয় তার পরিমাণ।
কতোখানি তার অতীতপতিত কতোখানি সে জলাশয় ॥

কে বা করে দফাদারি কে বা করে চৌকিদারি।
তার হিসাব রাখে কোন কাচারি সবসময় ॥

বত্রিশ ফুল কারে বলে দেহের বাও-বাতাস কোনদিক চলে
ফকির লালন কয় দেহের মূল কোনদিকে রয় ॥

৭২৫.
মন দেহের খবর না জানিলে মানুষরতন ধরা যায় না।
আপনদেহে মানুষ আছে করো তাঁহার ঠিকানা ॥

জীবাত্মা ভূতাত্মা পরমাত্মা আত্মারাম।
আত্মারামেশ্বর দিয়ে পঞ্চমাত্মা দড় হয় এদের চেনা ॥

দলপদ্মে রঙ দেখলে পরে তবেই চেনা যাবে আপনারে।
অন্যে কী তাই বলবে তোরে করো গুরুর সাধনা ॥

ঘুমায় যখন এই মানুষে মনমানুষ রয় কোনদেশে।
লালন বলে পেয়ে দিশে এমন অমূল্যধন দেখলে না ॥

৭২৬.
মন বাতাস বুঝে ভাসাওরে তরী।
তেহাটা ত্রিবেণীর তোড় তুফান ভারি ॥

একে অসার কাষ্ঠের নাও তাতে বিষম বদ হাওয়াও।
কুপাকে কুপ্যাঁচে পড়ে প্রাণে মরি ॥

মহাজনের ধন এনে ডুবাইলাম এই ত্রিবিনে।
মাড়ুয়া বাঁদীর মতো বুঝি যাই ধরা পড়ি ॥

কতো কতো মহাশয় সেই নদীতে মারা যায়।
লালন বলে বুঝবোরে মন তোর মাঝিগিরি ॥

৭২৭.
মনরে আত্মতত্ত্ব না জানিলে।
ভজন হবে না পড়বি গোলে ॥

আগে জান গে কালুল্লা আইনাল হক আল্লাহ যাঁরে মানুষ বলে।
পড়ে ভূত মন আর হোসনে বারংবার একবার দেখ না প্রেমনয়ন খুলে ॥

আপনি শাঁই ফকির আপনি হয় ফিকির ও সে লীলার ছলে।
আপনারে আপনি ভুলে রাব্বানি আপনি ভাসে আপন প্রেমজলে ॥

লা ইলাহা তন ইল্লাল্লা হু জীবন আছে প্রেম যুগলে।
লালন ফকির কয় যাবি মন কোথায় আপনারে আজ আপনি ভুলে ॥

৭২৮.
মনরে কবে ভবে সূর্যের যোগ হয় করো বিবেচনা।
চন্দ্রকান্ত যোগ মাসান্ত ভবে আছে জানা ॥

যে জাগে সেই যোগের সাথে অমূল্যধন পাবে হাতে।
ক্ষুধাতৃষ্ণা যাবে তাতে এমন ধন খুঁজলে না ॥

চন্দ্রকান্তি সূর্যকান্তি ধরে আছে আলকপন্তি।
যুগলেতে হলে একান্তি পাবে উপাসনা ॥

অখণ্ড উল্লাসরতি রসিকের প্রাণরসের গতি।
লালন ভেবে কয় সম্প্রতি দেহ খুঁজে দেখো না ॥

৭২৯.
মনরে দ্বীনের ভাব যেই ধারা শুনলেরে জীবন অমনই হয় সারা।
ও সে মরার সঙ্গে মরে ভাবসাগরে ডুবতে যদি পারে রসিক তারা ॥

অগ্নি ঢাকা যৈছে ভস্মের ভিতরে সুধা তৈছে গরলে হল করে।
কেউ সুধার লোভে যেয়ে মরে গরল খেয়ে মন্থনে সুতাক না জানে যারা ॥

দুধে ননীতে মিলন সর্বদা মন্থনদণ্ডে করে আলাদা।
মনরে তেমনই ভাবের ভাবে সুধানিধি পাবে মুখের কথা নয়রে সে ভাব করা ॥

যে স্তনেতে দুগ্ধ খায়রে শিশুছেলে জোঁকের মুখে সেথা রক্ত এসে মেলে।
অধীন লালন ভেবে বলে বিচার করিলে কুরসে সুরস মেলে সেই ধারা ॥

৭৩০.
মনরে সামান্যে কি তাঁরে পায়।
শুদ্ধপ্রেম ভক্তির বশ দয়াময় ॥

কৃষ্ণের আনন্দপুরে কামী লোভী যেতে নারে।
শুদ্ধভক্তি ভক্তের দ্বারে সে চরণকমল নিকটে রয় ॥

বাঞ্ছা থাকলে সিদ্ধি মুক্তি তারে বলে হেতুভক্তি।
নিহেতু ভক্তের রতি সবে মাত্র দীননাথের পায় ॥

ব্রজের নিগূঢ়তত্ত্ব গোঁসাই শ্রীরূপে সব জানালে তাই।
লালন বলে মোর সাধ্য নাই সাধলে সেমতো রসিক মহাশয় ॥

৭৩১.
মনের মানুষ খেলছে দ্বিদলে।
যেমন সৌদামিনী মেঘের কোলে ॥

রূপ নিরূপণ হবে যখন মনের মানুষ দেখবি তখন।
জনম সফল হবে ও মন সে রূপ দেখিলে ॥

আগে না জেনে উপাসনা আন্দাজি কি হয় সাধনা।
মিছে কেবল ঘুরে মরা মনের গোলমালে ॥

সেই মানুষ চিনলো যাঁরা পরম মহাত্মা তাঁরা।
অধীন লালন বলে দেখ নয়ন খুলে ॥

৭৩২.
মনেরে আর বুঝাবো কতো।
যেপথে মরণফাঁসি সেইপথে মন সদাই রত।

যে জলে লবণ জন্মায় সেই জলে লবণ গলে যায়।
তেমনই আমার মন মনুরায় দিবানিশি হচ্ছে হত ॥

চারের লোভে মৎস্যে গিয়ে জালের উপর পড়ে ঝাঁপিয়ে।
তেমনই আমার মন ভেয়ে মরণফাঁসি নিচ্ছে সে তো ॥

সিরাজ শাঁই দরবেশের বাণী বুঝবি লালন দিনি দিনি।
ভক্তিহারা ভাবুক যিনি সে কী পাবে গুরুর পদ ॥

৭৩৩.
মনেরে বুঝাইতে আমার দিন হলো আখেরি।
বোঝে না মন আপন মরণ এ কী অবিচার ॥

ফাঁদ পাতিলাম শিকার বলে সে ফাঁদ বাঁধলো আপন গলে।
এ লজ্জা কি যাবে ধুলে এই ভবের কাচারি ॥

পর ধরতে যাই লোভ দেখে আপনি লোভে পড়ি যেয়ে।
হাতের মামলা হারায়ে শেষে কেঁদে ফিরি ॥

ছায়ের জন্যে আনলাম আদার আদারে ছা খেলো এবার।
লালন বলে বুঝলাম আমার ভগ্নদশা ভারি ॥

৭৩৪.
মরে ডুবতে পারলে হয়।
মরে যদি ভেসে ওঠে সে মরার ফল কী তায় ॥

মরা তো অনেকে মরে ডোবা কঠিন হয় গভীরে।
মৃত্তিকাহীন সরোবরে থাকলে স্বরূপ রূপাশ্রয় ॥

মরণের আগেতে মরা প্রেমডুবারু হয়ে তারা।
সে জানতে পায় অধর ধরা অঠাঁইয়ে দিয়ে ঠাঁই ॥

ডোবে না মন ওঠে ভেসে ডুবতে চায় গলায় কলসি বেঁধে।
অধীন লালন বলছে কেঁদে না জানি শাঁই কোন্ ঘাটে লাগায় ॥

৭৩৫.
মাঝি ভাই উজানে চালাও তরী।
ওরে অকূল সমুদ্দুরই ॥

গঙ্গা যমুনাদি আর সরস্বতী নদী।
উঠছে কেউ পাতালভেদী হায়রে হায় মরি ॥

ভাটি বাঁকে পাকের গোলায় কতোজন তরী ডুবায়।
সামাল সামাল মনুরায় থেকো হুঁশিয়ারই ॥

অনুরাগের মাস্তুলেতে ভাবকাপড় লাগাও তাতে।
লালন কয় জ্ঞানকুপিতে বাঁধো ভক্তির ডুরি ॥

৭৩৬.
মানুষ ধরোরে নিহারে।
তাঁর মন নয়নে যোগযোগ করে ॥

নিহারায় চেহারা বন্দি করোরে করো একান্তি
সাড়ে চব্বিশ জেলায় খাটাও পন্তি পালাবে সে কোন শহরে।
ত্বরায় দারোগা হয়ে করো বাতাবন্দি স্বরূপ মন্দিরে ॥

স্বরূপে আসন যাঁহার পবন হিল্লোলে বিহার
পক্ষান্তরে দেখো এবার দিব্যচক্ষু বিকাশ করে।
দুপক্ষেতে খেলছে খেলা নরনারী রূপ ধরে ॥

অমাবস্যা পূর্ণমাসী তাহে মহাযোগ প্রকাশি
ইন্দ্র চাঁদ বায়ু বরুণাদি সে যোগে বাঞ্ছিত আছেরে।
সিরাজ শাঁই বলে মূঢ় লালন মানুষ সাধো প্রেমনীরে ॥

৭৩৭.
মানুষ মানুষ সবাই বলে।
আছে কোন কোন মানুষের বসত কোন কোন দলে ॥

অযোনি সহজ সংস্কার কার সঙ্গে কি সাধবো এবার।
না জানি কেমন প্রকার বেড়াই হরিবোল বলে ॥

সংস্কারসাধন না জানি কী সে সহজ কী সে অযোনি।
না জানি তার ভাবকরণই আগন্তু এই মানুষলীলে ॥

তিন মানুষের করণ বিচক্ষণ জানলে হয় এক নিরূপণ।
তাই না বুঝে অবোধ লালন পড়েছে বিষম গোলমালে ॥

৭৩৮.
মানুষ লুকায় কোন শহরে।
এবার খুঁজি মানুষ পাইনে তাঁরে ॥

ব্রজ ছেড়ে নদীয়ায় এলো তাঁর পূর্বাপর খবর ছিলো।
এবার নদীয়া ছেড়ে কোথায় গেলো যে জানে সে বলো মোরে ॥

স্বরূপে সে রূপ দেখা যেমন চাঁদের আভা।
এমনই মতো থেকে কে বা প্রভু ক্ষণে ক্ষণে বারাম দেয়রে ॥

কেউ বলে তাঁর নিজ ভজন লয়ে নিজদেশে গমন।
মনে মনে ভাবে লালন সেই নিজদেশ বলি কারে ॥

৭৩৯.
মানুষের করণ সে নয় সাধারণ জানে কেবল রসিক যাঁরা।
টলে জীব বিবাগী অটল ঈশ্বর রাগী
সেও রাগ লিখলেন বৈদিক রাগেরই ধারা ॥

যদি ফুলের সন্ধিঘরে বিন্দু পড়ে ঝরে
আর কি রসিক ভাই হাতে পায় তাঁরে
যেজন নীরে ক্ষীর মিশায় সে পড়ে দুর্দশায়
না মিশালে হেমাঙ্গ বিফলপারা ॥

হলে বাণে বাণক্ষেপণা বিষের উপার্জনা
অধোপথে গতি উভয় শেষখানা
পঞ্চবাণের ছিলেপ্রেমাস্ত্রে কাটিলে
তবে হবে মানুষের করণ সারা ॥

সেই রসিক শিখরে যে মানুষ বাস করে
হেতুশূন্যকরণ সেই মানুষের দ্বারে
নিহেতু বিশ্বাসে মিলে সে মানুষে
লালন ফকির হেতুকামে যায় মারা ॥

৭৪০.
মিলন হবে কতোদিনে।
আমার মনের মানুষের সনে ॥

চাতক প্রায় অহর্নিশি চেয়ে আছে কালোশশী।
হবো বলে চরণদাসী তা হয় না কপালগুণে ॥

মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন লুকালে না পায় অন্বেষণ।
কালারে হারায়ে তেমন ঐরূপ হেরি এ দর্পণে ॥

ঐ রূপ যখন স্মরণ হয় থাকে না লোকলজ্জার ভয়।
লালন ফকির ভেবে বলে সদাই ও প্রেম যে করে সেই জানে ॥

৭৪১.
মীনরূপে শাঁই খেলে।
প্রেমডুবারু না হলে মীন বাঁধবে নারে জালে ॥

জেলে জুতেল বর্শেলাদি ভ্রমিয়ে চার যুগাবধি কেউ না তাঁরে পেলে।
খাড় করে মীন রয় চিরদিন প্রেমসন্ধিস্থলে ॥

ত্রিবিনের তীরসন্ধি খুলতে পারে সেহি বন্দি প্রেমডুবারু হলে।
তবে তো মীন আসবে হাতে আপনার আপনি চলে ॥

স্বরূপশক্তি প্রেমসিন্ধু মীন অবতার দীনবন্ধু সিরাজ শাঁই তাই বলে
শোনরে লালন ম'লি এখন গুরুতত্ত্ব ভুলে ॥

৭৪২.
মুখের কথায় কি চাঁদ ধরা যায় রসিক না হলে।
সে চাঁদ দেখলে অমনি ত্রিজগত ভোলে ॥

শঙ্খরসের উপাসনা না জানিলে রসিক হয় না।
গাভীর ভাণ্ডে গোরোচনা নানা শস্য যাতে ফলে ॥

মনমোহিনীর মনোহরা যে রসে পড়েছে ধরা।
জানতে পারে রসিক যাঁরা অহিমুণ্ডে উভয় ধীর হলে ॥

নিগূঢ়প্রেম রসরতির কথা জেনে মুড়াও মনের মাথা।
কেন লালন ঘুরছো বৃথা শুদ্ধ সহজ রাগের পথ ভুলে ॥

৭৪৩.
মুর্শিদ জানায় যারে মর্ম সেই জানতে পায়।
জেনে শুনে রাখে মনে সে কি কারো কয় ॥

নিরাকার হয় অচিন দেশে আকার ছাড়া চলে না সে।
নিরন্তর শাঁই অন্ত যাঁর নাই যে যা ভাবে হয় ॥

মুন্সিলোকের মুন্সিগিরি রস নাহি তার ফষ্টি ভারি।
আকার নাই যার বরজোখ আকার বলে সর্বদাই ॥

নূরেতে কুল আলম পয়দা আবার বলে পানির কথা।
নূর কী পানি বস্তু জানি লালন ভাবে তাই ॥

৭৪৪.
মুর্শিদতত্ত্ব অথৈ গভীরে।
চার রসের মূল সেই রস রসিকে জানতে পারে ॥

চার পথের চার নায়ক জানি খাক আতশ পবন পানি।
মুর্শিদ বলে কারে মানি দেখো দেখি হিসাব করে ॥

শরিয়ত তরিকত আর যে মারেফত হকিকত লিখেছে।
এ চার ছাড়া পথ আছে জানে দরবেশ ফকিরে ॥

পনেরো পোয়া দেহের বলন করতে যদি পারো লালন।
তবে স্বদেশের চলন জানবি সেই অনুসারে ॥

৭৪৫.
মুর্শিদ ধনী গুণমণি গোপনে র'লো।
তাঁরে চেনা না গেলো ॥

চার যুগে সে রয় গোপনে দেখা নাই তাঁর করো সনে
ব্রহ্মা বিষ্ণু না পায় ধ্যানে মুনিগণে ঘুরে ম'লো।
নূরনবিকে মেহের করে আপনি দিদার দিল ॥

ইঞ্জিল তৌরা জব্বুর কোরান চার কোরান করলেন সোবহান
কোনটা তাঁর করলেন নিশান তার প্রমাণ জগতে আর কী র'লো।
সে কখন কোন ধ্যানে থাকে কিছুই না জানা গেলো ॥

সাধুর জবানে শুনি ধরাতে আছেন ধনী
কথা কয় না গুণমণি চেনা বিষম দায় হলো।
ভেবে লালন বলে ম'লাম ঘুরে মানবজনম অসার হলো ॥

৭৪৬.
মুরশিদ বিনে কী ধন আর আছেরে মন এই জগতে।
যে নামে শমন হরে তাপিত অঙ্গ শীতল করে
ভববন্ধনজ্বালা যায় গো দূরে জপ ঐ নাম দিবারাতে ॥

মুরশিদের চরণের সুধা পান করিলে যাবে ক্ষুধা
করো না কেউ দেলে দ্বিধা যেহি মুর্শিদ সেহি খোদা
ভজো অলিয়েম মোর্শেদা আয়াত লেখা কোরানেতে ॥

আপনি আল্লাহ্ আপনি নবি আপনি হন আদম সফি
অনন্ত রূপ করে ধারণ কে বোঝে তাঁর লীলার কারণ
নিরাকারে শাঁই নিরঞ্জন মুর্শিদ রূপ হয় ভজন পথে ॥

কুল্লে সাইয়ুন মোহিত আলা কুল্লে সাইয়ুন কাদির
পড়ো কোরান লেহাজ করো তবে সে ভেদ জানতে পারো
কেন লালন ফাঁকে ফেরো ফকির নাম পাড়াও মিছে ॥

৭৪৭.
মূল হারালাম লাভ করতে এসে দিয়ে ভাঙা নায়ে বোঝায় ঠেসে।
জনমভাঙা তরী আমার বল ফুরালো জলসেঁচে ॥

গলুই ভাঙ্গা জলুই খসা বরাবরই এমনই দশা।
গাবকালিতে যায় না কসা কী করি তার নাই দিশে ॥

কতো ছুতোর ডেকে আনি সারিতে এই ভাঙ্গা তরণী।
এক জা'গায় খোঁচ গড়তে অমনি আর এক জাগায় যায় ফেঁসে

যে ছুতোরের নৌকা গঠন তাঁরে যদি পেতাম এখন।
লালন বলে মনের মতোন সারতাম তরী তাঁর কাছে ॥

৭৪৮.
মূলের ঠিক না পেলে সাধন হয় কিসে।
কেউ বলেরে শ্রীকৃষ্ণ মূল কেউ বলে মূলব্রহ্ম সে ॥

ব্রহ্ম ঈশ্বর দুই তো লেখা যায় সাধ্যমতো।
উঁচানিচা কি তার তো করিতে হয় সেই দিশে ॥

কোথা যাই কি বা করি বললে কী হয় গোলে হরি।
লালন কয় এক জানতে নারি তাইতে বেড়ায় মন ভেসে ॥

৭৪৯.
ম্যারে শাঁইর আজব কুদরতি কেউ বুঝতে নারে।
আপনি রাজা আপনি প্রজা এই ভবের উপরে ॥

আহাদ রূপে লুকায় হাদি আহ্‌মদী রূপ ধরে।
এ মর্ম না জেনে বান্দা পড়বি ফেরে ॥

বাজিকর পুতুল নাচায় কথা কওয়ায় আপনি তারে।
জীবদেহ শাঁই চলায় ফেরায় সেই প্রকারে ॥

আপনারে চিনবে যেজন পৌঁছবে সেজন ভেদের ঘরে।
সিরাজ শাঁই কয় লালন কী আর বেড়াও ঢুঁড়ে ॥

৭৫০.
মোরাকাবা মোশাহেদায় আশেকজনা মশ্‌গুল রয়।
ফানা ফিল্লায় দাখিল হলে ইরফানি কোরান তাঁরে শোনায় ॥

আবির কুবির জানলে পরে চাররঙ যায় আপনি সরে।
শেষে আবার লালরঙ ধরে তারে কি হাতে ধরা যায় ॥

নফ্‌সের জ্যোতি আসলে পরে বিজলীর চটক ঝরে।
যে নফ্‌সসাধন না করে তারে কি সাধক বলা যায় ॥

আদ্যরূপ পুরা নফ্স জারি সামাল হলে হয় ফকিরি।
লালন বলে হায় কী করি বলো কোথা যাই ॥

৭৫১.
যদি উজান বাঁকে তুলসী ধায়।
খাঁটি তার পূজা বটে চরণচাঁদে পায় ॥

তুলসীদেহ যতো ভাটিয়ে যায় ততো।
কোথায় সে অটল পদ তুলসী কোথায় ॥

তুলসী গঙ্গাজলে উজাবে কোনকালে।
মনতুলসী হলে অবশ্য পায় ॥

প্রেমের ঘাটে বসি ভাসাও মনতুলসী।
লালন কয় তারে দাসী লেখে খাতায় ॥

৭৫২.
যা যা ফানার ফিকির জান গে যারে।
যদি দেখতে বাঞ্ছা হয় সে চাঁদেরে ॥

না জানিলে ফানার ফিকিরি তার আর কিসের ফকিরি।
নিজে হও ফানা ভাবো রব্বানা দেখে শমন যাবে ফিরে ॥

নিজের রূপ মুর্শিদের রূপ মাঝার আগে ফানার বিধি জানো মন আমার।
পিছে মুর্শিদ রূপ মনরে সেরূপ মিশাও শাঁইর অটল নূরে ॥

ফানার ফিকির মুর্শিদের ঠাঁই তাইতে মুর্শিদভজন আইন ভেজিলেন শাঁই।
সিরাজ শাঁইয়ের কৃপায় অধীন লালন কয় যাজন কষ্ট শাঁইয়ের দ্বরে ॥

৭৫৩.
যাঁরে ধ্যানে পায় না মহামুনি।
আছে অচিন মানুষ মীনরূপে ধরিয়ে পানি ॥

করোরে সমুদ্র নির্ণয় কোন যোগে তাঁর কোন ধারা বয়।
যোগ চিনে ডুবলে সেথায় মীন ধরা যায় তখনই ॥

আজব রঙের মীন বটে সে সাত সুমুদ্দুর জুড়ে আছে।
সবই হাতের কাছে রয় চিনতে পারে কোন ধনী ॥

যোগ বুঝে মীন পড়ে ধরা জানে যোগী রসিক যাঁরা।
সিরাজ শাঁই কয় লালন গোড়া সেইঘাটে খায় চুবানি ॥

৭৫৪.
যাঁরে প্রেমে বাধ্য করেছি।
তারে কি আর আগলে রেখেছি ॥

যাবার সময় বলে যাবে থাকতে বললে থাকতে হবে।
নতুবা সে ফাঁকি দেবে আমি দম দিয়ে দম মেনেছি ॥

দমের সঙ্গে হাওয়ার প্রণয় দম ধরিলে সে ধরা দেয়।
আমি ঘরের দ্বার বন্ধ করে খেদ মিটায়ে বসেছি ॥

হেসে হেসে কমল তুলেছি মনপ্রাণ যাঁরে সঁপেছি।
লালন বলে কথায় কী মানুষ মেলে করণকারণেই সেরেছি ॥

৭৫৫.
যে আমায় পাঠালে এহি ভাবনগরে।
মনের আঁধারহরা চাঁদ সেই যে দয়াল চাঁদ আর কতোদিনে দেখবো তাঁরে ॥

কে দেবেরে উপাসনা করিরে আজ কী সাধনা।
কাশীতে যাই কি মক্কায় থাকি আমি কোথায় গেলে পাবো সেই চাঁদরে ॥

মনোফুলে পূজিব কি নামব্রহ্ম রসনায় জপি
কিসে দয়া তাঁর হবে পাপীর উপর অধীন লালন বলে তাইতে প'লাম ফ্যারে ॥

৭৫৬.
যেও না আন্দাজি পথে মনরসনা ॥
কুপ্যাচে কুপাকে পড়ে প্রাণে বাঁচবে না ॥

পথের পরিচয় করে যাও না মনের সন্দেহ মেরে।
লাভলোকসান বুদ্ধির দ্বারে যাবে জানা ॥

উজানভেটেন পথ দুটি দেখো নয়ন করে খাঁটি।
দাও যদি মন গড়াভাটি কুল পাবা না ॥

অনুরাগ তরণী করো ধার চিনে উজান ধরো।
লালন কয় সে করতে পারো মূল ঠিকানা ॥

৭৫৭.
যেখানে শাঁইর বারামখানা।
শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে দেখতে যেমন ভুজঙ্গনা ॥

যা ছুঁইলে প্রাণে মরি এ জগতে তাইতে তরি।
বুদ্ধিতে বুঝিতে নারি কী করি তার নাই ঠিকানা ॥

আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে দিব্যজ্ঞানী সেই হয়েছে।
কুবৃক্ষে সুফল ফলেছে আমার মনের ঘোর গেলো না ॥

যে ধনে উৎপত্তি প্রাণধন সেইধনের হলো না যতন।
অকর্মের ফল পাকায় লালন দেখে শুনে জ্ঞান হলো না ॥

৭৫৮.
যেজন গুরুর দ্বারে জাত বিকিয়েছে।
তার কি আর জাতের ভয় আছে ॥

সূতার টানে পুতুল যেমন নেচে ফেরে সারা জনম।
নাচায় বাঁচায় সেহি একজন গুরুনামে জগত জুড়েছে ॥

গুরুমাখা ত্রিজগতময় হাসিকান্না স্বর্গনরক হয়।
উত্তমম্লেচ্ছ কারে বলা যায় দেখো গভীরেতে বুঝে ॥

সকল পুণ্যের পুণ্যফল গুরু বিনে নাই সম্বল।
লালন কয় তার জনম সফল যেজন গুরুধন পেয়েছে ॥

৭৫৯.
যেজন দেখেছে অটল রূপের বিহার।
মুখে বলুক কিংবা নাই বলুক সে থাকে ঐ রূপনিহার ॥

নয়নে রূপ না দেখতে পায় নামমন্ত্র জপিলে কী হয়।
নামের তুল্য নাম পাওয়া যায় রূপে তুল্য কার ॥

নিহারে গোলমাল হলে পড়বি মন কুজনার ভোলে।
ধরবি কারে গুরু বলে তরঙ্গ মাঝার ॥

স্বরূপে রূপ রূপের ভেলা ত্রিজগতে করছে খেলা।
লালন বলে ও মনভোলা কোলের ঘোর যায় না তোমার ॥

৭৬০.
যেজন বৃক্ষমূলে বসে আছে।
তাঁর ফলের কী অভাব আছে ॥

কল্পবৃক্ষে যেজন বসে রয় বাঞ্ছা করলে সে ফল হাতে পায়
ভুবন জোড়া গাছের গোড়া মূল শিকড় তলাতে আছে ॥

গাছের গোড়ে বসে যে রয় চৌদ্দ ভূবন সে দেখতে পায়।
একুল ওকুল দুকুল যায় জনম হবে না পশুর মাঝে ॥

ডাল নাই তার পাতা আছে তিন ডালে জগত জুড়েছে।
লালন বলে ভাবিস মিছে ফুলছাড়া ফল রয়েছে ॥

৭৬১.
যেজন হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতেছে।
ঘুঁচেছে তার মনের আঁধার সে দিকছাড়া নিরিখ বেঁধেছে ॥

হাওয়া দমে বেম্বোভেলা অধর চাঁদ মোর করছে খেলা।
ঊর্দ্ধনালে চলাফেরা কলকাঠি তার ব্রহ্মদ্বারে আছে ॥

হাওয়া দ্বারী দমকুঠরি মাঝখানে অটল বিহারী।
শূন্যবিহার স্বর্ণপুরী সাধনবলে কেউ দেখেছে ॥

মন খুঁটো প্রেমফাঁসি পরে জ্ঞানশিকারী শিকার ধরে।
ফকির লালন কয় বিনয় করে সেভাব ঘটলো না মোর হৃদয় মাঝে

৭৬২.
যেজনা আছেরে সেই খুঁটো ধরে।
লাগবে না যাঁতার ঘিস লাগবে নারে ॥

দেখ না যাঁতার মাঝার খুঁটোর গোড়ায় ফাঁক আছে তার।
জানি না যাঁতার কী মার চাপান পায়রে ॥

আসমানজমিন করে একঠাঁই যেদিনে ঘুরাবেন শাঁই।
যার আছে খুটোর বল ভাই বাঁচবে সেরে ॥

থাকলে গুরুরূপের হিল্লায় অটল রূপ তারেই মিলায়।
তাই তো লালন ফকির কয় সে ভিন্ন নয়রে ॥

৭৬৩.
যে জানে ফানার ফিকির সেই তো ফকির।
ফকির হয় কি করলে নাম জিকির ॥

আছে এমতো ফানার ধরন জানতে হয় তার বিবরণ।
ফানা ফিল্লাহ্ ফানা ফির রসুল আখের ॥

আখেরে অকারণ হবি কানা প্রাপ্ত ফানা তাও হলো না।
মুড়িয়ে মাথা জেনে শুনে ফকিরি পথ করো জাহির ॥

ফানা হয় মুর্শিদের পদে যে মাওলারে পায় অনায়াসে।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমার ফকিরি নয় ফাঁক ফিকির

৭৬৪.
যেতে সাধ হয়রে কাশি কর্মফাঁসি বাঁধলো গলায়।
আর কতোদিন ঘুরবো এমন নাগরদোলায় ॥

হলোরে এ কী দশা মনের ঘোলায় সর্বনাশা।
ডুবলো ডিঙ্গি নিশ্চয় বুঝি জন্মনালায় ॥

বিধাতা দেয় বাজি কি বা মন পাজি ফ্যারে ফেলায়।
বাও না বুঝে বাই তরণী ক্রমে তলায় ॥

কলুর বলদ যেমন ঢেঁকে নয়ন পাকে চালায়।
অধীন লালন প'লো তেমনই পাকে হেলায় ফেলায় ॥

৭৬৫.
যেপথে শাঁই আসে যায়।
সামান্যে কী তাঁর মর্ম পায় ॥

নিচে উপর থরে থরে সাড়ে নয় দরজা ঘরে।
নয় দরজা তাঁর জানতে হয় সবার আদিদরজা চেনে যাঁরা সজ্ঞানী হয় ॥

এমনিরে সে নিগম পথ হাওয়া তাতে নাই যাতায়াত।
যদি ফাঁদ পেতে বসতে সেপথে সাধনসিদ্ধি হতো নিশ্চয় ॥

এমনিরে তাঁর আজব কীর্তি সুঁইয়ের ছিদ্রে চালায় হাতি।
সিরাজ শাঁই বলে নিগূঢ়ভেদ খুলে কোলের ঘোরে লালন ঘুরে বেড়ায় ॥

৭৬৬.
যেপথে শাঁই চলে ফেরে।
তাঁর খবর কে করে ॥

সেপথে আছে সদাই বিষম কালনাগিনীর ভয়
কেউ যদি আজগুবি যায় অমনি উঠে ছোঁ মারে
পলকভরে বিষ ধেয়ে তার ওঠে ব্রহ্মরন্ধ্রেরে ॥

যে জানে উল্টোমন্ত্র খাটিয়ে সেহিতন্ত্র
গুরুরূপ করে নজর বিষ ধরে সাধন করে
দেখে তার করণরীতি শাঁই দরদী দরশন দেবে তারে ॥

সেই যে অধর ধরা যদি কেউ চাহে তারা
চৈতন্য গুণীন যাঁরা গুণ শেখে তাঁদের দ্বারে
সামান্যে কি পারবি যেতে সেই কুকাপের ভিতরে ॥

ভয় পেয়ে জন্মাবধি সেপথে না যাও যদি
হবে না সাধন সিদ্ধি তাই শুনে নয়ন ঝরে
লালন বলে যা করেন শাঁই থাকতে হয় সেইপথ ধরে ॥

৭৬৭.
যে যা ভাবে সেইরূপ সে হয়।
রাম রহিম করিম কালা একই আল্লাহ্ জগতময় ॥

কুল্লে সাইয়ুন মোহিত খোদা আল কোরানে কয় সে কথা।
এ কথা যার নাইরে বিচার পড়ে গোল বাঁধায় ॥

আকার সাকার নাই নিরাকারে একে অন্তউদয় নির্জন ঘরে।
রূপ নিহারে এক বিনেরে তা কি দেখা যায় ॥

এক নিহারে দাও মন আমার ছাড়িয়ে দুন আল্লাহর।
লালন বলে একরূপ খেলে ঘটে পটে সব জায়গায় ॥

৭৬৮.
যে সাধন জোরে কেটে যায় কর্মফাঁসি।
জানবি যদি সাধন কথা হও গুরুর দাসী ॥

স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আর নপুংসক শাসন কর।
যে লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের উপর তাই প্রকাশি ॥

মারে মৎস্য না ছোঁয় পানি রসিকের তেমনই করণ।
আকর্ষণে আনে টানি শারদ শশী ॥

কারণ সমুদ্রের পারে গেলে পাবি অধর চাঁদেরে।
অধীন লালন বলে নইলে ঘুরে মরবি চৌরাশি ॥

৭৬৯.
রঙমহলে চুরি করে কোথা সে চোরের বাড়ি।
ধরতে পারলে সেই চোরেরে পায়ে দিতাম মনোবেড়ি ॥

সিংদরজায় চৌকিদার একজন অষ্টপ্রহর থাকে সচেতন।
কীরূপ ভাবে ভেল্কি মেরে চুরি করে কোন ঘড়ি ॥

ঘর বেড়িয়ে ষোলোজন সেপাই এক একজনের বলের সীমা নাই।
তারাও চোরেরে টের না পেলো কার হাতে দেবে দড়ি ॥

পিতৃধন সব নিলো চোরে নেংটিঝাড়া করলো মোরে।
লালন বলে একই কালে চোরের কী হলো আড়ি ॥

৭৭০.
রসের রসিক না হলে কে গো জানতে পায়।
কোথা সে অটলরূপে বারাম দেয় ॥

শূন্যভরে আসন করে পাতালপুরে বারাম দেয়।
অমনি সে গিয়ে পড়ে ফাঁকের মাঝখানায় ॥

মনচোরা চোর সেই যে নাগর তলে আসে তলে যায়।
উপর উপর বেড়ায় ঘুরে জীব সদাই ॥

তলে ঢোঁড়ো তলে খোঁজো তবে সে ভেদ জানতে পায়।
লালন বলে উচ্চমনের কার্য নয় ॥

৭৭১.
রাখলেন শাঁই কূপজল করে আন্ধেলা পুকুরে।
কবে হবে সজল বরষা চেয়ে আছি সেই ভরসা
আমার এই ভগ্নদশা ঘুঁচবে কতোদিন পরে
এবার যদি না পাই চরণ আবার কী পড়ি ফ্যারে ॥

নদীর জল কূপজল হয় বিল বাওড়ে পড়ে রয়
সাধ্য কী জল গঙ্গাতে যায় গঙ্গা না এলে পরে
তেমনি জীবের ভজন বৃথা তোমার দয়া নাই যারে ॥

যন্ত্রে পরিয়ে অন্তর রয় যদি লক্ষ বছর
যন্ত্রিক বিহনে যন্ত্র কভু না বাজতে পারে
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী সুবোল ধরাও আমারে ॥

পতিতপাবন নামটি শাস্ত্রে শুনেছি খাঁটি
পতিতকে না তরাও যদি কে ডাকবে ওই নাম ধরে
লালন বলে তরাও গো শাঁই এই ভবকারাগারে ॥

৭৭২.
রাগ অনুরাগ যার বাঁধা আছে তার সোনার মানুষ আলাপন হৃৎকমলে
বেদ-পুরাণ আদিরাগের অনুবাদী নব অনুরাগী তা দেয়রে ফেলে ॥

অনুরাগীর মন সদা সচেতন মণিহারা ফণীর মতোন।
দেখলে তাঁর মুখ হৃদয়ে বাড়ে সুখ অঙ্গ পরশিলে প্রেম উজ্জ্বলে ॥

অনুরাগীর নয়ন যেদিকে ফিরায় পূর্ণচন্দ্র রূপ ঝলক দেখতে পায়।
ক্ষণেক হাসে মন ক্ষণেক সচেতন ক্ষণেক ব্রহ্মাণ্ডের উপর যায়রে চলে

অনুরাগে সদাই যে করে আশা অনুরাগে হয় তার দশমদশা।
লালন ফকির বলে অনুরাগ না হলে কার কার্যসিদ্ধি হয় কোনকালে ॥

৭৭৩.
রূপের তুলনা রূপে।
ফণী মণি সৌদামিনী কি আর তাঁর কাছে শোভে ॥

যে দেখেছে সেই অটল রূপ বাক নাহি মেরেছে চুপ।
পার হলো সে এ ভবকূপ রূপের মালা হৃদয় জপে ॥

আমি বিদ্যে বুদ্ধিহানি ভজন সাধন নাহি জানি।
বলবো কী সে রূপ বাখানি মনমোহিনীর মনোকল্পে ॥

বেদে নাই সে রূপের খবর কেবল শুদ্ধপ্রেমে বিভোর।
সিরাজ শাঁই কয় লালনরে তোর নিজরূপে রূপ দেখ সংক্ষেপে ॥

৭৭৪.
লণ্ঠনে রূপের বাতি জ্বলছেরে সদাই।
দেখ নারে দেখতে যার বাসনা হৃদয় ॥

রতির গিরে ফস্কা মারা শুধুই কথার ব্যবসা করা।
তার কি হবে রূপ নিহারা মিছে গোল বাঁধায় ॥

যেদিন বাতি নিভে যাবে ভাবের শহর আঁধার হবে।
সুখপাখি সে পালাইবে ছেড়ে সুখালয় ॥

সিরাজ শাঁই বলেরে লালন স্বরূপ রূপে দিলে নয়ন
তবেই হবে রূপ দরশন পড়িসনে ধাঁধায় ॥

৭৭৫.
লিঙ্গ থাকলে সে কি পুরুষ হয়।
বারমাসে চব্বিশ পক্ষ তবে কেন ঘরখানি বয় ॥

মাসান্তে কলা ফেরে খোস ফেলে যায়গো সেরে।
থাকে সেই জায়গায় পড়ে সদানন্দে বারাম সদাই ॥

পুরুষ বলতে কুম্ভ ভারি এক বীজে হয় পুরুষনারী।
বারিতে সৃষ্টি কারবারি এক ফুলে দুইরঙ ধরায় ॥

পরশখানা ছিলো আসল সে জায়গায় বাঁধলো গোল।
লালন বলে গোলে হরিবোল বললে কী মর্ম পায় ॥

৭৭৬.
লীলা দেখে লাগে ভয়।
নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই ডাঙ্গায় বয়ে যায় ॥

ফুল ফোটে তাঁর গঙ্গাজলে ফল ধরেছে অচিন দলে।
ফলে ফুলে মুক্ত হলে তাতে কথা কয় ॥

আবহায়াত নাম গঙ্গা সে যে সংক্ষেপেতে কেউ দেখো বুঝে
পলকে পাউড়ি ভাসে পলকে শুকায় ॥

গাঙ্গজোড়া এক মীন সে গাঙ্গে খেলছে খেলা পরমরঙ্গে।
লালন বলে জল শুকালে মীন যাবে হাওয়ায় ॥

৭৭৭.
শহরে ষোলোজনা বম্বেটে।
করিয়ে পাগলপারা নিলো তারা সব লুটে ॥

রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি চোরের সে শিরোমণি।
নালিশ করিব আমি কোনখানে কার নিকটে ॥

ছয়জনা ধনী ছিলো তারা সব ফতুর হলো।
কারবারে ভঙ্গ দিলো কখন যেন যায় উঠে ॥

গেলো ধন মালনামায় খালি ঘর দেখি জমায়।
লালন কয় খাজনারই দায় কখন যেন যায় লাটে ॥

৭৭৮.
সাঁই আমার কখন খেলে কোন খেলা।
জীবের কি সাধ্য আছে গুণে পড়ে তাই বলা ॥

কখনো ধরে আকার কখনো হয় নিরাকার।
কেউ বলে আকারসাকার অপার ভেবে হই ঘোলা

অবতারঅবতারী সবই সম্ভব তাঁরই।
দেখোরে জগতভরি একচাঁদে হয় উজালা ॥

ভাণ্ডব্রহ্মাণ্ড মাঝে শাঁই বিনে কী খেল আছে।
ফকির লালন কয় নাম ধরে সে কৃষ্ণ করিম ও কালা ॥

৭৭৯.

শাঁইর লীলা বুঝবি ক্ষ্যাপা কেমন করে।
লীলার যাঁর নাইরে সীমা কোন সময় কোন রূপ সে ধরে ॥

আপনি ঘর আপনি ঘরী আপনি করেন রসের চুরি ঘরে ঘরে।
আপনি করে মেজিস্টারি আপন পায়ে বেড়ি পরে ॥

গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয় গর্তে গেলে কূপজল কয় বেদ বিচারে।
তেমনই শাঁইয়ের বিভিন্ন নাম জানায় পাত্র অনুসারে ॥

একে বয় অনন্ত ধারা তুমিআমি নাম বেওয়ারা ভবের 'পরে।
লালন বলে কে বা আমি জানলে ধাঁধা যেতো দূরে ॥

৭৮০.

শুদ্ধপ্রেম না দিলে ভজে কে তাঁরে পায়।
ও সে না মানে আচার না মানে বিচার শুদ্ধপ্রেমরসের রসিক দয়াময় ॥

জানো না মন শুকনা কাষ্ঠে কবে তার মালঞ্চ ফোটে।
প্রেম নাই যাহার চিত্তে তেমনই কাষ্ঠ সে পরসুখের জন্যে নিজপুত্র বলি দেয় ॥

সে প্রেমের রসিক যাঁরা ফণী যেমন মণিহারা।
দেখলে তাঁর মুখ হৃদয়ে বাড়ে সুখ সেই দয়াল চাঁদ তাহার থাকে সদয় ॥

যোগীন্দ্র মণীন্দ্রাদি যোগ সেধে না পায় নিধি।
শুদ্ধপ্রেম দিয়ে তাঁরে ভজে গোপীর দ্বারে
লালন বলে সে প্রেম ঘটবে কি আমায় ॥

৭৮১.

শুদ্ধপ্রেম রসিক বিনে কে তাঁরে পায়।
যার নাম আলক মানুষ আলকে রয় ॥

রসিক রস অনুসারে নিগূঢ়ভেদ জানতে পারে।
রতিতে মতি ঝরে মূলখণ্ড হয় ॥

নীরে নিরঞ্জন আমার আদি লীলা করে প্রচার।
হলে আপন জন্মের বিচার সব জানা যায় ॥

আপনায় জন্মলতা খোঁজ গে তাঁর মূলটি কোথা।
লালন বলে পাবে সেথা শাঁইয়ের পরিচয় ॥

৭৮২.
শুদ্ধপ্রেমরসের রসিক ম্যারে শাঁই।
শুনিলে পড়িলে কী আর তাঁরে পাই ॥

রোজাপূজা করলে সবে আত্মসুখের কার্য হবে।
শাঁইয়ের খাতায় কি সই পড়িবে মনে ভাবো তাই ॥

ধ্যানী জ্ঞানী মুনিজনা প্রেমের খাতায় সই পড়ে না।
প্রেম পিরিতির উপাসনা কোনো বেদে নাই ॥

প্রেমে পাপ কি পূণ্য হয়রে চিত্রগুপ্ত লিখতে নারে।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোরে তাই জানাই ॥

৭৮৩.
শুদ্ধপ্রেমরাগে ডুবে সদাই থাকরে আমার মন।
স্রোতে গা ঢালান দিও না রাগে বেয়ে যাও উজান ॥

নিভাইয়ে মদনজ্বালা অহিমুণ্ডে কর গে খেলা।
উভয় নিহার উর্ধ্বতলা প্রেমের এই লক্ষণ ॥

একটি সাপের দুটি ফণী দুইমুখে কামড়ালেন তিনি
প্রেমবাণে বিক্রম যিনি তাঁর সনে দাও রণ ॥

মহারস মুদিত কমলে প্রেমশৃঙ্গারে লওরে তুলে।
আত্মসামাল সেই রণকালে কয় ফকির লালন ॥

৭৮৪.
শুদ্ধপ্রেম সাধলো যাঁরা কামরতি রাখলো কোথা।
বল গো রসিক রসের মাফিক ঘুঁচাও আমার মনের ব্যথা ॥

আগে উদয় কামের রতি রস আগমন তাঁহে গতি।
সেই রসে করে স্থিতি খেলছে রসিক প্রেমদাতা ॥

মন জানে না রসের করণ জানে না সে প্রেমের ধরন।
জলসেচিয়ে হয়রে মরণ কথায় কেবল বাজি জেতা ॥

মনের বাধ্য যেজন আপনার আপনি ভোলে সে জন।
ভেবে কয় ফকির লালন ডাকলে সে তো কয় না কথা ॥

৭৮৫.

শুদ্ধপ্রেমের প্রেমিক যেজন হয়।
মুখে কথা কউক বা না কউক নয়ন দেখলে চেনা যায় ॥

রূপে নয়ন করে খাঁটি ভুলে যায় সে নামমন্ত্রটি।
চিত্রগুপ্ত তার পাপপুণ্যটি লিখতে নারে খাতায় ॥

মণিহারা ফণী যেমন প্রেমরসিকের দুটি নয়ন।
কী দেখে কী করে সেজন অন্ত নাহি পায় ॥

সিরাজ শাঁই কয় বারে বারে শোনরে লালন বলি তোরে।
মদনরসে বেড়াস ঘুরে সে ভাব তোর কই দাঁড়ায় ॥

৭৮৬.

শুনি মরার আগে ম'লে শমনজ্বালা ঘুঁচে যায়।
জান গা কেমন মরার কী রূপ জানাজা দেয় ॥

জ্যান্তে মারিয়ে সুজন দিয়ে খেলকা তাজ তহ্বন বেশ পরায়।
রুহ্ চাপা হয় কিসে তাঁর গোর হয় কোথায় ॥

মরার শৃঙ্গার ধরে উচিত জানাজা করে যে যথায়।
সেই মরা আবার মরিলে জানাজা হয় কোথায় ॥

কথায় হয় না সে রূপ মরা তাঁদের করণ বেদছাড়া সর্বদাই।
লালন বলে সম্‌ঝে পরো মরার হার গলায় ॥

৭৮৭.

শূন্যেতে এক আজব বৃক্ষ দেখতে পাই।
আড়ে দীঘে কতো হবে বলার কারো সাধ্য নাই ॥

সেই বৃক্ষের দুই পূর্ব ডাল এক ডালে প্রেম আরেক ডালে কাল।
চারযুগেতে আছে একই হাল নাই টলাটল রতিময় ॥

বলবো কিসে বৃক্ষের কথা ফুলে মধু ফলে সুধা।
এমন বৃক্ষ মানে যে বা তার বলিহারি যাই ॥

বিনা বীজে সেই যে বৃক্ষ ত্রিজগতের উপলক্ষ।
শাস্ত্রেতে আছে ঐক্য লালন ভেবে বলে তাই ॥

৭৮৮.

শ্রীরূপের সাধন আমার কই হলো।
শুধু কথায় কথায় এ জনম বিফলে গেলো ॥

রূপের দয়া হলো না মোরে ভক্তি নাই আমার এ অন্তরে।
দিন আখেরি কথার জোরে সকলই তোর ফুরালো ॥

শ্রীরূপের আশ্রিত যাঁরা অনা'সে প্রেম সাধলো তাঁরা।
হলো না মোর অন্ত সারা কপালে এই ছিলো ॥

এলো বুঝি কঠিন শমন নিকাশ কী করবো তখন।
তাইতো এবার অধীন লালন গুরুর দোহাই দিলো ॥

৭৮৯.
ষড়রসিক বিনে কে বা তাঁরে চেনে যাঁর নাম অধরা।
শাক্ত শক্তি বুঝে শৈব শিবে মজে বৈষ্ণবের বিষ্ণুরূপ নেহারা ॥

বলে সপ্তপন্তি মতো সপ্তরূপ ব্যাখ্যিত
রসিকের মন নয় তাতে রত।
রসিকের মন রসেতে মগন রূপরস জেনে খেলছে তারা ॥

হলে পঞ্চতত্ত্বজ্ঞানী পঞ্চরূপ বাখানি
রসিক বলে সেও তো নিলেন নিত্যগুণই।
বেদবিধিতে যাঁর লীলের নাই প্রচার নিগম শহরে শাঁইজি ম্যারা ॥

যেজন ব্রহ্মজ্ঞানী হয় সেও তো কথায় কয়
না দেখে নামব্রহ্ম সার করে হৃদয়।
রসিক স্বরূপ রূপ দর্পণে রূপ দেখে নয়নে লালন বলে রসিক দীপ্তকারা ॥

৭৯০.
সদাই সে নিরঞ্জন নীরে ভাসে
যে জানে সে নারীর খবর নীরঘাটায় তাঁরে খুঁজলে পায় অনা'সে ॥

বিনা মেঘে নীর বরিষণ করিতে হয় তাঁর অন্বেষণ।
যাতে হলো ডিম্বুর গঠন থাকিয়ে অবিম্বু বাসে ॥

যথা নীরের হয় উৎপত্তি সেই আবেশে জন্মে শক্তি।
মিলন হলো উভয় রতি ভাসলে যখন নিরাকারে এসে ॥

নীরে নিরঞ্জন অবতার নীরেতে করবে সংহার।
সিরাজ শাঁই তাই কয় বারেবার দেখরে লালন আত্মতত্ত্বে বসে ॥

৭৯১.
সদা মন থাকো বাহুঁশ ধরো মানুষ রূপ নিহারে।
আয়না আঁটা রূপের ছটা চিলেকোঠায় ঝলক মারে ॥

বর্তমানে দেখো ধরি নরদেহে অটলবিহারী।
মরো কেন হড়িবড়ি কাঠের মালা টিপে হারে ॥

স্বরূপ রূপে রূপকে জানা সেই তো বটে উপাসনা।
গাঁজায় দম চড়িয়ে মনা ব্যোমকালী আর বলিস নারে ॥

দেল ঢুঁড়ে দরবেশ যাঁরা রূপ নিহারে সিদ্ধ তাঁরা।
লালন কয় আমার ফেরা ডেংগুলিটি সার হলোরে ॥

৭৯২.
সদা সোহাগিনী ফকির সাধে কেউ কি হয়।
তবে কেন কেহ কেহ বেদাতসেদাত কয় ॥

যাঁর নাম সামা সেই তোরে গান কোরানেতে বলে এলহাম।
তা নইলে কি হাদিস কোরান রাগরাগিনী দেয় ॥

সৎগান যদি বেদাত হতো তবে কি সুরে ফেরেস্তা গাইতো।
চেয়ে দেখো নবিকে মেরাজের পথে নৃত্যগীতে নেয় ॥

আধখুটি পোন বাঙ্গালি ভাই ভাব না বুঝে গোল যে বাঁধায়।
গানের ভাববিশেষে ফল দেবেন শাঁই লালন ফকির কয় ॥

৭৯৩.
সপ্ততলা ভেদ করিলে হাওয়ার ঘরে যাওয়া যায়।
হাওয়ার ঘরে গেলে পরে অধর মানুষ ধরা যায় ॥

হাওয়াতে হাওয়া মিশায়ে যাওরে মন উজান বেয়ে।
জলের বাড়ি লাগবে নারে যদি গুরুর দয়া হয় ॥

গুরুপদে যার মন ডুবেছেরে সে কি ঘরে রইতে পারে
রত্ন থাকে যত্নের ঘরে কোন সন্ধানে ধরবি তায় ॥

মৃণালের পর আছে স্থিতি রূপের ছটা ধরবি যদি।
লালন কয় তাঁর গতাগতি সেইখানে চাঁদ উদয় হয় ॥

৭৯৪.
সবাই কি তাঁর মর্ম জানতে পায়।
যে সাধনভজন করে সাধক অটল হয় ॥

অমৃতমেঘের বরিষণ চাতকভাবে চায়রে মন।
তাঁর একবিন্দু পরশিলে শমনজ্বালা দূরে যায় ॥

যোগেশ্বরীর সঙ্গে যোগ করে মহাযোগ সেই জানতে পারে
তিন দিনের তিন মর্ম জেনে একদিনে সেধে লয় ॥

বিনা জলে হয় চরণামৃত যা ছুঁইলে যায় জরামৃত।
লালন বলে চেতনগুরুর সঙ্গ নিলে দেখায়ে দেয় ॥

৭৯৫.
সমঝে করো ফকিরি মনরে।
এবার গেলে আর হবে না পড়বি ঘোরতরে ॥

অগ্নি যৈছে ভস্মে ঢাকা সুধা তেমনই গরলে মাখা।
মৈথুনদণ্ডে যাবে দেখা বিভিন্ন করে ॥

বিষামৃতে আছে মিলন জানতে হয় তার কী রূপসাধন।
দেখো যেন গরল ভক্ষণ করো না হারে ॥

কয়বার করলে আসাযাওয়া নিরূপণ কি রাখলে তাহা।
লালন কয় কে দেয় খেওয়া ভব মাঝারে ॥

৭৯৬.
সময় গেলে সাধন হবে না।
দিন থাকিতে তিনের সাধন কেন করলে না ॥

জানো না মন খালে বিলে থাকে না মীন জল শুকালে।
কী হবে আর বাঁধাল দিলে শুকনা মোহনা ॥

অসময়ে কৃষি করে মিছামিছি খেটে মরে।
গাছ যদিও হয় বীজের জোরে তাতে ফল ধরে না ॥

অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয় মহাযোগ সেইদিনে উদয়।
লালন বলে তাঁর সময় দণ্ড রয় না ॥

৭৯৭.
সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না।
জল শুকাবে মীন পলাবে পস্তাবিরে ভাই মনা ॥

ত্রিবেণীর তীরধারে মীনরূপে শাঁই বিরাজ করে।
উপরউপর বেড়াও ঘুরে সে গভীরে ডুবলে না ॥

মাসান্তে মহাযোগ হয় নিরস হতে রস ভেসে যায়।
করলিনে সেই যোগের নির্ণয় মীনরূপের খেলা খেলে না

জগতজোড়া মীন অবতার সন্ধি আছে তাহার উপর।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমার সন্ধানীকে চিনলে না ॥

৭৯৮.
সমুদ্রের কিনারে থেকে জল বিনে চাতকি ম'লো।
হায়রে বিধি ওরে বিধি তোর মনে কি ইহাই ছিলো ॥

নবঘন বিনে বারি খায় না চাতক অন্যবারি।
চাতকের প্রতিজ্ঞা ভারি যায় যদি প্রাণ সেও তো ভালো ॥

চাতক থাকে মেঘের আশে মেঘ বরিষণ অন্যদেশে।
বলো চাতক বাঁচে কিসে ওষ্ঠাগত প্রাণাকুল ॥

লালন ফকির বলেরে মন হলো না মোর ভজনসাধন।
ভুলে সিরাজ শাঁইয়ের চরণ মানবজনম বৃথা গেলো ॥

৭৯৯.
সহজে অধরমানুষ না যায় ধরা।
হতে হবে জ্যান্তে মরা ॥

অধর ধরার এমনই ধারা গুরুশিষ্য ঐক্য করা।
চৈতন্যরূপ নিহার করা জানিলে হয় করণ সারা ॥

হায়াতনদীর মধ্যে স্থিতি আজগুবি ফুল উৎপত্তি।
ফুলের মধ্যে ফলের জ্যোতি হয় উজ্জ্বল করা ॥

মেঘের কোলে বিদ্যুৎ খেলে অমনি সেরূপ যায়গো চলে।
ভাব না জেনে ধরতে গেলে পড়বি মারা ॥

নয়নকোণে মেঘ আকৃতি দেখবে কি সেইরূপের জ্যোতি।
লালন বলে কূলের পতি কূল না ছাড়লে কি দেবে ধরা ॥

৮০০.
সহজে আলক নবি।
দেহের ভিতর চৌদ্দ ভুবন বানালো কলের ছবি ॥

ভবভাবী ভরের ঘোরে ঘোর সাগরে অন্ধকারে।
চারিদিকে মায়ার প্রাচীরে প্রেমরতনে শাঁই সবই ॥

নাসুতে করে স্থিতি মালকুতে তাঁর বসতি।
জলে স্থলে শশীর কিরণ মালকুতে রয় রবি ॥

নিরাকারে হয়ে বারি বারি বিচে থাকেন বাড়ি।
জোর করে সকলে তার ই কার ভাবে হবি ভাবী ॥

লালন বলে কাতর হালে বাঁধা আছি ভূমণ্ডলে।
কাটারে মনের কলি ভাবের ভাবী ॥

৮০১.
সাধুসঙ্গ করো তত্ত্ব জেনে।
সাধন হবে না অনুমানে ॥

সাধুসঙ্গ করোরে মন অনর্থে হবে বিবর্তন।
ব্রহ্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়দমন হবেরে সঙ্গগুণে ॥

নবদ্বীপে পঞ্চতত্ত্ব তাঁর স্বরূপে রূপ আছে বর্ত।
ভজন যদি হয় গো সত্য গুরু ধরে লও জেনে ॥

আদ্য সঙ্গ যদি করে কোনো ভাগ্যবানে সেই তো দেখছে লীলা বর্তমানে
সিরাজ শাঁই বলে লালন যাসনে না জেনে শ্রীবাস অঙ্গনে ॥

৮০২.
সাধ্য কিরে আমার সেইরূপ চিনিতে।
অহর্নিশি মায়া ঠুসি জ্ঞানচক্ষেতে ॥

ঈশানকোণে হামেশ ঘড়ি সে নড়ে কি আমি নড়ি।
আমার আমি হাতড়ে ফিরি পাই না ধরিতে ॥

আমি আর সে অচিন একজন এক জায়গাতে থাকি দুজন।
ফাঁকে থাকি লক্ষ যোজন না পাই দেখিতে ॥

টুঁড়ে হদ্দ মেনে আছি এখন বসে খেদাই মাছি।
লালন বলে মরে বাঁচি কোন কার্যেতে ॥

৮০৩.
সামান্যে কি অধর চাঁদ পাবে।
যার লেগে হলেন যোগী দেবাদিদেব মহাদেবে ॥

ভাব না জেনে ভাব দিলে তখন বৃথাই যাবে ভক্তি ভজন
বাঞ্ছা যদি হয় সে চরণ ভাব দে না সেই ভাবে ॥

যে ভাবে সব গোপিনীরা হয়েছিলো পাগলপারা।
চরণ চিনে তেমনই ধারা ভাব দিতে হবে ॥

নিহেতু ভজন গোপিকার তাতে সদাই বাঁধা নটবর।
লালন বলে মনরে তোমার মরণ ভবলোভে ॥

৮০৪.
সামান্যে কি তাঁর মর্ম জানা যায়।
হৃৎকমলে ভাব দাঁড়ালে অজান খবর তারই হয় ॥

দুগ্ধে বারি মিশাইলে বেছে খায় রাজহংস হলে।
কারো সাধ যদি হয় সাধনবলে হও গে হংসরাজের ন্যায় ॥

মানুষে মানুষের বিহার মানুষ ভজলে দৃষ্ট হয় তার।
সে কি বেড়ায় দেশদেশান্তর পীড়েয় পেড়োর খবর পায় ॥

পাথরেতে অগ্নি থাকে বের করতে হয় ঠুকনি ঠুকে।
সিরাজ শাঁই দেয় তেমনই শিক্ষে লালন ভেড়ো সং নাচায় ॥

৮০৫.
সামান্যে কি সেইপ্রেম হবে।
গুরু পরশিলে আপনি প্রেম আপনি উদয় দেবে ॥

যে প্রেমে রাই হরে কৃষ্ণের মন অকৈত্তব সেই প্রেমের করণকারণ।
যোগ্য অনুসার মর্ম জানে তাঁর অযোগ্য পাত্রে কি সেইভাব সম্ভবে ॥

বলবো কী সেই প্রেমের বাণী কাম থেকে হয় নিষ্কামী।
সে যে শুদ্ধ সহজরস করিয়ে বশ দোহার মন বহে দোহার ভাবে ॥

অরুণকিরণে হয় যেমন কমলিনী প্রফুল্লবদন
লক্ষ যোজনান্তে দোহার প্রেম একান্তে
লালন কয় রসিকের প্রেম তেমনই ভবে ॥

৮০৬.
সামাল সামাল সামাল তরী।
ভবনদীর তুফান ভারি ॥

নিরিখ রেখো ঈশানকোণে চালাও তরী সচেতনে।
গালি খেলে মরবি প্রাণে জানা যাবে মাঝিগিরি ॥

না জানি কী হয় কপালে চণ্ডীপাঠ ডুবিল জলে।
এইবার প্রাণে বাঁচিলে আর হবো না নায়ের কাণ্ডারি ॥

ব্যাপারের ভাব যায় না জানা চিন্তাজ্বরে হলাম টোনা।
লালন বলে ঠিক পেলাম না কোথা আল্লাহ কোথায় হরি ॥

৮০৭.

সুফলা ফলাচ্ছে গুরু মনের ভাব জেনে।
মনেপ্রাণে ঐক্য করে ডাকছে তাঁরে যেজনে ॥

যার দেহে নাই প্রেমের অঙ্কুর সাধনভজন সব হবেরে দূর।
যার হিংসাভরা দেলসমুদ্দুর শুদ্ধ হবে কেমনে ॥

যার দেহে রয় কুটিলতা মুখে বলে সরল কথা।
অন্তরে যার গরলগাঁথা প্রাপ্তি হবে কেমনে ॥

আছে যেজন যোগধ্যানে কাজ কীরে তার লোকজানানে।
ফকির লালন বলে রূপনয়নে সাধন করো নির্জনে ॥

৮০৮.

সেই অটল রূপের উপাসনা।
ভবে কেউ জানে কেউ জানে না ॥

বৈকুণ্ঠে গোলোকের উপর আছেরে সেই রূপের বিহার।
কৃষ্ণের কেউ নয় সে অধর রাধার প্রতি সেজনা ॥

স্বরূপ রূপের এই যে ধরন দোহার ভাবে টলে দোহার মন।
অটলকে টলাতেরে মন পারে বলো কোনজনা ॥

নিরাকারে জল হইতে জন্মে শক্তির ধারা সেই অবিম্বে।
লালন বলে তার অণুপ্রেমে দিন থাকতে জেনে নে না ॥

৮০৯.

সেকথা কী কবার কথা জানিতে হয় ভাবাবেশে।
অমাবস্যায় পূর্ণিমা সে পূর্ণিমায় অমাবস্যে ॥

অমাবস্যায় পূর্ণিমাযোগ আজব সম্ভব সম্ভোগ।
জানলে খণ্ড এ ভবরোগ গতি হয় অখণ্ডদেশে ॥

রবিশশী রয় বিমুখা মাসান্তে হয় একদিন দেখা।
সেই যোগের যোগ লেখাজোখা সাধলে সিদ্ধি হয় অনায়াসে ॥

দিবাকর নিশাকর সদাই উভয় সঙ্গে উভয় লুকায়।
ইশারাতে সিরাজ শাঁই কয় লালনরে ভোর হয় না দিশে ॥

৮১০.

সে করণসিদ্ধি করা সামান্যের কাজ নয়।
গরল হতে সুধা নিতে আতশে প্রাণ যায় ॥

সাপের মুখে নাচায় ব্যাঙ্গা এ বড় আজব রঙ্গা।
রসিক যদি হয়রে ঘোঙ্গা অমনি ধরে খায় ॥

ধন্বন্তরি গুণ শিখিলে সে মানে না রূপের কালে।
সে গুণ তার উল্টায়ে ফেলে মস্তকে দংশায় ॥

একান্ত যে অনুরাগী নিষ্ঠারতি ভয়ংত্যাগী।
লালন বলে রসিকযোগই আমার কার্য নয়।

৮১১.
সে কী আমার কবার কথা জানিতে হয় ভাবাবেশে।
অমাবস্যায় পূর্ণশশী পূর্ণিমাতে অমাবস্যে ॥

অমাবস্যায় পূর্ণিমার যোগ অসম্ভব হয় সেই সম্ভোগ।
জানলে খণ্ডে এই ভবরোগ গতি হয় অখণ্ডদেশে ॥

রবি শশী রয় সে মুখা মাস অন্তে হয় একদিন দেখা।
সেই যোগের যোগ লেখাজোখা সাধন সিদ্ধি হয় অনা'সে ॥

দিবাকর নিশাকর সদাই লুকায়ে উভয় অঙ্গে রয়।
ইশারাতে সিরাজ শাঁই কয় লালন ভেড়োর হয় না দিশে ॥

৮১২.
সে ভাব উদয় না হলে।
কে পাবে সে অধর চাঁদের বারাম কোন্‌কালে ॥

ডাঙ্গাতে পাতিয়ে আসন জলে রয় তাঁর কীর্তি এমন।
বেদে কি তাঁর পায় অন্বেষণ রাগের পথ ভুলে ॥

ঘর ছেড়ে বৃক্ষেতে বাসা অপথে তার যাওয়াআসা।
না জেনে তার ভেদ খোলাসা কথায় কী মেলে ॥

জলে যেমন চাঁদ দেখা যায় ধরতে গেলে হাতে না পায়।
লালন তেমনই সাধনধারায় প'লো গোলমালে ॥

৮১৩.
সে যারে বোঝায় সেই বোঝে।
মকরউল্লার মকর বোঝার সাধ্য কার আছে ॥

যথায় কাল্লা তথায় আল্লা তেমনিরে সেই মকরউল্লা।
মনের চক্ষু থাকতে ঘোলা মক্কার পায় কী সে ॥

ইরফানি কেতাবরে ভাই হরফ নুক্তা তাঁর কিছু নাই।
তাঁই ঢুঁড়িলে খোদাকে পাই খোদে বলেছে ॥

এলমে লাদুন্নি হয় যাঁর সর্বভেদ মালুম হয় তাঁর।
লালন কয় চটকে মোল্লার দড়বড়ি মিছে ॥

৮১৪.
সে রূপ দেখবি যদি নিরবধি সরল হয়ে থাক।
আয় না চলে ঘোমটা ফেলে নয়নভরে দেখ ॥

সরলভাবে যে তাকাবে অমনি সে রূপ দেখতে পাবে।
রূপেতে রূপ মিশে যাবে ঢাকনি দিয়ে ঢাক ॥

চাতক পাখির এমনি ধারা অন্যবারি খায় না তারা।
প্রাণ থাকিতে জ্যান্তে মরা ঐ রূপডালে বসে ডাক ॥

ডাকতে ডাকতে রাগ ধরিবে হৃৎকমল বিকশিত হবে।
লালন বলে সেই কমলে হবে মধুর চাক ॥

৮১৫.
স্বরূপদ্বারে রূপদর্পণে সেই রূপ দেখেছে যেজন।
তার রাগের তালা আছে খোলা সেই তো প্রেমের মহাজন

অনুরাগের রসিক হয় যেজন
জানতে পারে সে রাগের করণ ॥

তার আপ্তসুখের নাইরে আশা
অন্তরে করে শুদ্ধরসের নিরূপণ ॥

সামান্যে না পাবে দেখা স্বরূপে রূপ আছে ঢাকা
লালন বলে কোলের ঘোরে হারালাম রাঙাচরণ ॥

৮১৬.
স্বরূপ রূপে নয়ন দেরে।
দেখবি সে রূপের অরূপ আ মরি কেমন স্বরূপ ঝলক মারে ॥

স্বরূপ বিনে রূপটি দেখা সে কেবল মিথ্যে ধোঁকা।
সাধকের লেখাজোখা স্বরূপ সত্যসাধন দ্বারে ॥

মনমোহিনীর মনোহরা রূপ নররূপেতে হের সে রূপ।
যে দেখো সে থাকোরে চুপ বলতে নারে ভেদ যারে তারে ॥

স্বরূপে যাঁর আছে নয়ন তাঁরে কি ছুঁতে পারে শমন।
সিরাজ শাঁই বলেরে লালন তুই রূপ ভুলিলে পড়বি ফ্যারে ॥

৮১৭.
স্বরূপে রূপ আছে গিলটি করা।
রূপসাধন করলো স্বরূপ নিষ্ঠা যারা ॥

শতদল সহস্রদলে রূপ স্বরূপে ভাটা খেলে।
ক্ষণেক রূপ রয় নিরালে নিরাকারা ॥

রূপ বললে যদি হয় রূপসাধন তবে কি আর ভয় ছিলো মন।
সে মহারাগের করণ স্বরূপ দ্বারা ॥

আসবে বলে স্বরূপমণি থাক গা বসে ঘাট ত্রিবেণী।
লালন কয় সামাল ধনী সেই কিনারা ॥

৮১৮.
সোনার মানুষ ঝলক দেয় দ্বিদলে।
যেমন মেঘেতে বিজলী খেলে ॥

দল নিরূপণ হয় যদি জানা যায় সে রূপনিধি।
মানুষের করণ হবে সিদ্ধি সেইরূপ দেখিলে ॥

গুরুকৃপার তুল্য যারা নয়ন তাদের দীপ্তকারা।
রূপাশ্রিত হয়ে তারা ভবপারে যায় চলে ॥

স্বরূপ রূপে রূপের কিরণ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভুবন।
সিরাজ শাঁই কয় অবোধ লালন চেয়ে দেখ নয়ন খুলে ॥

৮১৯.
সৃষ্টিতত্ত্ব দ্বাপরলীলা আমি শুনতে পাই।
চাঁদ হতে হয় চাঁদের সৃষ্টি চাঁদেতে হয় চাঁদোময় ॥

জল থেকে হয় মাটির সৃষ্টি জ্বাল দিলে জল হয় গো মাটি।
বুঝে দেখো এই কথাটি ঝিয়ের পেটে মা জন্মায় ॥

এক মেয়ের নাম কলাবতী নয় মাসে হয় গর্ভবতী।
এগারো মাসে সন্তান তিনটি মেঝটা তার ফকির হয় ॥

ডিমের ভিতর থাকলে ছানা ডাকলে পরে কথা কয় না।
সেথায় শাঁইয়ের আনাগোনা দিবারাত্রি আহার যোগায় ॥

মাকে ছুঁলে পুত্রের মরণ জীবগণে তাই করে ধারণ।
ভেবে কয় ফকির লালন হাটে হাড়ি ভাঙ্গবার নয় ॥

৮২০.
হতে চাও হুজুরের দাসী।
মনে গলদ পুরা রাশিরাশি ॥

জানো না সেবাসাধনা জানো না প্রেম উপাসনা।
সদাই দেখি ইতরপনা প্রিয় রাজি হবে কিসি ॥

কেশ বেঁধে বেশ করলে কী হয় রসবোধ না যদি রয়।
রসবতী কে তারে কয় কেবল মুখে কাষ্ঠহাসি ॥

কৃষ্ণপদে গোপীভজন করেছিলো রসিক সুজন।
সিরাজ শাঁই কয় পারবি লালন ছেড়ে ভবের সুখবিলাসই ॥

৮২১.
হরি কোনটা তোমার আসল নাম শুধাই তোমারে।
কোন নাম ধরে ডাকলে পরে পাওয়া যাবে তোমারে ॥

তুমি চৈতন্যরূপে কি থাকো চুপে চেপে
কি বা তুমি বিরূপে রও অন্ধকূপে
আমি জানতে পারলে সেবাদাসী হবো হরি এবারে ॥

তুমি ব্রজদ্বারের রাম আর বৃন্দাবনের শ্যাম
শতমুখে শুনি তুমি সে ভগবান
নামটি তোমার অধর ধরা কোন নামটি ভক্তের দ্বারে ॥

তুমি কোন ভাবেতে রও কিসে ধেনু চরাও
কখন কোনভাবে থাকো কোনরূপে আশ্রয়
কোনটি তোমার নামের গুণ হে প্রকাশিত ঘরে ঘরে ॥

তোমার অনন্ত নাম হয় তুমি কোন জায়গার গোঁসাই
নিরাকারে কী হও তুমি কোন জায়গার কানাই
ফকির লালন বলে কাতর দেলে কোন নাম রয় আমার তরে ॥

৮২২.
হলাম নারে রসিক ভেয়ে।
না জেনে রসের ভিয়ান মরতে হলো গরল খেয়ে ॥

গোঁসাইর লীলা চমৎকারা বিষেতে অমৃত পোরা।
অসাধ্যকে সাধ্য করা ছুঁলে বিষ উঠে ধেয়ে ॥

দুগ্ধে যেমন থাকে ননী ভিয়ানে বিভিন্ন জানি।
সুধা অমৃত বয় তেমনই গরলে আছে ঢাকিয়ে ॥

দুগ্ধে জল যদি মিশায় রাজহংস হলে সে বেছে খায়
লালন বলে আমি সদাই আমোদ করি জল নিয়ে ॥

৮২৩.
হাওয়ার ঘরে দম পাকড়া পড়েছে কী অপরূপ কারখানা।
শুদ্ধ হাওয়াকলে আলক দমে চলে হাওয়া নির্বাণ হলে দম থাকে না ॥

হাওয়া দমের যে কারিগরি নিগমতত্ত্বে শুনি
বলতে ডরাই সেসব অসম্ভব বাণী
লীলা নিত্যকারি হাওয়া যোগেশ্বরী
হাওয়ার ঘরে দমের হয় লেনাদেনা ॥

সে বাদশা নির্বাণ হাওয়ার গুণ বলবো কী আর
এক অঙ্গে দম হলে আর এক অঙ্গে শুমার
হাওয়া দম শুমারে খেলছে সদাই ঘরে
কলকাঠি যার হাতে বাইরে সে অজানা ॥

হাওয়া শক্তি ধরে যোগে জানতে পারে
নিগূঢ় করণকারণ সেই যাবে সেরে
লালন বলে মোর কোলে বিষম ঘোর
হাওয়ায় ফাঁদ পাতিলে যেতো সব জানা ॥

৮২৪.
হাবুডুবু করে ম'লো তবু কাদা গায়ে মাখলো না।
আমায় উপায় বলো না ॥

পানিকাউর দোয়েল পাখি রাতদিন তারে জলে দেখি।
আমার চিন্তাজ্বর তো গেলো না ॥

এককুল ভেঙ্গে দুইকুল হইল সেই গাঙ্গে লগি ঠাঁই না পাইল।
সেই জায়গায় নাও ডুবিল মাস্তুল জাগলো না ॥

সে গাঙ্গ দুইটা চলতি ছিলো কতো সাধু নাও বাহিল।
মাঝখানে তার চর পড়িল লালন বলে নদীর বেগ গেলো না ॥

৮২৫.
হীরা মতি জহুরা কোটিময়।
সে চাঁদ লক্ষ যোজন ফাঁকে রয় কোটি চন্দ্র কোটিময় ॥

ষোলোকটি দেবতা সঙ্গে আছে গাঁথা
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নারায়ণ জয় জয় জয়।
ষোলো চন্দ্র অন্ধ বেগে ধায় সে চাঁদ পাতালে
উদয় ভূমণ্ডলে সে চাঁদ মৃণালবেগে উজান ধায় ॥

ষড়চক্র পরে আছে তার আদি বিধান
পূর্ণ করে ষোলোকলা ভেদ করে সপ্ততলা।
তার উপরে বসে কালা মধু করে পান
সে চাঁদ মাহেন্দ্র যোগে দেখা যায় ॥

নবলক্ষ ধেণু চরায় রাখালে চাঁদের খবর সেই জানে
চাঁদ ধরেছে বৃন্দাবনে শ্রীরাধার চরণে।
ভাণ্ড ভেঙ্গে ননী খায় গোপালে লালনের ফকিরি করা নয় ফিকিরি
দরবেশ সিরাজ শাঁই যদি ছায়া দেয় ॥

৮২৬.
হীরে লাল মতির দোকানে গেলে না।
সদাই কিনলিরে পিতল দানা ॥

চটকে ভুলেরে মন হারালি অমূল্যরতন।
হারলে বাজি কাঁদলে তখন আর সারে না ॥

পিছের কথা আগে ভেবে উচিত বটে তাই করিবে।
এবার গতকাজের বিধি কিরে মনরসনা ॥

ব্যাপারে লাভ করলি ভালো সে গুণপনা জানা গেলো।
লালন বলে মিছে হলো আওনাযাওনা ॥

৮২৭.
ক্ষমো অপরাধ ওহে দীননাথ কেশে ধরে আমায় লাগাও কিনারে।
তুমি হেলায় যা করো তাই করতে পারো তোমা বিনে পাপীর তারণ কে করে ॥

পাপীকে তরাতে পতিত পাবন নাম তাইতে তোমায় ডাকি হে গুণধাম।
আমার বেলায় কেন হলে বাম তোমার দয়াল নামের দোষ রবে সংসারে ॥

শুনতে পাই পরম পিতা গো তুমি অতিঅবোধ বালক আমি।
তোমার ভজন ভুলে কুপথে ভ্রমি তবে দাও না কেন সুপথ স্মরণ করে ॥

না বুঝে পাপসাগরে ডুবে খাবি খাই
শেষকালেতে তোমার দিলাম গো দোহাই।
এবার যদি আমায় না তরাও হে শাঁই
আমি আর কতোকাল ভাসবো দুঃখের সাগরে ॥

অথৈ তরঙ্গে আতঙ্কে মরি কোথায় রইলে হে দয়াল কাণ্ডারি।
লালন বলে তরাও হে তরী নামের মহিমা জানাও ভববাজারে

৮২৮.
ক্ষমো ক্ষমো অপরাধ দাসের পানে একবার চাও হে দয়াময়।
বড় সংকটে পড়ে এবার বারে বার ডাকি তোমায় ॥

তোমারই ক্ষমতা স্বামী যা ইচ্ছে তাই করো তুমি।
রাখো মারো হাত তো স্বামী তোমার লীলা জগতময় ॥

পাপী অধম তরাতে শাঁই পতিতপাবন নাম শুনতে পাই।
সত্যমিথ্যা জানবো হেথায় তরালে আজ আমায় ॥

কসুর পেয়ে মারো যারে আবার দয়া হয় তাহারে।
লালন বলে এ সংসারে আমি কি তোর কেহ নই ॥
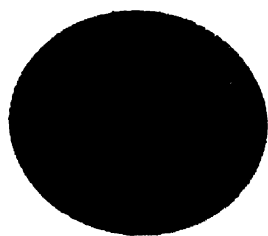
সিদ্ধিদেশ

দেশভূমিকা

ভাবরূপবিমুক্ত দেহকে বলা হয় সিদ্ধিদেশ। সিদ্ধিদেহ অর্থ যে দেহ জ্ঞানআগুনে পুড়ে খাঁটি সোনার মানুষ হয়েছে। এমন দেহ নির্বাণপ্রাপ্ত 'লা মোকাম সত্তা, আধ্যাত্মিকতার চরম স্তর উত্তীর্ণ মুক্তপুরুষদেহ। 'ভবরূপ' অর্থ বারবার জন্মমৃত্যুচক্রের কবলে পড়ে সংসারযাতনা ভোগান্তির দেহবন্দি অবস্থা। তাই ভবরূপবিমুক্ত দেহ মররার আগেই মরে গিয়ে জন্মমৃত্যুজয়ী জিতেন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়জয়ী সিদ্ধমহাপুরুষ হয়েছেন । সিদ্ধিদেশের কাল হলো গুরুবাক্য বিলীন হবার পরম হাল, চরমদশা।

সিদ্ধিদেশের পাত্র প্রজননহীন প্রকৃতিভাবাপন্ন সত্তা। তিনি মনে কোনো বিষয়মোহের জন্ম দেন না তাই জন্ম নেনও না। সর্বব্যাপী যিনি একক মূলসত্তাকে দর্শন ও শ্রবণ করেন।

সিদ্ধিদেশের আশ্রয় প্রকৃতিভাবে বিলীন। অর্থাৎ অখণ্ড মহাসত্তায় বিলীয় হয়ে যিনি নিজেই মহাসত্যদ্রষ্টা হন। সিদ্ধিদেশের আলম্বন সর্বকুলে বিনম্রতা। ভালমন্দ, পাপপুণ্য, শুভাশুভ, লাভক্ষতির সব হিসাবনিকাশের ঊর্ধ্বে স্থায়ীভাবে প্রজ্ঞাবান হালে সমস্ত মহত্ত্বকে আপন একক সত্তায় অঙ্গীকার করে নেয়া।

সিদ্ধিদেশের আলম্বন হলো সম্প্রদায়ে সর্বরূপ সচেতনা। 'সম্প্রদান' থেকে 'সম্প্রদায়' মানে মুক্তদায় থেকে মুক্তিদানবদ্ধতা। সোজা কথায় সমান দানে দাতা ও গ্রহীতা। সর্বোত্তম ভাবরসে ধ্যানসিদ্ধ শুদ্ধচিত্তে জ্ঞানস্নিগ্ধ শুভ্রতার প্রতিফলন ঘটানো।

সিদ্ধিদেশের চরম পর্যায় হলো মহাসিদ্ধি তথা সকল বন্ধন থেকে মুক্তি, বিশুদ্ধি বা চিরনির্বাণ লাভ করা যা একান্ত অর্জনীয় 'লা' সাধনসিদ্ধির সার্থকতা। তাই কোনোরূপ ভাষা-বাক্প্রতিমায় এই সূক্ষ্মতম পরম স্তর কখনো প্রকাশযোগ্য নয়। অনির্বচনীয় এই লোকোত্তর মহাসত্যকে লোকভাষায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সাধ্যাতীতভাবেই অসম্ভব।

৮২৯.
অজুদ চেনার কথা কইরে কলেমা সাবেত কর গা যারে।
কলেমা সাবেত না হইলে রসুল সাবেত হবে নারে ॥

চেয়ে দেখরে মন এই অজুদে আলিফ হে আর মিম দালেতে।
আহ্‌মদ নাম লেখা তাতে তাই জানতে হবে মুর্শিদ ধরে ॥

আগে চব্বিশ হরফ করো সন্ধি তবে দেখতে পাবে নক্সাবন্দি।
তাই দেখলে হয় বন্দেগি সে আলক সন্ধি বুঝতে পারে ॥

কোরানেতে আছে প্রমাণ এখলাস সুরা এহি কালাম।
তাই দেখে ফেরেস্তা তামাম আদমকে সেজদা করে ॥

মনসুর হাল্লাজ কলেমা দেখেছিলো দেখে ইশকেতে মশগুল গলো।
তাইতে আইনাল হক ফুকারিল ফকির লালন কয় ডাকি কই তাঁরে ॥

৮৩০.
অন্ধকারের আগে ছিলেন শাঁই রাগে আলকারেতে ছিলো আলের উপর।
ঝরেছিলো একবিন্দু হইল গভীর সিন্ধু ভাসিল দীনবন্ধু নয় লাখ বছর ॥

অন্ধকার ধন্ধকার নিরাকার কুওকার
তারপরে হলো হুহুংকার।
হুহুংকারের শব্দ হলো ফেনারূপ হয়ে গেলো
নীর গভীরে শাঁই ভাসলেন নিরন্তর ॥

হুহুংকারে ঝংকার মেরে দীপ্তকার হয় তারপরে
ধন্ধ ধরেছিলেন পরওয়ার।
ছিলেন শাঁই রাগের উপরে সুরাগে আশ্রয় করে
তখন কুদরতিতে করিল নিহার ॥

যখন কুওকারে কুও ঝরে বাম অঙ্গ ঘর্ষণ করে
তাইতে হইল মেয়ের আকার।
মেয়ের রক্তবীজে শক্ত হলো ডিম্ব তুলে কোলে নিলো
ফকির লালন বলে লীলা চমৎকার ॥

৮৩১.
অন্ধকারে রাগের উপরে ছিলো যখন শাঁই।
কিসের পরে ভেসেছিলো কে দিলো আশ্রয় ॥

তখন কোন আকার ধরে ভেসেছিলো কোন প্রকারে।
কোন সময় কোন কায়া ধরে ভেসেছিলো শাঁই ॥

পাক পাঞ্জাতন হইল যাঁরা কিসের পরে ভাসলো তাঁরা।
কোন সময় নূর সিতারা ধরেছিলো শাঁই ॥

সিতারা রূপ হলো কখন কী ছিলো তাঁর আগে তখন।
লালন বলে সে কথা কেমন বুঝা হলো দায় ॥

৮৩২.
অমর্ত্যের এক ব্যাধ ব্যাটা হাওয়ায় এসে ফাঁদ পেতেছে।
বলবো কি ফাঁদের কথা কাক মারিতে কামান পাতা
ব্রহ্মা বিষ্ণু নর নারায়ণ সেই ফাঁদে ধরা পড়েছে ॥

লোভের চার খাটিয়ে চার খাবার আশে।
প'ড়ে সেই বিষম পাশে কতো লোভী মারা যেতেছে ॥

জ্যান্ত ম'রে খেলে যাঁরা ফাঁদ ছিঁড়িয়ে যাবে তাঁরা।
সিরাজ শাঁই কয় ওরে লালন জন্মমৃত্যুর ফাঁদ তুই এড়াবি কিসে ॥

৮৩৩.
আজব এক রসিক নাগর ভাসছে রসে।
হস্তপদ নাইরে তাঁর বেগে ধায় সে ॥

সেই রসের সরোবর তিলে তিলে হয় সাঁতার।
উজানভেটেন কলকাঠি তাঁর ঘুরায় বসে ॥

ডুবলেরে দেল দরিয়ায় সে রাসলীলে জানা যায়।
মানবজনম সফল হয় তাঁর পরশে ॥

তাঁর বামে কুলকুণ্ডলিনী যোগমায়া যারে বলি।
লালন কয় স্মরণ নিলি যাই স্বদেশে ॥

৮৩৪.
আজব রঙ ফকিরি সাদা সোহাগিনী শাঁই।
তাঁর চুড়ি শাড়ি ফকিরি ভেদ কে বুঝিবে তাই ॥

সর্বকেশী মুখে দাড়ি পরনে তাঁর চুড়ি শাড়ি।
কোথা হতে এলো এ সিড়ি জানিতে উচিত তাই ॥

ফকিরি গোর মাঝার দেখোরে করিয়ে বিচার।
সাদা সোহাগিনী সবার উপর আদ্যঘর শুনতে পাই ॥

সাদা সোহাগিনীর ভাবে প্রকৃতি হইতে হবে
লালন কয় মন পাবি তবে ভাবসমুদ্রে থৈ ॥

৮৩৫.

আঠারো মোকামে একটি রূপের বাতি জ্বলছে সদাই।
নাহি তেল তার নাহি সলতে আজগুবি হয়েছে উদয় ॥

মোকামের মধ্যে মোকাম স্বর্ণশিখর বলি যার নাম।
বাতির লণ্ঠন সেথায় সদাই ত্রিভুবনে কিরণ ধায় ॥

দিবানিশি আটপ্রহরে এক রূপে চার রূপ ধরে।
বর্ত থাকতে দেখলি নারে ঘুরে ম'লি বেদের বিধায় ॥

যে জানে সে বাতির খবর ঘুঁচেছে তার নয়নের ঘোর।
সিরাজ শাঁই কয় লালনরে তোর দৃষ্ট হয় না মনের দ্বিধায় ॥

৮৩৬.

আঠারো মোকামের খবর জেনে লও হিসাব করে।
আউয়াল মোকাম রাগের তালা পাক পাঞ্জাতন সেই ঘরে ॥

হীরা নয় কষ্টিকান্তি সেখানে মনোহরা শান্তি
ঘুঁচলো না তোর মনের ভ্রান্তি বেড়াচ্ছো ঘুরে।
সে মোকামের মালিক যারা চার মোকামে বয় চারধারা
খাড়া আছে ফেরেস্তারা খুঁজে দেখো অন্তঃপুরে ॥

তার উপরে আরো আছে মা জানো না মন তাঁর মহিমা।
যেজন তাঁর পায় গো সীমা সাধনের জোরে ॥

সেই মোকামে যে হয় চালকা শিরে ছের ছিল্‌কা।
গলেতে তজবি খেলকা অনা'সে যায় তরে ॥

আরশ কুরসি লৌহ কলম তার উপরে আল্লাহ্‌র আসন।
তার উপরে ঘুরছে কলম কবুলতি ধরে ॥

তার উপরে আলক ধনী খবর হচ্ছে দিনরজনী।
নূরনবির মোকাম সদর সিরাজ শাঁই কয় লালনেরে ॥

৮৩৭.

আপনার আপন খবর নাই।
গগনের চাঁদ ধরবো বলে মনে করি তাই ॥

যে গঠেছে এ প্রেমতরী সেই হয়েছে চরণধারী।
কোলের ঘোরে চিনতে নারি মিছে গোল বাঁধাই ॥

আঠারো মোকামে জানা মহারসের বারামখানা।
সে রসের ভিতরে সে না আলো করে শাঁই ॥

না জেনে চাঁদ ধরার বিধি কথার কৈট সাধন সাধি।
লালন বলে বাদী ভেদী বিবাদী সদাই ॥

৮৩৮.
উব্দগাছে ফুল ফুটেছে প্রেমনদীর ঘাটে।
গাছের ডালপালা খালি রয়েছে ভিতরে ফুল ফোটে ॥

বারো মাসে বারো ফুল ধরে কতো ফুল তার যাচ্ছে ঝরে।
সুগন্ধি বারি পেলে ফুলের মোহর আঁটে ॥

তিন রতি আঠারো তিলে ফুলের মোহর তাই গঠিলে।
ফল বাহির হয়ে গাছের রস চুষিলে মানুষ রাক্ষস বটে ॥

সিরাজ শাঁইয়ের বচন শোনরে অবোধ লালন।
তুই ছিলি কোথায় এলি হেথায় আবার যাবি কার নিকটে ॥

৮৩৯.
একাকারে হুহুঙ্কার মেরে আপনি শাঁই রব্বানা।
অন্ধকার ধন্ধকার কুওকার নৈরাকার এসব কিছু ছিলো না ॥

'কুন্' বলে এক শব্দ করে সেই শব্দে নূর ঝরে।
ছয়টি গুটি হলো তাতে শোনো গো তার বর্ণনা ॥

সেই ছয়গুটি হতে ছয়টি জিনিস পয়দা তাতে।
আসমানজমিন সৃজনীতে মনে তাঁর হয় বাসনা ॥

ছয়েতে তসবিহ্ হলো সেই তসবিহ্ জপ করিল।
কোরানেতে প্রমাণ রইল লালন কয় শোনো ঠিকানা ॥

৮৪০.
এক ফুলে চার রঙ ধরেছে।
ফুলের ভাব নগরে কী শোভা করেছে ॥

মূল ছাড়া সে ফুলের লতা ডাল ছাড়া তার আছে পাতা।
এ বড়ো অকৈতব কথা ফুলের মর্ম কই কার কাছে ॥

কারণবারির মধ্যে সে ফুল ভেসে বেড়ায় একূলওকূল।
শ্বেতবরণ এক ভ্রমর ব্যাকুল ঘুরছে সে ফুলের মধুর আশে ॥

ডুবে দেখ দেলদরিয়ায় যে ফুলে নবির জন্ম হয়।
সে ফুল তো সামান্য ফুল নয় লালন কয় যাঁর মূল নাই দেশে ॥

৮৪১.
এ কীরে শাঁইয়ের আজব লীলে।
আমার বলতে ভয় হয়রে দেলে ॥

আপনি নিরঞ্জন মণি আপনি কুদরতের ধনী।
কে বা তাঁর দোসর পায় সে খবর খোদার অঙ্গ কে খণ্ড করিলে ॥

নূর টলে হলো নৈরাকার নিরঞ্জনের স্বপ্ন কী প্রকার।
দেখলো কি স্বপ্ন হলো সে মগ্ন কোন রূপ দেখে নিরঞ্জন ভোলে ॥

দেখে সেই আজব সুরত আপনি খুশি হলেন পাকজাত।
ভেবে কয় লালন সে হয় কোনজন কারে দেখলেন শাঁই নয়ন খুলে ॥

৮৪২.
এ বড়ো আজব কুদরতি।
আঠারো মোকামের মাঝে জ্বলছে একটি রূপের বাতি ॥

কি বা সে কুদরতি খেলা জলের মাঝে অগ্নিজ্বলা।
খবর জানতে হয় নিরালা নীরে ক্ষীরে আছে জ্যোতি ॥

ছনিমণি লাল জহরে সে বাতি রেখেছে ঘিরে।
তিন সময় তিন যোগ সে ধরে যে জানে সে মহারথী ॥

থাকতে বাতি উজ্জ্বলাময় দেখ না যার বাসনা হৃদয়।
লালন কয় কখন কোন সময় অন্ধকারে হবে বসতি ॥

৮৪৩.
ওগো মানুষের তত্ত্ব বলো না।
ভাবের মানুষ কয়জনা ॥

এই মানুষে আছেরে মন যাঁরে বলি মানুষরতন।
মনের মানুষ অধর মানুষ সহজ মানুষ কোনজনা ॥

অটল মানুষ রসের মানুষ সোনার মানুষ ভাবের মানুষ
সরল মানুষ সেই মানুষটি কোনজনা ॥

ফকির লালন বলে মানুষ মানুষ সবাই বলে।
এই মানুষে সেই মানুষ কোন মানুষের করি ভজনা ॥

৮৪৪.

কাফে কালু বালা কুল হু আল্লাহ্ লা শরিক সে পাকজাতে।
আজব সৃষ্টি করলেন বারি নিজ কুদরতে ॥

খোদা একা থাকতেন নিরঞ্জনে চিন্তা করলেন মনে মনে।
ইশকের জোরে পাঁচ বিন্দু ঘাম প'লো ঝরে শরীর হতে ॥

খোদার অঙ্গ হতে ঝরিল অম্বু পাঁচ চিজ হইল বিম্বু।
আরশ কুরশি লৌহ কলম হইল পাঁচ চিজেতে ॥

পাঁচ ধারে ছিলো পাক পাঞ্জাতন মধ্যে ছিলো খোদার আসন
শূন্যাকারে একেশ্বরে ছিলো খোদার অঙ্গেতে ॥

ধরে সিরাজ শাঁইয়ের চরণ কয় দীনের অধীন লালন।
ফেলো না গোলমালে রোজ হাসরে রেখো সাথে ॥

৮৪৫.

কারে বলে অটলপ্রাপ্তি ভাবি তাই।
অঙ্গ লয় হইলে নির্বাণ মুক্তি বলে তাও দোষাই ॥

দেখারে কয় অটলপ্রাপ্তি কি বা হবে সাথের সাথী।
ভজন কি সারা সেই অবধি কস্তুরের কি শান্তি নাই ॥

শালগ্রামশীলা হওয়া অচল বলে দোষাই তাহা।
স্বর্গে যেতে সুখ পাওয়া সেও তো নহে চিরস্থায়ী ॥

কেহ যেয়ে স্বর্গবাসে পাপ হলে ফের ভবে এসে।
লালন বলে ঊর্বশী নাম সে নিত্য তার প্রমাণ পাই ॥

৮৪৬.

কারে শুধাবোরে সে কথা কে বলবে আমায়।
পশুবধ করিলে কি খোদা খুশি হয় ॥

ইব্রাহিম নবিকে শুনি আদেশ করেন আল্লাহ্ গনি।
প্রিয় বস্তু দাও কোরবানি দুম্বা বলির আদেশ কোথায় ॥

মরণের আগে মরা আপন প্রাণ কোরবানি করা।
প্রাণ অপেক্ষা সেই পেয়ারা সে ভেদ কী বুঝায় শরায় ॥

সারিয়া আপনার জান আবেগেতে দাও বলিদান।
নবিজির হাদিস ফরমান মুতু কাবলা আন্তা মউত তাই ॥

কেমনে হবে কোরবানি সে ভেদ প্রকাশ নাহি জানি।
লালন বলে কোথায় জানি শাঁইয়ের কোরবানি এক্কেদায় ॥

৮৪৭.
কামিনীর গহিন সুখসাগরে।
দেখরে দেখ নিশান উড়ে ॥

সে নিশান দেখতে বাঁকা মাঝখানে কিছু আঁকাবাঁকা।
সাধন করলে দক্ষিণ পাশে মিলবে তাঁরে ॥

আলিফেতে জগত সংসার জায়গা নাই তাঁর লুকাবার।
গোপনেতে গেলো সে মিমের ঘরে ॥

অমাবস্যায় মিম থাকে ঘুমায়ে আলিফ তাঁরে নেয় জাগিয়ে।
লালন কয় মিমের ঘরে যে যায় ঐ ঘরেতে মানুষ মারে ॥

৮৪৮.
কি বা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে দেখলে নয়ন যায়রে ভুলে
ফণি মণি সৌদামিনী জিনি ঐ রূপ উজ্জ্বলে ॥

অস্থি চর্ম স্বর্ণ রূপ তাতে মহারসের কূপ বেগে ঢেউ খেলে।
তার একবিন্দু অপার সিন্ধু হয়রে ভূমণ্ডলে ॥

দেহের দলপদ্ম যাঁর উপাসনা নাইরে তাঁর কথায় কী মেলে।
তীর্থ ব্রত যাহার জন্য এইদেহে তাঁর সব লীলে ॥

রসিক যারা সচেতন রসরতি করে ভজন রূপ উদয় হলে।
লালন গোড়া নেংটি এড়া মিছে বেড়ায় রূপ বলে ॥

৮৪৯.
কী শোভা করেছে দ্বিদলময়।
সে মনোমোহিনী রূপ ঝলক দেয় ॥

কি বা বলবো সে রূপের বাখানি লক্ষ লক্ষ চন্দ্র জিনি।
ফণি মনি সৌদামিনী সে রূপের তুলনা নয় ॥

সহজ সুরসের গোড়া রসেতে ফল আছে ঘেরা।
কিরণে চমকে পারা দ্বিদলে ব্যাপিত হয় ॥

সে রূপ জাগে যাঁর নয়নে কি করবে তাঁর বেদ সাধনে।
দীনের অধীন লালন ভনে রসিক হলে জানা যায় ॥

৮৫০.
কী শোভা করেছে শাঁই রঙমহলে।
অজান রূপে দিচ্ছে ঝলক দেখলে নয়ন যায়রে ভুলে ॥

জলের মধ্যে কলের কোঠা সপ্ততালা আয়না আঁটা।
তাঁর ভিতরে রূপের ছটা মেঘে যেমন বিজলী খেলে ॥

লাল জরদ আর ছনি মনি বলবো কী তাঁর রূপ বাখানি।
দেখতে যেমন পরশমনি তারার মালা চাঁদের গলে ॥

অনুরাগে যার বাঁধা হৃদয় তারই সে রূপ চক্ষে উদয়।
লালন বলে শমনের দায় এড়ায় সে অবহেলে ॥

৮৫১.
কী সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে ॥

যেতে পথে কামনদীতে পাড়ি দিতে ত্রিবিনে।
কতো ধনীর ভারা যাচ্ছে মারা পড়ে নদীর তোড় তুফানে ॥

রসিক যাঁরা চতুর তাঁরা তাঁরাই নদীর ধারা চেনে।
উজান তরী যাচ্ছে বেয়ে তাঁরাই স্বরূপ সাধন জানে ॥

লালন বলে ম'লাম জ্বলে ম'লাম আমি নিশিদিনে।
মণিহারা ফণির মতো হারা হলাম পিতৃধনে ॥

৮৫২.
কৃষ্ণপদ্মের কথা করোরে দিশে।
রাধাকান্তি পদ্মের উদয় হয় মাসে মাসে ॥

না জেনে সেই যোগ নিরূপণ রসিক নাম সে ধরে কেমন।
অসময় চাষ করলে তখন কৃষি হয় কিসে ॥

সামান্যে বিশ্বাস যার বিশ্বাসে লয়ে ধরো।
অমূল্য ফল পেতে পারো তাহে অনায়াসে ॥

শুনতে পাই আন্দাজি কথা বর্তমানে জানো হেথা।
লালন কয় সে জন্মলতা দেখোরে বাহুঁশে ॥

৮৫৩.

কেমন দেহভাণ্ড চমৎকার ভেবে অন্ত পাবে না তার।
আগুন জল আকাশ বাতাস আর মাটিতে গঠন তার
সেই পঞ্চতত্ত্ব করে একত্র কীর্তি করে কীর্তিকর্মার ॥

মেরুদণ্ড শতখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হয় তাহার উপর
সাতসমুদ্র চৌদ্দভুবনের নয় নদী বয় নিরন্তর
ইড়া পিঙ্গলা সুষম্না দেখো রঙ হয় তিন প্রকার
উপরে ব্রহ্মনাড়িতে ব্রহ্মরন্দ্র রয় মূলাধার ॥

সপ্তদল পাতালের নীচে চতুর্দল আর কুলকুণ্ডলিনী সদাই স্থির
তার উর্ধ্বে বিজনেতে দশমদল কমলের উপর মণিপুরের ঘর
তার উর্ধ্বে দ্বাদশদলে উনপঞ্চাশ পবনের ঘর
পানঅপান সমানউদানের ব্যাস হতে গতিকার ॥

ষড়দলে দুলক্ষ যোজনের 'পরে ষোলোকলা গণ্য শরীরে
বিশুদ্ধাক্ষ নাম তার উর্ধ্বে মহাজ্ঞানে দ্বিদল কমলের 'পরে
চন্দ্রবিন্দু অঙ্গ ইন্দুরে জীবের বিন্দু ঝরে সিন্ধু হয় পাথার
লালন বলে জোড়াপদ্ম নীলপদ্ম ভেদ করো মন অতিদীপ্তকার ॥

৮৫৪.

চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করবো কী।
ঝিয়ের গর্ভে মায়ের জন্ম তাকে তোমরা বলবে কী ॥

ছয়মাসের এক কন্যা ছিলো নয় মাসে তার গর্ভ হলো।
এগারো মাসে তিনটি সন্তান কোনটা হবে ফকিরই ॥

ঘর আছে তার দুয়ার নাই মানুষ আছে তার কথা নাই।
কে বা তার আহার জোগায় কে দেয় সন্ধ্যাবাতি ॥

লালন ফকির ভেবে বলে ছেলে মরে মাকে ছুঁলে।
এ তিন কথার অর্থ না জানলে তার হবে না ফকিরি ॥

৮৫৫.

চেয়ে দেখ নারে মন দিব্যনজরে।
চারি চাঁদে দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে ॥

হলে সে চাঁদের সাধন অধর চাঁদ হয় দরশন হয়রে।
সে চাঁদেতে চাঁদের আসন রেখেছে ঘিরে ॥

চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া চাঁদে দেয় চাঁদের খেওয়া দেয়রে।
জমিনেতে ফলছে মেওয়া ঐ চাঁদের সুধা ঝরে ॥

নয়ন চাঁদ প্রসন্ন যাঁর সকল চাঁদ দৃষ্ট হয় তাঁর হয়রে।
অধীন লালন বলে বিপদ আমার গুরুচাঁদকে ভুলে ॥

৮৫৬.
জগত আলো করে সই ফুটেছে প্রেমের কলি।
ফোটে কী শোভা হয়েছে তার বাগানে এক মালি ॥

ফুলের নামটি নীল লাল জবা তাঁর ফুলে মধু ফলে সুধা।
তাঁর ভঙ্গি বাঁকা সে ফুলে হয় সাধুর সেবা কৃষ্ণ বাঁকা অলি ॥

ফুল ফুটে হয় জগত আলো তাঁরে দেখে প্রাণ শীতল হলো
ফকির লালন বলে তার উপায় বলো সাজছে সাধু দরবেশ অলি

৮৫৭.
জ্যান্তে মরা সেই প্রেমসাধন কি পারবি তোরা ।
যে প্রেমে কিশোরকিশোরী হয়েছে হারা ॥

শোষায় শোষে না ছাড়ে বাণ ঘোর তুফানে বায় তরী উজান।
তার কামনদীতে চর পড়েছে প্রেমনদীতে জল পোরা ॥

হাঁটতে মানা আছে চরণ মুখ আছে তার কইতে বারণ।
ফকির লালন বলে এ যে কঠিন মরণ তা কি পারবি তোরা ॥

৮৫৮.
তিন বেড়ার এক বাগান আছে।
তাহার ভিতর আজব গাছ আছে ॥

সেই যে আজব গাছে চন্দ্রসূর্য ফুল ফুটেছে।
কী শোভা তাহে দেখাচ্ছে বোঁটা নাই ফুল দুলে আছে ॥

সেই যে গাছের মূল কাটা পাহারা দেয় এই ছয় বেটা।
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র আঁটা সে গুরুরূপে ঝলক দিচ্ছে ॥

আছে মরা মানুষ গাছে চড়া আল্লাহ নবি বুলি বলছে তারা।
ফকির লালন বলে মনরে বোকা ফুলের সুধা খেলে মরা বাঁচে ॥

৮৫৯.
তৌহিদ সাগরে কঠিন পাড়ি।
অতলতলে মানিক পাবি হইলে ডুবরি ॥

তৌহিদে ডুবিলেরে মন খুলে যাবে গুপ্ত নয়ন।
নিদ্রা ছাড়া দেখবি স্বপন কলব হবে জারি ॥

চলে নদী ত্রিধারেতে নুবয়ত আর বেলায়েতে।
আর এক ধারা গোপনেতে সেই নদীর গভীরই ॥

সাধকের সাধনার জোরে সেই সাগর নেয় মন্থন করে
সাধলে পরে যাবি তরে না সাধলে অনাড়ি ॥

সেই সাগরে মিষ্টি পানি যে খেয়েছে যতোখানি।
লালন বলে যে যেমন জ্ঞানী তেমন তার ফকিরি ॥

৮৬০.
দমের উপর আসন ছিলো তাঁর।
আসমানজমিন না ছিলো আকার ॥

বিম্বরূপে শূন্যকারে ছিলো তখন দমের পরে।
ডিম্ব হতে বিম্ব ঝরে ছিলো শাঁই নূরের ভিতর ॥

যখন ছিলো বিন্দুমণি ধরেছিলো মা জননী।
ডিমে ওম দিলো শুনি ধরে ব্রহ্মার আকার ॥

ষোলো খুঁটি একই আড়া তিনশ ষাট রগের জোড়া।
নাভির নিচে হাওয়ার গোড়া লালন কয় সাত সমুদ্দুর ॥

৮৬১.
দেখলাম কী কুদরতিময়।
বিনা বীজে আজগুবি গাছ ফল ধরেছে তায় ॥

নাই সে গাছের আগাগোড়া শূন্যভরে আছে খাড়া।
ফল ধরে তার ফুলটি ছাড়া দেখে ধাঁধা হয় ॥

বলবো কী সেই গাছের কথা ফুলে মধু ফলে সুধা।
সৌরভে তার হরে ক্ষুধা দরিদ্রতা যায় ॥

জানলে গাছের অর্থ বাণী চেতন বটে সেহি ধনী।
গুরু বলে তাঁরে মানি অধীন লালন কয় ॥

৮৬২.
দেখবি যদি সোনার মানুষ দেখে যারে মনপাগলা।
অষ্টাঙ্গ গোলাপী বর্ণ পূর্ণকায়া ষোলোকলা ॥

ময়ূরীর কেশ ফিঙ্গেরই নাক দেখবি যদি তাকিয়ে দেখ।
ঐরূপ দেখে চুপ মেরে থাক বংশহীন তাঁর হংসগলা ॥

উরু দুটি তার দেখতে গোল সিংহ মাজা দেখি কেবল।
তাহাতে রয়েছে যুগল অনাদি কালা ॥

বক্ষস্থলে চাঁদের ছটা নাভিমূলে ঘোরে ল্যাটা।
দুটি বাহু বেলন কাটা দুটি হস্ত জবা ফুলা ॥

যে দেখে সে মহাযোগী হয় না অন্নভোগী।
লালন কয় সেই তো ত্যাগী হয়েছে তাঁর পূর্ণকলা ॥

৮৬৩.

দেখো আজগুবি এক ফুল ফুটেছে।
ক্ষণে ক্ষণে মুদিত হয় ফুল ক্ষণে আলো করেছে ॥

মূলের নীচে গাছের পাতা ডালের সঙ্গে শিকড় গাঁথা।
মধ্যস্থলে গাছের মাথা ফুল দেখি তারই কাছে ॥

নতুন নতুন রঙ ধরে ফুল দেখে জীব হয়রে ব্যাকুল।
কে করে সে ফুলের উল তাই ভেবে শঙ্কা লেগেছে ॥

সূর্যের সঙ্গে আছে কমল যতন করে তোলো সেই কমল।
তাই লালন ভেবে করে উল মূল মানুষ তাতে আছে ॥

৮৬৪.

ধরোরে অধর চাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে।
ক্ষীরোদ মৈথুনের ধারা ধরোরে রসিক নাগরা
যে রসেতে অধর ধরা থেকোরে সচৈতন্য হয়ে ॥

অরসিকের ভোলে ভুলে ডুবিসনে কূপনদীর জলে
কারণবারির মধ্যস্থলে ফুটেছে ফুল অচিন দলে
চাঁদচকোরা তাহে খেলে প্রেমবাণে প্রকাশিয়ে ॥

নিত্য ভেবে নিত্যে থেকো লীলাবাসে যেও নাকো
সেইদেশেতে মহাপ্রলয় মায়েতে পুত্র ধরে খায়
ভেবে বুঝে দেখো মনরায় সেইদেশে তোর কাজ কী যেয়ে ॥

পঞ্চবাণের ছিলে কেটে প্রেম যাজো স্বরূপের হাটে
সিরাজ শাঁই বলেরে লালন বৈদিক বাণে করিসনে রণ
বাণ হারায়ে পড়বি তখন রণখোলাতে হুবড়ি খেয়ে ॥

৮৬৫.
ধড় নাই শুধুই মাথা।
ছেলের মা রইলো কোথা ॥

ছেলের মাতাপিতা ঠিকানা নাই নামটি তাহার দিগ্বিজয় শুনতে পাই।
এমন ছেলে ভূ মণ্ডলে কে হয় জন্মদাতা ॥

ছেলের চক্ষু নাই বেশ দেখতে পায় চরণ নাই চলে বেড়ায় যেথা সেথায়।
হস্ত নাই বিমূর্তগুণে আহা কি বা ক্ষমতা ॥

ছেলের রূপে ভুবন আলো ছিলো কোথায় অকস্মাৎ জন্ম হলো।
লালন বলে সেই ছেলের গুণ কারো কারো হৃদয়ে গাঁথা ॥

৮৬৬.
নিচে পদ্ম উদয় জগতময়।
আসমানে যার চাঁদচকোরা কেমন করে যুগল হয় ॥

নিচের পদ্ম দিবসে মুদিত রয় আসমানেতে তখন চন্দ্রোদয়।
তারা দুইয়েতে এক যুগল আত্মা লক্ষ যোজন ছাড়া রয় ॥

গুরু পদ্ম হলে শিষ্য চন্দ্র হয় শিষ্যপদ্মে গুরু আবদ্ধ রয়।
ফকির লালন বলে এরূপ হলে যুগল আত্মা জানা সহজ হয় ॥

৮৬৭.
নিচে পদ্ম চরকবাণে যুগল মিলন চাঁদ চকোরা।
সূর্যের সুসঙ্গ কমল কীরূপে হয় যুগল মিলন
জানলিনে মন হলি কেবল কামাবশে মাতোয়ারা ॥

স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ভবে নপুংশকে না সম্ভবে
যে লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড গড়ে কী দেবো তুলনা তাঁরে
রসিকজনা জানতে পারে অরসিকের চমৎকারা ॥

সামর্থ্যকে পূর্ণ জেনে বসে আছে সেই গুমানে
যে রতিতে জন্মে মতি সে রতির কি আকৃতি
যাঁরে বলে সুধার পতি ত্রিলোকের সেই নিহারা ॥

শোণিত শুক্র চম্পাকলি কোন্ স্বরূপ কাহারে বলি
ভৃঙ্গরতির করো নিরূপণ চম্পাকলির অলি যেজন
গুরু ভেবে কহে লালন কিসে যাবে তাঁরে ধরা ॥

৮৬৮.

নৈরাকারে ভাসছেরে এক ফুল।
সে যে ব্রহ্মা বিষ্ণু হরি আদি পুরন্দর তাদের সে ফুল হয় মাতৃকুল ॥

বলবো কী সেই ফুলের গুণ বিচার পঞ্চমুখে সীমা দিতে নারে নর।
যারে বলি মূলাধার সেহি তো অধর ফুলের সঙ্গ ধরা তাঁর সমতুল ॥

নীরে অন্ত নাই স্থিতি সে ফুলে সাধকের মূলবস্তু এই ভূমণ্ডলে।
বেদের অগোচর সে ফুলের নাগর সাধুজনা ভেবে করেছে তার উল ॥

কোথা বৃক্ষ কোথারে তার ডাল তরঙ্গে পড়ে ফুল ভাসছে চিরকাল।
কখন এসে অলি মধু খায় সে ফুলি লালন বলে চাইতে গেলে হয়রে ভুল ॥

৮৬৯.

পাগল দেওয়ানা মন কী ধন দিয়ে পাই।
বলি যে ধন আমার আমার আমার বলতে কী ধন আছে আর
তাও তো আমার বোধ নাই ॥

দেহ মন ধন দিতে হয় সে ধন তাঁরই আমার তো নয়
আমি মুটে মোট চালাই।
আবার ভেবে দেখি আমি বা কী তাও তো আমার হিসাব নাই ॥

ও সে পাগলা বেটার পাগলা খিঁজি নয় সামান্য ধনে রাজি
কোন ভাবে কোন ভাব মিশাই।
পাগলার ভাব না জেনে যদি যায় শ্মশানে পাগল হয় কি অঙ্গে মাখলে ছাই ॥

ও সে পাগল ভেবে পাগল হলাম সেই পাগল কই সরল হলাম
আপনপর তো ভুলি নাই।
অধীন লালন বলে আপনার আপনি ভুলে ঘটে প্রেমপাগলের এমনই বাই ॥

৮৭০.

প্রেম প্রেম বলে করো কোর্ট কাচারি।
সেই প্রেমের বাড়ি কোথায় বলো বিহারী ॥

সেই প্রেমের উৎপত্তি কিসে শূন্যে কি ভাণ্ড মাঝে।
আবার কোন প্রেমেতে দিবানিশি ঘুরি ফিরি ॥

কোন প্রেমে মাতাপিতা খণ্ড করে জীবাত্মা।
না জেনে সেই প্রেমের কথা গোলমাল করি ॥

কোন প্রেমে মা কালী পদতলে মহেশ্বর বলি।
লালন বলে ধন্য দেবী জয় জয় হরি ॥

৮৭১.
বলোরে সেই মনের মানুষ কোনজনা।
মা করে পতি ভজনা মাওলা তাঁরে বলে মা ॥

কে বা আদ্য কে বা সাধ্য কার প্রেমেতে হয়ে বাধ্য।
কে জানালো পরমতত্ত্ব বেদে নাই যাঁর ঠিকানা ॥

একেতে দুই হলো যখন ফুল ছাড়া হয় ফলের গঠন।
আবার তারে করে মিলন সৃষ্টি করলেন সেইজনা ॥

লা মোকামে সেই যে নূরি আদ্যমাতা নূর জহুরি।
লালন বলে বিনয় করি আমার ভাগ্যে ঘটলো না ॥

৮৭২.
বিনা মেঘে বর্ষে বারি সুরসিক হলে মর্ম জানে তারই।
তার নাইরে সকালবিকাল নাই কালাকাল অবধারী ॥

মেঘমেঘিতে সৃষ্টির কারবার তারা সবে ইন্দ্রিয়রাজার আজ্ঞাকারি।
যেজন সুধাসিন্ধু পাশে ইন্দ্রিয়রাজার নয় সে অধিকারী ॥

নিরসে সুরস ঝরে সবাই কি তা জানতে পারে শাঁইয়ের কারিগরি।
যাঁর একবিন্দু পরশে এ জীব অনা'সে হয় অমরই ॥

বারিতে হয় ব্রহ্মাণ্ডের জীবন বারি হতে পাপ বিমোচন হয় সবারই।
সিরাজ শাঁই কয় লালন চিনে সেই মহাজন থাকো নিহারি ॥

৮৭৩.
বেঁজো নারীর ছেলে ম'লো এ কী হলো দায়।
মরা ছেলের কান্না দেখে মোল্লাজি ডরায় ॥

ছেলে ম'লো তিনদিন হলো ছেলের বাবা এসো জন্ম নিলো।
বাপের জন্ম ছেলে দেখলো এ কী হলো হায় ॥

দাই মেরে ফয়তা করে নাপিত মেরে শুদ্ধ হয়রে।
মোল্লাজির কাল্লা কেটে জানাজা পড়ায় ॥

লালন ফকির ভেবে বলে দেখলাম মরা ভাসে মরার ঘাটে।
আবার মরায় মরায় সাধন করে মরায় ধরে খায় ॥

৮৭৪.
ভবে আশেক যার লজ্জা কী তার সে খোঁজে দীনবন্ধুরে।
সে খোঁজে প্রাণভরে দীনবন্ধু প্রাণসখা দেখা দাও মোরে ॥

বাহ্য কাজ ত্যাজ্য করে নয়ন দুটি রূপের ঘরে।
সদাই থাকে ঐ রূপ নিহারে শয়নে স্বপনে কভু সে রূপ ভুলতে না পারে।

আশেকের ভেদ মাশুক জানে জানে না আর অন্যজনে।
সদাই থাকে রূপ বদনে রূপের মালা হৃদয়ে গেঁথে ভাসে প্রেমসাগরে ॥

মরণের ভয় নাইকো তার রোজ কেয়ামত রোজের মাঝার
মুর্শিদ রূপটি করে সে সার তাজমালা সব ফেলে লালন যায় ভবসিন্ধু পারে ॥

৮৭৫.
মরি হায় কী ভবে তিনে এক জোড়া।
তিনের বসত ত্রিভুবনে মিলনের এক মহড়া ॥

নর নারায়ণ পশু জীবাদি দুয়েতে এক মিলন জোড়া চারযুগ অবধি।
তিনেতে এক মিলন জোড়া এ বা কোন যুগের দাঁড়া ॥

তিন মহাজন বসে তিন ঘরে তিনজনার মন বাঁধা আছে আধা নিহারে।
অধর মানুষ ধরবি যদি ভাঙ দেখি বিধির বেড়া ॥

তিনজনা সাতপস্থির উপরে আদ্যপস্থি আছে ধরা জান গে যা তাঁরে।
ফকির লালন বলে সেহি ছলে মিলবে যে পথের গোড়া ॥

৮৭৬.
মহাসন্ধির উপর ফেরে সে।
মনরে সদাই ফেরো যাঁর তল্লাশে ॥

ঘটে পটে সব জায়গায় আছে আবার নাই বলা যায়।
চন্দ্র যে প্রকার উদয় জলের উপর তেমনই শাঁই আছে এই মানুষে ॥

যদিও সে অটলবিহারী তবু আলোক হয় সবারই।
কারো মরায় মরে না ধরা সে দেয় না ধরতে গেলে পালায় অচিন দেশে ॥

শাঁই আমার অটল পদার্থ নাইরে তাঁর জরামৃত
যদি জরামৃত হয় তবে অটল পদ না কয়
ফকির লালন বলে তা আর কয়জন বোঝে ॥

৮৭৭.
ময়ূররূপে কে গাছের উপরে।
দুই ঠোঁটে তসবিহ্ জপ করে ॥

গাছের গোড়ায় করিম রহিম শুনি গাছের নাম রেখেছেন শাঁই রব্বানি।
গাছের চারটি শাখা দেখতে বাঁকা কোন শাখায় কোন রঙ ধরে ॥

তিপ্পান্ন হাজার সেই গাছের নাম সেই নামটি হয় মারেফত মোকাম।
ডাকলে একনাম ধরে জীবের যতো পাপ হরে
সাধ্য কি জীবে এতো পাপ করে ॥

সত্তর লাখ আঠারো হাজার সাল নাম নিতে গেলো এতো কাল।
সিরাজ শাঁই বলছে লালন এসে কী করলি ভবের পারে ॥

৮৭৮.
মানুষের করণ সে নয় সাধারণ জানে কেবল রসিক যাঁরা।
টলে জীব বিবাগী অটল ঈশ্বর রাগী সেও রাগ লেখে বৈদিক রাগের ধারা ॥

আছে ফুলের সন্ধিঘরে বিন্দু যদি ঝরে
আর কী রসিক ভেয়ে হাতে পায় তারে
যে নীরে ক্ষিরে মিশায় সে পড়ে দুর্দশায় না মিশালে হেমাঙ্গ বিফলপারা ॥

হলে বাণে বাণক্ষেপণা বিষের উপার্জনা
অধোপথে গতি উভয় শেষখানা
পঞ্চবাণের ছিলে প্রেমাস্ত্রে কাটিলে তবে হবে মানুষের করণ সারা ॥

আছে রসিক শিখরে সেই মানুষ বাস করে
হেতুশূন্য করণ সেই মানুষের দ্বারে
নিহেতু বিশ্বাসে মিলে সে মানুষে ফকির লালন হেতুকামে যায় মারা ॥

৮৭৯.
মুর্শিদ রঙমহলে সদাই ঝলক দেয়।
যার ঘুঁচেছে মনের আঁধার সে দেখতে পায় ॥

সপ্ততলে অন্তপুরী আলীপুরে তাঁর কাচারি।
দেখলেরে মন সে কারিগরি হবি মহাশয় ॥

সজল উদয় সেইদেশেতে অনন্ত ফুল ফলে তাতে।
প্রেমজাল পাতলে তাতে অধর ধরা যায় ॥

রত্ন যে পায় আপন ঘরে সে কি বাইরে খুঁজে মরে।
না বুঝিয়ে লালন ভেড়ে দেশবিদেশে ধায় ॥

৮৮০.
মোকামে একটি রূপের বাতি জ্বলছেরে সদাই।
নাহি তেল তার নাহি সলতে আজগুবি হয়েছে উদয় ॥

মোকামের মধ্যে মোকাম স্বর্ণশিখর বলি যাঁর নাম।
বাতির লণ্ঠন সদাই মোদাম ত্রিভুবনে কিরণ ধায় ॥

দিবানিশি আট প্রহরে একরূপে সে চাররূপ ধরে।
বর্ত থাকতে দেখলি নারে ঘুরে ম'লি বেদের ধোঁকায় ॥

যেজন জানে সেই বাতির খবর ঘুঁচেছে তাঁর নয়নের ঘোর।
সিরাজ শাঁই কয় লালনরে তোর দৃষ্ট হয় না মনের দ্বিধায় ॥

৮৮১.

যাঁর আছে নিরিখ নিরূপণ দরশন সেই পেয়েছে।
তার অন্যদিকে মন ভোলে না একনাম ধরে আছে ॥

এই ভাণ্ডের জল ঢেলে ফেলে শ্যাম বলে উঠাইলে
আধা যায় থাকে মিশে আর কী মিলে
সেখানে নাই টলাটল সে অটল হয়ে বসেছে ॥

ক্ষণে আগুন ক্ষণে পানি কী বলো সে নামের ধ্বনি
সিরাজ শাঁইয়ের গুণেই লালন কয় বাণী
সে যে বাতাসের সঙ্গে বাতাস ধরে বসে আছে ॥

৮৮২.

যার সদাই সহজ রূপ জাগে।
বলুক বা না বলুক মুখে ॥

যাঁর কর্তৃক সয়াল সংসার নামের অন্ত নাই কিছু আর।
বলুক যে নাম ইচ্ছে হয় তার বলে যদি রূপ দেখে ॥

যে নয় গুরুরূপের আশ্রি কুজনে যেয়ে ভুলায় তারি।
ধন্য যারা রূপ নিহারি রূপ দেখে রয় ঠিক বাগে ॥

না মিশেই রূপ নিহারা সর্বজয় সাধক তাঁরা।
সিরাজ শাঁই কয় লালন গোড়া তুই আলিগেলি কিসের লেগে ॥

৮৮৩.

যে জন ডুবে আছে সেই রূপসাগরে।
রূপের বাতি দিবারাতি জ্বলছে তাঁর অন্তরে ॥

রূপরসের রসিক যাঁরা রসে ডুবে আছে তাঁরা।
হয়েছে সে জ্যান্তে মরা রাজবসন ছেড়ে ॥

রাজ্যবসন ত্যাজ্য করে ডোর কোপনি অঙ্গে পরে।
কাঠের মালা গলে নিয়ে করঙ্গ লয়েছে করে ॥

রূপনদীর ত্রিঘাটে যে বসেছে মওড়া এঁটে।
সেই নদীতে জোয়ার এলে রসিক নেয় ধরে ॥

জোয়ার আসলে উঠে সোনা ধরে নেয় সেই রসিকজনা।
কামনদীর ঘাটে লোনা লালন কয় সেই ঘাটে মানুষ মরে ॥

৮৮৪.
যে জন পদ্মহেম সরোবরে যায়।
অটল অমূল্যনিধি সে অনা'সে পায় ॥

অপরূপ সেই নদীর পানি জন্মে তাহে মুক্তামণি।
বলবো কী তাঁর গুণ বাখানি করস্পর্শে পরশ হয় ॥

পলক ভরে পড়ে চরা পলকে বয় তরকা ঝরা।
সেই ঘাট বেঁধে মৎস্য ধরা সামান্যের কাজ নয় ॥

বিনা হাওয়ায় মৌজা খেলে ত্রিখণ্ড হয় তৃণপোলে।
তাহে ডুবে রত্ন তোলে রসিক মহাশয় ॥

গুরু যার কাণ্ডারি হয়রে অঠাঁইয়ে ঠাঁই দিতে পারে।
লালন বলে সাধন জোরে শমন এড়ায় ॥

৮৮৫.
যেদিন ডিম্বুভরে ভেসেছিলেন শাঁই দরিয়ায়।
কে বা তাঁহার সঙ্গে ছিলো সেইকথা কারে শুধাই ॥

পয়ার রূপ ধরিয়ে সে যে দেখা দিলো ঢেউতে ভেসে।
কী নাম তাঁর পাইনে দিশে আগমে ইশারায় বলে কহে তাই ॥

সৃষ্টি না করিল যখন কি ছিলো তাঁর আগে তখন।
শুনিতে সেই অসম্ভব বচন একের কুদরত দুইজন তাঁরাই ॥

তাঁরে না চিনিতে পারি অধরেরে কেমনে ধরি।
লালন বলে সেহি নূরী খোদার ছোটো নবির বড়ো কেহ কেহ কয় ॥

৮৮৬.
রঙমহলে সদাই ঝলক দেয়।
যার ঘুঁচেছে মনের আঁধার সেই দেখতে পায় ॥

শতদলে অন্তঃপুরী আলিপুরে তার কাচারি।
দেখলে সে কারিগরি হবে মহাশয় ॥

সজল উদয় সেইদেশেতে অনন্ত ফল ফলে তাতে।
প্রেমপাতিজাল পাতলে তাতে অধরা ধরা যায় ॥

রত্ন যে পায় আপন ঘরে সে কী আর খোঁজে বাহিরে।
না বুঝিয়ে লালন ভেড়ে দেশবিদেশে ধায় ॥

৮৮৭.
রসিক সুজন ভাইরে দুজন আছো কোন আশে।
তোদের বাড়ি অতিথ এলো দুই ছেলে আর এক মেয়ে ॥

ভবের 'পরে এক সতী ছিলো বিপাকে সে মারা গেলো।
মরার পেটে গর্ভ হলো এই ছিলো তার কপালে ॥

মরা যখন কবরে নেয় তিনটি ছেলে তার তখন হয়।
তিনজনা তিনদেশে যায় মরা লাশ দূরে ফেলে ॥

মরার যখন মাংস পচে তিনজনাতে বসে হাসে।
অন্যলোকে ঘৃণা করে লালন তুলে নেয় কোলে ॥

৮৮৮.
রূপের ঘরে অটল রূপ বিহারে চেয়ে দেখ না তোরা।
ফণি মণি জিনি রূপের বাখানি দুইরূপে আছে সেইরূপ হল করা ॥

যেজন অনুরাগী হয় রাগের দেশে যায়
রাগের তালা খুলে সে রূপ দেখতে পায়
রাগেরই করণবিধি বিস্মরণ
নিত্যলীলার অপার রাগ নিহারা ॥

অটল রূপ শাঁই ভেবে দেখো তাই
সে রূপের কভু নিত্যলীলা নাই
যেজন পঞ্চতত্ত্ব যজে লীলারূপে মজে
সে কি জানে অটলরূপ কী ধারা ॥

আছে রূপের দরজায় শ্রীরূপ মহাশয়
রূপে তালাছোড়ান তাঁর হাতে সদাই
যেজন শ্রীরূপগত হবে তালা ছোড়ান পাবে
অধীন লালন বলে অধর ধরবে তাঁরা ॥

৮৮৯.
শুদ্ধ আগম পায় যেজনা।
নিগমেতে উঠছে আগম সেই পেয়েছে নবির বেনা ॥

হুহুঙ্কার ছাড়লে বিন্দু তাহাতে জন্মালে ডিম্ব।
দশ হাজার বছর ছিলো সেজদায় তাঁর আওয়াজ শুনে হয় দুইখানা ॥

অঙ্গ ভেঙ্গে করলেন ছয়খান পাঁচতনেতে বসালেন জান।
কে বুঝিবে মালেক শাঁইয়ের কাম সজলায় রূপ গঠলেন তৎক্ষণা ॥

যাতে হয় আদমের দৌলত পাঁচচিজ তখন করলেন খয়রাত।
ফকির লালন বলে সমঝে এবার তাইতে মা বলেছেন শাঁই রব্বানা ॥

৮৯০.
শুদ্ধপ্রেম রসিক বিনে কে তাঁরে পায়।
যাঁর নাম আলক মানুষ আলকেতে রয় ॥

রসরতি অনুসারে নিগূঢ়ভেদ জানতে পারে।
রতিতে মতি ঝরে মূলখণ্ড হয় ॥

নীরে নিরঞ্জন আমার আদিলীলা করে প্রচার।
হলে আপন জন্মের বিচার সব জানা যায় ॥

আপনার জন্মলতা খোঁজ গে তার মূলটি কোথা।
লালন বলে পাবি সেথা শাঁইয়ের পরিচয় ॥

৮৯১.
শূন্যভরে ছিলেন যখন গুপ্ত জ্যোতির্ময়।
লা শরিকালা কারুবালা ছিলেন লুকায় ॥

রাগের ধোঁয়ায় কুওকারময় সুখনাল ঝরে নৈরাকার হয়।
আপনার রসে আপনি ভাসে ডিম্বাকার দেখায় ॥

অন্ধকারে রতিদানে ছিলো সে না পতির রূপ দর্পণে।
হলো সেই না পতির সঙ্গে গতি নীরে পদ্মময় ॥

তার আগা গ'লে ডিম্ব ছোটে চৌদ্দ ভুবন তারই পেটে।
সিরাজ শাঁই কয় অবোধ লালন এ ভেদ বুঝতে পারলে হয় ॥

৮৯২.
শাঁই দরবেশ যাঁরা।
আপনারে ফানা করে অধরে মিশায় তাঁরা ॥

মন যদি আজ হওরে ফকির
জেনে লও সেই ফানার ফিকির সে কেমন অধরা।
ফানার ফিকির না জানিলে ভস্মমাখা হয় মশকরা ॥

কূপজলে সে গঙ্গাজল পড়িলে হয়রে মিশাল উভয় একধারা।
এমনই যেন ফানার করণ রূপে রূপ মিলন করা ॥

মুর্শিদরূপ আর আলক নূরী কেমনে এক মনে করি দুইরূপ নিহারা
লালন বলে রূপসাধনে হোসনে যেন জ্ঞানহারা ॥

৮৯৩.
সদর ঘরে যার নজর পড়েছে।
সে কী আর বসে রয়েছে ॥

সদরে সদর হয়েছে যাঁর বলো জন্মমৃত্যুভয় কী আছে তার।
সে না সাধন জোরে শমন আর যম মেরে বসে রয়েছে ॥

ফণি মণি মুক্তালতা তার সর্বাঙ্গে কাঞ্চন মুক্তা গাঁথা।
কহিবার নয় সে সব কথা রূপে ঝলক দিতেছে ॥

সে যখন দরজা খোলে মানুষ পবন হিল্লোলে চলে।
লালন বলে তাঁর কী বাহক আছে আর সে তো জপসাধন করেছে ॥

৮৯৪.
সদা সে নিরঞ্জন নীরে ভাসে।
যে জানে সে নীরের খবর নীরঘাটায় খুঁজলে তাঁরে পায় অনা'সে ॥

বিনা মেঘে নীর বরিষণ করিতে হয় তার অন্বেষণ।
যাতে হলে ডিম্বের গঠন থাকে অবিঘ্ন শম্ভুবাসে ॥

যথা নীরের হয় উৎপত্তি সেই আবিম্বে জন্মে শক্তি।
মিলন হলো উভয় রতি ভাসলে যখন নৈরেকারে এসে ॥

নীরে নিরঞ্জন অবতার নীরেতে সব করবে সংহার।
সিরাজ শাঁই তাই কয় বারে বার দেখরে লালন আত্মতত্ত্বে বসে ॥

৮৯৫.
সব সৃষ্টি করলো যেজন তাঁরে সৃষ্টি কে করেছে।
সৃষ্টি ছাড়া কী রূপেতে সৃষ্টিকর্তা নাম ধরেছে ॥

সৃষ্টিকর্তা বলছো যাঁরে লা শরিক হয় কেমন করে।
ভেবে দেখো পূর্বাপরে সৃষ্টি করলে শরিক আছে ॥

চন্দ্রসূর্য যে গঠেছে তাঁর খবর কে করেছে।
নীরেতে নিরঞ্জন আছে নীরের জন্ম কে দিয়েছে ॥

স্বরূপশক্তি হয় যেজনা কে জানে তাঁর ঠিক ঠিকানা।
জাহের বাতেন যে জানে না তার মনেতে প্যাঁচ পড়েছে ॥

আপনার শক্তির জোরে নিজশক্তির রূপ প্রকাশ করে।
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোরে নিতান্তই ভূতে পেয়েছে ॥

৮৯৬.
সরোবরে আসন করে রয়েছে আনন্দময়।
জীবনশূন্য সবাই মান্য স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁর মাথায় ॥

চক্ষু আছে নাহি দেখে তিন মরা একত্রে থাকে।
পরের মুখে মুখ লাগায়ে মর্মকথা কয় ॥

একে মরা নাই তাঁর জীবন তাঁর মধ্যে জ্যান্ত আছে একজন।
সাধকজনে সাধে যখন জাগে মানুষ ঐ সময় ॥

আশেকে করেছে লীলা ভবের 'পরে দেবের দেব পূজেছে তাঁরে।
পদ নাই সে চলে ফেরে রসিকের সভায় ॥

ঐ পিরিতে সবাই মেতে বিলাচ্ছে প্রেম হাতে হাতে।
ফকির লালন বলে ঐ পিরিতে মজেছি আপন ইচ্ছায় ॥

৮৯৭.
সুখসাগরের ঘাটে যেয়ে মৎস্য ধরো হুঁশিয়ারে।
জল ছুঁয়ো না মনরসনা বলি তোমায় বারে বারে ॥

সুখসাগরের তুফান ভারি তাহে বজরা সুলুক ধরতে নারি।
বিনা হাওয়ায় মৌজা তারই ধাক্কা লাগে কিনারে ॥

সে ঘাটে আছে পঞ্চ নারী বসে আছে খড়্গ ধরি।
তাতে হঠাৎ করে নাইতে গেলে এককোপে ছেদন করে ॥

প্রেমডুবারু হলে পরে যেতে পারে সেই সরোবরে।
সিরাজ শাঁই কয়রে লালন ধর গে-মীন হাওয়ার ঘরে ॥

৮৯৮.
সে ফুলের মর্ম জানতে হয়।
যে ফুলে অটলবিহারী শুনে লাগে বিষম ভয় ॥

ফুলে মধু প্রফুল্লতা ফলে তার অমৃত সুধা।
এমন ফুল দ্বীন দুনিয়ায় পয়দা জানিলে দুর্গতি যায় ॥

চিরদিন সেই যে ফুল দ্বীন দুনিয়ার মকবুল।
যাঁতে পয়দা দ্বীনের রসুল মালেক শাঁই যাঁর পৌরুষ পায় ॥

জন্মপথে ফুলের ধ্বজা ফুল ছাড়া নয় গুরুপূজা।
সিরাজ শাঁই কয় এইভেদ বোঝা লালন ভেড়োর কার্য নয় ॥

৮৯৯.
সোনার মানুষ ভাসছে রসে।
যে জেনেছে রসপন্তি সেই দেখতে পায় অনা'সে ॥

তিনশ ষাট রসের নদী বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদী।
তার মাঝে রূপ নিরবধি ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে ॥

মাতাপিতার নাই ঠিকানা অচিন দেশে বসতখানা।
আজগুবি তাঁর আওনাযাওনা কারণবারির যোগ বিশেষে ॥

অমাবস্যায় চন্দ্রোদয় দেখিতে যার বাসনা হৃদয়।
লালন বলে থেকো সদাই ত্রিবেণীর ঘাটে বসে ॥

৯০০.
হায় কী আজব কল বটে।
কী ইশারায় কল টিপে দেয় অমনি ছবি ধায় ওঠে ॥

অগ্নিজল হতে সে কলাপাতা তাতে।
ধড়ফড় করে চলছে ছবি কোন দাঁড়ায় হেঁটে ॥

হু হু শব্দে ধোঁয়া ওঠে ব্যোমকল হতে।
একজনা সে হাতনে ফোঁকে তার জায়গা ঐবার পিটে ॥

ঘরে রেখেছে এঁটে সকল কলের মূল গুটে।
লালন বলে সব অকারণ কখন যে কল যায় ফেটে ॥

৯০১.
হায় কী কলের ঘরখানি বেঁধে সদাই বিরাজ করে শাঁই আমার।
দেখবি যদি সে কুদরতি দেলদরিয়ার খবর কর ॥

জলের জোড়া সকল সেইঘরে তার খুঁটির গোড়া শূন্যের উপরে।
শূন্যভরে সন্ধি করে চারযুগ আছে অধর ॥

তিল পরিমাণ জায়গা বলা যায় আছে শত শত কুঠরিকোঠা তায়।
নিচে উপর নয়টি দুয়ার নয়দ্বারে দিচ্ছে বারাম এবার ॥

ঘরের মালিক আছে বর্তমান একজন তারে দেখলি নারে দেখবি আর কখন
সিরাজ শাঁই কয় লালন তোমায় বলবো কি শাঁইয়ের কীর্তি আর ॥

সংযোজন

৯০২.

স্থূ ল দে শ

শুধুরে ভাই জাতাজাতির দোষে।
ফিরিঙ্গিরা রাজা হলো এদেশেতে এসে ॥

হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান পরস্পর হিংসায় দিলো প্রাণ।
তাইতে পাদ্রি খ্রিস্টান যিশু খ্রিস্টের দ্বীন প্রকাশে ॥

কোটি কোটি ভারতবাসী এক হয়ে রইলো না মিশি।
কয়জনা ফিরিঙ্গি আসি এদেশেতে জুড়ে বসে ॥

হায়রে ধর্ম হায়রে জাতি বোঝে না সে রীতিনীতি।
লালন বলে জাতের প্রীতি ত্যাজো ত্যাজো একজাতে মিশে

৯০৩.

প্র ব র্ত দে শ

গুরু বিনে বান্ধব নাইরে আর।
নিদানের কাণ্ডারী গুরু ভবপারের কর্ণধার ॥

গুরু নামের মেঘ সাজায়ে থাকো রে মন চাতক হয়ে।
যদি গুরু দয়া করে ঘুচবে মনের অন্ধকার ॥

গুরু অনুরাগী যেজন কাজ কি রে তার ভজন সাধন।
রূপনগরে করে আসন পায় সে মহাধন অপার ॥

সিরাজ শাঁই কয় লালন ওরে গুরু বিনে ধন নাই সংসারে।
কাঙ্গালের কাঙ্গালী গুরু বাস করে ভক্তের দ্বার ॥

৯০৪.

সা ধ ক দে শ

কী আনন্দ ঘোষপাড়াতে পাপীতাপী উদ্ধারিতে।
দুলাল চাঁদকে নিয়ে সাথে বসেছেন মা ডালিমতলাতে ॥

কে বোঝে মা তোমার খেলা এখানে এই দোলের মেলা।
অন্ধ আঁতুর বোবা কালা মুক্ত হয় মা তোমার কৃপাতে ॥

কেন গো সতী স্বরূপিনী সামনে আছে সুরধুনী।
অনেক দূরে ছিলো শুনি এগিয়ে এলো তোর কাছেতে ॥

লালন কয় তোর মনকে কর খাঁটি ডালিমতলার নিয়ে মাটি।
হারাস যদি হাতের লাঠি পড়বি খানা আর ডোবাতে ॥

আলোচন

অখণ্ড লালনসঙ্গীত

অখণ্ড লালনসঙ্গীত ॥ ভূমিকা, সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা: আবদেল মাননান ॥ প্রচ্ছদ: মাহবুব কামরান ॥ প্রকাশক: রোদেলা প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ॥ প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ॥ মূল্য: ৪৬০ টাকা মাত্র

সুফিতত্ত্বে নিমগ্ন সাধক ফকির লালন শাঁই যে অমর বাণী রচনা করে গেছেন তাঁর স্বভাব কবিত্বের চরণ প্রতিভার বলে তার ব্যাখ্যা বহুমাত্রিক। সেই বহুমাত্রিকতা একই সঙ্গে যেমন সরল বাণীর ব্যঞ্জনায় সাধারণের হৃদয়গ্রাহী, তেমনই গভীর রহস্যময় ওই সরল বাণীর অন্তরালে নিহিত গূঢ়তত্ত্বে। যেখানে ইহকাল-পরকালে, স্রষ্টা-সৃষ্টিতে, সীমা আর অসীমের মধ্যে আশেক আর মাশুকের মিলনতৃষ্ণায়, অমর কাব্যের মহিমায় আধ্যাত্মচেতনার বাণী স্পন্দিত। অলৌকিক প্রতিভা ছাড়া যে একজন নিরক্ষর স্বভাব কবির পক্ষে এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক শাশ্বত বাণী রচনা সম্ভব নয়, লালনের গান শুনলে অথবা মগ্ন হয়ে তাঁর গানের বাণীর মর্মার্থ অনুধাবন করলে যে কেউ তা স্বীকার করবেন। এই মহর্ষি কবির গান গত প্রায় দুশ বছরে ধীরে ধীরে আবহমান বাংলার লোকসমাজ থেকে উচ্চশিক্ষিত ও নাগরিক সমাজেও প্রিয়তায় অভিষিক্ত হচ্ছে।

লালনের গান এখন আর শুধু লালনভক্ত ফকির, বাউল কিংবা গ্রামীণ জনপদের গায়েনের কণ্ঠেই সীমাবদ্ধ নয়, হালের তরুণ সমাজেও দিন দিন প্রিয় হয়ে উঠছে। বাড়ছে লালনের সঙ্গীতচর্চা ও তাঁর দর্শন নিয়ে গবেষণাও। গবেষকের গভীর নিষ্ঠা নিয়েই আবদেল মাননান সম্পাদনা করেছেন এই অমর মরমী কবির নয় শতাধিক গানের সংকলন 'অখণ্ড লালনসঙ্গীত'। ১১/১ বাংলাবাজার ঢাকার রোদেলা প্রকাশনীর এই রুচিস্নিগ্ধ বইটির প্রকাশক রিয়াজ খান। নিঃসন্দেহে এখনও লালনসঙ্গীত সম্পাদনা ও প্রকাশনার জন্যে অসংখ্য লালন অনুরাগীর ভালোবাসায় স্নাত হবেন এর সম্পাদক ও প্রকাশক।

আবদেলে মাননান নিজে একজন কবি। একই সঙ্গে সুফিতত্ত্ব ও বৈষ্ণব সাধকদের উপর নিবিড় পঠনপাঠনে তাঁর মানসলোক উদ্ভাসিত। তিনি লালনসঙ্গীতের দেহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাসহ নানামুখি একটি পর্যালোচনাও উপস্থান করেছেন 'কৈফিয়ত' শিরোনামের নাতিদীর্ঘ রচনায় যা কিছুটা নতুনত্বও এনেছে লালন ব্যাখ্যার জগতে।

'প্রকাশকের কথা' অংশে প্রকাশক যে মন্তব্য করেছেন তাতেও আন্দাজ করা যায় এই সুসম্পাদিত অখণ্ড সঙ্গীত সংকলনের স্বকীয়তা। তিনি লিখেছেন:"এতদিন ধরে যে লালনকে আমরা জেনে এসেছি কবি আবদেল মাননান সে ধারণা একেবারেই তছনছ করে উল্টে দিলেন। অন্য এক লালনকে তিনি উন্মোচন করলেন যাঁকে পৃথিবীর মানুষ এমনভাবে আর কখনও দেখেনি। বাজার চলতি আর সব লালন গবেষণা-প্রকাশনাকেও কবি বড় এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন"।

সে চ্যালেঞ্জ নিয়ে যে বিতর্ক হবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেখানেই মাননানের সাফল্য। তবে যারা গবেষণা বা দার্শনিক ব্যাখ্যা নিয়ে মাথা ঘামান না, স্রেফ লালনের গান ভালোবাসেন, তাদের জন্যও এক মলাটে লালনের সব গান (৯০৪টি) পেয়ে যাওয়া অনেক বড় প্রাপ্তিই বলতে হবে।

নাসির আহমেদ

দৈনিক সমকাল : সাহিত্য সাময়িকী 'কালের খেয়া' ৬ নভেম্বর ২০০৯, শুক্রবার, ঢাকা

অখণ্ড মন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচর

অখণ্ড লালনসঙ্গীত ॥ ভূমিকা, সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা: আবদেল মাননান ॥ প্রচ্ছদ: মাহবুব কামরান ॥ প্রকাশক: রোদেলা প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ॥ প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ॥ মূল্য: ৪৬০ টাকা মাত্র

এক.

বিগত প্রায় তিন-চার যুগ ধরে অখণ্ডমণ্ডলী আশ্রমে নিয়মিত গীত হয়ে আসছে "খণ্ড আজিকে হোক অখণ্ড অণু পরমাণু মিলিত হোক/ ব্যথিত পতিত দুঃখী দীনেরা ভুলুক বেদনা ভুলুক শোক" এ গানটি। কারণ খণ্ডসত্তা যে কোনো বস্তুর মধ্যবর্তী অবস্থা। সুপ্ত এবং বিকশিত এ দু অবস্থায় বস্তু কিংবা ভাব উভয়ই পরিণত তথা অখণ্ড অবস্থা। খণ্ড ও অখণ্ডের মূলগত এ দ্বান্দ্বিকতা না বুঝলে উচ্চাঙ্গিক লালনতত্ত্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতা বুঝবার উপায় নেই।
খণ্ডসত্তায় কোনো কিছু না দর্শিয়ে বিচারবোধের বিকাশসাধন করা মোটেও সম্ভবপর নয়। অথচ এ কথাটি মনে রাখার পরও আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ ফকির লালন শাঁইজির 'অখণ্ড চৈতন্য প্রকাশ' তথা তাঁর তত্ত্বভিত্তিক পদাবলি সঠিক ধারায় সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে চরম দায়িত্বহীনতা আর ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি। অতিসম্প্রতি সেই কলঙ্ক থেকে জাতি হিসেবে আমাদের দায়মুক্ত করলেন কবি-দার্শনিক আবদেল মাননান।
লালনশাহী ফকিরি মতের চর্চা ও চর্যা যে সময়কাল আর যে অবিভক্ত নদিয়া পরিমণ্ডল জুড়ে ব্যাপ্ত তিনি সেসব জায়গায় বছরের পর বছর হানা দিয়ে সাধক-গায়কদের মুখ এবং কলব ছেঁকে আমাদের জন্যে সযত্নে উদ্ধার করে এনেছেন লালন শাঁইজির ৯০১টি কালাম তথা পদাবলি। তাঁর আগে দুই বাংলার অপরাপর সংগ্রাহকগণ সর্বসাকুল্যে ৭৫০টি পর্যন্ত লালনপদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আবদেল মাননান সে সমস্ত পুরনো সংগ্রহ সীমা অতিক্রম করে নতুন মাত্রাযোগ করলেন 'অখণ্ড লালনসঙ্গীত' প্রকাশের মধ্য দিয়ে। নবপ্রজন্মের লালনচর্চা এর ফলে আরো গতিশীল হবার অভীষ্ট খুঁজে পাবে নিঃসন্দেহে। অখণ্ড বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের ইতিহাসে এ কাজটি খুব নীরবে ঘটে যাওয়া এক যুগান্তকারী ঘটনা। নিকট ভবিষ্যতে তাত্ত্বিক তথা দার্শনিক গবেষণার জগতে এ কাজের সুদূরপ্রসারী প্রভাবক ভূমিকা যে পড়বে–সেকথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

দুই.

সুবৃহৎ গ্রন্থটির 'প্রকাশকের কথা', 'কৈফিয়ত', সম্পাদনা প্রসঙ্গে' এবং 'পটভূমি' পাঠ করার পর আমাদের অতিরিক্ত প্রাপ্তিযোগ ঘটে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব, লীলা ও দেশাশ্রিত পদগুলোর শুরুতে 'তত্ত্বভূমিকা', 'লীলাভূমিকা' ও 'দেশভূমিকা'র বিস্তৃত বয়ানে। তাতে পদগুলোর নির্যাস, উৎপত্তি ও করণকারণ অতিসংক্ষিপ্ত আভাসে তুলে ধরেছেন আবদেল মাননান। এক্ষেত্রে তিনি শাঁইজির আদেশ-নির্দেশ সম্যকভাবে মেনে চলেছেন। খেয়াল রেখেছেন 'তত্ত্ব ভুলে কার গোয়ালে ধুয়ো দিলি'–এমন যেন না ঘটে পূর্ববর্তীদের মতো সম্পাদনাকর্মে।
শাঁইজির পদের পর্যায়ক্রমিক বিষয়বস্তু অনুযায়ী তাঁর অখণ্ড জ্ঞানরাজ্যের তত্ত্ব, লীলা এবং দেশ বিভাজিত এরূপ তিনটি তত্ত্ব, পাঁচটি লীলা ও চারটি দেশ অনুক্রমে মোট বারোটি সুনির্দিষ্ট বিভাগে এ প্রথম সাধুসুলভ শৃংখলায় লালনসঙ্গীতমালা সংকলিত করলেন আবদেল

মাননান। তত্ত্বাংশের পরে আশ্রয় ঘটেছে 'লীলা'রসের। পরিশেষে আছে দেশ (দেহ) বিভাজন। তত্ত্বের ভেতর রয়েছে 'নূরতত্ত্ব' 'নবিতত্ত্ব' ও 'রসুলতত্ত্ব'। লীলা অংশ বিন্যস্ত হয়েছে যথাক্রমে 'কৃষ্ণলীলা', 'গোষ্ঠলীলা', 'নিমাইলীলা', 'গৌরলীলা', এবং 'নিতাইলীলা'য়। লালনঘরের আত্মতত্ত্বসাধনার মার্গ বা দেহ তথা দেশগত পর্যায়বৃত্তকে সাধু সংকলক মূলত চারটি ভাগে ভাগ করেছেন; যথা: ১. স্থূলদেশ (শরিয়ত), ২. প্রবর্তদেশ (তরিকত), ৩. সাধকদেশ (মারেফত), ৪. সিদ্ধিদেশ (হকিকত)। প্রতিটি দেশের রয়েছে আবার ছয়টি করে পৃথক পৃথক লক্ষণ; যথা: দেশ, কাল, পাত্র, আশ্রয়, আলম্বন ও উদ্দীপন। যদিও সাধু পদাবলির এরূপ দেশ বিভাজন বাংলা তত্ত্বসঙ্গীতের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। মনুলাল মিশ্রকে আমরা দেখেছি কর্তাভজাদের 'ভাবের কথা' নামক আইন পুস্তকের বিশ্লেষণে এ দেশ বিভাগকে অন্য ঢংয়ে ব্যবহার করতে। তিনি সাধনার স্তরগুলোকে বর্ণনা করেছেন এভাবে; যেমন: "অবস্থা ও পাত্রভেদে প্রবর্ত্ত-সাধক-সিদ্ধি-সুর-নিবৃত্তি-মহৎ (মনুলাল মিশ্র ॥ কর্তাভাজন ধর্মের আদিবৃত্তান্ত ॥ প্রকাশকাল ১৩৭১ ॥ পৃ. ৮৪)। রামকৃষ্ণও এ কথা অন্যভাবে বলেছেন: "প্রথমে প্রবর্ত্তক–সে পড়ে, শোনে। তারপর সাধক তাঁকে ভাবছে, ধ্যান-চিন্তা করছে, নামগুণ কীর্ত্তন করছে। তারপর সিদ্ধ তাকে বোধে বোধ করছে, দর্শন করছে। তারপর সিদ্ধের সিদ্ধি" (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত ॥ চতুর্থ ভাগ ॥ সপ্তম খণ্ড ॥ ২য় পরিচ্ছদ)।

তিন.

একেবারে গোড়ার 'পটভূমিকা'য় আবদেল মাননান হুবহু দৃষ্টান্ত-প্রমাণসহ লালনদর্শনের বিভিন্ন দিকের বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আর তুলনামূলক অধ্যয়ন স্পষ্টতর ভাষায় পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল কিংবা অ্যাক্সিডেন্টাল মীর জাফরদের সাথে লালন শাঁইজির বাহ্য সাদৃশ্য দেখিয়ে তাঁকে তথাকথিত যুগোপযোগী করতে চাননি মোটেও। প্রাচ্যের ধর্মতত্ত্ব এবং দর্শনের ধারাক্রম থেকেই উৎস-উপাত্ত সংগ্রহ করে শাঁইজির গ্রহণ-বর্জন-সমন্বয়ের মর্মবস্তু স্বচ্ছকথায় তুলে ধরেছেন। মাননান বলতে চেয়েছেন, ধর্মতত্ত্ব এবং ভজনপথের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম ভেদরেখা আছে বিস্তর। শাঁইজির কালাম তথা পদ হচ্ছে সাধুজনের নিত্য ভজনপথের সহায়ক আর নিগূঢ় পদ্ধতির প্রকরণ। শুধুমাত্র আচারসর্বস্ব ধর্মতত্ত্ব এটি নয়। প্রাচ্যজগতের মধ্য থেকে ব্রাত্যজনের ভাষাবোধ মন্থন করে অখণ্ড দর্শনের স্বরূপে লালন শাঁই স্বয়ংপ্রকাশরূপে দণ্ডায়মান। এ প্রাচ্যজগত থেকে যেমন 'মূল'এর বহুলকথিত ভাষা ব্যবস্থার সূত্রপাত তেমনই বৈদিক এবং অনার্য নারায়ণী সমাজ ব্যবস্থার দর্শনই ক্রমান্বয়ে বিভক্ত ও বিকশিত হতে হতে আজকের প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রবল আধুনিকতা-উত্তরাধুনিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। মাননান এ সমস্ত চিন্তা-ভাবনার সপক্ষে কোরানসম্মত সুফিসূত্র এবং ফকির লালন শাঁইজির শব্দোৎপত্তির উদাহরণগুলোকে চুম্বক কথায় আমাদের সামনে টেনে এনেছেন। শাঁইজি বলছেন: "আদিকালে আদমগণ/ এক এক জায়গা করতেন ভ্রমণ/ ভিন্ন আচার ভিন্ন বিচার তাই তো সৃষ্টি হয়/ জানতো না কেউ কারো খবর/ ছিলো না এমন কালির জবর/ এক এক দেশে/ ক্রমে ক্রমে শেষে/ গোত্র প্রকাশ পায়/ জ্ঞানী দিগ্বিজয়ী হলো/ নানারূপ দেখতে পেলো/ দেখে নানারূপ/ সব হলো বেওকুফ/ এরূপ জাতির পরিচয়/ খগোল-ভূগোল নাহি জানতো/ যার যার কথা সেই বলতো/ লালন বলে/ কলিকালে/ জাত বাঁচানো বিষম দায়"। এ পদের সমর্থন কোরানেও রয়েছে; যেমন: "হে মানুষ, আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ এবং এক নারী হইতে। এবং তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি এবং গোত্রে যাহাতে তোমরা এক অপরের সহিত

পরস্পর পরিচিত (বা মিলিত) হইতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম মর্যাদাপ্রাপ্ত যে অধিক মোত্তাকি (সৎকর্মশীল)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ের উপর সূক্ষ্মদ্রষ্টা এবং শ্রোতা। তিনি সকল কিছুর খবর রাখেন"(সূরা আল হুজরাত ॥ বাক্য ১৩)। আমরা এখানে 'আল্লাহ' শব্দটি উচ্চারণের দ্বারা যেভাবে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রসূত সাত আসমানের উপর নিরাকার-অদৃশ্য স্রষ্টার কথা সাধারণত ধারণা করে থাকি সাধু আবদেল মাননান সেই তমসাচ্ছন্ন ভ্রান্ত ভাবনা-চিন্তার মোড় ঘুরিয়েই দেননি শুধু, একেবারে উল্টেপাল্টেই দিয়েছেন শাঁইজির 'আপনি আল্লাহ ডাকো আল্লাহ বলে'র দিকে নিঃশঙ্ক সংযোগে ।

ধর্ম, জাতি বা গোষ্ঠীগত সামঞ্জস্যের সাথে সাথে শাব্দিক উৎপত্তির দিকে নজর দিলেও স্পষ্ট বোঝা যায়, মূলত এক ভাষা থেকেই উৎপত্তি ঘটেছে বিশ্বের সকল ভাষার। আজকের কালের ভাষার মূলে নিহিত রয়েছে ভারতের আদিভাষার উদ্ভাবনা। উচ্চারণগত তারতম্য গ্রাহ্য না করলে অর্থ কিন্তু একই থাকে। 'পটভূমিকা'য় কবি আবদেল মাননান লিখছেন: "কোরানে বর্ণিত এক উৎস থেকে মানবজাতির আগমনের সূক্ষ্ম প্রমাণ মেলে বিশ্বভাষার মূলধ্বনির সাথে অন্য ভাষাগুলোর মুলধ্বনিগত মিলের দিকে তাকালে; যেমন: সংস্কৃত শব্দ 'অষ্টন্' থেকে হয়েছে যথাক্রমে আবস্তিক শব্দ 'অস্তন', পারসিক শব্দ 'হস্তন', গ্রিক শব্দ 'অক্টো', লাতিন শব্দ 'অক্টো', জর্মন শব্দ 'অক্টো, ফরাসি শব্দ 'উইথ', ইংরেজি শব্দ 'এইট' এবং বাংলা শব্দ 'আট'। আবার সংস্কৃত শব্দ 'দাদাসি' থেকে শব্দ থেকে হয়েছে আবস্তিক শব্দ 'দধাহি', পারসিক শব্দ 'দেহ', গ্রিক শব্দ 'ডিডোস', লাতিন শব্দ 'ডাস' ইত্যাদি"।

'অখণ্ড লালনসঙ্গীত' সম্পাদকের মূল 'পটভূমি' মোট ৫১ পৃষ্ঠায় ১৯টি অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে। পপুলার সব লৌকিক ধমর্জাত তামসিক-রাজসিক ধারণাতন্ত্র থেকে শাঁইজির সাত্তিক 'লোকোত্তর দর্শন'এ 'আল্লাহ', 'কোরান', 'ইসলাম', 'নামাজ' প্রভৃতি শব্দের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা যে একদম ভিন্নতর সেটা শুরুতে ধরিয়ে দিয়েছেন সম্পাদক। সজাগ-সতর্ক প্রহরীর মতো তিনি লোক এবং লোকোত্তর দর্শনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে শাদাকালো ভেদরেখা টেনে দেখিয়েছেন সত্যমিথ্যার স্বরূপে আসল পার্থক্যটা কোথায়। মনে রাখা জরুরি যে, শাঁইজি সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে খ্যাতির কালোয়াতি করেননি, করেছেন নিরেট দর্শনচর্চা। সেটা বুঝিয়ে না দিলে লালন শাহের কালামের মাহাত্ম্য সাধারণ লোক কখনো বুঝতে পারে না। শাঁইজির কালাম হলো আপন ভক্তগণের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধচর্চার দলিলস্বরূপ। তাই ভোগবাদী লোকজগতের আরোপিত আন্দাজ-অনুমানের উপর নির্ভর করে তাঁর রহস্যজগতে প্রবেশ লাভ করা একেবারে অসম্ভব। সেকথা প্রশ্নাকারে শাঁইজির কালাম দিয়েই পুনরুত্থাপন করেন তিনি: ইসলাম কায়েম যদি হয় শরায়/ কী জন্যে নবিজি রহে/ পনের বছর হেরাগুহায়/ পঞ্চবেনায় শরা জারি/ মৌলভিদের তম্বি ভারি/ নবিজি কী সাধন করি নবুয়তি পায়/ না করিলে নামাজ-রোজা/ হাসরে হয় যদি সাজা/ চল্লিশ বছর নামাজ কাজা/ করেছেন রসুল দয়াময়/ কায়েম উদ্ দ্বীন হবে কিসে/ অহর্নিশি ভাবছি বসে/ দায়েমি নামাজের দিশে/ লালন ফকির জানায় ॥

দু বাংলার খ্যাতঅখ্যাত আর সব লালন গবেষকের সাথে আবদেল মাননানের কাজের এখানেই মূল চরিত্রগত পার্থক্য যে, তিনি লালন শাঁইকে স্থানকালে আবদ্ধ করতে চাননি। প্রচলিত ও অতিরঞ্জিত জনপ্রিয় সমস্ত কল্প-কাহিনির বানোয়াট বিভ্রম জাল থেকে সম্পূর্ণ

নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিয়ে মাননান শাঁইজিকে স্থানকালজয়ী মুক্ত মহাপুরুষরূপেই অনুসন্ধান করেছেন। কোনো মহাপুরুষকে জাত-ধর্ম-গোত্রবিভক্তির অধীনে চিত্রিত করতে যাওয়া তাঁর সর্বজনীন দর্শনের পরিপন্থি কাজ। অবশ্য এতোকাল যাবৎ লালন শাহ্‌কে যারা 'বাউল ও হিন্দু' বলে কাঠমোল্লাদের মতো একতরফা প্রচারণা চালিয়ে এসেছে কবি তাঁদের দাবির ঘোর বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে লালন শাহের মূল ফকিরি ধর্মতত্ত্ব সুফির (অর্থাৎ মহানবির অঙ্গনচারী 'আসহাবে সুফ্‌ফা'র) আত্মদর্শনমূলক কোরান থেকেই উৎসারিত। শাঁইজির পদাবলি থেকে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন কীভাবে বেদ-বেদান্ত খারিজ করে লালন ফকির কোরানকে মহিমান্বিত রূপে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। কোরান ও লালনকে তিনি সমার্থক মর্যাদায় প্রমাণ করার ফলে 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' ধার্মিক ও লেখকগণ তাঁর উপর বিষম অসন্তুষ্ট। সেকথা আগাম জেনে-বুঝেই তিনি বলতে পেরেছেন: 'সত্যের জন্যে সব কিছু নির্ভয়ে ত্যাগ করা যায়। কিন্তু কোনো কিছুর জন্যে সত্যকে কখনো ত্যাগ করতে পারবো না।'

চার.

আবদেল মাননান সম্পাদিত 'অখণ্ড লালনসঙ্গীত' গবেষণাকর্মের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, শাঁইজির পদগুলো প্রাচীন সাধুদের মুখ থেকে কিংবা পুরনো খাতা থেকে তুলে এনে যে সমস্ত লালনসঙ্গীত গ্রন্থ ইতোপূর্বে দু বাংলায় শতবর্ষ ধরে প্রকাশিত হয়ে এসেছে, সে সমস্ত গ্রন্থরাজ্য ঘেঁটে এবং দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি সম্পাদনা পর্ষদের সহযোগে নানাবিধ তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ শেষে শাঁইজির সাধনাগত দর্শনের সাথে সঙ্গতি রেখে পদগুলো গ্রন্থবদ্ধ করা। উদাহরণস্বরূপ এখানে একটি পদের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটা খোলাসা করে দেখা যেতে পারে: শাঁইজির সাধকদেশের একটি বিখ্যাত পদ হচ্ছে 'আপনারে আপনি চিনিনে'। এ পদটি যেমন বহু জনপ্রিয় তেমনই এর দর্শনটিও গুরুত্ববহ। খন্দকার রফিউদ্দিন সম্পাদিত হুয়াল গনি 'ভাবসঙ্গীত' গ্রন্থটি ব্যতীত অপর সব গ্রন্থে রয়েছে এমতো : 'কর্তারূপের নাই অন্বেষণ/ অন্তরে কি হয় নিরূপণ/ আপ্ততত্ত্বে পায় শতধন/ সহজ সাধক জনে' (দ্রষ্টব্য: শাঁইজির দৈন্যগান ॥ ফরহাদ মজহার)। অন্যদিকে আবদেল মাননানের সর্বশেষ সংকলনে রয়েছে: 'কর্তারূপের নাই অন্বেষণ/ নইলে কি হয় রূপ নিরূপণ/ আপ্তবাক্যে পায় সে আদিধরন/ সহজ সাধকজনে'। 'আপ্ততত্ত্বে পায় শতধন' আর 'আপ্তবাক্যে পায় সে আদিধরন' এ বাক্য দুটির মধ্যে দর্শনের আকাশপাতাল ফারাক অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথম বাক্যের চেয়ে দ্বিতীয় বাক্যটিই বরং শাঁইজির মৌলিক ভাবদর্শনের সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ আপ্তবাক্যে সহজ সাধক যা পান সেটিই হলো আদিধরন। এ আদিধরনই সহজ ধর্মের মুখ্য বিষয়। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে 'আদিধরন' এর পূর্ণ বিশ্লেষণে না গিয়েও মোদ্দাকথায় বলা যায়, এ আদিধরনই হলো Great emptiness of mind তথা নাজাত বা নির্বান। আরবি কোরানে যাকে বলা হচ্ছে 'লা মোকাম' বা 'মোকামে মাহমুদা' সেটাই চিত্তশুদ্ধির সাধকের জন্যে সত্য ও সহজ। এ অবস্থায় উত্তীর্ণ মানুষই হলেন প্রকৃত শুদ্ধ, মুক্ত ও বুদ্ধসত্তা। অতি উচ্চস্তরের এমন সাধু-মহৎ ব্যক্তিত্বই 'সহজ মানুষ' অর্থাৎ 'মহাকাজে মহাধন্য মহামান্য মহাজন' একজন কামেল মোর্শেদ বা 'জগত গুরু।'

গোঁসাই পাহ্‌লভী

দৈনিক আজাদী : সাহিত্য সাপ্তাহিকী, ২৭ নভেম্বর ২০০৯, শুক্রবার, চট্টগ্রাম

এ পর্যন্ত সংগৃহীত ও সঙ্কলিত যতোগুলো 'লালনসঙ্গীত' গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে প্রায় সব ক'টিই অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত। তাতে ছয়শো থেকে আটশো পর্যন্ত গান খুঁজে পাওয়া যেতো। ওসব পুরনো সংগ্রহ সংখ্যার রেকর্ড ভেঙে কবি আবদেল মাননান নয় শতাধিক লালনসঙ্গীত সংগ্রহ ও সঙ্কলন করে 'অখণ্ড লালনসঙ্গীত' ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করলেন বহুদিনের নিরবিচ্ছিন্ন সাধনায়।

শুধু সংগ্রহকর্ম নয়, লালন ফকিরের মারেফতজ্ঞানের নিরিখে নূরতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব, রসুলতত্ত্ব, কৃষ্ণলীলা, গোষ্ঠলীলা, নিমাইলীলা, গৌরলীলা, নিতাইলীলা, স্থূলদেশ, প্রবর্তদেশ, সাধকদেশ ও সিদ্ধিদেশ অনুক্রমে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে লালনচর্চায় যুগান্তর ঘটালেন

এতোকাল যে 'বাউল' লালনকে আমরা জেনে শুনে এসেছি কবি আবদেল মাননান তাকে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়ে অন্য এক 'ফকির' লালনকে তুলে ধরলেন জগতের সামনে। তাতে আলেম-বুদ্ধিজীবীদের আরোপিত মান্ধাতার আমলের ভ্রান্ত ধারণা সকল খারিজ হয়ে যায়। প্রচলিত সব লালনবিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনাকে তিনি কঠিন এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। খণ্ডিত লালনচর্চার সমস্ত বদ্ধবৃত্ত ধারণা-সংস্কার থেকে তিনি শাঁইজিকে বের করে অখণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠা দিলেন।

সম্যকরূপে লালনকে দেখার এমন দিব্যদৃষ্টি আর কোনো কবির কস্মিনকালেও হয়নি।

আবদেল মাননানের লালনবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ

- তোমার নামের মহিমা জানাও গো শাঁই
- লালন বলে কুল পাবে না এবার ঠকে গেলে
- লালনদর্শন
- লালভাষা অনুসন্ধান . ১
- লালভাষা অনুসন্ধান . ২

প্রতিকৃতি ‖ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রচ্ছদ চিত্রণ ‖ মাহবুব কামরান